

ভারতীয় অর্থনীতি

ইহার স্বরূপ ও সমস্যা

INDIAN ECONOMY

Its Nature and Problems

অধ্যাপক অলক ঘোষ, এম. এ.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রীডার

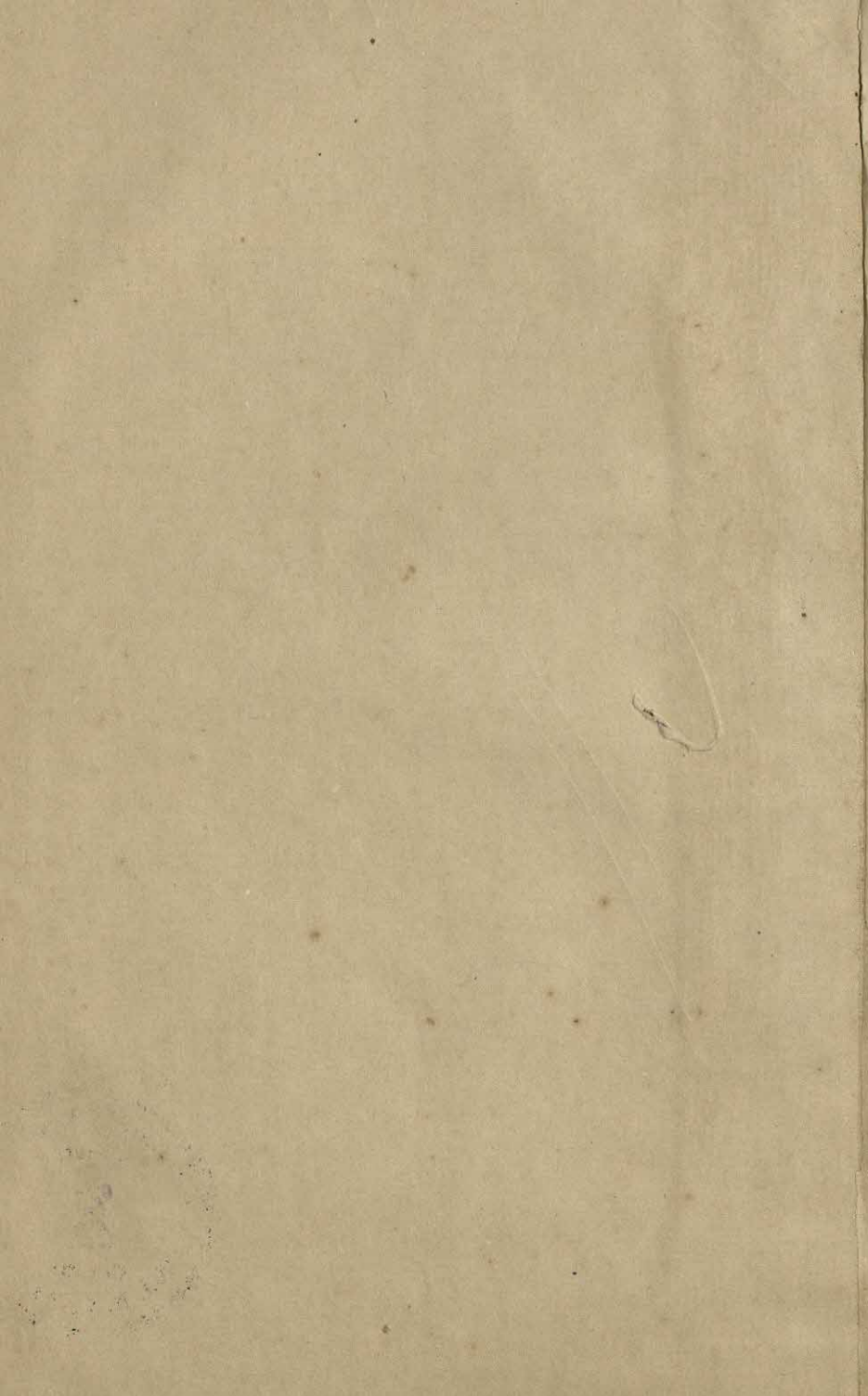
ওয়ার্ল্ড প্রেস

201
25.3.72

3277

C

✓

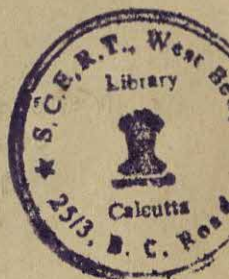


ভারতীয় অর্থনীতি

ইহার স্বরূপ ও সমস্তা

অধ্যাপক অলক ঘোষ, এম. এ.
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের রীডার,
প্রাক্তন অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা
এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলিকাতা

কলিকাতা
দি ওয়াল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
১৯৬৯



সর্বস্ব সংরক্ষিত
কপিরাইট ১৯৬৯, দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৩৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

LIBRARY	
TRAINING	
ACC. No.	209
Date	25.3.70
Call	
No.	

S.C.E.R.T., West Bengal
Date 3-7-85
Acc. No. 3277

de Roy

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী, ১৯৬৯

দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শ্রী শ্রীপতি ভট্টাচার্য কর্তৃক
৩৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীঅরুণ চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক আভা প্রেস, ৬-বি,
গুড়িপাড়া রোড, কলিকাতা-১৫ হইতে মুদ্রিত

ভূমিকা

আমার ইংরেজী ভাষায় লেখা 'Indian Economy' গ্রন্থটির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় উৎসাহিত হইয়া বাংলা ভাষায় উত্তরদানেচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনে বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় ব্রতী হইয়াছি। বিভিন্ন কলেজে শিক্ষাদানে নিযুক্ত অধ্যাপকগণ আমাকে ইংরেজী গ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ বাহির করিবার জ্ঞাত বার বার অনুরোধ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'ভারতীয় অর্থনীতি' নামক বর্তমান গ্রন্থখানি আমার ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা হইলেও ইহা তাহার হুবহু বঙ্গানুবাদ নয়।

পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভারতীয় অর্থনৈতিক সমস্টার ত্রিবার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের (বি. এ. ও বি. কম.) যে সিলেবাস চালু আছে তদনুসারে গ্রন্থটি লিখিত হইয়াছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং অন্যান্য সুনির্বাচিত প্রশ্নপত্র এবং উত্তর-সংকেত সন্নিবেশিত হইয়াছে, ইহার ফলে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণ উপকৃত হইবে।

বর্তমান গ্রন্থটির রচনাকার্যে আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র অধ্যাপক শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ আমাকে প্রভূত সহায়তা করিয়াছে এবং ওয়ার্ল্ড প্রেসের কর্তৃপক্ষ এবং কর্মীবৃন্দের তৎপরতা এবং দক্ষতায় পুস্তকটির সম্ভব প্রকাশ সম্ভব হইল বলিয়া তাঁহাদের নিকটও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যাহাদের জ্ঞাত গ্রন্থটি রচিত হইয়াছে সেই ছাত্রছাত্রীগণ উপকৃত হইলে আমি শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

অলক ঘোষ

১৯১৯৬৯

1871

THE FIRST PART OF THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON, FROM THE
FIRST SETTLEMENT TO THE
PRESENT TIME, IN TWO VOLUMES.
BY
JOHN B. BOWEN, ESQ.,
OF THE BOSTON BAR.
PUBLISHED BY
JOHN B. BOWEN, 10 NASSAU ST.
N. Y.

THE SECOND PART OF THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON, FROM THE
FIRST SETTLEMENT TO THE
PRESENT TIME, IN TWO VOLUMES.
BY
JOHN B. BOWEN, ESQ.,
OF THE BOSTON BAR.
PUBLISHED BY
JOHN B. BOWEN, 10 NASSAU ST.
N. Y.

THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON, FROM THE
FIRST SETTLEMENT TO THE
PRESENT TIME, IN TWO VOLUMES.
BY
JOHN B. BOWEN, ESQ.,
OF THE BOSTON BAR.
PUBLISHED BY
JOHN B. BOWEN, 10 NASSAU ST.
N. Y.

আমার ছোট্ট মা-মণি
অপিতাকে

মুচীগত

প্রথম খণ্ড

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় ॥ অনুন্নত দেশের প্রকৃতি ১-৯

অনুন্নত দেশের প্রকৃতি—বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ—অনুন্নত দেশের
সঠিক লক্ষণ—অনুন্নতির কারণ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক ১০-২৫

উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা—উন্নয়নের অর্থনৈতিক সর্তসমূহ—
কৃষি-উৎপাদন, সামাজিক মূলধনের চাহিদা ও শিল্পোন্নয়ন—মানবিক
সম্পদ—কৃষি বনাম শিল্প—ভারী-শিল্প—উন্নয়নের অর্থসংক্রান্ত দিক—
মূলধনের প্রয়োজনীয়তা—উন্নয়ন মূলধনের উৎসসমূহ—আভ্যন্তরীণ ঋণ,
কর ব্যবস্থা, ঘাটতি ব্যয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ—বাণিজ্য ব্যালান্স ।

তৃতীয় অধ্যায় ॥ অনুন্নত দেশের মূল সমস্যা ২৬-৩৫

অনুন্নত দেশের মূল সমস্যা—ছদ্মবেশী বেকারত্বের কারণ—নার্কসের
যুক্তি—ভাকিল ও ব্রক্ষানন্দের যুক্তি ।

দ্বিতীয় খণ্ড

চতুর্থ অধ্যায় ॥ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—

উহার উদ্দেশ্য ও সমস্যা ৩৬-৪১

অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সংজ্ঞা—সাম্যবাদ বনাম গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা
—অনুন্নত দেশে পরিকল্পনা পদ্ধতি ।

পঞ্চম অধ্যায় ॥ ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ... ৪২-৪৮

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—প্রথম পরিকল্পনার সাফল্য—
প্রথম পরিকল্পনার অর্থসংস্থান—প্রথম পরিকল্পনার মূল্যায়ন ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ... ৪৯-৬৪

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প, কৃষি
এবং পরিবহন—দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান—দ্বিতীয় পরিকল্পনার
পর্যালোচনা—দ্বিতীয় পরিকল্পনা এবং উচ্চাশার সঙ্কট—দ্বিতীয় পরি-
কল্পনার পুনর্বিচার—কর্মসংস্থান এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ—
কর্মসংস্থান ও প্রথম পরিকল্পনা—কর্মসংস্থান ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা—
কর্মসংস্থান ও তৃতীয় পরিকল্পনা—কর্মসংস্থান ও চতুর্থ পরিকল্পনা—প্রথম
ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা—দ্বিতীয় পরিকল্পনার ত্রুটি ।

সপ্তম অধ্যায় ॥ ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ... ৬৫-৭৮

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—তৃতীয় পরিকল্পনার আয়তন এবং
উদ্দেশ্য—ভারতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা—তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি—
তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতি—প্রতিরক্ষা, উন্নয়ন এবং জরুরী অবস্থা—
তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান—তৃতীয় পরিকল্পনার দোষত্রুটি—তৃতীয়
পরিকল্পনার মধ্যকালীন পর্যালোচনা—তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য এবং
বার্থতার চূড়ান্ত পর্যালোচনা ।

অষ্টম অধ্যায় ॥ ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ... ৭৯-৮৫

ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা—চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন—
চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি এবং শিল্প—চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থান ।

নবম অধ্যায় ॥ উন্নয়ন পরিকল্পনার সমীক্ষা ও

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ... ৮৬-১০৪

সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা—সমাজ উন্নয়ন এবং
জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক ফলাফল—সমাজ উন্নয়ন পরি-

কল্লনার মূল্যায়ন—বলবন্তী মেহতা কমিটির সুপারিশ—পরিবর্তিত
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যালোচনা—
সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে সেচ ব্যবস্থা—
পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প—বহুমুখীন পরিকল্পনা—
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখীন পরিকল্পনা।

তৃতীয় খণ্ড

দশম অধ্যায় ॥ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ ... ১০৫-১০৯

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ—ভারতের খনিজ সম্পদ—ভারতের বনসম্পদ
এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

একাদশ অধ্যায় ॥ জাতীয় আয় ... ১১০-১২১

জাতীয় আয়—জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব—ভারতের জাতীয় আয়
পরিমাপের অসুবিধা—ভারতে জাতীয় আয়ের হিসাব—ভারতে জাতীয়
আয়ের বৈশিষ্ট্য—জাতীয় আয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা—মহলানবীশ
কমিটির রিপোর্ট।

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায় ॥ জনসংখ্যা ... ১২২-১৩৫

জনসংখ্যা—জনসংখ্যা এবং কৃষি—জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং খাদ্য সরবরাহ—
জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন—ভারতীয় জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য—
ভারতে কি জনাধিক্য ঘটয়াছে?—পরিবার পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক
পরিকল্পনাসমূহ—জনসংখ্যা সম্পর্কে সরকারী নীতি।

ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥ কৃষি উৎপাদন, সরকারী নীতি এবং খাদ্যসমগ্রতা

১৩৬-১৫৪

কৃষি উৎপাদন, সরকারী নীতি এবং খাদ্যসমগ্রতা—ভারতীয় কৃষির
সমগ্রতাসমূহ—সরকারী নীতি এবং কৃষি পরিকল্পনা—প্রাক-পরিকল্পনা

যুগের খাতিরনীতি—উন্নয়নশীল ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা—
খাদ্যসমস্যা ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা—দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে
খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ—খাদ্যমূল্য স্থিতিকরণের জন্ত মেহতা
কমিটির কার্যসূচী—খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটির সুপারিশ—
সাম্প্রতিক খাদ্যসঙ্কট : কারণ ও প্রতিবিধান—খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য
—কৃষি উৎপাদনের স্থিতিশীলতার কারণ ও প্রতিবিধান।

চতুর্দশ অধ্যায় ॥ কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা এবং কৃষি ঋণ

১৫৫-১৬৯

কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা এবং কৃষিঋণ—ভারতে কৃষিপণ্যের বিক্রয়
সমস্যা—কৃষিপণ্য বিক্রয় সমস্যা সমাধানে সরকারী নীতি—কৃষিঋণ
সমস্যা—কৃষিঋণ সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কৃষিঋণ
ব্যবস্থা—সরকারী কৃষিঋণ জরিপ (১৯৫১-৫২) এবং ভারতে কৃষি-
ঋণের পুনর্গঠন—সর্বভারতীয় কৃষিঋণ জরিপ কমিটির প্রধান সুপারিশ :
সুসম্বদ্ধ গ্রাম্য ঋণ পরিকল্পনা—কমিটির সুপারিশসমূহের মূল্যায়ন—
সুসম্বদ্ধ কৃষিঋণ পরিকল্পনার পুনর্বিচার।

পঞ্চদশ অধ্যায় ॥ ভূমিসংস্কার এবং ভূমিনীতি

... ... ১৭০-১৮০

ভূমিসংস্কার এবং ভূমিনীতি—ভারতের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা—জমিদারী
প্রথা উচ্ছেদ—জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলাফল—পূর্বতন ভূমিস্বত্ব
আইন—পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভূমিস্বত্ব আইন—নূতন কৃষিনীতি :
নাগপুর প্রস্তাবনা।

ষোড়শ অধ্যায় ॥ সমবায় চাষ এবং সমবায় আন্দোলন

... ... ১৮১-১৯০

সমবায় চাষ এবং সমবায় আন্দোলন : ভারতে সমবায় চাষের অগ্রগতি
—যৌথ সমবায় কৃষি—ভারতে সমবায় আন্দোলন—প্রাক-পরিকল্পনা
যুগে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ—সেবা সমবায় সমিতি।

সপ্তদশ অধ্যায় ॥ কৃষিশ্রমিক এবং কৃষি যন্ত্রিকরণ

... ... ১৯১-২০০

কৃষিশ্রমিক এবং কৃষি যন্ত্রিকরণ : প্রথম ও দ্বিতীয় কৃষিশ্রমিক অনুসন্ধান
কমিটির বিবরণ—কৃষিশ্রমিকের পুনর্বাসন—কৃষি যন্ত্রিকরণ।

পঞ্চম খণ্ড

অষ্টাদশ অধ্যায় ॥ শিল্প পরিচালনা : ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা ২০১-২১৫

শিল্প পরিচালনা : ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা—ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যাবলী—ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার কুফল—১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন প্রবর্তনের পূর্বে এই প্রথার সংস্কার—১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইনের দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সংস্কার—১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের পর্যালোচনা—ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্যাটেল কমিটির (১৯৬৫) রিপোর্ট—মনোপলি অল্প-সম্মান কমিশনের রিপোর্ট—সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা—সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত—সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কৃষ্ণ মেনন কমিটির সুপারিশ ।

উনবিংশ অধ্যায় ॥ সরকার, শিল্প এবং বৈদেশিক মূলধন ... ২১৬-২৩২

সরকার, শিল্প এবং বৈদেশিক মূলধন—স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে ভারতের শিল্প-নীতি—১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি—প্রথম পরিকল্পনা এবং ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন—দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি—১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির মূল্যায়ণ— তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পনীতি—সরকারের প্রথম নীতি—পুরাতন বিভেদ-মূলক সংরক্ষণ নীতি—দ্বিতীয় ফিস্ক্যাল কমিশনের সুপারিশ এবং নূতন ফিস্ক্যাল নীতি, ১৯৪৯—উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা—ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃতি—বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি—বৈদেশিক মুদ্রাস্ফট এবং বৈদেশিক মূলধন ।

বিংশ অধ্যায় ॥ শিল্প-মূলধন ... ২৩৩-২৪৯

শিল্প-মূলধন—ভারতের শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন—কার্যাবলী—কার্যাবলীর পর্যালোচনা—ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা এবং রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন—রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন—অগ্রাগ্রা অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন এবং উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ।

একবিংশ অধ্যায় ॥ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা ... ২৫০-২৫৬

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা—কার্ভে কমিটির সুপারিশ—কার্ভে কমিটির সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা—ক্ষুদ্রশিল্পের সমস্যা—আন্তর্জাতিক পরিকল্পনা দলের নির্দেশিত প্রতিকার—ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি ।

দ্বাবিংশ অধ্যায় ॥ কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প ও তাহাদের

সমস্যা ... ২৫৭-২৭৫

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প ও তাহাদের সমস্যা—বস্ত্রশিল্প—পাটশিল্প—
কয়লাখনি শিল্প—বস্ত্র, পাট এবং কয়লাখনি শিল্পের আধুনিকীকরণ—
চিনিশিল্প—লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—চা শিল্প ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ॥ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিক সংঘ

এবং যোঁথ দরাদরি ... ২৭৬-২৮৭

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিক সংঘ এবং যোঁথ দরাদরি—শিল্প বিরোধ
সংক্রান্ত আইন—শিল্প বিরোধের কারণ—শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের
বর্তমান অবস্থা—শ্রমিক সংঘ—ভারতে শ্রমিক-আন্দোলনের অশুবিধা
—শ্রমিক-সংঘ আইন—ভারতীয় শ্রমিক সংঘের উন্নয়নের উপায়—
যোঁথ দরাদরি—যোঁথ দরাদরির সাফল্যের সূর্ত—শিল্প পরিচালনায়
শ্রমিকের অংশ গ্রহণ ।

চতুর্বিংশ অধ্যায় ॥ শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতা, মজুরি নির্ধারণ

এবং লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা ... ২৮৮-২৯৭

শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতা, মজুরি নির্ধারণ এবং লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা—
কারখানা আইন এবং শ্রমিকের দক্ষতা—নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র এবং
শ্রম-দক্ষতা—শিবরাও-কমিটির রিপোর্ট—মজুরি নির্ধারণ—সর্বনিম্ন মজুরি,
গ্রাযা মজুরি এবং মজুর বোর্ডের ভূমিকা—সর্বনিম্ন মজুরি ও ইহার প্রভাব
—১৯৪৮ সালের সর্বনিম্ন মজুরি আইন—গ্রাযা মজুরির সমস্যা এবং
১৯৫০ সালের গ্রাযা মজুরি বিল—ভারতীয় শিল্পে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা
—১৯৬৪ সালের বোনাস কমিশনের রিপোর্ট ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ॥ সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প-শ্রমিকের

বাসগৃহ এবং শ্রমকল্যাণ ... ২৯৮-৩০৯

সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্প-শ্রমিকের বাসগৃহ এবং শ্রমকল্যাণ—সামাজিক
নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা—১৯৪৮ সালের রাজ্যবীমা আইন—
বেকার বীমা—শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন—মেনন কমিটির
সুপারিশ এবং নূতন পরিকল্পনা—শিল্প-শ্রমিকদের বাসস্থান—পরিকল্পিত
অর্থনীতিতে শ্রমোন্নতি এবং শ্রমকল্যাণ ।

ষষ্ঠ খণ্ড

ষড়বিংশ অধ্যায় ॥ ভারতীয় কর ব্যবস্থার সংস্কার ... ৩১০-৩১৫

ভারতীয় কর ব্যবস্থার সংস্কার—কর নীতি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ
—ভারতীয় কর সংস্কার সম্পর্কে ডাঃ ক্যালডরের প্রস্তাব—কেন্দ্রীয়
সরকারের ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট।

সপ্তবিংশ অধ্যায় ॥ কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে

অর্থ-সম্পদের বণ্টন ... ৩১৬-৩২৫

কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে অর্থ-সম্পদের বণ্টন—নিয়মার এবং দেশমুখ
বাঁটোয়ারা—ভারতীয় রাজ্যগুলির আর্থিক সম্পর্ক—ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয়
আয়-ব্যয় ব্যবস্থা—প্রথম অর্থ-কমিশন—দ্বিতীয় অর্থ-কমিশন—তৃতীয়
অর্থ-কমিশন—চতুর্থ অর্থ-কমিশন।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ॥ কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের অর্থ-ব্যবস্থা ... ৩২৬-৩৪৪

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের অর্থ-ব্যবস্থা—কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়—ভারতের
জাতীয় ঋণের বর্তমান অবস্থা—প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় কর—রাজ্য
সরকারসমূহের আয়-ব্যয় ব্যবস্থা।

সপ্তম খণ্ড

উনত্রিংশ অধ্যায় ॥ ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

এবং বিল বাজার পরিকল্পনা ... ৩৪৫-৩৬০

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিল বাজার পরিকল্পনা—
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন—১৯৫৬ সালের
সংশোধনী আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন ক্ষমতা এবং দায়িত্ব—ভারতীয়
টাকার বাজার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ নীতি—রিজার্ভ
ব্যাঙ্কের বিল বাজার পরিকল্পনা।

ত্রিংশ অধ্যায় ॥ যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ... ৩৬১-৩৭৬

যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক—ব্যাঙ্কিং কোম্পানী
আইনের প্রধান প্রধান বিধানাবলী—১৯৬৩ সালের ব্যাঙ্কিং আইনের
প্রধান বিধানাবলী—আমানত বীমা পরিকল্পনা—বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, শ্রুফ
কমিটি এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য—ভারতে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থা
—কৃষি পুনঃঅর্থ-সরবরাহ কর্পোরেশন—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়-

করণ—রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা—কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পে অর্থ-সরবরাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকা—বাণিজ্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ॥ মুদ্রা-ব্যবস্থা, মুদ্রাক্ষন এবং মূল্যসূত্র ... ৩৭৭-৩৯৯

মুদ্রা ব্যবস্থা, মুদ্রাক্ষন এবং মূল্যসূত্র—দ্বিতীয় যুদ্ধ ও পরবর্তীকালে ভারতীয় মুদ্রা এবং বিনিময়—ভারতের স্টার্লিং পাওনা—১৯৪২ সালের মুদ্রামান হ্রাস—১৯৬৬ সালের জুন মাসের মুদ্রামান হ্রাস—ভারতের বর্তমান মুদ্রা-মান ব্যবস্থা—আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং ভারত—ভারতে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধান্তর যুগের মুদ্রাস্ফীতি—প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যসূত্র—তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্য-নীতি—সাম্প্রতিক অতিরিক্ত মূল্যসূত্র বৃদ্ধি এবং শিল্পগত মন্দা ।

অষ্টম খণ্ড

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় ॥ বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা

এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন ... ৪০০-৪১৬

বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারতের বহির্বাণিজ্য—ভারতীয় বাণিজ্যনীতি এবং বাণিজ্য চুক্তি—স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতের বাণিজ্যনীতি—গ্রেট ব্রিটেন, ইউরোপীয় সাধারণ বাজার এবং ভারত—দ্বিতীয় পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট—বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট এবং সরকারী নীতি পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ।

ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায় ॥ অন্তর্বাণিজ্য এবং পরিবহণ ব্যবস্থা ... ৪১৭-৪২৬

ভারতীয় পরিবহণ ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা—রেলপথ—জল-পরিবহণ—জাহাজ শিল্প—বিমানপথ—উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা ।

পরিশিষ্ট ॥ ... ৪২৭-৪৩৭

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তাবনা : পরিকল্পিত উন্নয়নের দুইটি পর্যায়—মধ্যবর্তী পর্যায়ের বাৎসরিক পরিকল্পনা—চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন এবং লক্ষ্য-মাত্রা—চতুর্থ পরিকল্পনার গঠনকৌশল—চতুর্থ পরিকল্পনা—তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য । বাণিজ্য ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ—সমালোচনা ।

প্রশ্নপত্র ॥ ... ৪৩৮-৪৪৮

ভারতীয় অর্থনীতি

ভারতীয় অর্থনীতি

প্রথম খণ্ড

অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও প্রাগ্-পরিকল্পনা যুগের ভারত

প্রথম অধ্যায়

অনুন্নত দেশের প্রকৃতি

(Nature of Underdeveloped Areas)

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে আজ পৃথিবী দুইটি শিবিরে বিভক্ত—উন্নত দেশসমূহ এবং অনুন্নত দেশসমূহ। উন্নত দেশে জনগণের মাথাপিছু আয় অধিক, জীবনযাত্রার মান উচ্চ; অপরপক্ষে জীবনযাত্রার নিম্নমান, কৃষির আধিক্য এবং শিল্পোন্নতির অভাব হইল অনুন্নত দেশের লক্ষণ। অনুন্নত দেশে সকলদিকেই উন্নয়নের প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। মূলধনের অভাব, দক্ষ কারিগরের অভাব, উৎপাদনের ভারসাম্যহীনতা, মাক্কাত আমলের কৃষি-পদ্ধতি, দেশব্যাপী অভিশপ্ত দারিদ্র্য এবং উহার দরুন সক্রিয় উন্নয়নের চাহিদার স্বল্পতা—ইহারা ই উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করিতেছে। প্রতিবন্ধক মূলধন, শ্রমিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতার অভাবের দরুন বৃটিশ শাসনাধীন ভারতে উৎপাদন-দক্ষতা খুবই নিম্নস্তরের ছিল।

অনুন্নত দেশে কৃষির আধিক্য এবং অতিরিক্ত কৃষি-নির্ভরশীলতা থাকিলেও কৃষি-উৎপাদনশীলতা অবিশ্বাস্যরকমের কম এবং জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক ছিল, অপরদিকে ঝুঁকিবহনকারী উত্তোক্তা, যন্ত্রপাতি এবং দক্ষ-শ্রমিকের অভাবের জন্ত দেশে দ্রুত শিল্পায়ণ হয় নাই। ইহা ছাড়া অনুন্নত দেশে সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার হয় না। বৃটিশ শাসনকালে ভারতে জনশক্তি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভাবই দেশের উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। জমির উপর জনসংখ্যার চাপ অত্যধিক হওয়া সত্ত্বেও উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে প্রতি একর জমির উৎপাদনের পরিমাণ অত্যন্ত কম ছিল অর্থাৎ জমির উপযুক্ত ব্যবহার হয় নাই। জলসেচের অভাব, সারের অভাব, উৎকৃষ্ট বীজের অভাব, এবং জমির ক্রমহ্রাসমান উর্বরতাশক্তি প্রভৃতি হইল উৎপাদন স্বল্পতার কারণ। কৃষিতে প্রচ্ছন্ন অধনিয়োগ (hidden underemployment) ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। কৃষক

সাধারণত জমিতে বছরে একটি ফসল ফলায়, আর বছরের ছয়-সাত মাস কর্মহীন অবস্থায় বসিয়া থাকে। ভারতে সংগঠিত মুষ্টিমেয় শিল্পের ক্ষেত্রেও মূলধনী যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার হয় না।

অল্পমতদেশে উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলি পরস্পরকে প্রভাবিত করে। উন্নয়নের অনেকগুলি প্রতিবন্ধক একই সঙ্গে দারিদ্র্যের কারণ এবং ফল। চক্রাকারে ক্রিয়াশীল দারিদ্র্যের প্রতিবন্ধকগুলিকে দারিদ্র্যের পাপচক্র (vicious circles of poverty) বলা হয়। অল্পমতদেশে দারিদ্র্যই অল্পমতির কারণ। উৎপাদন কম বলিয়া মূলধন গঠনের হার কম হয়—ইহাই মূল পাপচক্র। উৎপাদন কম বলিয়া প্রকৃত আয় কম হয়, আর প্রকৃত আয় কম বলিয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ কম হয়। আবার সঞ্চয়ের পরিমাণ কম বলিয়া বিনিয়োগের পরিমাণ কম হয়, আর বিনিয়োগের পরিমাণ কম হওয়ার দরুন মূলধনের ঘাটতি দেখা দেয়। মূলধনের ঘাটতি এবং উৎপাদনশীলতার স্বল্পতা ইংরেজ শাসনকালে ভারতে খুব স্পষ্ট হয়েই দেখা দেয় এবং মূল পাপচক্রের সৃষ্টি করে। অগ্ৰাণ্ড ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহকারী পাপচক্র মূল পাপচক্রের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া যায় এবং উহার শক্তি বৃদ্ধি করে। প্রকৃত আয়ের স্বল্পতা একই সঙ্গে স্বল্প চাহিদার কারণ ও ফল। প্রকৃত আয় স্বল্প বলিয়া চাহিদাও স্বল্প হয় এবং বিনিয়োগ প্রেরণার অভাবে মূলধনে ঘাটতি দেখা দেয়। আর একটি পাপচক্র দেশের অব্যবহৃত সম্পদকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপক নিরক্ষরতা, দক্ষতার অভাব, অসম্পূর্ণজ্ঞান, উপাদানের গতিহীনতা, এবং ব্রিটিশ শাসকদের উদাসীন নীতি—এই সকল কারণের ফলে আমাদের সম্পদের পরিপূর্ণ এবং যথাযথ ব্যবহার হয় নাই। অব্যবহৃত সম্পদ একইসঙ্গে জনগণের অনগ্রসরতার কারণ এবং ফল।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ : অল্পমত দেশের দৃষ্টান্ত (India during British Rule : A Typical Underdeveloped Economy)

পরিকল্পনা শুরু হইবার পূর্বে, বিশেষ করিয়া ইংরেজ আমলে, ভারতে অল্পমত দেশের সকল লক্ষণই বর্তমান ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে ভারতীয় অর্থনীতির দুইটি মূল বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হইত—উৎকট আয়বৈষম্য এবং বিতশালী শ্রেণীর বিলাসবায়। ভারতের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক উদ্ভূত অধিকতর উদ্ভূত সৃষ্টি না করিয়া এবং উন্নয়নের কাজে ব্যবহৃত না হইয়া ধনীদের ভোগবিলাসে ব্যয়িত হইত এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকারে উহাদের হাতে আসিয়া জমা হইতে থাকিত। ডঃ এস. কে. মুরজনের হিসাবানুযায়ী ১৯২০ সালে ভারতে মূল্যবান ধাতুর বৃদ্ধি মোট নীচ দৃশ্যমান সঞ্চয় (visible savings) বৃদ্ধির শতকরা ৪০ ভাগ ছিল।

বান্ধ আমানত, সরকারী ঋণ, যৌথমূলধনী কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভ, বীমা কোম্পানীর প্রিমিয়াম বাবদ আয় প্রভৃতি দৃশ্যমান সঞ্চয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হইবার পর, ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাহাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বিস্তৃত বাজার এবং কাঁচামালের অফুরন্ত সম্ভাবনা দেখিয়া ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। ভারতকে বৃটিশ শিল্পজাতদ্রব্যের বাজারে রূপান্তরিত বিদেশী শাসনের করিবার জন্ত বৃটিশ-শাসকেরা ভারতের শিল্পগুলিকে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল এবং ধীরে ধীরে ভারতকে গ্রেট ব্রিটেনের কৃষি-পশ্চাৎদেশে (hinterland) পরিণত করিল। যে পদ্ধতিতে ভারতের উন্নয়ন হইলে উহা ব্রিটেনের উন্নয়নের পরিপূরক হয় বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠী ভারতে সেই নীতিই প্রয়োগ করিয়াছে। নিজ স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নয়ন বৃটিশ সরকারের কাম্য ছিল না। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অভিশপ্ত দিন যাপন করিত, সঞ্চয়ের হার নৈরাশ্রজনকভাবে স্বল্প ছিল এবং শিল্প-বাণিজ্য ও পরিবহণে যে সামান্য অগ্রগতি হইয়াছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় উহা নেহাতই নগণ্য।

মোট কথা, ভারতের রাজনৈতিক পরাধীনতাই তাহার অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার কারণ। রাজনৈতিক পরাধীনতাই অর্থনৈতিক পরাধীনতার সৃষ্টি করে। অর্থনৈতিক দিক হইতে ভারতকে শক্তিশালী করিয়া তোলা কোনদিনই বৃটিশনীতির মূল লক্ষ্য ছিল না। বিদেশী শাসনব্যবস্থা ভারতের স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়।

বৃটিশ আমলে ভারতীয় কৃষির প্রতি সরকার যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করে নাই; বৃটিশ-শাসনের শেষ যুগেও মাক্কাতা আমলের কৃষিপদ্ধতি প্রচলিত ছিল এবং কৃষিতে যন্ত্রের ব্যবহার হইত না বলিলেও চলে। মূলধনের অভাবে কৃষির উন্নয়ন রুদ্ধ হইয়া বৃটিশ যুগে গিয়াছিল। অনমনীয় ও প্রতিকূল ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা, উচ্চ খাজনার কৃষির অবস্থা হার, অত্যধিক স্তরের হার, ঋণ-নির্ভর কৃষি, এবং জমির খণ্ডিকরণ ও অসম্বদ্ধতা—এইগুলিই হইল কৃষি উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। এই সকল কারণের জন্ত বৃটিশ যুগে ভারতীয় কৃষি “অনুন্নত শিল্পের” (depressed industry) পর্যায়ভুক্ত ছিল। কৃষি হইতে উদ্ধৃত আয় অ-কৃষিগত আয়ের তুলনায় খুবই কম ছিল এবং জমির মোট উৎপাদন সমগ্র কৃষি-নির্ভর জনগণের স্বাভাবিক জীবিকা নির্বাহের পক্ষে পর্যাপ্ত ছিল না।

বৃটিশ যুগে, জমিতে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ সত্ত্বেও সম্প্রসারণমূলক কৃষির (extensive cultivation) পরিবর্তে প্রগাঢ় কৃষির (intensive cultivation) কোন প্রসার দেখা যায় না। বৃটিশ-শাসনের শেষ ত্রিশ বৎসরে যে কৃষি-উৎপাদন

বৃদ্ধি পাইয়াছিল উহা উৎপাদন-কৌশলের পরিবর্তনের জন্ম হয় নাই, উহার কারণ সেচব্যবস্থার প্রসার এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধার। তাঃ এস. সুব্রামানিয়ামের মতে, দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে বাণিজ্যিক শস্যের ক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পাইলেও, দেশের প্রধান খাদ্য-শস্য ধানের ক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। ব্রিটিশ ভারতে মোট কর্ষিত জমির শতকরা মাত্র ১৫ ভাগ অঞ্চলে দুইটি ফসল উৎপাদন করা হইয়াছিল, কিন্তু দেশের বহু অঞ্চলে সার এবং জলসেচের ব্যবস্থা করিতে পারিলে বৎসরে দুইটি ফসল উৎপাদন করা যাইত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ভারতে কৃষির মোটেই প্রসার হয় নাই।

এইবার শিল্পের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। ১৮৫০ খৃস্টাব্দের পূর্বে ভারতে কোন বৃহদায়তন শিল্প গড়িয়া ওঠে নাই। ১৮৫০ খৃস্টাব্দের পর ধীরে ধীরে কয়েকটি ব্রিটিশ যুগে আধুনিক ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কর্ম-শিল্প সংস্থানের দিক হইতে বিচার করিলে বস্ত্রশিল্পই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। লোহ ও ইস্পাতের মত মূলশিল্পও সবে গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে কিন্তু মেশিনটুল ও ভারী রাসায়নিক শিল্পের ভিত্তি ব্রিটিশ যুগে স্থাপিত হয় নাই।

ব্রিটিশ যুগে ভারতে দেশীয় বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যাপ্ত হয় নাই দুইটি কারণে। কৃষি হইতে যে “অর্থনৈতিক উদ্ধৃত” সৃষ্টি হইত উহার অধিকাংশই লাভ করিত ধনী-ব্রিটিশ যুগে ব্যক্তিগণ এবং এই উদ্ধৃতের অধিকাংশই তাহাদের অগ্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ভোগবিলাসে এবং মূল্যবান ধাতু ও প্রস্তর কিনিতে ব্যয় করিত। দ্বিতীয়ত, শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইলে যে উৎসাহী এবং বুঝি বহনে আগ্রহী উদ্যোক্তার প্রয়োজন দেশে তাহার বিশেষ অভাব ছিল। লোকে শিল্প অপেক্ষা জমিতেই নিরাপদে টাকা খাটাইতে পছন্দ করিত।

ভারতের অর্থনৈতিক জগতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারলাভ করে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার মধ্য দিয়া। বিভিন্ন দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি ম্যানেজিং হিসাবে ম্যানেজিং এজেন্টগণ ইংলণ্ড হইতে ভারতে আসে। কিন্তু এজেন্টদের শীঘ্রই ভারতের নানা ধরনের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা তাহাদের ভূমিকা দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাহারা এদেশে শিল্প গড়িয়া তুলিতে উদ্যোক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রতিটি ম্যানেজিং এজেন্সির অধীনে শিল্প-কারখানা, খনি, বাগিচা, জাহাজ কোম্পানী, ব্যাঙ্ক, বিক্রয় এজেন্সি প্রভৃতি নানাবিধ শিল্প-উদ্যোগ রহিয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ উচ্চহারে কমিশন এবং নানাবিধ পারিশ্রমিক আদায় করিয়া তাহাদের নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পগুলিকে যতদূর সম্ভব শোষণ করিয়াছে। কার্যত, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাই আংশিকভাবে ভারতীয় শিল্পে দক্ষতার অভাব এবং ভারতীয় মূলধনের সন্নিধনতা বা লাজুকতার জন্ম দায়ী।

যে মুষ্টিমেয় ভারতীয় উদ্যোক্তা দেশে শিল্পোদ্যোগে আগ্রহী ছিল তাহারাও ব্রিটিশ

ম্যানেজিং এজেন্টদের পথ অনুসরণ করিয়া পাট, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট এবং ব্রিটিশ যুগে কাগজ-শিল্প গড়িয়া তুলিতে যত্নবান হইল। ব্রিটিশেরা ভারতে মূল ভারতীয় উদ্যোগ ভারী-শিল্প গড়িয়া তুলিতে চায় নাই, কারণ, উহা ভারতীয় অর্থনীতির মূলধন-বন্যাদ দূত করিবে এবং দেশের দ্রুত শিল্পায়ণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হ্রাসিত করিবে, ইহা ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী। আবার ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় ভারতীয় শিল্পপতিরাও ভারী-শিল্প গড়িয়া তুলিতে চায় নাই। উপরন্তু ব্রিটিশ উদ্যোক্তাগণ ভারী-শিল্প গড়িতেছে না দেখিয়া দেশীয় শিল্পপতিগণ ভাবিল যে, ঐ ধরনের শিল্পগঠনে ঝুঁকির পরিমাণ খুব বেশি। তাহারা আরও দেখিল যে ভারী-শিল্প হইতে দ্রুত মুনাফা অর্জনের কোন আশা নাই। এই সকল কারণের জন্য ব্রিটিশ আমলে ভারতের শিল্পকাঠামো সমতাহীন হইয়া পড়ে—বস্ত্রশিল্প এবং বাগিচাশিল্পের প্রসার হইলেও ভারী এবং মূল শিল্প সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হয়।

অনুন্নত দেশের সঠিক লক্ষণ

(Precise Meaning of an Underdeveloped Area)

অনুন্নত দেশের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা খুবই কঠিন ব্যাপার। সাধারণত মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতাই অনুন্নতির লক্ষণ বলিয়া গণ্য করা হয়। ১৯৩৯ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অর্থসংক্রান্ত সমস্তার জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ (National Advisory Council on International Monetary and Financial Problems) বিশ্বের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক লইয়া গঠিত ৫৩টি জাতির মাথাপিছু আয়ের হিসাব দেয়। এই পরিষদের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে আলোচ্যমান ৫৩টি জাতিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি অতি উন্নত দেশগুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশে বাৎসরিক গড় আয় ১০০০ টাকা বা তদুর্ধ্ব। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ইতালী, গ্রীস, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি উন্নত দেশগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত; এই সকল দেশে বাৎসরিক গড় আয় ৫০০ টাকা হইতে ১০০০ টাকা। ভারত, বর্মা, সিংহল, চীন, ইন্দো-নেশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার অধিকাংশ দেশ তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই সকল দেশে বাৎসরিক মাথাপিছু আয় ৫০০ টাকা বা তদপেক্ষা কম। এই দেশগুলিকে অনুন্নত দেশ বলে। এই সকল দেশে মাথাপিছু আয় কম বলিয়া জীবনযাত্রার মান নীচু। মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা জাতীয় অর্থনীতির স্বল্প উৎপাদনক্ষমতার পরিচায়ক। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া মাথাপিছু এবং জাতীয় আয়ের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধিই অনুন্নত দেশের মূল সমস্যা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু বাৎসরিক গড় আয় \$১২৮৬, যুক্তরাজ্যে উহা \$৮৪৬ আর ভারতে উহা মাত্র \$৬৭; উন্নত দেশসমূহের মাথাপিছু আয়ের সহিত ভারতের

মাথাপিছু আয়ের তুলনা করিলেই এক নৈরাশ্রজনক চিত্র ফুটিয়া ওঠে। উন্নত দেশের সহিত ভারতের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে বলিয়া অদূর ভবিষ্যতে উহাদের সমকক্ষ হইবার সম্ভাবনা ভারতের নাই। অবশ্য আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের মাধ্যমে যে ব্যাপক উন্নয়নী প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে, ১৯৭৫-৭৬ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ \$১০০-এ আসিয়া পৌঁছবে। উন্নয়নী প্রয়াসে কোনরূপ শৈথিল্য দেখা দিলে নয় বছরে ৩৩ ডলার আয় বৃদ্ধির এই সামান্য আশাটুকুও ফলবতী হইবে না।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোন্ পর্যায়ের তাহা জানিতে হইলে মাথাপিছু আয়ের তুলনামূলক আলোচনা ব্যতীতও আরও অনেক পদ্ধতি রহিয়াছে। যান্ত্রিকশক্তি
অত্যাশ্রয় ব্যবহারের পরিমাণ দ্বারাও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর নির্ধারণ
মানদণ্ড করা যায়। ১৯৩৯ সালের পূর্বে \$১০০ বা তদপেক্ষা কম আয়-
সম্পন্ন অল্পন্নত দেশের অধিবাসীরা মাথাপিছু দৈনিক ১.২ অশ্ব-শক্তি-ঘণ্টা (horse
বিদ্যুৎ power-hours) বিদ্যুৎ ব্যবহার করে। ভারতে মাথাপিছু দৈনিক
ব্যবহার বিদ্যুৎশক্তি ভোগের পরিমাণ ছিল ১.০ অশ্ব-শক্তি ঘণ্টার কিছু
কম। অপরপক্ষে, অতি উন্নত দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহারের পরিমাণ অল্পন্নত
দেশের তুলনায় বিশগুণ বেশী ছিল।

কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ হইতেও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর বুঝিতে পারা যায়। উন্নত দেশে একর প্রতি কৃষি উৎপাদন অল্পন্নত দেশের তুলনায় অনেক বেশী।

কৃষির ১৯৩৫—৩৯ সালে ভারতে একর প্রতি গম উৎপাদনের পরিমাণ
উৎপাদনশীলতা ছিল ১১ বুশেল, আর ঐ সময়ে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে একর
প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪১ বুশেল। ভারতে ধান প্রধান খাদ্যশস্য; দক্ষিণ-পূর্ব
এশিয়ার দেশগুলিতে ধান উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য তারতম্য দেখা যায়। ১৯৩৫—৩৯
সালে ভারতে একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৬ বুশেল, আর ঐ
সময়ে জাপানে একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৬ বুশেল। আধুনিক
কৃষি-পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে জাপানে উৎপাদনের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পায়। সম্মিলিত
জাতিপুঞ্জের খাদ্য এবং কৃষি দপ্তর হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, অতি উন্নত দেশের কৃষক
অল্পন্নত দেশের কৃষকের তুলনায় বারোগুণ বেশী আয় করে।

অল্পন্নতির কারণ (Why do Underdeveloped Areas Exist?)

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, ভারত ও অন্যান্য দেশের স্বল্পোন্নতির কারণ কি? অল্পন্নতির লক্ষণগুলি আলোচনায় মোটামুটিভাবে স্বল্পোন্নতির কারণসমূহের একটা আভাস পাওয়া গিয়াছে। অল্পন্নত দেশের কারণগুলিকে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া আলোচনা করা হইল।

(ক) রাজনৈতিক কারণ (Political Forces) : দ্রুত শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজন

কাঁচামালের সুনিশ্চিত যোগান এবং বিস্তীর্ণ বাজার। শিল্প-নির্ভর পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি এশিয়া ও আফ্রিকায় এই দুই-এর সীমাহীন সম্ভাবনা দেখিতে পাইয়া এই দুই মহাদেশে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করিতে তৎপর হয়। বিদেশী শাসন ভারত ও আফ্রিকা-এশিয়ার অগ্রাগ্রহ দেশগুলির স্বাভাবিক বিকাশের পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইউরোপীয় শক্তিগোষ্ঠী নিজেদের যন্ত্রশিল্পের প্রসারে ভারতকে যথাসাধ্য শোষণ করিয়াছে। ভারতীয় বিদেশী শাসন কুটির শিল্পসমূহকে ধ্বংস করিতে এবং কৃষিকে বিদেশী শিল্পের ও শোষণ কাঁচামাল যোগানের ক্ষেত্রে পরিণত করিতে বৃটিশ শাসন প্রত্যক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়া যে উদ্ধৃত্ত অর্জিত হইত তাহা সরকার দেশীয় জনগণের কল্যাণ বা শিক্ষার জন্য কখনো ব্যয় করে নাই। সমাজ দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল—একদিকে ছিল মুষ্টিমেয় বিত্তশালী জমিদার ও সামন্ত শ্রেণী, ইহারা যথেষ্ট রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিত, আর অপরদিকে ছিল লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত জনগণ—ইহারা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কোন রকমে তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। জীবন সম্পর্কে ইহারা চরম নৈরাশ্রবাদী ছিল বলিয়া দেশের উন্নয়নের কথা কখনো চিন্তা করে নাই। বিদেশীয় শাসনের অবসানে যখন জাতির জন্মান্তর ঘটিয়াছে তখন স্বভাবতই অমূল্য জাতির সম্মুখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রশ্ন গুরুত্ব লাভ করিয়াছে।

(খ) সামাজিক কারণ (Social Forces) : অধিকাংশ অমূল্য দেশে সমাজ-ব্যবস্থা এরূপ যে, উহা জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধির পথে বাধার সৃষ্টি করে। সমাজের উচ্চপর্ষায়ে রহিয়াছে মুষ্টিমেয় বিত্তশালী জমিদার, ব্যবসায়ী এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী; ইহারা স্বৈরাচারী এবং সাধারণত দুর্নীতিপরায়ণ। আর সমাজের নিম্ন পর্ষায়ে রহিয়াছে কৃষক এবং শ্রমিক লইয়া গঠিত দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি। কৃষক ও শ্রমিকদের শোষণ করিয়া ধনীসম্প্রদায় সমাজব্যবস্থার শীর্ষদেশে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। আর এই কারণেই সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। শুধু প্রাণরক্ষার তাগিদেই উহারা কোন একটা ছোটখাটো জীবিকা অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। “খাওয়ার জন্য উহারা কাজ করিত, আর কাজ করার জন্যই খাইতে পাইত” (“they must work to eat and eat to work”)।

জাতিভেদ প্রথা, যৌথপরিবার প্রথা এবং জনসংখ্যার চাপ—এইগুলি ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

জাতিভেদ প্রথা হিন্দুসমাজের এক মূল বৈশিষ্ট্য। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—জাতিভেদ এই চারিটি শ্রেণীতে হিন্দুসমাজ বিভক্ত। জাতিভেদ প্রথা শ্রমের প্রথা গতিশীলতা এবং শ্রমবিভাগের প্রসারে বাধা দিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিয়াছে।

সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োজন নূতন নূতন বিনিয়োগ। নূতন বিনিয়োগের দরুন দেশের বিশেষ বিশেষ শিল্প বিকাশলাভ করিবে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদায় পরিবর্তন দেখা দিবে। এই চাহিদা পরিবর্তনে সাড়া দিবার জ্ঞান শ্রমিক এক পেশা হইতে আর এক পেশায়, এক অঞ্চল হইতে আর এক অঞ্চলে আসিবে। কিন্তু ভারতে জাতিভেদ প্রথার দরুন শ্রমের গতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।

জাতিভেদ প্রথার দ্বারা ভারতীয় যৌথপরিবার প্রথাও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। যৌথপরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাওয়া, বস্ত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে যৌথপরিবার নিশ্চিত থাকায় উহাদের কর্মপ্রেরণা ও উদ্যোগস্পৃহা হ্রাস এবং প্রথা অলসতা প্রদর্শন পায়। যৌথপরিবার প্রথা শ্রমের গতিশীলতা হ্রাস করিয়া শিল্পোদ্যোগে এবং অর্থনৈতিক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

অল্পমত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের আর একটি বাধা হইল ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অল্পমত দেশগুলিতে জমির উপর জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান অত্যধিক চাপের ফলেই মাথাপিছু উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস জনসংখ্যা পাইয়াছে। কৃষি-উদ্ভূতের পরিমাণ কম বলিয়া জীবনযাত্রার উচ্চমান অসম্ভব। জমিতে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা রোধ করিবার জ্ঞান ভারত, সিংহল এবং জাভার ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম্য অঞ্চলে বিরাজিত। সংগ্রাম চলিতেছে। ১৯৬২ সালে ভারতে প্রতিবর্গ কিলোমিটারে গড় জনঘনত্ব ছিল ১৩০; উপরন্তু এই সকল দেশে জন্মহার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ক্রমশই দুরূহ হইয়া পড়িতেছে। জনগণের মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার পরিমাণ ভোগ বৃদ্ধি পাইলে তবেই জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব। ভারত এবং অন্যান্য অল্পমত দেশে মূল সামাজিক সমস্যা হইল জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা এবং শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

(গ) অর্থনৈতিক কারণ (Economic Forces) : অল্পমত দেশে জনগণের অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে জীবনধারণের উর্ধ্ব উৎপাদন উদ্ভূত সৃষ্টি করিতে হইবে। উদ্ভূতের পরিমাণ যত বেশি হইবে দেশে দ্রব্য ও সেবার পরিমাণ ততই বেশি হইবে। অল্পমত দেশে উৎপাদনের পরিমাণ কম বলিয়া উদ্ভূতের পরিমাণও স্বল্প।

বর্ধিত উৎপাদন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবে। কিন্তু সমস্যা হইল অল্পমত উৎপাদন দেশে মাথাপিছু উৎপাদন কিভাবে বৃদ্ধি করা যায়। মূলধন এবং বৃদ্ধির সমস্যা শ্রম প্রাকৃতিক সম্পদে প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন করা হয়। উৎপাদন উপাদানগুলি কাম্য অনুপাতে সম্মিলিত হইলে তবেই উৎপাদন সর্বাধিক হইবে। জমি এবং মূলধনের তুলনায় শ্রমিকের অনুপাত অধিক হইলে শ্রমিক পিছু

উৎপাদন কম হইবে। জমি এবং মূলধনের অনুপাতে শ্রমিকের সংখ্যা অধিক বলিয়া অনুন্নত দেশগুলিতে মাথাপিছু এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণ স্বল্প।

অনুন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা অতিরিক্ত বলিয়া উৎপাদনের অগ্রাগ্রহ উপাদানের তুলনায় শ্রমের যোগান খুব বেশি। অর্থাৎ জমি ও মূলধনের তুলনায় শ্রমের যোগান খুব বেশি বলিয়া মোট উৎপাদনের অতি সামান্য অংশ শ্রমিক পাইয়া থাকে—উহা এতই সামান্য যে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষেও উহা পর্যাপ্ত নয়। কৃষক এবং শ্রমিকেরা তাহাদের উৎপাদনের প্রায় সবটাই নিজেরা ভোগ করে বলিয়া কোন উদ্বৃত্তই সৃষ্টি হয় না; ফলে দেশে সঞ্চিত মূলধন-গঠন হইতে পারে না। কৃষকগণ সামান্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিলে জমিদার ও সামন্ত প্রভুরা ভূমিকরের মাধ্যমে উহা শোষণ করিয়া নিজেদের ভোগবিলাসে ব্যয় করে।

জনবহুল অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথ সহজেই নির্দেশ করা যায়। সমাধানের সম্ভা রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা অপসারণ করিয়া এবং শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিয়া সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে, আর সেই সঞ্চয় সঠিকভাবে বিনিয়োগ করিয়া মূলধন গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতে হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন দিক

(Different Aspects of Economic Development)

সরকারের ভূমিকা (Role of Government)

অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু করিবার পূর্বে দেশে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা পরিবেষ্টন সৃষ্টি করা প্রয়োজন। অত্যাচ্ছ সকল অবস্থা অনুকূল না হইলে শুধুমাত্র ভারী শিল্প গঠন, কৃষিযন্ত্রীকরণ অথবা দ্রব্য বিক্রয়ের জ্ঞাত নূতন এবং ব্যাপক বাজার সৃষ্টি করিয়া কোন দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাইতে পারে না। পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহ, ত্যাগ কর-কাঠামো, স্থায়ী মুদ্রাব্যবস্থা, অনুকূল আইন এবং বিচার ব্যবস্থারও

সরকারের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। সরকার দায়িত্ব এই সকল বিষয়গুলিকে প্রভাবিত করিতে পারে বলিয়া উন্নয়নের অনুকূল সর্তগুলি যাহাতে পূরণ হয় তাহার জ্ঞাত প্রয়োজন দৃঢ় এবং শক্তিশালী সরকার।

ইহা ছাড়া, আধুনিক সমাজের জ্ঞাত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দায়িত্বও সরকারের। অধিকাংশ অনুন্নত দেশে পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব এবং জনসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাটুকুর সুযোগ হইতেও বঞ্চিত। পর্যাপ্ত পরিমাণ রাস্তার অভাবে বাজারের আয়তন বাড়িতে পারে না বলিয়া শ্রমবিভাগ ও বিশেষিকরণ হয় না। বিশেষিকরণ না হইলে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা কঠিন হয়, আর সেই কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত হইতে পারে না। অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া তাহাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর এরূপ পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে যে তাহারা যেন দেশের উন্নয়নে তাহাদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠে। সুতরাং উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা এবং ব্যাপকহারে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব সরকারের। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের দায়িত্ব বেসরকারী উত্তোগের দায়িত্ব অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয়, বরং বেসরকারী উত্তোগের অভাবে শিক্ষাবিস্তার দেশ পিছাইয়া পড়িলে রাষ্ট্রের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। বস্তুতঃ সকল অনুন্নত দেশে শিল্পায়ণ এবং দেশের অগ্রগতিতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

অধিকাংশ অনুন্নত দেশে উৎপাদন ক্ষমতা এবং আয়স্বরূপ অস্বাভাবিক পরিমাণে স্বল্প এবং সেইজন্ম বর্তমান প্রয়োজন এবং ভবিষ্যৎ প্রাচুর্যের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা পূরণ করিবার পন্থা আবিষ্কার করিতে হইবে। প্রাথমিক নিফলতার দরুন এই সকল দেশে সীমিত আকারে নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হইবে না। ফলবিহীন সময় যত দ্রুত সম্ভব অতিক্রম করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত, অনুন্নত দেশগুলি বিলম্বে

অর্থনৈতিক উন্নয়ন শুরু করায়, সময় ইহাদের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্তমানের উন্নত দেশগুলি উন্নয়নের শুরুতে অনুন্নত দেশগুলি কর্তৃক পরিবেষ্টিত ছিল বলিয়া উহাদের শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের বাজার এবং কাঁচামালের যোগানে কোন অভাব ঘটে নাই। কিন্তু বর্তমানের অনুন্নত দেশগুলি সেই সুযোগ হইতে বঞ্চিত। জনসংখ্যা এবং সম্পদের মধ্যে সম্পর্ক পূর্বকার তুলনায় অধিকতর প্রতিকূল এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ভয়াবহ। যত সত্ত্বর উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টি করা যায় ততই মঙ্গল। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়া যাহাতে “বিস্ফোরণ” না ঘটায় তাহার জন্য প্রয়োজন দ্রুত উন্নয়ন এবং শিল্পায়ণ।

এই সকল উন্নয়নমূলক কার্য সমাধা করিবার জন্য রাষ্ট্রকে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে হইবে। ১৯৪৭ সালের পর জাতীয় সরকার পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ভারতে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন।

সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও রাষ্ট্রকে পেশাগত এবং কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। রাষ্ট্রকে যন্ত্রা, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যাধি উচ্ছেদ করার পেশাগত ও জল অনলস অভিযান চালাইতে হইবে এবং বাসগৃহ ও জনস্বাস্থ্যের কারিগরী শিক্ষা উন্নতির জন্য উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। এই সকল ব্যবস্থার দরুন শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। বর্ধিত উৎপাদন শুধুমাত্র জীবনযাত্রার ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতেই ব্যয়িত হইবে না, উহা অতিরিক্ত ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধনীয়-দ্রব্য উৎপাদনেও ব্যবহৃত হইয়া উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিবে।

উন্নয়নের অর্থনৈতিক সর্তসমূহ (Economic Considerations during the Process of Development) : অনুন্নত দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান বলিয়া উহাদের বিস্তারিত আলোচনা করা হইল : (ক) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি; (খ) সরকার কর্তৃক বহুবিধ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৃষ্টি এবং (গ) শিল্পায়ণ।

[এক] **কৃষি উৎপাদন :** প্রায় সকল অনুন্নত দেশই মূলত কৃষিপ্রধান। ভারত এবং অন্যান্য অনুন্নত দেশে দুইটি কারণে অধিকাংশ লোকই জমিতে নিযুক্ত রহিয়াছে : প্রথমত, জীবনধারণের জন্য, দ্বিতীয়ত, বিকল্প নিয়োগের সম্ভাবনা নাই বলিয়া কৃষি-প্রাধান্যের লোকে জমি চাষ করিতে বাধ্য হয়। এইজন্য কৃষি পরিবারের সকল কারণ ব্যক্তিই ভাগাভাগি করিয়া পৈতৃক জমি চাষ করে এবং উৎপন্ন দ্রব্য যৌথভাবে ভোগ করে। এইরূপ অবস্থায় উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টি করিতে হইলে, দুইটি সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। শিল্প এবং অ-কৃষিগত নিয়োগের সম্প্রসারণ করিয়া অতিরিক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং এইভাবে কৃষি হইতে বাড়তি শ্রমিক সরাইয়া লইতে হইবে। দ্বিতীয়ত, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সঠিক পদ্ধতি, কৌশল এবং কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

শুধুমাত্র কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জ্ঞান নয়, অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে খাত ও কাঁচামাল সরবরাহের জ্ঞানও উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কৃষি-শ্রমিকের উৎপাদন উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষমতা বাড়ানোর একটি প্রধান উপায় হইল কৃষি যন্ত্রীকরণ। কিন্তু উপায় ভারতে জোতের আয়তন ক্ষুদ্র এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বলিয়া যন্ত্রীকরণ করা লাভজনক নয়। খণ্ড জোতগুলিকে একত্র করিয়া জমি চাষ করিলে যন্ত্রীকরণ করার কোন অসুবিধা থাকে না। ভারতে সমবায় কৃষির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কৃষি গবেষণা : কৃষি গবেষণালব্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করিলে কৃষি সংগঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট সফল পাওয়া যাইবে। উপযুক্ত বীজ নির্বাচন, একই জমিতে বিভিন্ন কৃষি-শিক্ষার শস্য রোপণ, কাটনাশক ঔষধের ব্যবহার এবং উন্নত কৃষি প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব। কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে শিক্ষা দিবার জ্ঞান সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া সরকারের কর্তব্য।

ব্যাপক কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা এবং গবেষণা ও পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে সরকারের যথেষ্ট ব্যয় হইবে সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও ইহা সমর্থনযোগ্য, কারণ, এই ব্যয়ের দরুন একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

১৯২৮ সালে কৃষির উপর রয়েল কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার পর ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষি সংক্রান্ত গবেষণার ব্যাপারে পুসায় অবস্থিত ইম্পিরিয়াল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট যথেষ্ট কাজ করিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান ত্রুটি এই যে, গবেষণা এবং পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান কৃষকদের কৃষিসংক্রান্ত নিকট পৌঁছাইয়া দিবার কোন ব্যবস্থা হয় নাই। কিন্তু প্রথম গবেষণা ও পরিকল্পনাকালে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা, যৌথসমবায় চাষ পরিকল্পনা এবং গ্রাম সম্প্রসারণ সেবার উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করায় কৃষি গবেষণা এবং পরীক্ষার ফল কৃষকদের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিসংক্রান্ত গবেষণার জ্ঞান ২৮ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত টাকাটা ব্যয়িত হয় নাই বলিয়া ব্যাপক কৃষিবিপ্লব বিলম্বিত হয়।

ভূমিস্বত্ব আইন : অধিকাংশ অনুন্নত দেশে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা জমিদার কর্তৃক কৃষককে শোষণ করিতে সহায়তা করে। জমিদারের অত্যাচার হইতে কৃষকদিগকে ভূমি সংস্কারের রক্ষা করিবার জ্ঞান এবং যতদিন তাহারা জমি চাষ করিবে প্রয়োজনীয়তা ততদিন জমিতে তাহাদের স্বত্ব নিশ্চিত করিবার জ্ঞান উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন। আইন দ্বারা কাম্যপরিবর্তন সাধন করা অসম্ভব বলিয়া মনে হইলে বৈপ্লবিক সংস্কারসাধন করিতে হইবে। জমিদারশ্রেণী কৃষকদের

এরূপভাবে শোষণ করে যে, উৎপাদন যেটুকু বৃদ্ধি পায় জমিদারেরাই উহা আত্মসাৎ করে। এই জন্ম রায়তেরা উন্নত প্রণালীতে জমি চাষ করিতে চায় না এবং তাহারা স্বল্প উৎপাদন, স্বল্প আয় করিয়া অনন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। চিয়াং-কাইশেকী চীন এবং পরাধীন ভারতে এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল।

বৃটিশ যুগে কৃষকের স্বার্থ রক্ষার জন্ম ভারতে বহু ভূমিস্বত্ব আইন পাশ হইয়াছিল কিন্তু উহাতে ভূমিহীন কৃষকদের কোন ব্যবস্থা না থাকার দরুন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। কৃষকদের দারিদ্র্য এবং শোষণের অত্যন্ত কারণ জমিদারী ব্যবস্থা। কিন্তু এই প্রথা উচ্ছেদের কোন ব্যবস্থাই বৃটিশ যুগে করা হয় নাই। ডাঃ রাধাকমল মুখার্জী এবং অত্যাগত অর্থনীতিবিদগণের মতে দায়িত্ববিহীন জমিদারদের জমিদারী প্রথার ক্রটি দূর করিবার পক্ষে শুধুমাত্র ভূমিস্বত্ব আইনের সংস্কারই যথেষ্ট নয়। জমিদারী প্রথার পরিপূর্ণ উচ্ছেদই হইবে ভারতীয় কৃষি সংগঠনের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু বৃটিশ যুগে এই ধরনের কোন বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করা হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার এই

ভূমিসংস্কারের	বিষয়ে দৃষ্টি দেন এবং জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্ম বিহার, উড়িষ্যা,
প্রথম পদক্ষেপ :	পশ্চিম বাংলা, উত্তর প্রদেশ এবং মধ্য প্রদেশে আইন পাশ করা
জমিদারী উচ্ছেদ	হয়। সমবায় যৌথ চাষ প্রবর্তন করাই হইল সরকারের কৃষি-সংক্রান্ত নীতির মূল লক্ষ্য। এই ব্যবস্থায় জমি একত্রিত করিয়া চাষ করা হইবে, জমিতে
সরকারী	কৃষকের স্বত্ব থাকিবে এবং জমির আয়তন অনুসারে কৃষক উৎপাদিত শস্যের অংশ ভোগ
ভূমিনীতির	করিবে। যাহারা সমবায় ধামারে কৃষিকার্য করিবে, তাহাদের
মূল লক্ষ্য	জমি থাকুক আর নাই থাকুক, উহারা পরিশ্রমের অনুপাতে ফসলের
	অংশ পাইবে। “জমি কৃষকের” (Land to the tillers) —

সরকারী ভূমিনীতির ইহাই মূল লক্ষ্য।

কৃষি ঋণ : শুধুমাত্র ভূমি-সংস্কারের মাধ্যমেই যথেষ্ট পরিমাণে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হইবে না। অল্পমত দেশে ছোট ছোট কৃষকেরা চরম ঋণগ্রস্ত, সরকারের উচিত ইহাদের ঋণভার লাঘব করিবার জন্ম উপযুক্ত পস্থা অবলম্বন করা এবং স্বল্প সুদে ঋণদানের ব্যবস্থা করা। আইন প্রণয়ন করিয়া বেসরকারী ঋণদান ব্যবস্থার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিয়া কৃষি-ঋণ সমস্তার প্রতিকার ঋণদানে সমবায়ের করা যাইবে না। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, সরকারী ভূমিকা সহায়তায় কৃষি-ঋণদান সংস্থার সৃষ্টি এবং ফসল-বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া কৃষি ঋণের যথার্থ সমাধান করা যাইতে পারে। সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষকদিগকে বীজ, সার এবং কৃষি-যন্ত্রপাতি ক্রয়ের বন্দোবস্ত করিতে পারিলে ইহা কৃষি ঋণ ভার লাঘব করিতে সহায়তা করিবে। সমবায় ব্যাঙ্কের সমিতি স্থাপন করিতে পারিলে কৃষক তাহার ফসলের উপযুক্ত দাম পাইবে এবং উহা তাহার আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে। সমবায় বিক্রয় সমিতি গঠনেও সরকারের উত্তোগী হওয়া উচিত।

ভারতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে কতিপয় গ্রাম-সমবায় সমন্বিত সুসম্বদ্ধ গ্রাম্য ঋণ পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। “কতিপয় গ্রাম-সমবায়” (several village co-operatives) ঋণবটনে কিছু পরিমাণ সাফল্যলাভ করে, কিন্তু ইউনিটগুলির আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়ায় উহার সরকারী নিয়ন্ত্রণমুক্ত ছিল না। পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে গঠিত “একক গ্রাম-সমবায় সমিতি” (one village co-operatives) সারা দেশে সম্প্রসারিত করার যে নূতন প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহা সরকার গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। এই একক-গ্রাম-সমবায় সমিতিগুলি বহুমুখীন সেবা-সমবায় সমিতির ভিত্তি হইবে এবং যৌথ-সমবায় চাষের পথ সুগম করিবে।

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতে অধিকাংশ কৃষকই ঋণভারে জর্জরিত ছিল। গ্রাম্য মহাজন কৃষকের দারিদ্র্যকে মূলধন করিয়া অর্থোপার্জন করিয়াছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার সুদখোরী আইন এবং ঋণভার হ্রাসের উদ্দেশ্যে কতকগুলি আইন পাশ করিয়া-ছিলেন কিন্তু উহার কৃষিঋণ সমস্যার উপরিভাগই শুধু স্পর্শ করিয়াছিল, মূলোৎপাটনে সমর্থ হয় নাই। যাহাতে কৃষকেরা লাভবান হয় সেই উদ্দেশ্যে সমবায় আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার জন্ত কোন সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করা অথবা বিশেষ কৃষি-ঋণদান সংস্থা এবং ফসল-বীমার কোন সুব্যবস্থা করা হয় নাই। স্বাধীনতালাভের পর বিশেষ পরিকল্পনাধীন করিয়া পরিকল্পনা শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সময়ে কৃষি-ঋণের সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কৃষকদিগকে কৃষি-ঋণের অধিকতর সুবিধা সুযোগ দিবার এবং ব্যাপক কৃষি-সমবায় প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করিয়া উহার নূতন নামকরণ করা হয় ‘স্টেট ব্যাঙ্ক’। কৃষি-ঋণের পুনর্গঠন করা স্টেট ব্যাঙ্কের অগ্রতম প্রধান স্টেট ব্যাঙ্ক কাজ। প্রথম পরিকল্পনাকালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয় কৃষি-ঋণ তহবিল (National Agricultural Credit Fund) এবং জাতীয় সমবায় উন্নয়ন তহবিল (National Co-operative Development Fund) গঠন করে। উপরন্তু সমবায় চাষ পরিকল্পনাকালে কৃষি পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে এবং সরকার অতি সম্ভব দেশব্যাপী যৌথ সমবায় চাষের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার আশা পোষণ করেন।

অন্যতম দেশে কৃষি-পুনর্গঠনের যে সকল কর্মসূচীর আলোচনা করা হইল উহার কৃষি-বিপ্লব সংঘটিত করিবে এবং ইহার ফলে যে পরিমাণ কৃষি-শ্রমিক উদ্ধৃত হইয়া পড়িবে তাহাদের শিল্পে এবং অগ্র ধরনের কাজ-কর্মে নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। পরিকল্পিত পদ্ধতিতেই হউক অথবা অপরিকল্পিত পদ্ধতিতেই হউক কৃষি-বিপ্লব শিল্প-বিপ্লবের পূর্ব-সর্ত। কৃষি-উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করিবার এবং শিল্পায়নের পথ সুগম করিবার জন্ত “সামাজিক মূলধন” (Social Capitals) গঠনের প্রয়োজন। রেলপথ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, বন্দর স্থাপন, জলসেচ পরিকল্পনা, বিদ্যুৎ উন্নয়ন প্রভৃতি

সামাজিক মূলধনের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক মূলধনের সুব্যবস্থা না হইলে অনুন্নত দেশে শিল্পোন্নয়ন সম্ভবপর হইবে না।

[তুই] সামাজিক মূলধনের চাহিদা (Social Capital Requirements) : সামাজিক মূলধন বলিতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি মৌলিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সেবামূলক কার্য বুঝায়। অধিকাংশ অনুন্নত দেশে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, রাজপথ গবেষণার সুব্যবস্থা এবং জন-সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। ইহাদের অভাবে, কৃষি-উন্নয়ন ব্যাহত এবং শিল্পায়ণের গতি মন্থর হয়। সামাজিক মূলধন গঠন করিতে হইলে প্রভূত পরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করা প্রয়োজন কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এইরূপ বিনিয়োগ হইতে কোনরূপ মুনাফা অর্জন করা যাইবে না। অনুন্নত দেশে বেসরকারী উদ্যোগ পরিবহণ, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে বিনিয়োগ করিতে মোটেই উৎসাহী নয়, কারণ ইহা হইতে দ্রুত সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু সামাজিক মূলধন গঠনের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করিতে পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে না। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে, কে ইহা গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং কিভাবে অর্থ সংস্থান করা যাইবে। অনুন্নত দেশগুলিতে সামাজিক মূলধন গঠনের দায়িত্ব সরকারকে বহন করিতে হইবে। প্রথমত, সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি করা। তাহাকে শিক্ষা, জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সড়ক পরিবহন, কৃষি-গবেষণা কর্মসূচী, হাসপাতাল প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। অধিকাংশ অনুন্নত দেশের সরকার নিজ নিজ জনগণের মঙ্গল বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী এবং যদি তাহারা পশ্চাৎপদ দেশকে সম্প্রসারণশীল কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করিতে চায়, তাহা হইলে তাহারা প্রয়োজনীয় সামাজিক মূলধন গঠনের ব্যবস্থা করিবে। দ্বিতীয়ত, স্কুল, হাসপাতাল এবং রিসার্চকেন্দ্র ছাড়াও সরকার অগ্রবিধ সুবিধার ব্যবস্থা করিবে, যেমন, গুদামঘর নির্মাণ, রেলপথ স্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরঞ্জাম স্থাপন; কারণ এইগুলি দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত অপরিহার্য। দেশের সরকারকেই এইসব ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ বেসরকারী উদ্যোক্তার পক্ষে এইরূপ প্রভূত বিনিয়োগের দায়িত্ব বহন করা সম্ভবপর নয়। তৃতীয়ত, অধিকাংশ অনুন্নত দেশে বিনিয়োগের অবস্থা বেসরকারী বৈদেশিক মূলধন প্রবাহের পক্ষে অনুকূল নয়। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয়করণের আশঙ্কা থাকায় বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যাহত হয়। ব্যবসায়ের উজ্জল সম্ভাবনা এবং দেশীয় সরকার কর্তৃক নিরাপত্তার ব্যবস্থা না থাকিলে বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগকারী অনুন্নত দেশে মূলধন বিনিয়োগ করিবে না। সুতরাং অনগ্রসর দেশের সরকার রাষ্ট্রের কল্যাণে সামাজিক মূলধন বিনিয়োগ করিবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেসরকারী উদ্যোগকে সাহায্য করিবে। সামাজিক মূলধন খাতে যে প্রভূত ব্যয়ের

প্রয়োজন সরকারের সেই পরিমাণ অর্থসংস্থান না-ও থাকিতে পারে। একপক্ষেত্রে ঋণ ও সরকার দেশের লোকের নিকট হইতে অথবা বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ ঘাটতি ব্যয় করিতে পারে, আর ইহাও যদি পর্যাপ্ত না হয় তাহা হইলে অর্থনীতির “উদ্ধরণময় পর্যায়” (take off period) ঘাটতি ব্যয়ও অনুমোদনযোগ্য।

ব্রিটিশ যুগে ভারতে যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রেলপথ, বন্দর এবং পরিবহন ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার মূল উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক সুবিধা। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার এবং জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ইহা করা হয় নাই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সাল হইতে ভারত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু করে। পরিকল্পনাধীন সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ছাড়াও বিদ্যুৎ-শক্তি এবং জলসেচ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ব্যাপক কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে। সামাজিক মূলধনের চাহিদা পূরণের ফলে দেশে নূতন বিনিয়োগের সুযোগ গড়িয়া উঠিতেছে এবং এইভাবে শিল্পায়নের গতি ত্বরান্বিত করিতেছে।

[তিন] শিল্পোন্নয়ন : কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি এবং সর্বনিম্ন সামাজিক মূলধনের অভাব পূরণ ছাড়াও অগ্রগত উপাদানের উপর শিল্পোন্নয়ন নির্ভর করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ : শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ অপরিহার্য। যে অনুরক্ত দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণ কয়লা, লৌহ, খনিজ তৈল এবং অগ্রগত সম্পদ আছে তাহার শিল্পোন্নয়ন সহজ হইবে। আর যে দেশের ঐ সকল প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি রহিয়াছে তাহার দ্রুত শিল্পোন্নয়ন বেশ কঠিন ব্যাপার। সৌভাগ্যক্রমে ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে মূল সম্পদগুলি রহিয়াছে। ব্রিটিশ শাসন কালে কয়লা, লৌহ এবং তৈল খনি হইতে উত্তোলিত হইলেও ব্যাপক শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় নাই। অধিকন্তু অত্র, মাংগানিজ আকরিক, ইলমেনাইট এবং মোনজিট প্রভৃতি মূল্যবান খনিজ পদার্থ বিদেশে রপ্তানি হইত।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে ভারত সরকার দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নী কর্মসূচীর সহিত খনিজ সম্পদ উন্নয়নের নীতির সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। প্রথম পরিকল্পনাকালে ভারতের প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থগুলির গুণগত এবং পরিমাণগত মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এই সময়ে জাতীয় ধাতুবিজ্ঞান গবেষণাগার (National Metallurgical Laboratory) এবং ইন্ধন গবেষণা ইনস্টিটিউট (Fuel Research Institute) প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার খনিজ সম্পদ উন্নয়নের কর্মসূচীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত কয়লা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত কয়লা খনি হইতে উত্তোলিত হয়। পেট্রোলিয়মের যোগান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানীর সহযোগে পশ্চিম বাংলার নদী অববাহিকায় এবং আসাম অয়েল কোম্পানীর সহযোগে আসাম অঞ্চলে ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালায়। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে

মূল খনিজ সম্পদ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৃতীয় এবং পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে আরও কার্যকরী পস্থা গৃহীত হইবে।

মানবিক সম্পদ (Human Resources) : শিল্পায়ণ শুধুমাত্র প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে না, মানবিক সম্পদও সমভাবে প্রয়োজনীয়। শিল্পায়ণের জ্ঞান প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশসাধনের প্রয়োজন আর উহা নির্ভর করে মানবিক সম্পদের প্রকৃতির উপর। দেশের লোক যত অনগ্রসর হইবে, প্রাকৃতিক সম্পদের উন্নতি ততই কম হইবে। অপর পক্ষে দেশের শ্রমশক্তি সুদক্ষ হইলে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জ্ঞান নিপুণভাবে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ করা সম্ভবপর হইবে। ভারতে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকিলেও কারিগরী জ্ঞান-সম্পন্ন লোক এবং খনিজ যন্ত্রপাতির অভাবে উহাদের দ্রুত আহরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই সমস্যা সমাধানের জ্ঞান বহু সংখ্যক কারিগরী কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া দক্ষ কারিগরের যোগান বৃদ্ধি করা বিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন। কিন্তু ইহা সময়সাপেক্ষ, সেইজন্ম অন্তর্বর্তীকালে বিদেশ হইতে টেকনিসিয়ান এবং বিশেষজ্ঞ আনা প্রয়োজন। এই কারণে পরিকল্পনা-ধীন সময়ে ভারত ব্রিটিশ, জার্মান এবং রাশিয়ান টেকনিসিয়ানদের সহায়তায় তাহার খনিজ সম্পদ এবং ভারী ও মূলশিল্প উন্নয়নের চেষ্টা করিতেছে।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন। ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো শিল্পোন্নত পাশ্চাত্য দেশগুলির সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পাশ্চাত্য পদ্ধতি এবং শিল্প-কৌশল আমাদের স্থানীয় অবস্থার উপযোগী করিতে হইবে তবেই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে। ভারতের গ্রাম অল্পমত দেশসমূহ বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী জ্ঞানের যথাযথ প্রয়োগ করিবে কিন্তু তাহার অবস্থার উপযোগী বিশেষ শিল্প-কৌশল তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।

সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ব্যাপক সমস্তার আকার ধারণ করিয়াছে। উন্নয়নকামী অল্পমত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উচ্চহার অর্থনৈতিক প্রগতি এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান ব্যাহত করিবে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা মূলতঃ জনসংখ্যার সমস্যা। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যা হইল ৪৩০.২৩ মিলিয়ন—১৯৫১ সালের তুলনায় উহা ২১.৫০% অধিক।

জনসংখ্যার দিক হইতে ভারত পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে, এ বিষয়ে চীনের স্থান প্রথম। ১৯৫১ সালে পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬১.১৩ মিলিয়ন। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবানুযায়ী ১৯৫১—৬১ এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইবে ১২.৫% (অর্থাৎ বাৎসরিক বৃদ্ধির হার হইবে ১.২%)। সুতরাং অনুমান করা হইয়াছিল যে ১৯৬০—৬১ সালে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট জনসংখ্যা হইবে ৪০৮ মিলিয়ন। কিন্তু জনসংখ্যার অনুমিত হার প্রকৃত হার অপেক্ষা

অনেক কম হইয়াছিল। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ ভাবিয়াছিলেন জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হইবে বাৎসরিক ১.২%, কিন্তু প্রকৃত হার ২% অপেক্ষাও কিছু বেশী হয়। পরি-

জনসংখ্যা কল্পিত অর্থনীতির প্রথম দশ বৎসরে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা
নিয়ন্ত্রণ ২১ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় শতকরা ৩৮ ভাগ।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার ভয়াবহ বলিয়া ব্যাপক উন্নয়নী প্রচেষ্টা ব্যতিরেকেও জনসংখ্যা
নিয়ন্ত্রণের জন্ত সক্রিয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে জন্মহার হ্রাস করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিবার
পরিকল্পনা শুধুমাত্র জন্মহার হ্রাস করার জন্তই প্রয়োজন নয়, উহা মাতার স্বাস্থ্য এবং

পরিবার সম্ভানের সঠিক প্রতিপালনের জন্তও প্রয়োজন। পঞ্চবার্ষিক
পরিকল্পনার পরিকল্পনায় জনসংখ্যা পরিকল্পনার নীতি হইতে বুঝা যায় যে ভারত
উদ্দেশ্য সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন। প্রথম পরিকল্পনাকালে
সরকারী পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সূরু করা হয়। পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীকে
রূপায়িত করিবার জন্ত প্রথম পরিকল্পনায় ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয়
পরিকল্পনায় ওই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে
পরিবার পরিকল্পনা বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

কৃষি বনাম শিল্প : কৃষি-প্রধান অনুন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি
অত্যধিক হয় তাহা হইলে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিই মন্ডর হইবে না, কৃষি-
পরিবারের ভোগের পরিমাণও ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাইবে। হিসাব করিয়া দেখা
হইয়াছে যে ভারতে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন প্রতি বৎসর ১৭ হইতে ১৮ লক্ষ
টন অতিরিক্ত খাদ্যশস্যের প্রয়োজন হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রুত শিল্পায়নের পথে এক
বিরাট বাধাস্বরূপ, কারণ, শিল্পায়নের জন্ত উদ্ভূত খাদ্যশস্য কৃষকদিগের নিকট হইতে
সংগ্রহ করিয়া শহরে পাঠানো প্রয়োজন যাহাতে শিল্প-শ্রমিকদের জন্ত খাদ্যের যোগান
অব্যাহত থাকে। এই সমস্যা সমাধানের জন্ত দুই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন ;
প্রথমত, কৃষি-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্ত চরম এবং সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করা ;
দ্বিতীয়ত, কৃষি পুনর্গঠন এবং আধুনিকীকরণের ফলে যে পরিমাণ শ্রমিক উদ্ভূত হইয়া
পড়িবে তাহা অ-কৃষিগত পেশায় স্থানান্তরিত করা।

অনুন্নত দেশে জনসংখ্যাকে কৃষি হইতে অ-কৃষিগত উপজীবিকায় স্থানান্তর করা সহজ
নয়, আর ইহার উপর যদি জনসংখ্যা অতি দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইতে থাকে তাহা হইলে
উহা আরো দুর্লভ হইয়া পড়িবে। ভারতীয় কৃষকের গ্রামের প্রতি এক সহজ এবং
স্বাভাবিক আকর্ষণ রহিয়াছে বলিয়া বিকল্প নিয়োগের জন্ত শহরে যাইতে সে খুব আগ্রহী
নয়। অধিক মজুরী তাহাদের মধ্যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারিবে বলিয়া মনে
হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে উহাদের কুটিরশিল্প এবং গ্রাম-সম্প্রসারণ ও সমষ্টি উন্নয়ন
পরিকল্পনায় নিয়োগ করিলে অধিকতর সুরক্ষা প্রত্যাশা করা যায়। ইহা আশার কথা

যে, গ্রাম সম্প্রসারণ রকের সহিত যৌথ সমবায় খামারের সমন্বয় সাধন করিবার জন্ত কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইতেছে।

বুটিশ যুগে জমি হইতে জনসংখ্যার চাপ কমানিবার জন্ত কিছুই করা হয় নাই। স্বাধীনতালাভের পর, বিশেষ করিয়া পরিকল্পনায়ুগে ভারত সরকার কৃষির সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধনের জন্ত, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের জন্ত এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও সমবায় খামার প্রসারের জন্ত ব্যাপক কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল প্রচেষ্টার দরুন জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ হ্রাস পাইবে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে।

ভারী শিল্প : সূচিস্থিত পরিকল্পনার মাধ্যমে বিনিয়োগকে একরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সাফল্য অর্জন করা যায়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবার পর কয়লা, বিদ্যুৎ, লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট এবং ভারী রাসায়নিক প্রভৃতি ভারী-শিল্পগুলির প্রতি প্রথম দৃষ্টি দিতে হইবে। ভারী শিল্পের একরূপ এক সুসম্বদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে পরস্পরের অনুরূপক শিল্পসমূহ গড়িয়া উঠে। ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভবপর হইবে, আর ইহা প্রয়োজন, কারণ শ্রুতগতিতে উন্নয়ন হইলে বর্ধিত জনসংখ্যার দরুন উহার কোন সুফলই ভোগ করা যাইবে না। উপরন্তু ভারী শিল্পের উন্নতি হইলে মূলধনের যথার্থ ভিত্তি

ভারী শিল্প অর্থ স্থাপিত হইবে যাহা দ্রুত শিল্পায়ণের সহায়ক। ভারী শিল্পের ন্যস্তির ভিত্তি উন্নতি হইলে যন্ত্রপাতির যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে ভোগ্য-বস্তু উৎপাদনকারী শিল্পসমূহ লাভবান হইবে। ভারী শিল্পের ভিত্তি জাতীয় সংকটের সময় অসামরিক দ্রব্য উৎপাদন হইতে দ্রুত সামরিক দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত হইতে পারিবে।

বুটিশ শাসনাধীন ভারতে মূল এবং ভারী শিল্পের উন্নতি আদৌ ঘটে নাই, কারণ, ইহা উপনিবেশিক শাসনের পরিপন্থী ছিল। ভারতে শিল্পায়ণ ঘটিলে বুটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার নষ্ট হইবে এই চিন্তায় বুটিশ সরকার এদেশে মূল ও ভারী শিল্প গঠনে উদ্যোগী হন নাই। কিন্তু জাতীয় সরকার উপলব্ধি করিয়াছেন যে, দ্রুত শিল্পায়ণ এবং প্রতিরক্ষা এই উভয় কারণেই ভারী শিল্পের উন্নতি প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল এবং ভারী শিল্প উন্নয়নের জন্ত বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উন্নয়নের অর্থসংক্রান্ত দিক : অনুরূপ দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) মূলধনের প্রয়োজনীয়তা, (২) মূলধনের উৎসসমূহ এবং (৩) বাণিজ্য ব্যালান্স।

মূলধনের প্রয়োজনীয়তা (Capital Needs) : অর্থনৈতিক উন্নয়নের কর্মসূচীকে রূপায়িত করিতে হইলে যে মূলধনের প্রয়োজন তাহাকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত

করা যায়। প্রথমত, কৃষি পুনর্গঠন করিবার জন্ত মূলধন প্রয়োজন। নূতন এবং উন্নত ধরনের কৃষি উৎপাদনপদ্ধতি প্রবর্তনের জন্ত পরীক্ষামূলক কৃষিসংস্থা স্থাপন করা প্রয়োজন। ইহার জন্ত পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করিতে হইবে। কৃষি-জগতে চরম সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধনের জন্ত যদি গণতান্ত্রিক সরকার জমিদারী উচ্ছেদ করে তাহা হইলে জমিদারদিগকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করিবে; ইহার জন্ত অর্থের প্রয়োজন। অর্থাৎ উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারকে কৃষি বাবদ যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হইবে। বৃটিশ সরকারের নিকট ইহা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নাই কারণ সরকার কৃষিকে আধুনিকীকরণের কোন প্রচেষ্টা করে নাই। কিন্তু স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষিউন্নয়নের উপর অগ্রাধিকার দান করেন। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নের জন্ত ৩৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, অপ্রধান সেচপ্রকল্প, সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমবায় বাবদ ৫৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ঐ সকল খাতে তৃতীয় পরিকল্পনাধীন সময়ে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হইল ১০৬৮ কোটি টাকা।

দ্বিতীয়ত, সামাজিক মূলধন গঠনের জন্ত অর্থের প্রয়োজন। রাস্তাঘাট, সেতু, বন্দর প্রভৃতি নির্মাণের জন্ত যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। বিদ্যালয় ও হাসপাতাল, গৃহনির্মাণ, জলসেচ প্রকল্প নির্মাণ এবং গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের জন্ত অর্থের প্রয়োজন।

মাথাপিছু স্বল্প আয় অনুন্নত দেশের একটি বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেশে অধিকাংশ লোকের প্রধান উপজীবিকা হইল কৃষি; কিন্তু মাঙ্কাতা আমলের কৃষিপদ্ধতি অতাবধি বহাল থাকায় এবং জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ পড়ায় কৃষি-শ্রমিকের মাথাপিছু উৎপাদনশীলতা অবিস্বাস্য রকমের স্বল্প। ইহার ফলে তাহাদের আয় কম হয় আর এই স্বল্প আয়ের অধিকাংশই জীবনের মূল প্রয়োজন মিটাইতেই ব্যয় হইয়া যায় বলিয়া কৃষক কিছুই সঞ্চয় করিতে পারে না। শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, জমি এবং সম্পত্তির

সঞ্চয়ের

মালিক এবং মহাজনেরা কিছু পরিমাণ সঞ্চয় করে কিন্তু ইহারা মোট

স্বল্পতা

জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র অংশ। অধিকাংশ লোকেরই কোনরূপ

সঞ্চয় করিবার ক্ষমতা নাই, মুষ্টিমেয় ধনীশ্রেণীর যে সঞ্চয় তাহা জাতীয় আয়ের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। সুতরাং অনুন্নত দেশে সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুন সামাজিক মূলধন গঠনের প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয় হইতে পাওয়া যাইবে না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামাজিক মূলধন গঠনের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ কর এবং আভ্যন্তরীণ ঋণগ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করা কঠিন হইবে। অনুন্নত দেশের সরকারকে সামাজিক মূলধন গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং বেসরকারী বৈদেশিক

বৈদেশিক ঋণ

এজেন্সি এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মত আন্তর্জাতিক সংস্থা

ও বাটতি ব্যয়

হইতে অর্থ সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাতেও যদি

প্রয়োজন না মেটে তাহা হইলে “মুজু বাটতি ব্যয়” করিতে হইবে।

মূলধনের অভাবে যদি রেলপথ, টেলিফোন, জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি মূল সেবামূলক শিল্পগুলির সম্প্রসারণ রুদ্ধ হয় তাহা হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রথমেই ব্যাহত হইবে যাহা অনগ্রসর দেশের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। ভারতীয় জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ কামনা বৃটিশ শাসকগণের কাম্য ছিল না আর তাহারা এদেশের দ্রুত উন্নয়নেও আগ্রহী ছিল না। পরিবহণ ব্যবস্থা ছাড়া তাহারা সামাজিক মূলধন গঠনের অগ্রাঙ্ক দিকের প্রতি মোটেই দৃষ্টি দেয় নাই। বৃহৎ দেশের মধ্যে সকল অঞ্চলের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে এবং প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি করিবার আকাজক্ষায় যোগাযোগ এবং পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করা হইয়াছিল, উহার পিছনে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি-সাধন করার কোন অভিপ্রায় ছিল না। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সরকার সুসম্বন্ধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে মূল সামাজিক মূলধন গঠনের চেষ্টা করিতেছেন এবং এই নীতি মূলতঃ জনগণের মঙ্গল ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রচিত।

তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথভাবে আহরণ করিবার এবং মূল ও ভারী শিল্প গড়িয়া তুলিবার জন্ত অর্থের প্রয়োজন। ভারী শিল্প গঠনের জন্ত প্রভূতপরিমাণ মূলধনের প্রয়োজন। অল্পমত দেশে জনগণের সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম বলিয়া সমস্তা সমাধান করিবার পক্ষে উহা যথেষ্ট নয়। সুতরাং উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে বাধ্যতামূলক সঞ্চয় মূল এবং ভারী শিল্প গড়িয়া উঠিতেছে তখন জনগণ যাহাতে সঞ্চয় অধিক পরিমাণ সঞ্চয় করে তাহার জন্ত তাহাদের উৎসাহিত করা প্রয়োজন। কিন্তু সাধারণ প্ররোচনা খুব কার্যকর হইবে বলিয়া মনে হয় না—জনগণকে সঞ্চয় করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন হইতে পারে।

গণতান্ত্রিক দেশের জনগণ বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের প্রকাশ্য এবং প্রত্যক্ষ পদ্ধতি সহ্য করিবে না। এইজন্ত ছদ্মবেশী এবং পরোক্ষ কৌশল প্রয়োগ করা লাভজনক হইবে। মুহূদ্ভাষীতি “মুহূদ্ভাষীতি” সৃষ্টি করিয়া বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় সৃষ্টি করিতে হইবে। এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (“forced saving”) কর ব্যবস্থা এবং আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সংগ্রহ করিয়া দেশের শিল্পায়ণের ক্ষেত্রে নিয়োগ করিতে হইবে। কিন্তু অত্যধিক মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইলে বাধা আয়ের এবং অপেক্ষাকৃত নিম্ন আয়ের জনগণের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাইবে এবং গণতন্ত্রে জনগণ উহা চিরকাল সহ্য করিবে না। এইবার মূলধন গঠনের উৎসসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে।

উন্নয়ন মূলধনের উৎসসমূহ (Sources of Developmental Finance) : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত মূলধনের সংগ্রহের উৎস চারিটি—আভ্যন্তরীণ ঋণ, কর ব্যবস্থা, ঘাটতি বায় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ।

[এক] **আভ্যন্তরীণ ঋণ (Domestic Borrowing) :** অল্পমত দেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুব কম বলিয়া জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশের কোনরূপ সঞ্চয়ের

S.C.E.R.T., West Bengal

Date: 3-7-85



ক্ষমতা নাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন এবং নূতন নূতন শিল্প স্থাপিত হইলে শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইলে শ্রমিকের আয় বৃদ্ধি পাইবে। এখন প্রশ্ন হইল, শ্রমিক কি তাহার বর্ধিত আয় সঞ্চয় করিবে, না জীবনযাত্রার মান উন্নত করিবার জন্ত ভোগ্যব্যয় বৃদ্ধি করিবে? ভারতীয় কৃষকের ক্ষেত্রে বর্ধিত আয়ের একাংশ ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যয়িত হইবে, উহার কিছু অংশ সামাজিক উৎসবে ব্যয়িত হইবে অথবা ভোগের জন্ত ব্যয়িত হইবে। কৃষকের আয় বৃদ্ধির দরুন তাহার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইবে এবং উহার দরুন প্রাথমিক অবস্থায় ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। খুব কম ক্ষেত্রেই কৃষক স্বেচ্ছায় তাহার বর্ধিত আয় উন্নত বীজ, সার এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে ব্যয় করিবে। অর্থাৎ সাধারণ অবস্থায় ভারতীয় কৃষক স্বেচ্ছায় সঞ্চয় করিবে না। নগরাঞ্চলের শিল্প-শ্রমিকও তাহার বর্ধিত আয় সঞ্চয় না করিয়া আরামপ্রদ দ্রব্যের উপর ব্যয় করিবে। নগরাঞ্চলের শ্রমিক সর্বদাই ধনীলোকের জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে বলিয়া তাহারও কিছুই সঞ্চয় হইবে না। জরুরী অবস্থায় স্বেচ্ছামূলক সঞ্চয় ছাড়াও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় লর্ড কেন্স গ্রেট ব্রিটেনের জন্ত এই বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনার সুপারিশ করিয়াছিলেন। ১৯৬৩ সালে ভারতেও বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা চালু করা হয়, কিন্তু পর বৎসর উহা তুলিয়া লওয়া হয়।

[দুই] করব্যবস্থা (Taxation) : অনুরূপ দেশে যে মুষ্টিমেয় ধনী সম্প্রদায় রহিয়াছে শিল্পায়ণের প্রথম পর্যায়ে তাহাদের নিকট হইতে যতখানি সম্ভব কর আদায় করিতে হইবে। সরকার জমি এবং সম্পত্তির উপর উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া যে অর্থ-সংগ্রহ করিবে তাহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজে ব্যয়িত হইবে। কিন্তু ভূমি-সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করার দরুন জমিদার শ্রেণীর পরিবর্তে জমিতে কৃষকের মালিকানা স্থাপিত হইবে অথবা সমবায় থামার গড়িয়া উঠিবে। ভূমি-সংস্কারের ফলে ভূমিকর হইতে অধিক পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। এই কারণে নগরাঞ্চলের জমি, ঘরবাড়ী এবং অগ্নি ধরনের সম্পত্তির উপর ধার্য করের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

যতদিন পর্যন্ত জমিদারী ব্যবস্থা বহাল ছিল ততদিন পর্যন্ত জমি এবং সম্পত্তির উপর উচ্চহারে কর ধার্য করিয়া পর্যাপ্ত রাজস্ব সংগ্রহ করা সম্ভবপর ছিল। কিন্তু জমিদারী জমিদারী উচ্ছেদের উচ্ছেদের সহিত ওই উৎস হইতে অধিক রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা দরুন নূতন নষ্ট হইয়াছে। সুতরাং রাজস্ব সংগ্রহের নূতন উৎস সন্ধান করিতে সমস্তা হইবে। উন্নয়নের ফলে যাহাদের আয় বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাদের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিতে হইবে আর ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতিজনিত প্রভাব দূর হইবে এবং অর্থনীতির বনিয়াদ দৃঢ় হইবে। কর ধার্যের সময় সতর্কতার সহিত লক্ষ্য করিতে

হইবে যেন উহা জনগণের কর্মপ্রেরণা হ্রাস না করে। উন্নতিকামী দেশের করদার্থের মূলনীতিকে এইভাবে ব্যক্ত করা যায় : উন্নয়নের ফলে যাহারা লাভবান হইতেছে করদার্থের তাহাদের উপর কর ধার্য করিতে হইবে, আর উহাদের কর্মপ্রেরণা হ্রাস মূলনীতি না করিয়া অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা সরাইয়া লইতে হইবে। ভারতের প্রথম পরিকল্পনায় করব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগ মাত্র কর বাবদ আদায় করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়নী মূলধন সংগ্রহের জন্ত করব্যবস্থার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

[তিন] ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing) : আভ্যন্তরীণ ঋণগ্রহণ এবং কর ধার্য করিয়া পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থসংগ্রহ করা সম্ভবপর না হইলে ঘাটতি ব্যয় করা যাইতে পারে। ঘাটতি ব্যয়ের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল মুদ্রাস্ফীতি। সরকার ঘাটতি ব্যয়ে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে উহা হইতে বিরত থাকিতে পারিবে না এবং পরিশেষে চরম মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। অতি সতর্কতার সহিত ঘাটতি ব্যয় করা প্রয়োজন। অব্যবহৃত জনশক্তি ও সম্পদকে কাজে লাগাইবার জন্ত ঘাটতি ব্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। ঘাটতি ব্যয়ের ফলে দেশের সামাজিক মূলনীতিগঠন বৃদ্ধি পাইবে, বেকার জনগণের নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে এবং সরকার উন্নয়নী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্ত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করায় বেসরকারী ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উৎসাহিত হইবে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত যদি অতিরিক্ত পরিমাণ মুদ্রাস্ফীতির প্রয়োজন হয় তাহা হইলে সাময়িকভাবে ঘাটতি ব্যয় বন্ধ রাখিতে হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ পর্যায়ে ভারতে ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় আর কোন ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন স্থির করিয়াছেন। ভারতের প্রথম তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘাটতি ব্যয় বিশেষ পঞ্চবার্ষিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার আয়তন পরিকল্পনা খুব ব্যাপক না হইলেও উহাতে ৫৩২ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা ও ঘাটতি ব্যয় হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ায় উহাতে ১২০০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ৭৮৫ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়, উহার মধ্যে প্রথম দুই বৎসরে ৬৩৫ কোটি টাকা এবং তৃতীয় বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৩ কোটি টাকা। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হয় ২৪৮ কোটি টাকা—মূল বরাদ্দ অপেক্ষা ২৫২ কোটি টাকা কম। তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল্যস্ফুরের স্থায়িত্ব রক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় বলিয়া ওই সময়ে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৫৫০ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করিবার প্রস্তাব গৃহীত

হয়। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যকালীন অগ্রগতির পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরেই ৬১৬ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হয়।

[চার] বৈদেশিক বিনিয়োগ (Foreign Investment) : এইবার অনুন্নত দেশের উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা লইয়া আলোচনা করা যাঁতে পারে। সাম্প্রতিককালে সেই সকল অনুন্নতদেশেই বেসরকারী বৈদেশিক মূলধন অনুপ্রবেশ করিয়াছে যেখানে বিনিয়োগ সর্বাপেক্ষা লাভজনক। এই কারণেই মার্কিন মূলধনের এক বৃহত্তর অংশ ল্যাটিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের পেট্রোলিয়াম শিল্পে নিয়োজিত হইয়াছে। কিন্তু ভারতের গ্রায় অনুন্নত দেশে বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয়করণের আশঙ্কা সর্বদা বিद्यমান থাকায় বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ খুব বেশী হইবার সম্ভাবনা নাই।

অবশ্য কতকগুলি বিশেষ আন্তর্জাতিক ঋণদান সংস্থা রহিয়াছে যাহাদের নিকট আন্তর্জাতিক ঋণের জন্ম আবেদন করা যায়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক (IBRD) ঋণদান সংস্থা এই ধরনের একটি সংস্থা, ইহা অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নয়নের জন্ম ঋণদান করে। সাম্প্রতিককালে আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলিকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থসাহায্য করিয়াছে। অনুন্নত দেশগুলির উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করিয়া ব্যাঙ্ক উহাদের উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

সর উঃ

সম্প্রতি আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক আন্তর্জাতিক ফিনান্স কর্পোরেশন নামে একটি ঋণদান আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠন করিয়াছে, এই প্রতিষ্ঠানটি অনুন্নত দেশের বৃহৎ ফিনান্স বেসরকারী উত্তোগকে ঋণ সরবরাহ করিবে। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে কর্পোরেশন মার্কিন সরকারের রপ্তানি-আমদানি ব্যাঙ্ক বিদেশে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করিতে পারে। অনেক অনুন্নত দেশ মার্কিন সরকারের অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিচালন কর্মসূচীর (Economic Co-operation Administration Programme) অংশ হিসাবে অনুদান ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ সাহায্য পাইতেছে।

বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of Payments Considerations) : বিদেশের সহিত দেশের মোট দৃশ্যমান (visible) ও অদৃশ্যমান (invisible) দেনা-পাওনার হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স বলে। কি কারণে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হয় (অর্থাৎ মোট রপ্তানি-মূল্য অপেক্ষা মোট আমদানি-মূল্যের আধিক্য) তাহা দেখা যাক।

শিল্পায়ণের জন্ম দ্রুতহারে মূলধন গঠন করা প্রয়োজন। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মূলধনের প্রধান উৎস কি। রাজমিস্ত্রী, শ্রমিক, ইট-কাঠ প্রভৃতি মূলধনের অংশ দেশাভ্যন্তর হইতেই সংগ্রহ করিতে পারা যাইবে। অপরপক্ষে যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং কিছু পরিমাণ দক্ষ শ্রমিক বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইবে। শিল্পায়ণের জন্ম

বিদেশ হইতে মূলধনী সরঞ্জাম এবং দক্ষ কারিগর সংগ্রহ করিবার জন্ত উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইবে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত বিদেশ হইতে অধিক পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিলে বা অধিক পরিমাণ যন্ত্রপাতি এবং টেকনিসিয়ান দেশে আনিলে পাওনা মিটানো বাবদ সমস্যা দেখা দিবে। বৈদেশিক মূলধন আমদানিকারী অল্পসংখ্যক দেশ বিদেশে অধিক পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয় করিতে পারিলে বিদেশীদের নিকট হইতে পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং পরিণামে দেনা ও পাওনার সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে জনগণের আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় দ্রব্যসামগ্রীর জন্ত দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। বাণিজ্য ব্যালান্স এবং ইহার ফলে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা কঠিন হইবে। সঙ্কটের কারণ রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে না পারিলে স্বভাবতই বাণিজ্য ব্যালান্সে সঙ্কট দেখা দিবে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষার জন্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে অভূতপূর্ব বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির দরুন যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হয় তাহা ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে। বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধির দরুন সম্পদ ভোগ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে হইতে মূলধনীদ্রব্যের ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়। মূলধন এবং ভোগ্যদ্রব্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দরুন মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের প্রতিকূলতা তীব্রভাবে বৃদ্ধি পায়। নূতন বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্ত বৈদেশিক যন্ত্রপাতি আমদানির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এই সময় তীব্র খাণ্ডসঙ্কট দেখা দিলে বিদেশ হইতে প্রভূত পরিমাণ খাণ্ড আমদানি করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায় এবং ইহার দরুন বাণিজ্য ব্যালান্সে অতিরিক্ত চাপ পড়ে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত প্রতিরক্ষা ব্যয় যুক্ত হইয়া (এই সময় ভারত চীন এবং পাকিস্তান এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হয়) ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সে তীব্র সঙ্কটের সৃষ্টি করে।

দ্রুত শিল্পায়ণের জন্ত যদি বৈদেশিক মূলধন এবং কারিগরী দক্ষতার উপর দেশকে নির্ভর করিতে হয় তাহা হইলে উন্নয়নের প্রাথমিক পর্যায়ে দেশের বাণিজ্য ব্যালান্সে কিছু পরিমাণ অসুবিধা অবশ্যই দেখা দিবে। অতি সতর্কতার সহিত মূলধন এবং কারিগরী দক্ষতা আমদানি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করিতে হইবে এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্ত সর্বপ্রকার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। অধিকাংশ অল্পসংখ্যক দেশের পক্ষে

বাণিজ্য ব্যালান্স বিদেশ হইতে বিরাট বিরাট দামী যন্ত্রপাতি না আনিয়া, টেকনিসিয়ান সঙ্কট পরিহারের এবং সাধারণ ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানি করাই উৎকৃষ্ট পন্থা হইবে।

পন্থা যে ব্যক্তি চলিতেই শিখে নাই তাহার পক্ষে দৌড়ানো বিপদের কারণ হইবে। সীমাবদ্ধ আকারে বৈদেশিক মূলধন আমদানি করিলে বাণিজ্য ব্যালান্সের সঙ্কট পরিহার করা যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুরত দেশের মূল সমস্যা

(Fundamental Problems of Underdeveloped Areas)

ভারতের গ্রাম অনুরত দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন দুই ভাগে বিভক্ত। এই সকল দেশের ক্ষুদ্রাংশে রহিয়াছে অসংগঠিত এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইহা সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ লইয়া গঠিত। এখানে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত কতিপয় অসংগঠিত শিল্প, সরকারী আদর্শধামার এবং বেসরকারী মালিকানাধীন বাগিচাশিল্প রহিয়াছে। দেশের বৃহত্তর অংশে রহিয়াছে জীবনধারণোপযোগী অর্থনৈতিক সংগঠিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্র (subsistence sector)। এই ক্ষেত্রে রহিয়াছে ক্ষুদ্রায়তন জীবনধারণের জীবনধারণোপযোগী কৃষি, ছোটখাটো ধরনের ব্যবসায়। এই ক্ষেত্রে নীচ সঙ্কয়ের পরিমাণ নগণ্য এবং ভোগ্যবস্তুর জন্ম ইহাদের সক্রিয় চাহিদার পরিমাণ খুবই সীমাবদ্ধ। অত্যাধিক উপার্জনের সুযোগ থাকিলেও লোক এই অসংগঠিত ক্ষেত্র হইতে যাইতে চাহে না, আর অত্যাধিক গমন করিবার মত অর্থও তাহাদের নাই।

অর্থনৈতির সংগঠিত এবং আধুনিক ক্ষেত্রেই সঙ্কয়ের প্রধান উৎস, কারণ, এইক্ষেত্রে মাথাপিছু মজুরী এবং আয় অসংগঠিত ক্ষেত্র অপেক্ষা অনেক বেশী আর এই ক্ষেত্রেই অসংগঠিত শিল্পগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং উহাদের মালিকেরা যথেষ্ট পরিমাণ মুনাফা অর্জন করিতেছে। এই ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের মাথাপিছু অধিক আয় এবং মালিকদের উচ্চ মুনাফা সঙ্কয় গঠনের প্রধান উৎস। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রেই অধিকাংশ অর্থনৈতিক উদ্ভূতের সৃষ্টি হয় বলিয়া ইহার সম্প্রসারণ এবং উন্নয়নের মাধ্যমে অনুরত দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে।

অনুরত দেশের সংগঠিত ক্ষেত্র আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুবিধা পাইয়া থাকে। এইক্ষেত্রেই উদ্যোক্তা শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন আধুনিক ধরনের যন্ত্রপাতি এবং শিল্পকোশল প্রবর্তন করিতে আগ্রহী থাকে। এইজন্য এই ক্ষেত্রে মূলধন গঠনের এবং কারিগরী উন্নয়নের হার বেশ উচ্চ। মূল কথা হইল অনুরত দেশে এই ক্ষুদ্র সংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাবনা নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার মধ্যে কোন জড়ত্বের লক্ষণ নাই। অবশ্য এই ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ ঘটিতেছে তাহার সকল সুফলই মুষ্টিমেয় মালিক শ্রেণী ভোগ করিতেছে।

অসংগঠিত ক্ষেত্রে কৃষিই জনগণের প্রধান উপজীবিকা। ক্রমবর্ধমান হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বিকল্প নিয়োগের অভাবে জমির উপর জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ পড়িয়াছে। জীবিকা অর্জনের জন্য অধিক সংখ্যক লোক কৃষিতে আসিয়া ভীড় করিয়াছে। ক্ষুদ্রায়তন

পারিবারিক কৃষিব্যবস্থার দরুন এই সমস্যা তীব্রতর আকার ধারণ করিয়াছে। পরিবারের সকল লোকই ক্ষুদ্রায়তন পৈতৃক জমি চাষ করে। ক্ষুদ্রায়তন জমিতে অধিক পরিমাণ লোক নিয়োগ করিলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না।

ধরা যাক, কোন একখণ্ড পারিবারিক জোত সাতজন লোক সাতটি লাঙ্গল ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি লইয়া উপযুক্তভাবে চাষ করিতে পারে। কিন্তু যদি পরিবারে দশজন ব্যক্তি থাকে, তাহা হইলে উহারা সকলেই ঐ জমি চাষ করিবে কিন্তু ঐ তিনজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিযুক্ত হওয়ার দরুন কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে না। জমির পরিমাণ অধিক হইলে অথবা চাষের পদ্ধতির উন্নতি হইলে ঐ তিনজন অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু জমির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকায় এবং কৃষি-পদ্ধতির কোনরূপ উন্নতি না হওয়ায় অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের দরুন উৎপাদন হ্রাস পাইবে না। ঐ তিনজন অতিরিক্ত শ্রমিক অপ্রয়োজনীয় বেকার কারণে উহাদের কাজে নিয়োগ করার দরুন মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, অপর পক্ষে সমান উৎপাদন অধিক সংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে বন্টিত হওয়ায় গড় উৎপাদন হ্রাস পায়। যে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা শূন্য অর্থাৎ যাহাকে উৎপাদন হইতে সরাইয়া লইলেও মোট উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইবে না, তাহাকে “ছদ্মবেশী বেকার” (disguised unemployed) বলে।

ছদ্মবেশী বেকারের অস্তিত্বের কারণ হইল পারিবারিক সম্পদ, বিশেষ করিয়া জমির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম বলিয়া পরিবারের সকল লোকই সারা বৎসর কাজ পাইতে পারে না, আর বিকল্প নিয়োগের কোন সুযোগ না থাকায় উদ্ভূত শ্রমিক অল্প কোন উপজীবিকা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। দেশে অর্থনিয়োগের পরিমাণ কি তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া দুর্লভ। অবশ্য আন্তর্জাতিক জাতিপুঞ্জের একটি রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে ভারত, পাকিস্তান, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এবং ইন্দোনেশিয়ার বহু অঞ্চলে উদ্ভূত কৃষি শ্রমিকের পরিমাণ শতকরা ২০ হইতে ২৫ ভাগ হইবে।

ছদ্মবেশী বেকারত্বের দরুন কৃষিতে নিযুক্ত শ্রমিকের মাথাপিছু আয় অত্যন্ত কম আর এই স্বল্প আয় হইতে সঞ্চয় করা খুবই কঠিন। কৃষকগণ খাণ্ড এবং বস্ত্র ব্যতীত আর স্বল্প উৎপাদন- কিছুই ক্রয় করে না বলিয়া ফেরিওয়ালার, খুচরা দ্রব্য বিক্রেতা প্রভৃতি শীলতার কারণে যে সকল ব্যক্তি দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রে জীবিকা অর্জনের জগ্গ নিযুক্ত রহিয়াছে তাহারা যে খুব বেশী মুনাফা অর্জন করিবে সে সম্ভাবনাও নাই। অনুন্নত দেশের এই বিরাট অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন সম্ভাবনা নাই। এই ক্ষেত্রে গতির বেগ সৃষ্টি করিতে না পারিলে সুসংগঠিত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণও ব্যাহত হইবে। দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি অসংগঠিত ক্ষেত্রে বাস করিতেছে, তাহাদের আয়, সঞ্চয় এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে সুসংগঠিত ক্ষেত্রে শিল্পায়ণ ত্বরান্বিত হইবে।

ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র পাশাপাশি অবস্থিত

ছিল। খাদ্য ও কাঁচামাল রপ্তানি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি বাণিজ্য, আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, আধুনিক পরিবহন ব্যবস্থা, খনি ও বাগিচা শিল্প এবং বস্ত্র ও পাট শিল্পের মত কয়েকটি আধুনিক শিল্প সুসংগঠিত ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অপরপক্ষে অসংগঠিত জীবনধারণের ক্ষেত্রে রহিয়াছে কুটির ও হস্তশিল্প, এবং কৃষি। সংগঠিত ক্ষেত্রে মূলধন সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে ম্যানেজিং এজেন্টগণ এবং আধুনিক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা। অপরপক্ষে দেশীয় ব্যাঙ্কার এবং মহাজনেরা অসংগঠিত ক্ষেত্রে মূলধন যোগান দিয়া থাকে। অসংগঠিত ক্ষেত্র প্রধানত ভারতীয়গণই নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে আর সংগঠিত ক্ষেত্রে বৃটিশ মূলধন এবং পরিচালনা কর্তৃত্ব করিত। বৃটিশ যুগে এই দুই ক্ষেত্রের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। কিন্তু এই ভারসাম্যহীনতা হ্রাস করিবার জন্য বৃটিশযুগে কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। স্বাধীনতালাভের পর জাতীয় সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে একই সঙ্গে অনগ্রসর, অসংগঠিত ক্ষেত্রের উন্নতি এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের দ্রুত শিল্পায়নের সুসম্বদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছে।

স্বাধীনতাপূর্ব যুগে ভারতীয় অর্থনীতির অসংগঠিত ক্ষেত্রের অবস্থা ভয়াবহ ছিল। জমিদার ও মহাজনের নিষ্পেষণ, সরকারের ঔদাসীণ্য এবং কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচীর অভাবে অধিকাংশ লোকই কোনমতে দিন গুজরান করিত। উপরন্তু বিদেশী শাসকের অধীনে থাকায় জনগণের মনে নূতন আশা ও আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হইতে পারে নাই। অপরপক্ষে বৃটিশ ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিজেদের স্বার্থে কয়েকটি সংগঠিত শিল্প গড়িয়া তোলে। এই শিল্পগুলি কলিকাতা এবং বোম্বাই-কে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া ওঠে, ফলে অগ্রাগ্রা অঞ্চলের তুলনায় এই অঞ্চলগুলি অপেক্ষাকৃত উন্নত হইয়া উঠে। বাংলা ও বোম্বাই এই দুই প্রদেশে বৃটিশ-ভারতের এক-চতুর্থাংশ লোক বাস করিত কিন্তু এই দুই প্রদেশে বৃহদায়তন শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৬৬.৮ ভাগ (১৯৩৮-১৯৩৯)।

বৃটিশ উদ্যোগে চা, কফি এবং পাট শিল্প শুরু হওয়ার সাথে সাথে ভারতে আধুনিক শিল্পগুলির উন্নয়ন শুরু হয়। এই শিল্পগুলি হইতে প্রভূত মুনাফা অর্জিত হয়, উহার কিছু অংশ গ্রেট ব্রিটেনে পাঠানো হয় আর বাকী অংশ শিল্পগুলিতে পুনরায় বিনিয়োগ করা হয়। এই কারণে বৃটিশ যুগে বাগিচা শিল্পগুলিরই প্রভূত উন্নতি সাধন হয়।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধ এবং বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি (policy of discriminating protection) গ্রহণ করার ফলে বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইস্পাতশিল্প, চিনিশিল্প, সিমেন্ট-শিল্প, কাগজশিল্প এবং দিয়াশলাইশিল্প প্রতিষ্ঠার সুযোগ আসে। কিন্তু বস্ত্রশিল্প এবং লৌহ ও ইস্পাতশিল্প ব্যতীত অগ্রাগ্রা শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নের গতিবেগ বেশ মন্থর থাকে। বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি এবং বস্ত্রের আভ্যন্তরীণ চাহিদা এই দুই কারণে বস্ত্রশিল্প দ্রুত উন্নতিলাভ করে। লৌহ আকরিক এবং কয়লা সহজলভ্য হওয়ায় এবং বাড়িঘর,

কারখানা, সেতু, রেলপথ, বন্দর প্রভৃতি নির্মাণের জন্য লৌহ ও ইস্পাতের ব্যাপক চাহিদা থাকায় লৌহ ও ইস্পাতশিল্প সন্তোষজনকভাবে সম্প্রসারিত হয়।

বাগিচাশিল্প, বস্ত্রশিল্প এবং লৌহ-ইস্পাতশিল্পের উন্নতির দরুন বৃটিশ বিনিয়োগকারী এবং ভারতীয় উদ্যোক্তাগণ প্রভূত মুনাফা অর্জন করিলেও উহা পশ্চাৎপদ, অসংগঠিত ক্ষেত্রে স্প্রসারণ করিবার জন্য ব্যবহার করা হয় নাই। ইহার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট হইয়া যায়।

অনুন্নত দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বেকারের অস্তিত্ব উহার প্রধান লক্ষণ। অনুন্নতির একটি লক্ষণ অনুপাদনশীল, ছদ্মবেশী বেকার ক্ষুদ্রায়তন পারিবারিক জোতের মোট উৎপাদনের উপর জীবনধারণের জন্য নির্ভর করে। ইহার ফলে উৎপাদনশীল শ্রমিকদের তাগত্বীকার করিতে হইতেছে, কারণ, তাহাদের ভোগের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে এবং মোট উৎপাদনের একাংশ অনুপাদনশীল শ্রমিকদের জন্য সরাইয়া রাখিয়া দিতেছে। অর্থাৎ উৎপাদনশীল শ্রমিকেরা তাহাদের প্রকৃত আয়ের একাংশ সঞ্চয় করিতেছে বলিয়াই পরিবারের অনুপাদনশীল, ছদ্মবেশী বেকারের ভরণপোষণ সম্ভবপর হইতেছে। অনুপাদনশীল আত্মীয়স্বজনকে ভরণপোষণের জন্য উৎপাদনশীল শ্রমিকের সঞ্চয়কে অধ্যাপক নার্কস “প্রচ্ছন্ন সঞ্চয়” (saving potential) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় সত্ত্বেও অনুন্নত দেশের অসংগঠিত, জীবনধারণোপযোগী ক্ষেত্র “দারিদ্র্যের পাপচক্র” দ্বারা পরিবেষ্টিত। অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণের আয় অল্প বলিয়া সংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের জন্য তাহাদের সক্রিয় চাহিদার পরিমাণ খুব কম আর এই কারণে দ্রুতগতিতে মূলধন গঠন এবং অর্থনীতির বিকাশ ঘটিবে না। সংগঠিত ক্ষেত্রের দ্রুত সম্প্রসারণ না ঘটিলে ছদ্মবেশী বেকারকে কৃষি হইতে অল্প উপজীবিকায় স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু শিল্পের উন্নতির জন্য যথোপযুক্ত এবং কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। যতদিন পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব উচ্চ থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইবে না। কারণ নূতন নূতন ব্যক্তি আসিয়া পারিবারিক জোতে ভিড় করিবে এবং গড় উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকিবে। এই অবস্থা চলিতে থাকিলে পরিশেষে দারিদ্র্যের এক পাপচক্রের সৃষ্টি হইবে যাহার ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পিছাইয়া যাইবে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন এই ছদ্মবেশী বেকারদিগকে উৎপাদনশীল কার্কে নিয়োগ করা হইতেছে না? অত্যাধিক প্রশ্ন করা যায়, অসংগঠিত ক্ষেত্রের “প্রচ্ছন্ন সঞ্চয়” কেন সংগঠিত ক্ষেত্রের সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা হইতেছে না? অধ্যাপক নার্কসের মনে সর্বপ্রথম এই প্রশ্ন জাগে। কৃষি-পরিবারভুক্ত ছদ্মবেশী বেকারদিগের গ্রামীণ জীবনের প্রতি এক অদ্ভুত আকর্ষণ থাকায় উহাদের শহরের কারখানায় লইয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না। উহাদের জমি হইতে সরাইয়া লইয়া বাঁধ নির্মাণ, পথ নির্মাণ, খাল

খনন এবং সেচপ্রকল্প প্রভৃতি সহজ মূলধন প্রকল্পে নিয়োগ করিতে হইবে ; উৎপাদনশীল শ্রমিকদের “প্রচ্ছন্ন সঞ্চয়” যথাযথভাবে সংগ্রহ করিয়া উহাদের ভোগ্য প্রয়োজন মিটাইতে হইবে। এই সকল মূলধন প্রকল্পগুলি অসংগঠিত ক্ষেত্রে অথবা উহার সন্নিবিষ্ট স্থাপন করিলে তবেই উহাদের মধ্যে গতিশীলতার বেগ সঞ্চারিত হইবে।

অধ্যাপক নার্কসের যুক্তি মূলতঃ ক্রটিবিহীন। ছদ্মবেশী বেকারগণ পূর্বে যে দ্রব্য নার্কসের ভোগ করিত তাহা সংগ্রহ করা ছাড়া উহাদের উৎপাদনশীল ভোগের যুক্তি কাজে লাগাইতেও নার্কস আগ্রহী। অগ্রভাবে বলা যায় যে, ছদ্মবেশী বেকার সমস্যা সমাধানে নার্কস যে পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন উহা হইল উৎপাদনশীল ভোগ এবং অল্পউৎপাদনশীল ভোগের মধ্যে উৎপাদনের পুনর্বণ্টন। কিন্তু যদি ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে ঘাটতি থাকে তাহা হইলে উৎপাদনের পুনর্বণ্টন করিয়া ছদ্মবেশী বেকারসমস্যা সম্পূর্ণরূপে সমাধান করা যাইবে না। কারণ উৎপাদনশীল ভোগ ও অল্পউৎপাদনশীল ভোগের মধ্যে অপরিপূর্ণ ভোগাদ্রব্যের পুনর্বণ্টন হইলে উহা ছদ্মবেশী বেকারদিগের—যাহারা বর্তমানে অগ্রভাগ উৎপাদনশীল কাজে স্থানান্তরিত হইয়াছে তাহাদের ভোগের চাহিদা পরিপূর্ণভাবে মিটাইতে পারিবে না।

সাম্প্রতিককালে অধ্যাপক ভাকিল এবং ব্রহ্মানন্দ নার্কসের “প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় তত্ত্ব”কে সম্প্রসারিত করিয়াছেন। ইহাদের মতে, প্রথম দল শ্রমিকদের জন্ম ভোগ্যাদ্রব্যের

ভাকিল ও	পর্যাপ্ত পরিমাণ যোগান থাকিলে ছদ্মবেশী বেকারদিগকে সংগঠিত
ব্রহ্মানন্দের	ক্ষেত্রের উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করিয়া প্রচ্ছন্ন সঞ্চয়কে লাভজনক
যুক্তি	ভাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু অর্থনৈতিক উন্নয়নের

প্রাথমিক পর্যায়ে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদিত না হয় তাহা হইলে বহু সংখ্যক ছদ্মবেশী বেকারকে উৎপাদনশীল কর্মে নিয়োগ করা কঠিন হইবে। যদি প্রথম ছদ্মবেশী বেকারদল, যাহারা জমি হইতে অগ্র কাজে স্থানান্তরিত হইয়াছে, খুব ছোট হয় তাহা হইলে দারিদ্র্যের পাপচক্র প্রতিহত করিয়া উন্নয়নের প্রকৃত গতিবেগ সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না।

সমস্যাটিকে সরলভাবে আলোচনা করা যাইতে পারে। অসংগঠিত ক্ষেত্রে “প্রচ্ছন্ন সঞ্চয়” থাকা সত্ত্বেও সংগঠিত ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের প্রকৃত গতিবেগ সৃষ্টির পথে এক মৌলিক প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। ছদ্মবেশী বেকারকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করিলে তাহার ভোগের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা অধিক হইবে। অগ্র ভাষায় বলা যায় যে, প্রত্যেক ছদ্মবেশী বেকার শ্রমিককে উৎপাদনশীল কাজে স্থানান্তরিত করার ফলে একটি “ভোগ্যবস্তু-জনিত ফাঁকের” (consumption goods gap) সৃষ্টি হইবে। (পুরাতন ভোগস্তর এবং নূতন ভোগস্তরের পার্থক্য হইল ভোগ্যবস্তুজনিত ফাঁক)। ইহা খুবই স্বাভাবিক, কারণ, যখন শ্রমিক পারিবারিক জোতে ছদ্মবেশী বেকাররূপে কাজ করিত তখন সে খাদ্য ও বস্ত্রের সর্বনিম্ন চাহিদা পূরণ হইলেই সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু শ্রমিক সুসংগঠিত

ক্ষেত্রে নিয়োগ পাইবার পর সর্বপ্রথম অর্থ উপার্জন করিবে বলিয়া সে শুধু উন্নত ধরনের খাদ্য ও বস্ত্রই ব্যবহার করিবে না—পরন্তু নানাধরনের ভোগ্যবস্তুও ব্যবহার করিবে। ইহার দরুন “ভোগ্যবস্তু জনিত ফাঁকের” সৃষ্টি হইবে। সুতরাং এই “ভোগ্যবস্তুজনিত ফাঁক” পূরণ না হইলে ছদ্মবেশী বেকারকে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত করা যাইবে না। “ভোগ্যবস্তু জনিত ফাঁকের” ধারণা নার্কসের সরল “প্রচ্ছন্ন সঞ্চয় তত্ত্ব” অপেক্ষা উন্নত। নার্কসের মতে ভোগ্যবস্তুর যথাযথ পুনর্বণ্টন করিয়া ছদ্মবেশী বেকারকে কৃষি হইতে সুসংগঠিত ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত করা যাইবে। ভাকিল এবং ব্রহ্মানন্দ “ভোগ্যবস্তুজনিত ফাঁকের” সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করায় ছদ্মবেশী বেকারকে কৃষি হইতে সংগঠিত ক্ষেত্রে স্থানান্তরকালে সম্পদ ঘাটতির উপর আলোকপাত করা হইয়াছে। এইজন্যই উৎপাদনের উপযুক্ত পুনর্বণ্টন সত্ত্বেও স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে স্থানান্তর কার্য সম্পন্ন হইবে না।

ধরা যাক, একজন শ্রমিকের জ্ঞাত যে পরিমাণ ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন তাহা কোন উপায়ে সংগ্রহ করা হইল। ইহার দ্বারা ছদ্মবেশী বেকারদিগের মধ্য হইতে একজনকে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যাইবে। ইহার দরুন শ্রমিক এতদিন যে ভোগ্যবস্তু ব্যবহার করিতেছিল তাহা পাওয়া যাইবে। যদি ধরিয়া লই যে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের ভোগের পরিমাণ ছদ্মবেশী বেকারের ভোগের দ্বিগুণ, তাহা হইলে প্রাপ্ত ভোগ্যবস্তুর সাহায্যে অপর একজন ছদ্মবেশী বেকারের নিয়োগের জ্ঞাত প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ভোগ সম্ভবপর হইবে। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে যদি একজন শ্রমিকের ভোগের ব্যবস্থা

ভোগ্যবস্তুর

গুণক

করা যায়, তাহা হইলে দুইজন শ্রমিকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। অর্থাৎ মোট নিয়োগ বৃদ্ধির পরিমাণ প্রাথমিক নিয়োগ বৃদ্ধির গুণিতক

(multiple)। প্রাথমিক নিয়োগ এবং সর্বশেষ নিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক “ভোগ্যবস্তু গুণকের” (consumption goods multiplier) সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। যদি একজন শ্রমিকের প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে এই ভোগ্যবস্তু বৃদ্ধির দরুন অল্পমত দেশের অসংগঠিত ক্ষেত্র হইতে যে ভোগ্যবস্তু পাওয়া যাইবে তাহাতে পরিশেষে দুইজন লোক নিয়োগ করা সম্ভবপর হইবে। এই ক্ষেত্রে “ভোগ্যবস্তু গুণক” হইল দুই এবং ইহা হইল শ্রমিক ও ছদ্মবেশী বেকারের ভোগের পার্থক্যকে শ্রমিকের ভোগ দ্বারা ভাগ করিলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহার বিপরীত।

এখন “ভোগ্যবস্তুর গুণককে” সহজ কিন্তু বাস্তবাত্মক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। ধরা যাক, ছদ্মবেশী বেকার অল্পমত দেশের শ্রমিক হিসাবে এক ইউনিট ভোগ্যবস্তু ভোগ করে কিন্তু সংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদনশীল শ্রমিক হিসাবে স্থানান্তরিত হইবার পর তাহার দুই ইউনিট ভোগ্যবস্তুর প্রয়োজন হইবে। প্রাথমিক অবস্থায় যদি দুই ইউনিট ভোগ্যবস্তুর সংস্থান করা সম্ভবপর হয় তাহা হইলে একজন ছদ্মবেশী বেকারকে জীবনধারণের ক্ষেত্র হইতে সংগঠিত ক্ষেত্রে স্থানান্তর করা সম্ভব হইবে।

আরও ধরা যাক, ছদ্মবেশী বেকার কৃষি হইতে সংগঠিত ক্ষেত্রে নূতন নিয়োগে

আসিবার সময় তাহার এক ইউনিট ভোগ্যবস্তু তাহার ব্যাগে পুরিয়া লইয়া আসিল (ছদ্মবেশী বেকার হিসাবে ইহা সে ভোগ করিত) ; নূতন কর্মে নিয়োগকালে তাকে দুই ইউনিট ভোগ্যবস্তু দেওয়া হইলে সে কর্তৃপক্ষকে তাহার আনীত এক ইউনিট ভোগ্যবস্তু প্রদান করিতে সমর্থ হইবে। এখন আরও একজন ছদ্মবেশী বেকারকে সংগঠিত ক্ষেত্রে আনা চলিবে, আর সেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে হইতে সংগঠিত ক্ষেত্রে আসিবার সময় তাহার এক ইউনিট ভোগ্যবস্তু লইয়া আসিবে, যাহা সে ছদ্মবেশী বেকার হিসাবে পূর্বে ভোগ করিত। এখন, শ্রমিকটি এক ইউনিট ভোগ্যবস্তু সঙ্গে আনিতেছে আর পূর্ববর্তী শ্রমিকের প্রদত্ত এক ইউনিট ভোগ্যবস্তু প্রদানের ফলে দুই ইউনিট ভোগ্যবস্তুর সংস্থান হওয়ায় দ্বিতীয় শ্রমিককে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগে আর কোন অসুবিধা থাকিবে না।

অর্থনীতির ভাষায় প্রকাশ করিয়া বলা যায় যে, যদি সংগঠিত ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক ছদ্মবেশী বেকারকে নিয়োগ করিতে হয় তাহা হইলে যথেষ্ট পরিমাণ ভোগ্যবস্তুর ব্যবস্থা করিবার পর কর অথবা লেভী ধার্য করিয়া অসংগঠিত ক্ষেত্রের “প্রাচুর্য সঞ্চয়কে” সংগ্রহ করিতে হইবে। এইভাবে দেখিলে ভোগ্যবস্তুর গুণককে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মত মনে হয় যাহার দ্বারা দারিদ্র্যের পাপচক্র উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইবে। কিন্তু যদি আমরা ইহাকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখি তাহা হইলে ইহার মধ্যে আর কোন অভিনবত্বই দেখা যায় না, কারণ, ইহা এই সাধারণ সত্যই প্রকাশ করিতেছে যে, গুণকের পরিমাণ কৃষিপ্রধান অসংগঠিত ক্ষেত্রের উদ্ভূত প্রাপ্তির উপর নির্ভর করে।

অনুরূপ দেশে সম্প্রসারণের প্রকৃত পদ্ধতি বর্ণনা করিবার জন্ত “ভোগ্যবস্তু গুণক” তত্ত্বের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। উন্নয়নের পদ্ধতি সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। যদি প্রতিটি ছদ্মবেশী বেকারের “ভোগ্যবস্তু জনিত ফাঁক”—পূরণ করা যায় তাহা হইলে শ্রমিক সংগঠিত ক্ষেত্রে স্থায়ী হইবে। যদি শ্রমিক প্রতি ভোগ্যবস্তুজনিত ফাঁক পূরণ করা যায় এবং পরিবারের “সম্ভাব্য সঞ্চয়ের” সেই অংশ যাহা পূর্বে শ্রমিকের ভোগের জন্ত ব্যয়িত হইত তাহা সংগ্রহ করা যায় তাহা হইলে সকল ছদ্মবেশী বেকারকে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগ করা যাইবে।

ভোগ্যবস্তুর গুণকের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংঘটিত করিতে হইলে দুইটি বাধা অতিক্রম করা প্রয়োজন। প্রথমত, অনুরূপ দেশে উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টি করিবার পূর্বে ভোগ্যবস্তুর প্রাথমিক ঘাটতি পূরণ করিতে হইবে। কিন্তু সমস্তা হইল যে অনুরূপ দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে ভারী এবং প্রথম সমস্তা মূল শিল্প উপেক্ষিত হইবে আর ইহার দরুন কিছুকাল পরে নূতন যন্ত্রপাতির অভাবে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনকারী শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হইবে।

এই কারণে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদের অধিক অংশ ভারীশিল্প গঠনে নিয়োগ করিতেছে; ভারীশিল্প ভোগ্যবস্তু উৎপাদনকারী শিল্পের

ভবিষ্যৎ উন্নয়নের সহায়ক হইবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার দরুন পরিকল্পনা কমিশন প্রাথমিক পর্যায়ে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের মারফতে প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর যোগান বৃদ্ধি করিবার নীতি গ্রহণ করেন। ছদ্মবেশী বেকার শ্রমিকদিগকে সংগঠিত ক্ষেত্রের উৎপাদনশীল কার্কে নিযুক্ত করিবার পর তাহাদের প্রয়োজনীয় ভোগ কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের বর্ধিত যোগান হইতেই মিটানো যাইবে। উপরন্তু ছদ্মবেশী বেকারগণ সকল মূলধন প্রকল্প এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনায় কাজ করিবে। ইহারা সাধারণত পারিবারিক জোতের নিকটবর্তী অঞ্চলে স্থাপিত হইবে, ফলে, শ্রমিকের পক্ষে পারিবারিক জোত হইতে তাহার পূর্বের খাণ্ডের অংশ গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে।

দ্বিতীয় সমস্যাটি হইল, যদি ছদ্মবেশী বেকারকে পারিবারিক জোত হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত কারখানায় নিয়োগ করা হয় তাহা হইলে সম্ভাব্য সঞ্চয় সংগ্রহ করা

দ্বিতীয়

সমস্যা

খুবই কঠিন হইয়া পড়িবে। ইহার কারণ ছদ্মবেশী বেকারকে সঠিক দূরবর্তী অঞ্চলের কারখানায় নিযুক্ত করিলে তাহার অগ্ৰাণ আত্মীয়-

স্বজন তাহাকে অনুপস্থিত সদস্য বলিয়া মনে করিবে এবং ভাবিবে এখন অল্প-পাদনশীল শ্রমিকের ভরণপোষণের দায়িত্ব হইতে তাহারা অব্যাহতি পাইয়াছে; এই ধারণার ফলে তাহাদের ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ইহার অর্থ হইল সম্ভাব্য সঞ্চয়ের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাইবে। কঠোর কর ধার্য বা বাধ্যতামূলক “লেভী” ব্যবস্থা প্রবর্তন না করিলে পরিপূর্ণ সম্ভাব্য সঞ্চয় সংগ্রহ করা সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু ভারতের গ্রায় গণতান্ত্রিক দেশে এই ধরনের কঠোর ব্যবস্থা জনসাধারণ বোধ হয় সহ্য করিবে না।

সুতরাং অধিকাংশ ছদ্মবেশী বেকারকে পারিবারিক জোত হইতে সরাইয়া দূরবর্তী কারখানায় নিযুক্ত করিলে আসল উদ্দেশ্য সাধিত হইবে না। এই কারণে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে ছদ্মবেশী বেকারদিগকে পারিবারিক জোতের সন্নিবর্তে গঠনমূলক প্রকল্প, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কুটির-শিল্পে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উপরন্তু, ছদ্মবেশী বেকারের পক্ষে অভ্যন্ত গ্রাম্য-পরিবেশ পরিত্যাগ করিয়া কারখানার পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যবিধান করা বেশ কঠিন। নূতন পরিবেশে ছদ্মবেশী বেকারকে আকৃষ্ট করিবার পক্ষে মজুরী যথেষ্ট নয়।

এই অসুবিধার কথা মনে রাখিয়া ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন ছদ্মবেশী বেকারদিগের সমস্যাটিকে বাস্তবায়ন দৃষ্টিতে বিচার করিয়াছেন। সরল গঠনমূলক প্রকল্প এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রামে অথবা গ্রাম ও শহরের সীমানায় স্থাপন করিয়া ভারতীয় পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ আশা করেন যে, ছদ্মবেশী বেকারদিগের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যাইবে। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা ভোগ্যবস্তুর গুণকের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ইহার সমাধানের চেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর যুক্তিসঙ্গত, কারণ, ইহা সমস্যাটিকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিচার করে এবং উপলব্ধি

পরিকল্পনা করে যে, অসংখ্য ছদ্মবেশী বেকারকে গ্রাম হইতে দূরবর্তী অঞ্চলে
কমিশনের নিয়োগের জন্ত স্থানান্তর করা খুবই কঠিন কাজ। ইহা সোভাগ্যের
দৃষ্টিভঙ্গী কথা যে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন গ্রামীণ জনগণের উন্নয়নের
জন্ত পরিকল্পনা কর্মসূচী প্রণয়ন করিবার সময় তাহাদের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করিবার চেষ্টা
করিয়াছেন।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর-সংকেত

1. Discuss the main features of Underdevelopment to be witnessed in India's economy to-day. (C. U. B. A. 1962)
[পৃষ্ঠা ১-৬]
2. Examine the socio-economic factors impeding economic growth in India.
[পৃষ্ঠা ৬-৯]
3. Examine briefly the major obstacles to progress in an underdeveloped country like India.
[পৃষ্ঠা ৬-৯]
4. Consider briefly the role of the Government in initiating economic development in an underdeveloped country like India.
[পৃষ্ঠা ১০-২০]
5. Discuss briefly the different sources of finance for economic development.
[পৃষ্ঠা ২১-২৪]
6. Show that in India improvement in agriculture and industrial development depends on each other. (C. U. B. A. 1950)
[পৃষ্ঠা ১১-২১]
7. Discuss the extent to which the Industrial development of India is hindered or facilitated by its social and physical conditions. What part can the State play in securing rapid industrialisation of the Country? (C. U. B. Com '54)
[পৃষ্ঠা ১০-২১]
8. What are the circumstances in which you would justify inflationary financing of development expenditure? Do the circumstances exist in India? (C. U. B. Com '59.) [পৃষ্ঠা ২৩-২৪]

9. Do you think that agricultural development and industrial progress should take place simultaneously in a planned economy ? How far India's Five year plans are stimulating both agricultural and industrial development ?

(Kalyani B. A. Hons. '67 and Burdwan B. Com. '65)

[পৃষ্ঠা ২৬-৩২]

10. "Story of India during British rule is a story of arrested economic growth." Discuss. (Kalyani B. A. Hons. '64) [পৃষ্ঠা ২-৫]



দ্বিতীয় খণ্ড

পরিকল্পনা ও ভারতীয় অর্থনীতি (Planning and the Indian Economy)

চতুর্থ অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা—উহার উদ্দেশ্য ও সমস্যা (Problems and Objectives of Economic Planning)

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত অর্থনৈতিক কাজে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই হইল অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। অধ্যাপক রবিনসের মতে সকল অর্থনৈতিক কার্যাবলীই পরিকল্পিত। উদ্দেশ্য লইয়া নির্বাচন করিয়া কাজ করার নামই পরিকল্পনা—অর্থনৈতিক কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে রহিয়াছে নির্বাচন। অবশ্য ইহা পরিকল্পনার ব্যাপক ধারণা। অর্থনীতির পরিকল্পনার ছাত্র-ছাত্রীর নিকট পরিকল্পনা হইল সরকারী প্রচেষ্টায় সম্বন্ধে এবং সংজ্ঞা সচেতনভাবে রচিত একটি পদ্ধতি যাহার সাহায্যে সামাজিক কাঠামোর রূপান্তর এবং সমাজের বর্তমান উপকরণসমূহের উপযুক্ত এবং কার্যকরী ব্যবহার সম্ভব। পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান কাজ হইল সর্বনিম্নব্যয়ে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাধন করিবার পদ্ধতি আবিষ্কার করা। পরিকল্পনা কমিশন লক্ষ্য রাখিবেন যাহাতে পরিকল্পিত অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রেই ন্যূনতম ব্যয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার উৎপাদন সম্ভব হয় এবং পরিকল্পনায় চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে।

সাম্যবাদী বনাম গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা

(Communistic Vs. Democratic Planning)

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে সোভিয়েত রাশিয়া অগ্রণী। সোভিয়েত রাশিয়া পূর্ণমাত্রায় কমিউনিষ্ট পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করে। সোভিয়েত সমাজ-ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রীকরণ করিবার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করা হয় এবং ব্যক্তিগত উত্তোগ ও খোলাবাজার পদ্ধতিকে সাম্যবাদী ও সুপরিকল্পিত উপায়ে বিনষ্ট করা হয়। সোভিয়েত পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক রচয়িতাগণ ভারীশিল্পসমূহের দ্রুত উন্নয়নের উপর অধিক গুরুত্ব পরিকল্পনা আরোপ করায় ভোগ্যপণ্য শিল্পগুলি উপেক্ষিত হয় এবং সোভিয়েত জনসাধারণ চরম দুঃখ-হর্দশায় পতিত হয়। কমিউনিষ্ট-পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল মূল এবং ভারী-শিল্পগুলির দ্রুত উন্নতি করা।

অনমনীয় সর্বাঙ্গিক কমিউনিষ্ট পরিকল্পনার বিকল্প হইল গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিকল্পনাসমূহকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যদি কোন সাময়িক বিপর্যয়ের দরুন অর্থনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয় তবে জনগণের মঙ্গলের জ্ঞাত কোন ব্যাপক পরিবর্তন না আনিয়া যদি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রয়োজনমত ব্যবহারযোগ্য করিয়া তোলা যায় তবে ইহা একপ্রকার গণতন্ত্র সম্মত পরিকল্পনা বলিয়া গণ্য হইবে। ১৯৩০-এর বিশ্বব্যাপী মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জ্ঞাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জ্ঞাত বৃটেন এই পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটেনে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সম্পদের পুনর্বিত্তাস করা হয়; পরিকল্পনা অবাধ প্রতিযোগিতা ও বেসরকারী উদ্যোগের উপর প্রতিষ্ঠিত স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির পরিপূরক হয়। এই ধরনের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা কোনরূপ সামাজিক জটিলতা অথবা গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি না করিয়া জনগণের অবস্থার উন্নতিসাধন করে। দ্বিতীয় ধরনের গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা অধিকতর কেন্দ্রাভিগামী, সূক্ষ্মদৃষ্ট এবং সর্বাঙ্গিক। ইহা সমাজদেহের সকল অঙ্গে পরিবর্তন আনিতে চেষ্টা করে। এই ধরনের পরিকল্পনা অনমনীয় কমিউনিষ্ট পরিকল্পনা এবং জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার এক মধ্যবর্তী অবস্থা আর ইহা অনুরূপ দেশের বিশেষ উপযোগী কারণ ইহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্বও গ্রহণ করে। এই ধরনের পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করিলে রাষ্ট্রকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, জাতীয় আয়ের বর্ধিত অংশ যেন ভোগের প্রয়োজনে ব্যবহৃত না হইয়া বিনিয়োগিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দ্রুত উন্নয়নের জ্ঞাত ভোগকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামাইয়া আনা খুবই কঠিন। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণকে স্বীকার করা হয়। এই ধরনের পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়। এইরূপ গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইতেছে। সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া অর্থনীতির উন্নয়ন দ্বারা কোটি কোটি নর-নারীর কল্যাণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই ভারতের পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ সৃষ্টি হইয়াছে। গণতান্ত্রিক সরকারের অবস্থিতি এবং পূর্বতন উৎপাদনব্যবস্থার দ্রুত রূপান্তর ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়ক হইয়াছে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং খোলাবাজার পদ্ধতি ভারতের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিবে। পরিকল্পনার দরুন ভারতে এক নূতন অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে—উহাকে “মিশ্রঅর্থনীতি” (Mixed Economy) বলে; ইহাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে।

অনুরূপ দেশে পরিকল্পনা পদ্ধতি

(Planning Technique in Backward Areas)

অনুরূপ দেশের উন্নয়নের জ্ঞাত পরিকল্পনা অপরিহার্য। স্বল্প আয় এবং উৎপাদনশীলতা অনুরূপ দেশের বৈশিষ্ট্য। শুধুমাত্র বর্তমান প্রয়োজন মিটাইবার জ্ঞাতই নয়, ভবিষ্যৎ

সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির জ্ঞাও পরিকল্পনার সাহায্যে আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। স্বয়ং নির্ভরশীল উন্নয়নের জ্ঞা প্রারম্ভিক মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ পর্যাপ্ত হওয়া চাই। মূল শিল্প, পরিবহণ, রাস্তাঘাট নির্মাণ প্রভৃতি কাজের জ্ঞা প্রভূত মূলধন বিনিয়োগ প্রয়োজন। এই সকল কাজে আশু মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেসরকারী উদ্যোগ এই ধরনের বিনিয়োগে উৎসাহ পাইবে না, সুতরাং রাষ্ট্রকেই এইকাজে অগ্রসর হইতে হইবে। বস্তুতঃ, যে কোন দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সাফল্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে : (১) প্রারম্ভিক রাষ্ট্রীয় ব্যয় ; (২) মূলধন গঠন ও নূতন বিনিয়োগ এবং (৩) গণ-সহযোগিতা।

যে পর্যায়ে পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনীতিকে অচলাবস্থা হইতে উত্তোলন করিয়া উহাতে গতির বেগ সঞ্চার করা হয় তাহাকে “উর্ধ্বগমন পর্যায়” (take off stage) উর্ধ্বগমন বলে। উর্ধ্বগমন পর্যায়ে উন্নয়ন দ্রুত হওয়া প্রয়োজন কারণ ইহা পর্যায় এমন এক গতিবেগ সৃষ্টি করিবে যাহাতে অনুরূপ দেশে স্বাভাবিক, স্বয়ংনির্ভরশীল, নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইতে পারে ; বিনিয়োগের জ্ঞা পর্যাপ্ত উদ্ভূত সৃষ্টি হইলেই ইহা সম্ভব হইবে। অধ্যাপক রোস্ট-র মতে উর্ধ্বগমন পর্যায় ১৫ হইতে ২৫ বৎসর কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয়, অবশ্য অনুরূপ দেশ সঠিক উন্নয়নী কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া এই পর্যায়কে সংক্ষেপ করিতে পারে। উর্ধ্বগমন পর্যায়ের পর “স্বয়ং নির্ভরশীল সম্প্রসারণ” পর্যায় আসিবে। অনুরূপ দেশের প্রকৃতি এরূপ যে সামান্য পরিমাণ বিনিয়োগ দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ সৃষ্টি করিতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ ও রাস্তাঘাট সম্প্রসারণ, এবং মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের জ্ঞা পর্যাপ্ত মূলধন বিনিয়োগিত হইলে তবেই দেশ অর্ধ-অচলাবস্থা হইতে উঠিতে পারে। এই ধরনের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ঘটাইয়া অনুরূপ দেশে “উর্ধ্বগমন পর্যায়” সংক্ষেপ করা যায়। সুতরাং পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এমন এক পরিকল্পনা-কৌশল গ্রহণ করিবেন যাহাতে ভারী শিল্প, পরিবহণ এবং বিদ্যুতের দ্রুত উন্নতি হয়। এই ধরনের বিনিয়োগের দরুন আশু মুনাফা অর্জনের কোন সম্ভাবনা নাই বলিয়া বেসরকারী উদ্যোগীগণ ইহাতে কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না। এই সকল বিনিয়োগের কাজ সরকারকেই উদ্যোগী হইয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অনুরূপ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ সৃষ্টির জ্ঞা পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্রমাগত নূতন বিনিয়োগ প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ভারী শিল্প অগ্রাধিকার পাইলে উন্নয়ন দ্রুততর হইবে।

পরিবহণ, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে বাজারের আয়তন সম্প্রসারিত হইবে এবং নূতন বিনিয়োগ উৎসাহিত হইবে। সামাজিক মূলধন খাতে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে মূলধন গঠনের হার এবং জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, জলসেচ ও পরিবহণের ব্যাপক সম্প্রসারণ না হইলে দ্রুত উন্নয়নের প্রারম্ভিক গতিবেগ সৃষ্টি হইবে না এবং অর্ধ-অচলাবস্থা হইতে গতিশীল উর্ধ্বগমন পর্যায়ের রূপান্তর বিলম্বিত

হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচকগুলি বিশ্লেষণ করিলে ভারীশিল্প, পরিবহণ, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ সম্প্রসারণে রাষ্ট্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার নির্ভর করে তিনটি সূচকের উপর : (১) অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ, (২) মূলধন গঠনের হার (অর্থাৎ নতুন বিনিয়োগের প্রবাহ) এবং (৩) গণ-সহযোগিতা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ত্বরান্বিত করিতে হইলে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, নতুন বিনিয়োগের প্রবাহ সম্প্রসারিত করিতে হইবে, সমাজব্যবস্থাকে উপযুক্তভাবে সংগঠন করিতে হইবে এবং জনগণের উদ্দীপনার রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে হইবে।

মূল ও ভারীশিল্পগুলির উন্নয়ন এবং পরিবহণ, জলসেচ ও বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ নতুন বিনিয়োগ প্রবাহকে বাড়াইবে আর এইভাবে মূলধন গঠনের গতিবেগ ত্বরান্বিত হইবে। মূলধন গঠনের এই বর্ধিত হারের দরুন অনগ্রসর অল্পমত অর্থনীতি উর্ধ্বগমন পর্ষায় হইতে স্বয়ং নির্ভরশীল সম্প্রসারণের শেষ পর্ষায়ে আসিয়া দাঁড়াইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, অল্পমত দেশে বেসরকারী উদ্যোগ ভারীশিল্প, পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে মূলধন বিনিয়োগ করিতে মোটেই আগ্রহী নয়। এই সকল ক্ষেত্রে একই সঙ্গে বিনিয়োগ প্রয়োজন বলিয়া প্রারম্ভিক পর্ষায়ে রাষ্ট্রকে প্রভূত ব্যয় করিতে হইবে।

প্রভূত পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের দরুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত হইবে। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় অবশ্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নয়। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ জনগণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মূলধনকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সুষ্টভাবে বণ্টন করিবেন। এই কারণেই সম্পদের একাংশ সমষ্টি উন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছে। মোট সম্পদের কিয়দংশ অত্র নিয়োগের দরুন মূলধন বৃদ্ধির সর্বাধিক গতিবেগ ব্যাহত হইয়াছে। সমষ্টি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ সম্প্রসারণ সেবায় ব্যয়িত না হইয়া সমগ্র মূলধন ভারীশিল্প উন্নয়নে বিনিয়োগিত হইলে অধিক মূলধনী দ্রব্য সৃষ্টি হইতে পারিত এবং মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাইত। কিন্তু গণতান্ত্রিক, কল্যাণ-প্রণোদিত পরিকল্পনায় সর্বাধিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং জনগণের সর্বাধিক কল্যাণের মধ্যে সামঞ্জস্যবিধান করা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় গণসহযোগিতার এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। গ্রামীণ জীবন পুনরুজ্জীবিত করায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। ইহা জনগণের মধ্যে নবীন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে এবং কৃষি-প্রধান দেশের উন্নয়নের বিশেষ সহায়ক হইবে। বস্তুতঃ জনগণের সহযোগিতা এবং উদ্দীপনা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় উপাদানগুলির মধ্যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করিবে এবং এইভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিবে।

কৃষি-প্রধান অল্পমত দেশে কি ধরনের পরিকল্পনা-কৌশল (Planning technique)

গ্রহণ করিতে হইবে সে সম্পর্কে আমরা এখন সিদ্ধান্তে আসিতে পারি। পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইবে অর্ধ-অচলাবস্থা হইতে অর্থব্যবস্থাকে দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা। ভারীশিল্প, পরিবহণ, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ দ্রুত শিল্পায়ণের স্তম্ভস্বরূপ বলিয়া রাষ্ট্রকে উহাদের উন্নয়নের জন্ত প্রভূত বিনিয়োগ করিতে হইবে। এই বিনিয়োগের ফলে মূলধন গঠনের হার এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে আর ইহার দরুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে।

কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিকল্পনায় জনগণের কল্যাণের প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় অবস্থা, এরূপভাবে প্রভাবিত করা প্রয়োজন যে, জনসাধারণ যেন অনুভব করে যে, তাহাদের সুবিধার জন্তই পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে এই বোধের সৃষ্টি হইলে পরিকল্পনার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠিবে। কৃষি-প্রধান দেশে সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রামীণ জনগণের মধ্যে নূতন আশা এবং আকাঙ্ক্ষার সঞ্চার করিবে। সুতরাং পরিকল্পনা-কৌশল এরূপ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে একই সঙ্গে ভারীশিল্প, পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে ঠিক এই ধরনের পরিকল্পনা-কৌশলই অনুসরণ করা হইয়াছে। ভারতের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারী ও মূল শিল্প, পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর অধিক মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, কারণ, ইহারা রাষ্ট্রীয় ব্যয় এবং নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ—অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ধারণকারী এই দুইটি বিষয়কে উৎসাহিত করিবে। কিন্তু ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ জনকল্যাণ প্রণোদিত গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা বলিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ সমষ্টি উন্নয়ন এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক প্রকল্পে বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় শক্তিসমূহকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে সহায়তা করিবে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে সুগম করিবে।

পরিকল্পনা-কৌশলের সাফল্য নির্ভর করে দুইটি সর্তের উপর। প্রথমত, কুটির ও হস্তশিল্পে যে উৎপাদন ক্ষমতা সংরক্ষিত আছে তাহা কার্যকরীভাবে একত্রিকরণ করিতে হইবে। মূলধন-স্বল্প অনুরূপ দেশের পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে ভারীশিল্পের উপর সাক্ষ্যের অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইলে ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের উপর সর্ব যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে ভোগ্যবস্তুর জন্ত ব্যাপক চাহিদা দেখা দিবে এবং গ্রামীণ অর্থবেকারদের কুটির ও হস্তশিল্পে নিয়োগ করিয়া এই চাহিদা মিটাইতে হইবে। অবশ্য কুটির এবং হস্তচালিত শিল্পগুলিকে ধীরে ধীরে যন্ত্রিকরণ করিতে হইবে। সুলভ বিদ্যুৎ এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহা করা মোটেই কঠিন হইবে না। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভোগ্যবস্তুর ঘাটতি পূরণের জন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির এবং হস্ত-

শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির বিবরণ (Progress Report) হইতে অবশ্য জানা গিয়াছে যে, কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতি নৈরাশ্যব্যঞ্জক। সুতরাং তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কুটির ও হস্তশিল্পগুলিকে যত্নবরণ করিবার জ্ঞাত সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিকল্পনা-কৌশলের সাফল্যের দ্বিতীয় সর্ত হইল সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপিত করা। দ্রুত শিল্পায়ণের জ্ঞাত প্রয়োজন কৃষির পুনর্গঠন এবং দ্রুত কৃষিউন্নয়ন। শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে খাদ্যোৎপাদন এবং কাঁচামালের যোগানের উপর। দ্রুত শিল্পায়ণ কৃষি-উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। শিল্প-বিপ্লবের পূর্বসর্ত হইল কৃষিবিপ্লব। এই কারণেই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু কৃষিউন্নয়নের কর্মসূচী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় সম্যকভাবে অনুসৃত হয় নাই বলিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্ফুরে তীব্র উর্ধ্বগতি দেখা দেয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জ্ঞাত সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা করিতে হইবে এবং সার, কীটনাশক ঔষধ কৃষিযন্ত্রপাতি প্রভৃতি সরবরাহ করিয়া শিল্প-কৃষি উন্নয়নে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করিবে। কৃষি এবং শিল্প একই সঙ্গে সম্প্রসারিত না হইলে এবং পরস্পরকে সাহায্য না করিলে উন্নয়ন-প্রয়াস ব্যাহত হইবে।



পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(India's First Five Year Plan)

সরকারী উদ্যোগে যদিও ভারতের জগ্না কার্যকরী পরিকল্পনা ১৯৫১ সালের পূর্বে রচিত হয় নাই তথাপি ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘকাল হইতেই অনুভূত হইয়াছে।

বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ স্যার এম. বিস্বেস্বরায় (M. Visvesvaraya) ১৯৩৪ সালে তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ **Planned Economy for India** রচনা করেন। সম্ভবত ভারতের বিস্বেস্বরায় অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জগ্না রচিত ইহাই প্রথম পরিকল্পনা। ১৯৩৭ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জওহরলাল নেহেরুর নেতৃত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির দরুন কমিটির কার্য ব্যাহত হয় বলিয়া ১৯৪৮ সালের পূর্বে ইহার পক্ষে রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব হয় নাই।

১৯৪৩ সালে বোম্বাই-এর আটজন বিখ্যাত শিল্পপতি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক পরিকল্পনা রচনা করেন। ইহাই বোম্বাই পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার বোম্বাই উদ্দেশ্য ছিল কৃষি উৎপাদন ১৩০ ভাগ এবং শিল্পোৎপাদন ৫০০ ভাগ পরিকল্পনা বৃদ্ধি করা। এই পরিকল্পনায় মূল শিল্পের প্রতি অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল এবং আগামী ১৫ বৎসরে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করিবার লক্ষ্য ধাৰ্য করা হইয়াছিল। ঐ একই সময়ে বিপ্লবী শ্রী এম. এন. রায় জাতির উন্নয়নের জগ্না “জনগণের পরিকল্পনা”(Peoples Plan) রচনা করেন। ইহা ১৫,০০০ কোটি টাকার একটি দশ-শালা পরিকল্পনা। কৃষি এবং ভোগ্যপণ্য শিল্পকে ইহা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়া মূল শিল্পকে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দিয়াছিল। ইহা ব্যতীত শ্রী এস. এন. আগরওয়াল ৩৫০০ কোটি টাকায় বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে স্বয়ং নির্ভরশীল গ্রামীণ অর্থনীতির গান্ধীবাদী পরিকল্পনা (Gandhian Plan) রচনা করেন। কৃষিসংস্কার এবং কুটিরশিল্পের পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ছিল।

১৯৪৪ সালে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নের জগ্না ভারত সরকার পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন বিভাগ গঠন করেন। এই বিভাগ স্বাভাবিক অর্থনৈতিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জগ্না কতকগুলি স্বল্পমেয়াদী এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জগ্না কতকগুলি পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশ ব্যতীত আর কিছুই করে নাই। ১৯৫০ সালের গঠন মার্চ মাসে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে এই কমিশন প্রথম পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেন। এই সময় হইতেই পরিকল্পিত অর্থনীতির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনা শুরু হইবার দেড় বৎসর পরে চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে জাতির নিকট উপস্থাপিত করা হয়। ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাস—এই পাঁচ বৎসর প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (First Five Year Plan) : প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভকালে ভারতের অর্থনৈতিক জীবন বিপর্দস্ত ছিল। খাওয়ার ঘাটতি, কাঁচামালের অভাব, দেশবিভাগ জনিত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সঙ্কট, মুদ্রাস্ফীতির প্রবল চাপ, পরিবহণের দুর্বস্থা এবং প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স—এমনই এক পটভূমিকায় রচিত হইয়াছিল প্রথম পরিকল্পনা। প্রথম পরিকল্পনা বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বৈষম্য হ্রাস এই দুইটি ইহার মূল লক্ষ্য হইলেও জনগণকে উন্নত জীবনধারণের এবং পরিবর্তিত জীবনের স্বযোগ দিবার উদ্দেশ্যে ইহা নূতন সামাজিক উদ্দেশ্য ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। পরিকল্পনা কমিশন জনকল্যাণের আদর্শে গঠিত মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তিতে পরিকল্পিত উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এই ধরনের সমাজব্যবস্থায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিবে। পরিকল্পনাধীন সময়ে সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে কে ধীরে ধীরে প্রসারিত করা হইলেও জাতীয়করণের কোন সর্বাঙ্গিক পরিকল্পনা গৃহীত হয় নাই। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগকে রাষ্ট্রের অল্পবিস্তর নিয়ন্ত্রণ সহ সম্প্রসারিত এবং মুনাকা অর্জন করিবার স্বযোগ দেওয়া হইয়াছিল। গণতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্যের জ্ঞাত যে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের সামঞ্জস্যপূর্ণ সহাবস্থান প্রয়োজন এ সম্পর্কে পরিকল্পনা কমিশন সম্পূর্ণ সচেতন রহিয়াছেন। কার্ঘ্যত দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মোট ২০৬৯ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দের স্থির হইয়াছিল, পরে ইহা বৃদ্ধি করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যয়

প্রধান প্রথম বরাদ্দের সমানও হয় নাই—ইহার পরিমাণ ছিল মাত্র ২০১২ কোটি টাকা। ২০১২ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ খুবই সামান্য, কারণ ইহা ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র শতকরা ৪ ভাগের মত। এই সংযত ব্যয়বরাদ্দ অর্থনীতিতে যদিও কোনরূপ ব্যাপক পরিবর্তন আনিতে পারে নাই তথাপি ইহা উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সাহসিকতাপূর্ণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভিত্তিস্থাপনে সহায়তা করিয়াছে।

আশা করা হইয়াছিল যে, সরকারী উদ্যোগে মোট ২৩৭৮ কোটি টাকার মধ্যে কৃষি এবং সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ৩৫৪ কোটি টাকা (১৪.৯%), জলসেচ ও বিদ্যুৎ খাতে ৬৪৭ কোটি টাকা (২৭.২%), শিল্প ও খনি খাতে ১৮৮ কোটি টাকা (৭.৯%), পরিবহণ ও যোগাযোগ খাতে ৫৭১ কোটি টাকা (২৪%), সামাজিক এবং কল্যাণমূলক

কাজের জন্ম ৫৩২ কোটি টাকা (২২.৪%) এবং বিবিধ কাজের জন্ম ৮৬ কোটি টাকা (৩.৬%) ব্যয় হইবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ম প্রথম পরিকল্পনায় তিনটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছিল : (ক) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ম কৃষিব্যবস্থাকে পুণর্গঠিত করিয়া গ্রামীণ অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা, (খ) স্বাধীনতা-পরবর্তীযুগে অর্থনৈতিক স্বায়িত্বকে রক্ষা করা এবং (গ) উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও সাহসিকতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার ভিত্তি প্রস্তুত করা।

(১) **কৃষি কর্মসূচী (Agricultural Programme)** : স্বাধীনতা-পরবর্তীযুগে খাতিসমস্তাই দেশের বৃহত্তর সমস্তা ছিল বলিয়া প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ১০০১ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৪২.১ ভাগ কৃষি, সমষ্টি উন্নয়ন এবং বহুমুখীন জলসেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জন্ম বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া উপযুক্ত কাজ হইয়াছে, কারণ এই সময় দেশে চরম খাদ্যসংকট দেখা দেয়। খাদ্য এবং কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে দ্রুত শিল্পায়ণ ব্যাহত হইবে। সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির জন্ম কৃষিকে পুনর্গঠন করা প্রয়োজন।

প্রথম পরিকল্পনাকালে মোটামুটি কৃষি-পরিকল্পনা সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই সময়ে কৃষি-উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কৃষি-পরিকল্পনার প্রধান দ্রুটি যে, কোন সুসংগত এবং ব্যাপক শস্তা পরিকল্পনার (Crop planning) ব্যবস্থা কমিশন করিতে পারেন নাই।

(২) **পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং জলসেচ (Transport, Power and Irrigation)** : কৃষির পরই পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং জলসেচের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। ১২১৮ কোটি টাকা অর্থাৎ মোট ব্যয়ের ৫১.২ ভাগ পরিবহণ, বিদ্যুৎ এবং জলসেচ খাতে বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পরবর্তীকালের পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের জন্ম এই সামাজিক মূলধন (social capital) বৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজন। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সংসরণের অভাব যাহাতে কোনরূপ বাধা সৃষ্টি না করে সেইজন্ম ইহাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল।

(৩) **সামাজিক সেবা (Social Services)** : স্বাস্থ্য, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ এবং অগ্রাধিকার সমাজ কল্যাণমূলক কাজের জন্ম মোট ব্যয়ের শতকরা ২২ ভাগ বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ভারত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শে বিশ্বাসী বলিয়া পরিকল্পনা রচয়িতাগণ সমাজ কল্যাণমূলক কাজকে অবহেলা করিতে পারেন নাই।

(৪) **শিল্প কর্মসূচী (Industrial Programme)** : বৃহদায়তন শিল্প, খনি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে মোট ১৩২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। উহা মোট ব্যয়ের শতকরা ৫.৮ ভাগ। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের জন্ম ৪২ কোটি টাকা

(মোট ব্যয়ের ২.১%) বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সকলপ্রকার শিল্প, খনি এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা খাতে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৮৮ কোটি টাকা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ১০০ কোটি টাকা। পরিকল্পনার প্রারম্ভকালে নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গঠনের উপযুক্ত যন্ত্রপাতির অভাবের দরুন মোট বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হয় নাই। যখন পরিকল্পনা চূড়ান্ত আকার গ্রহণ করে তখন পরিকল্পনার দুইটি বৎসর ইতিপূর্বেই শেষ হইয়া গিয়াছে এবং প্রশাসনিক দুর্বলতার জন্ত অবশিষ্ট তিন বৎসরে শিল্প উন্নয়নের সামান্য কর্মসূচীও কার্যে পরিণত হয় নাই।

প্রথম পরিকল্পনার অগ্রগতির রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, পরিকল্পনাকালে শিল্প-উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫০ সালে শিল্পের উৎপাদনসূচী ছিল ১০৫, ১৯৫৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬১-তে আসিয়া দাঁড়ায়। (১৯৪৬=১০০)।

প্রথম পরিকল্পনার সাফল্য (Achievements of the First Plan) :

ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি এবং চরম খাণ্ডসঙ্কটের মধ্য দিয়া প্রথম পরিকল্পনা শুরু হইলেও পরিকল্পনাকাল অতিবাহিত হইবার পর দেখা গেল যে প্রথম পরিকল্পনা মোটামুটি সফল হইয়াছে। জাতীয় আয় ৮৮৭০ কোটি টাকা (১৯৫০-৫১) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ১০,৪২০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে কৃষি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পাওয়াতে নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্রাস করা সম্ভব হয়। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে পাইকারী দামের সূচীসংখ্যা ৪৫০ হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে নামিয়া ৩৮৭.৩-এ আসিয়া দাঁড়ায়। (ভিত্তি, ১৯৩৯=১০০)।

(১) কৃষির অগ্রগতি (Agricultural Progress) : প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষিউৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। খাদ্য উৎপাদন ৫০ মিলিয়ন টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ৫৬ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়ায়। এই সময়ে ৮৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা হয় এবং বিদ্যুৎশক্তিও ১৩ লক্ষ কিলো ওয়াট বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষি, জলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন বেশ সন্তোষজনকই হইয়াছিল।

(২) শিল্পের অগ্রগতি (Industrial Progress) : প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্পোৎপাদন প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে শিল্প উৎপাদনসূচী ছিল ১৩৭, ১৯৫৪-৫৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪৮ হয়। পরবর্তী-কালে শিল্পায়ণের এই অগ্রগতি অব্যাহত ছিল। বস্ত্র উৎপাদন পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৪০ কোটি গজ বেশী হইয়াছিল। কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদনক্ষমতাকে পূর্ণভাবে কাজে লাগাইবার ফলে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

(৩) পরিবহণের অগ্রগতি (Transport Progress) : পরিবহণ ও যোগা-যোগ সংরক্ষণ খাতে প্রথমে ৪৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও পরে উহা বৃদ্ধি করিয়া

৫৭০ কোটি টাকা করা হয়। পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রথম পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ৩৮০ মাইল নতুন রেলপথ নির্মাণ, ৪৩০ মাইল পুরাতন রেলপথের সংস্কার, জাতীয় সড়ক নির্মাণের জন্ত ৬৩৬ মাইল রাস্তা নির্মাণ, ৩০টি প্রধান সেতু নির্মাণ এবং ৪০০০ মাইল রাস্তার সংস্কার—এই সকল কাজই প্রথম পরিকল্পনাকালে সম্পন্ন হয়।

১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির মিলিত ব্যয়বরাদ্দ ছিল ২০৬২ কোটি টাকা। পরবর্তীকালে পরিকল্পনার আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যয়বরাদ্দও বৃদ্ধি করিয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল ২০১২ কোটি টাকা—অনুমিত ব্যয় অপেক্ষা শতকরা ১৫.৪ ভাগ কম।

প্রথম পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financing of the First Plan) : পরিকল্পনার জন্ত প্রথমে মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ২০৬২ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১২৫৮ কোটি টাকা কর রাজস্ব ও আভ্যন্তরীণ ঋণ হইতে, ২২০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করিয়া এবং অবশিষ্ট ৫২১ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা ঘাটতি ব্যয় করিয়া পূরণ করা হইবে।

সংশোধিত হিসাবানুযায়ী পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া ২৩৭৮ কোটি টাকা দাঁড়ায়। কর ও অগ্রাণু সূত্র হইতে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় ১২৭৭ কোটি টাকা, বৈদেশিক সাহায্য ২০৩ কোটি টাকা এবং ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৩২ কোটি টাকা।

(১) **আভ্যন্তরীণ ঋণ (Borrowing) :** প্রথম পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ সূত্র হইতে ঋণ সংগ্রহ বেশ সন্তোষজনক হইয়াছিল। ১২৭৭ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ২০২ কোটি টাকা—পরিকল্পনার লক্ষ্য অপেক্ষা ইহা ৮৭ কোটি টাকা বেশী। ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ হইয়াছিল ৩০.৪ কোটি টাকা কিন্তু পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ২৭০ কোটি টাকা।

(২) **কর সংগ্রহ (Taxation) :** প্রথম পরিকল্পনাকালে কর হইতে সংগৃহীত টাকার পরিমাণ ছিল এইরূপ : ১৯৫০-৫১ সালে ৬২৬ কোটি টাকা ; ১৯৫১-৫২ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩৮ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী দুই বৎসরে ইহা হ্রাস পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ইহা মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৭ ভাগের কিছু বেশী। ভারতের মত বিরাট দেশের পক্ষে ইহা আশাপ্রদ সংগ্রহ নয়।

(৩) **ঘাটতি ব্যয় (Deficit Financing) :** প্রথম পরিকল্পনাকালে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সংযতভাবে ঘাটতি ব্যয় করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল হইতেই ঘাটতি ব্যয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কেনস্ প্রভৃতি আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে দেশে অব্যবহৃত সম্পদ থাকিলে ঘাটতি ব্যয়ের ফলে মুদ্রাস্ফীতির পরিবর্তে উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে। অনুল্লত

দেশে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দ্রুত মূলধন গঠন এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত ঘাটতি ব্যয় করা হয়। ভারতেও এই উদ্দেশ্যে ঘাটতি ব্যয় করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে ২২০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হয় ৫৩২ কোটি টাকা।

(৪) বৈদেশিক সাহায্য (External Assistance) : আভ্যন্তরীণ স্রুত হইতে সংগৃহীত অর্থ প্রয়োজনের তুলনায় কম হইলে বৈদেশিক মূলধন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ২০৩২ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে প্রথম তিন বৎসরে ১২২ কোটি টাকা, চতুর্থ বৎসরে ১৬ কোটি টাকা এবং শেষ বৎসরে ৫৮২ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যায়। বৈদেশিক সাহায্যের দ্বারা প্রধানত গম, ইম্পাত এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার মূল্যায়ন (An Appraisal of the First Plan) : প্রথম পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিলে ইহার কতকগুলি ত্রুটি চোখে পড়ে। প্রথমত, পরিকল্পনার মোট ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ২৩৭৮ কোটি টাকা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ১৯৬০ কোটি টাকা। পরিকল্পনা রচনার ত্রুটির জন্তই ইহার সকল কার্যসূচী বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনা কমিশন ভারতের জাতীয় সম্পদের পরিপূর্ণ এবং সঠিক হিসাব প্রস্তুত না করিয়াই একটি মোটামুটি ধারণা লইয়া পরিকল্পনা রচনা করিয়াছিল। তৃতীয়ত, দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের (physical resources) হিসাব লইয়া পরিকল্পনা না করিয়া আর্থিক সম্পদের (financial resources) উপরই প্রধানত নির্ভর করা হইয়াছে। এই কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাবে পরিকল্পনার অনেক লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। চতুর্থত, কৃষির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে বৃহৎ শিল্পগুলি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছিল, এমন কি ইহাদের উন্নয়নের জন্ত যৎসামান্য বরাদ্দ টাকাও ব্যয় করা হয় নাই। পঞ্চমত, পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের জন্ত দীর্ঘকালীন প্রকল্পের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় কৃষি-উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় নাই। ষষ্ঠত, কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও পরিকল্পিত পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের (crop planning) কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই এবং ফসল বীমাকরণ কৃষি পরিকল্পনায় স্থান লাভ করে নাই।

এই সকল দোষত্রুটি সত্ত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, প্রথম পরিকল্পনা ভারতের পরিকল্পিত অগ্রগতির প্রথম নির্ভুল পদক্ষেপ। ভিত্তিমূলক পরিকল্পনা হিসাবে কৃষির উপর অগ্রাধিকার না দিয়া ইহার উপায় ছিল না। প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষি-উৎপাদন শতকরা ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শিল্পের উৎপাদনও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পরিকল্পনাকালে ৫৩২ কোটি টাকার ঘাটতি ব্যয় করা হইলেও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় নাই। পরিকল্পনা কমিশন বলিয়াছেন যে, পরিকল্পনা জনসাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনা ও

উৎসাহের সৃষ্টি করে। স্থিতিশীল ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রথম পরিকল্পনা নূতন প্রেরণা এবং গতিবেগের সঞ্চার করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের মূলে ছিল তাহার সংঘত লক্ষ্যমাত্রা, মৌসুমী বায়ুর আবহুকল্যাণ, শিল্পগুলির পূর্ণশক্তিতে কাজ করিবার ক্ষমতা এবং সর্বোপরি আশাবুরূপ বৈদেশিক সঞ্চয়। প্রথম পরিকল্পনার সাফল্যের উপর ভিত্তি করিয়াই অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচী গৃহীত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(India's Second Five Year Plan)

১৯৫৬ সালের ৩১শে মার্চ প্রথম পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল হইল ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং সাহসিকতাপূর্ণ।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল চারটি : (ক) দেশবাসীর জীবন-ধারণের মান উন্নয়নের জন্ত উল্লেখযোগ্যরূপে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সাধন করা ; (খ)

উদ্দেশ্য মূল এবং ভারী-শিল্পগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া দ্রুত শিল্পায়ণ করা ; (গ) কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ বৃদ্ধি করা এবং (ঘ) আয় ও ধনবৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সমবন্টনের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করা। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত মুনাকার অবসান ঘটাইয়া সামাজিক মুনাকা বৃদ্ধি করার জন্ত উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলি গৃহীত হইয়াছে।

উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্ত বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন আবার উৎপাদন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিবার জন্ত প্রয়োজন সামাজিক মূলধন, খনিজ সম্পদ ও মূলশিল্পের সম্প্রসারণ করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়ণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল। মোট ব্যয়বরাদ্দের ১৮ শতাংশ ভারী এবং মূলশিল্পে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্ত ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাহা মূলনীতির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতির মৌল অভাবগুলি দূর করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল শিল্পায়ণ। শিল্পায়ণ ব্যতীত দ্রুত অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে না। দ্রুত শিল্পায়ণ ভিন্ন ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কর্মসংস্থানের কোন উপায় নাই এবং অতিরিক্ত জনসংখ্যাকে কৃষি হইতে শিল্পে সরাইয়া না লইলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ইহা ব্যতীত শিল্পোন্নতি না হইলে কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না, ফলে কৃষিজ দ্রব্যের দাম হ্রাস পাইবে এবং ইহা সমগ্র অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, যাহাতে মূলধনের

ভিত্তি দৃঢ় হয়, উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়, কারিগরী দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং নূতন বিনিয়োগ প্রবাহ দ্রুততর হয়।

শিল্পায়ণ ত্বরান্বিত করিতে হইলে লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, সিমেন্ট, ভারী রাসায়নিক প্রভৃতি শিল্পের উন্নতি করা প্রয়োজন, কারণ, ইহারা মূলধনী সরঞ্জাম উৎপাদনে সহায়তা করিবে। মূল এবং ভারী-শিল্পগুলি মূলধন প্রগাঢ় (Capital intensive) বলিয়া ইহারা অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করিতে পারে না। মূল এবং ভারী-শিল্পে বিনিয়োগ হইলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এবং ভোগ্যপণ্যের জ্ঞতা চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু স্বল্পকালীন সময়ে উহাদের যোগান বৃদ্ধি পাইবে না। সুতরাং সমতাপ্রাপ্ত শিল্পায়ণের জ্ঞতা অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্ধিত ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পূরণ করা ছাড়াও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জ্ঞতা ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জ্ঞতা ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, অবশ্য প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল ১৭৫ কোটি টাকা। কুটিরশিল্প যদি দেশের ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পারে তবে মূল শিল্পগুলির উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। সমতাপ্রাপ্ত শিল্পায়ণের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারী মূলশিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পগুলির যুগপৎ উন্নয়নের চেষ্টা করা হইয়াছে।

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়া পরিকল্পনা কমিশন কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। ভারতের গ্রামেই অর্ধবেকারদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। ইহারা পূর্ণ কর্মসংস্থানের জ্ঞতা উন্মুখ হইলেও নিজস্ব পরিবেশ ছাড়িয়া অত্র যাইতে অনিচ্ছুক। কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহাতে একই সঙ্গে অর্থনিয়োগ সমস্যার সমাধান হইবে এবং ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্প, কৃষি এবং পরিবহণ (Industry, Agriculture and Transport in the Second Plan): প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং কারিগরী শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীর অভাবে প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্পায়ণের গতি মন্থর ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মুখ্য শিল্পগুলির উন্নয়নের জ্ঞতা কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শিল্প-কর্মসূচীর ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনের পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ নির্ধারণ করে। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন বৃদ্ধির জ্ঞতা সরকারী উদ্যোগে ভিলাই, করকেলা ও দুর্গাপুরে একটি করিয়া বৃহদায়তন লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে এবং সোভিয়েত সহযোগিতায় তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ দিকে বোকারোতেও একটি ইস্পাত-শিল্প গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাসায়নিক ও যন্ত্রশিল্পের উন্নয়নের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। সিমেন্ট,

সার এবং অগ্রাঙ্ক উৎপাদক দ্রব্য (producers goods) উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। ইহা ছাড়া পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প প্রভৃতি পুরাতন শিল্পগুলির আধুনিকীকরণ করা হয়। এই সকল শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করিবার কর্মসূচীও গৃহীত হয়। ভোগ্যপণ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্ত নূতন শিল্প স্থাপন করা হইলেও চাহিদার বৃহত্তর অংশ মিটাইতে হইবে পূর্বপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের জন্ত যে প্রকার দায়িত্বপূর্ণ সাহসিকতা দেখা যায় কৃষির ক্ষেত্রে কিন্তু উহা বিরল আর অনেক ক্ষেত্রেই উৎপাদন চাহিদার তুলনায় স্বল্প।

কৃষির উন্নয়ন খাত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ১ কোটি টন, তুলা ১৩ লক্ষ গাঁট, তৈলবীজ ১৫ লক্ষ টন, ১০ লক্ষ গাঁট পাট এবং ১৩ লক্ষ টন ইক্ষু। প্রথম পরিকল্পনায় খাত উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্য ছিল ৭৬ লক্ষ টন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ২৫ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পোন্নয়নের দরুন ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এক কোটি টন খাতোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা সত্যি প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য বলিয়া মনে হয়। পরে এই ত্রুটি উপলব্ধি করিয়া খাতোৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া এক কোটি ৫৫ লক্ষ টন করা হয়। ইহার দরুন দৈনিক মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ ১৭.২ আউন্স হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮.৩ আউন্সে আসিয়া দাঁড়াইবে। তুলার ক্ষেত্রে ২৩ লক্ষ গাঁট, তৈলবীজের ক্ষেত্রে ২১ লক্ষ টন, পাটের ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ গাঁট এবং ইক্ষুর ক্ষেত্রে ২০ লক্ষ টন—এইগুলি হইল সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কমিশন পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দিয়াছিলেন। রেলপথ উন্নয়নের জন্ত ২০০ কোটি টাকা ও রাস্তাঘাটের জন্ত ২৭১ পরিবহণ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজ সংযোগ স্থাপন ব্যতীত উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্রগুলির মধ্যে সংযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যেই যোগাযোগ ও পরিবহণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। পরিবহণ ও সংযোগ ব্যবস্থার উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন নির্ভরশীল, কারণ ইহাদের উন্নতি ঘটিলে নূতন বাজার সৃষ্টি হইবে, নূতন বিনিয়োগে উৎসাহিত হইবে এবং উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financing of the Second Plan) :

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে ২৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। সরকারী ক্ষেত্রে যে ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় তাহা নিম্নলিখিত সূত্রগুলি হইতে সংগ্রহ করা হয় :

কোটি টাকা

১। চলতি রাজস্ব হইতে উদ্ধৃত (Surplus from current revenues)

৮০০

(ক) ১৯৫৫-৫৬ সালের করের হার

৩৫০

কোটি টাকা

(খ) অতিরিক্ত কর ধার্য	৪৫০	
২। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ (Borrowing from the public)		১২০০
(ক) বাজার হইতে সংগৃহীত ঋণ	৭০০	
(খ) স্বল্প-সঞ্চয়	৫০০	
৩। বাজেটের অন্যান্য উৎস (Other budgetary sources)		৪০০
(ক) উন্নয়নী কর্মসূচীতে রেলপথের অর্থদান	১৫০	
(খ) প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য জমা	২৫০	
৪। বিদেশ হইতে অর্থ সংগ্রহ (Resources to be raised externally)		৮০০
৫। ঘাটতি ব্যয় (Deficit financing)		১২০০
৬। ঘাটতি—আভ্যন্তরীণ অন্যান্য অর্থসংগ্রহের উপায়ের সাহায্যে পূরণ করিতে হইবে (Gaps to be covered by additional measures to raise domestic resources)		৪০০

মোট ৪,৮০০

উপরের তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চলতি রাজস্ব হইতে উদ্ভূত, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ এবং বাজেটের অন্যান্য উৎস হইতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারগুলি ২৪০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবেন। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে ১২০০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে এবং ৮০০ কোটি টাকার বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে বলিয়া ধরা হয়। ইহা সত্ত্বেও আরও ৪০০ কোটি টাকার ঘাটতি থাকিয়া যায়। নূতন কর স্থাপন করিয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে বলিয়া স্থির হয়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের দরুন বিভিন্ন ক্ষেত্র হইতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে। সেই বর্ধিত আয় যাহাতে ক্রমবর্ধমান ভোগ্যপণ্যের চাহিদা পূরণেই নিঃশেষ না হইয়া যায় সে জগৎ সঞ্চয়কে জাতীয় মূলধন গঠনের জগৎ বিনিয়োগ করা প্রয়োজন। ভারতীয় করকাঠামোকে একরূপভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক সঞ্চয় সংগ্রহ করিতে পারা যায়। উন্নয়নের ফলে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চয়ের সৃষ্টি হয়। মূলধন গঠনের জগৎ প্রয়োজনীয় সম্পদ যাহাতে কেবলমাত্র একটি শ্রেণী হইতে না আসিয়া সকল ক্ষেত্র হইতে আসে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

উন্নয়নের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ভারতে প্রগতিশীল করনীতি গ্রহণ করা হইয়াছে। অতিরিক্ত করধার্য করিয়া অর্থসংগ্রহের স্বপক্ষে দুইটি প্রধান যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় ;

প্রথমত, কর রাজস্ব ভারতে জাতীয় আয়ের মাত্র ৭ শতাংশ। এই অনুপাত পৃথিবীর যে কোন দেশের তুলনায় কম বলিয়া কর অনুসন্ধান কমিশন এই অনুপাত বৃদ্ধির সমর্থনে যত প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, ভারতে জাতীয় আয় ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে, ফলে, দেশের করদানের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

করব্যবস্থার প্রকৃতি ব্যয়-বরাদ্দের খাঁচ হইতে জানা যাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারী শিল্প ও সমাজসেবা খাতে অধিক ব্যয়-বরাদ্দের ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। ব্যয় বৃদ্ধির দরুন যে নূতন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হইবে তাহাতে সমাজের নিম্নস্তরে আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং চাহিদার উপর ইহা নূতন চাপ সৃষ্টি করিবে। উপযুক্ত করনীতি নির্ধারণ করিয়া চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা আনিতে হইবে। এই জগ্গই সরকার দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পরোক্ষ করের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং ব্যক্তিগত আয়কর, মূলধন লাভকর, সম্পদকর ও ব্যয়করের হারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করেন। প্রত্যক্ষ করের হার এরূপভাবে সংশোধন করা হয় যাহাতে ইহা যুগপৎ বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন গঠনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে এবং সরকারের নিকট অতিরিক্ত রাজস্ব যোগায়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে প্রত্যক্ষ করের অপেক্ষাকৃত উচ্চহার সমর্থনযোগ্য, কারণ সরকার কর্তৃক সতর্কনীতি অনুসরণের দরুন বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস এবং মুনাফার হার বৃদ্ধি পায়। অধিক করভারের জগ্গ যে নিরুৎসাহের সৃষ্টি হইবে তাহা বিভিন্ন সরকারী সাহায্যের দ্বারা দূর করিতে হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত কর হইতে ১০৫২ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। কর-রাজস্ব জাতীয় আয়ের ৭.৫ ভাগ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া পরিকল্পনার শেষে ৮.৯ ভাগে আসিয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জনসাধারণের নিকট হইতে ১২০০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করা হয়। বাজার হইতে সংগৃহীত ঋণ, সামাজিক নিরাপত্তা হইতে অর্থদান

এবং জীবনবীমা কোম্পানীর ফাণ্ড হইতে লব্ধ অর্থের পরিমাণ ৭০০ কোটি এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় হইতে ৫০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়া দেখেন যে জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় বাবদ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ১১৮০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দরুন ক্ষুদ্র সঞ্চয় বৃদ্ধির যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রশাসনিক ক্রটির জগ্গ ইহা সম্ভব হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল স্থগিত ঋণ ব্যবস্থার (deferred credit system) সাহায্যে বর্ধিত আয়ের একাংশ সঞ্চয় করা।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থসংস্থানে ঘাটতিব্যায়ের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। ঘাটতি ব্যয়ের মাধ্যমে ১২০০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে—উহা মোট ব্যয়ের ২.৫ শতাংশ। অবশ্য ইহার মধ্যে ২০০ কোটি টাকা ভারতের

স্টার্লিং পাউন্ড হইতে মিটানো হইলে প্রকৃত ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হইবে ১০০০ কোটি টাকা।

আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুন উচ্চাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্ত ব্যাপকহারে ঘাটতি ব্যয় করা হয়। ঘাটতি ব্যয় এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে সমাজের ক্রয়শক্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া চলে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তাহা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মোট ২৪৮ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়—উহা অনুমিত হিসাব অপেক্ষা ২৫২ কোটি টাকা কম। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ৩৩৫ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়, তৃতীয় বৎসরে ১৫০ কোটি টাকা এবং পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে ১৬১ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হয়। অনিয়মিত এবং অসমানভাবে ঘাটতি ব্যয়ের দরুন টাকার যোগান আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অনিয়মিত এবং ব্যাপক ঘাটতির ফলে দামের উর্ধ্বগতি রোধ করিতে হইলে করের হার বৃদ্ধি করা অথবা দাম নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। মূল্যস্তর বৃদ্ধি সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করিয়া গেলে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ করিয়াও মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা যাইবে না। এইরূপ অবস্থায় কিছুকালের জন্ত ঘাটতি ব্যয় বন্ধ রাখা প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা কমিশন এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন।

ঘাটতি ব্যয় ব্যতিরেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রভূত ব্যয়বরাদ্দ পূরণ করা সম্ভব ছিল না। বার্নস্টিন মিশন (Bernstein Mission) দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত সীমাবদ্ধ আকারে ঘাটতি ব্যয় সমর্থন করেন। পরবর্তীকালে অধ্যাপক ক্যালডার তাঁহার ভারতীয় করসংস্কার সংক্রান্ত রিপোর্টে (Report on Indian Tax Reform) ঘাটতি ব্যয়কে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যয় পূরণের একটি প্রয়োজনীয় উপায় বলিয়া উল্লেখ করেন। ঘাটতি ব্যয় করিবার সময় কয়েকটি বিষয়ের প্রতি সর্বতক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনঃ (১) ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ, (২) উৎপাদনশীল সরকারী ব্যয়ের অনুপাত, (৩) ব্যয় এবং উৎপাদনের মধ্যবর্তী সময়গত ব্যবধান। উৎপাদনশীল সরকারী ব্যয়ের সহিত ঘাটতি ব্যয়ের সাম্য বজায় থাকিলে এবং ব্যয় ও উৎপাদনের মধ্যে সময়গত ব্যবধান কম হইলে ঘাটতি ব্যয়ের কুফল পরিহার করা যাইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পর্যালোচনা (Review of the Second Plan's Working) : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উন্নয়নখাতে মোট ৪৬০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ব্যয় হয় ৬৪১ কোটি টাকা; দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বৎসরে ব্যয় হয় যথাক্রমে ৮৬৩ কোটি এবং ১০৬৪ কোটি টাকা। চতুর্থ বৎসরে ব্যয় হয় ১০২২ কোটি টাকা এবং পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ব্যয় হয় প্রায় ২৪০ কোটি টাকা। সুতরাং পরিকল্পিত ব্যয়ের তুলনায় (৪৮০০ কোটি

টাকা) প্রকৃত বায় ২০০ কোটি টাকা কম হয়। পরিকল্পনার এই ব্যয় স্বল্পতার জন্ত কেবলমাত্র সরকারী নীতিকেই দায়ী করা চলে না,—স্বয়ংজ্ঞাতল সমগ্রা, আভ্যন্তরীণ মূল্যান্তরের উৎসর্গতি, এবং বৈদেশিক মুদ্রার দ্রুত হ্রাস ইহারাও অনেকাংশে দায়ী। অবশ্য বস্তুগত সম্পদের সঠিক বিভাগীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া এই ত্রুটি বহুলাংশে সংশোধন করা যাইত। উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ নির্ভর করে প্রশাসনিক দক্ষতার উপর। প্রশাসনিক সংগঠন দক্ষ না হইলে বৃহদায়তন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা দুঃসম্ভব।

১৯৫৫-৫৬ সালে আর্থের বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ৭.৫ শতাংশ ছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এই অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ হয়। কিন্তু তখন সঞ্চয়ের পরিমাণ ৭.৬ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮.৫ শতাংশ হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের এই পার্থক্য আমদানি উদ্ভূতের দ্বারা পূরণ করা হয়। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রার সংরক্ষিত তহবিল এবং বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির হিসাব হইতে দেখা যায় যে, প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষিজ এবং শিল্পজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে যে উন্নতি শুরু হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে উহা অব্যাহত ছিল। প্রকৃতপক্ষে প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনার প্রথম দশকে শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অধিকতর উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্প উৎপাদন ২৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫-৫৬ সালে খাটোৎপাদন ছিল ৬ কোটি ৫৮ লক্ষ টন, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি ৮৮ লক্ষ টন হয় কিন্তু উপযুক্ত বৃষ্টিপাতের অভাবে ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৬ কোটি ২৫ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৮-৫৯ এবং ১৯৬০-৬১ সালে খাটোৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টন এবং ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়।

কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ইক্ষু, পাট, তৈলবীজ এবং তুলার উৎপাদন পরিমিত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। শিল্পের উৎপাদন সূচক ১৩২ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬০-৬১ সালে ১৯৭-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের ক্ষেত্রে আশানুরূপ উন্নতি হয় নাই। সরকারী সাহায্য সত্ত্বেও তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছিল। হস্তচালিত তাঁতকে যন্ত্রচালিত তাঁতে রূপান্তরকরণও আশানুরূপ হারে হয় নাই। প্রতিবৎসর ১৫,০০০ যন্ত্রচালিত তাঁত বসাইবার বন্দোবস্ত করা হইলেও প্রথম বৎসর প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৭২৮১টি যন্ত্রচালিত তাঁত বসানো হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যে অম্বর চরকার সাহায্যে বস্ত্রোৎপাদনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল তাহাও ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইতে পাবে নাই।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহের ঘাটতি এবং অস্থিতিস্থাপকতা এই দ্বিমুখী আক্রমণ আমাদের দরিদ্র অর্থনীতির উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। প্রথম পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে ঘাটতি ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ দুই বৎসরে উহা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সময় ঘাটতি ব্যয় মুদ্রাস্ফীতির অন্যতম কারণ। প্রাকৃতিক বিপদ এবং কৃষির প্রতি শৈথিল্যের দরুন দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে খাণ্ড ঘাটতি দেখা দেয়। কালো বাজার, মুনাকা শিকার এবং মজুতদারীর জন্ত এই ঘাটতি সঙ্কটের আকার ধারণ করে। পরিকল্পনার জন্ত প্রয়োজনীয় মূলধনী দ্রব্য এবং খাণ্ড-শস্ত্র আমদানী ব্যতীত আমদানী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকার দরুন ভোগ্যবস্তু ও পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেশে আমদানি হয়—ইহার ফলে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইয়া দাঁড়ায়। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধিতে কুটিরশিল্পের ব্যর্থতা, পরিবহণ ব্যবস্থার ত্রুটি, প্রশাসনিক দক্ষতার অভাব এবং বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির ঋণযোগ্য সম্পদ বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে ভারতীয় অর্থনীতিতে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। পাইকারী দামের সূচক ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ছিল ৩৮৭.৩, ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৪১.৮-এ আসিয়া দাঁড়ায় (ভিত্তি বৎসর, আগষ্ট ১৯৩৯=১০০)। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সাধারণ মূল্যস্তর বৎসরে শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা এবং “উচ্চাশার সঙ্কট” (The Second Plan and the “Crisis of Ambition”) : অভিযোগ করা হয় যে, প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অত্যন্ত সংযত ছিল। ইহা শেষ হইলে উৎসাহের আতিশয্যে অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনা করা হয়। কি কি কাজ করা উচিত তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতেই পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে, সেগুলি কি উপায়ে কার্যকরী করা যাইতে পারে সে কথা বিস্তারিতভাবে চিন্তা করিবার অবসর পান নাই। নৈসর্গিক কারণ এবং মজুতদারীর জন্ত খাণ্ডসঙ্কট, বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের ঘাটতি, পরিবহণ ও যোগানের বাধা এবং অর্থনীতির বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব—এই সকল কারণ ভারতীয় অর্থনীতিতে চাপের সৃষ্টি করে। একদিকে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দরুন চাহিদা বৃদ্ধি এবং অপর দিকে বেসরকারী শিল্পের সামঞ্জস্যহীন অগ্রগতি, শিল্পবিরোধ, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাব, উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির দীর্ঘ গঠনকাল—এই সমস্ত কারণে চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতীয় অর্থনীতির উপর দুইটি চাপ পড়িয়াছিল—আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর ক্রমবর্ধমান চাপ। বৃহৎ প্রকল্পগুলি রূপায়িত করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আনিতেই বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কট তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্য বা বিনিয়োগের অভাবও বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। পরিকল্পনাজনিত আয়

বৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া যদি খাজ ও অজ্ঞাত ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভবপর হইত তাহা হইলে এই বিপর্যয় ঘটত না। সংগঠন, প্রশাসন এবং পরিকল্পিত কর্মসূচীর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রভূত অসামঞ্জস্য ছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reassessment of the Second Plan) : দ্বিতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণে নানাবিধ অসুবিধা দেখা দেওয়ায় মূল পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দকে কাট-ছাঁট করার কথা উঠে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, পরিকল্পনার দুই বৎসরের কাজ সম্পূর্ণ হইবার পর হঠাৎ পরিকল্পনা ছাঁটাই করা বিশেষ অসুবিধাজনক। ইহা সত্ত্বেও ১৯৫৮ সালের মে মাসে বাধ্য হইয়া পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ কিছু কাটছাঁট করেন। ইহাকেই পরিকল্পনার পুনর্বিচার (reappraisal) বলা হয়। পরিবর্তনের ফলে পরিকল্পনাকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা হয়—প্রথম বা মূল অংশের জন্ত ব্যয়-বরাদ্দ হয় ৪৫০০ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় অংশের জন্ত ব্যয়-বরাদ্দ হয় ৩০০ কোটি টাকা। মোট ব্যয়বরাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকাই রাখা হয়। প্রথম অংশে আছে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি (core-projects) যাহাদের কাজ ইতিমধ্যেই অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। প্রথম অংশে বরাদ্দ টাকা ব্যয় করিয়া সম্ভব হইলে তবেই দ্বিতীয় অংশে হাত দেওয়া হইবে। মূল প্রকল্পগুলির মধ্যে রহিয়াছে (১) দুর্গাপুর, ভিলাই এবং রুরকেলার ইস্পাত কারখানা, (২) ১২টি বিদ্যুৎউৎপাদন কর্মসূচী, (৩) কয়লার খনিসমূহ, (৪) রেল ও বন্দর উন্নয়ন কর্মসূচী এবং (৫) কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি।

নানারূপ পর্যালোচনার পর দ্বিতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ৪৫০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪৬০০ কোটি টাকা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল বরাদ্দ এবং পুনর্বিচারের পর সংশোধিত বরাদ্দ এইরূপ হইবে :

উন্নয়নক্ষেত্র	মূলবরাদ্দ	পুনর্বিচারের পর বরাদ্দ
১। কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	৫৬৮ কোটি টাকা	৫৩০ কোটি টাকা
২। সেচ ও বিদ্যুৎ	২১৩ " "	৮৬৫ " "
৩। শিল্প ও খনি	৮২০ " "	১০৭৫ " "
৪। পরিবহণ	১৩৮৫ " "	১৩০০ " "
৫। সমাজসেবা	২৪৫ " "	} ৮৩০ " "
৬। বিবিধ	২২ " "	
মোট	৪৮০০ " "	৪৬০০ " "

কর্মসংস্থান এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ (Employment and Five Year Plans) : কোন দেশে তিনটি কারণের যে কোন একটি দেখা দিলে

বেকার সমস্যা দেখা দিবে। প্রথমত, সক্রিয় চাহিদা (effective demand) হ্রাস পাইলে কর্মসংস্থানের অভাব দেখা দিবে। দ্বিতীয়ত, দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও উৎপাদন উৎপাদন ব্যয়ের মধ্যে কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা এবং তৃতীয়ত, মূলধনের অভাব দেশব্যাপী বেকারত্বের সৃষ্টি করিতে পারে। উন্নতশীল পাশ্চাত্য দেশসমূহে সক্রিয় চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ভারতের গ্রাম্য কৃষিনির্ভর দেশে মজুরির মধ্যে মূনাফার অংশ রহিয়াছে, কারণ, এখানে জমির মালিকেরাই মজুর। সুতরাং ভারতে সক্রিয় চাহিদা কর্মসংস্থানের উপর অতি সামান্য প্রভাব বিস্তার করিতে পারে।

ভারতে বেকারসমস্যার মূল কারণ হইল মূলধন গঠনের স্বল্পতা। পূর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে (full employment) উপনীত হওয়া ভারতের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। এখানে অধিকাংশ ব্যক্তি হয় বেকার নতুবা অর্ধবেকার। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রমিকেরা নিজস্ব পরিবেশ ছাড়িয়া দূরে যাইতে চাহে না। শ্রমের গতিশীলতার অভাব উন্নয়নকে ব্যাহত করে। শ্রমের গতিশীলতার অভাব, কারিগরি দক্ষতার অভাব, গ্রামাঞ্চলে মূলধনের অভাব এবং দ্রুত শিল্পায়ণের অভাবের দরুন বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে।

কর্মসংস্থান ও প্রথম পরিকল্পনা (Employment and the First Plan) :

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে দ্বিতীয়-মহাযুদ্ধের দরুন ভারতীয় অর্থনীতিতে পূর্ণ কর্মসংস্থানের প্রভাব বিঘ্নমান ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল না। পরবর্তীকালে কর্মসংস্থানের কি অবস্থা হইবে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কি পরিণতি হইবে পরিকল্পনা রচয়িতাগণ এ সম্পর্কে চিন্তা করেন নাই। ১৯৫৩ সালে যুদ্ধের দরুন যে পূর্ণ-কর্মসংস্থান অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পরিবর্তন ঘটে এবং পরিকল্পনা কমিশন কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হন। কমিশন নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিবার জন্ত অতিরিক্ত ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৫৩ সালের শেষের দিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সুবিধার জন্ত পরিকল্পনা কমিশন ১১ দফা কার্যসূচী গ্রহণ করেন। এই কার্যসূচীর প্রধান প্রধান বিষয়গুলি হইল

১১-দফা
কার্যসূচী

এইরূপ : (১) সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নিকট শিক্ষণ কেন্দ্র (training centres) খুলিয়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা ; (২) ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন অথবা ব্যবসা করিবার জন্ত বিভিন্ন

ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র সংগঠনকে সাহায্য দান ; (৩) যে সকল ক্ষেত্রে দক্ষ কর্মীর অভাব সেই সকল স্থানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ; (৪) কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে উৎসাহদানের জন্ত সরকারী সংস্থা কর্তৃক ঋণগুলি প্রয় এবং ব্যবহার ; (৫) শহরাঞ্চলে বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্র এবং গ্রামাঞ্চলে এক-শিক্ষকযুক্ত বিদ্যালয় (one teacher school) স্থাপন

করিয়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা; (৬) জাতীয় সম্প্রসারণ কেন্দ্রগুলি বৃদ্ধি করিয়া নূতন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; (৭) পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন; (৮) আবর্জনা মোচন এবং স্বল্প আয়যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য বাসগৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা কার্যকরী করা; (৯) বেসরকারী উদ্যোগে গৃহ নির্মাণে উৎসাহ দান; (১০) উদাস্ত শহরতলীগুলিতে পরিকল্পিত সাহায্য দান এবং (১১) প্রথম পরিকল্পনাকে সংশোধন করিয়া যে সকল প্রকল্পগুলিতে আশু কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা অধিক তাহাদের অগ্রাধিকার দান করা।

কৃষি ও শিল্পে বিনিয়োগ প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প হওয়ায় প্রথম পরিকল্পনা বেকার সমস্যা সমাধানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে নাই। প্রথম পরিকল্পনাকালে

কর্মসংস্থান

বৃদ্ধি

প্রত্যক্ষভাবে ৪৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

অবশ্য ব্যবসায়-বাণিজ্য ইত্যাদিতে পরোক্ষভাবে যে নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনা

ভারতীয় অর্থনীতিকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হয় বলিয়াই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার বেকারসমস্যার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিতে পারিয়াছিল।

কর্মসংস্থান ও দ্বিতীয়-পরিকল্পনা (Employment and the Second Plan):

কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনা নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইতে পারে নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশে ৫৩ লক্ষ বেকার ছিল, ইহা ছাড়া পরিকল্পনাধীন সময়ে নিয়োগপ্রার্থীর সংখ্যা আরও এক কোটি বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এক কোটি লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার নীতি গৃহীত হয়। সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ৫৩ লক্ষ লোক বেকার থাকিয়া যায়। সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ৬৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং প্রায় ২০ লক্ষ বেকার লইয়া তৃতীয় পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হয়।

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহিত বেকারের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। অত্যাধিক বলা যায় যে, দেশের মোট শ্রমশক্তির অনুপাতে বেকারের সংখ্যা হ্রাস পাইলেও কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ এবং কৃষি সংগঠনের সঙ্গে সঙ্গে ছদ্মবেশী বেকার পূর্ণবেকাররূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া মোট বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করিবে। পরিশেষে, মারাত্মক “জনসংখ্যার বিস্ফোরণ” (population explosion) বেকার সমস্যা বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগাইতেছে।

কর্মসংস্থান ও তৃতীয় পরিকল্পনা (Employment and the Third Plan):

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পুরাতন এবং নূতন কর্মপ্রার্থীর মোট সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৫৩ লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৬৫ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হওয়ায় পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২০ লক্ষ (৮৮ লক্ষ)। ইহা ব্যতীত

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ১ কোটি ৭০ লক্ষ হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পুরাতন ও নূতন কর্মপ্রার্থীর মোট সংখ্যা হইবে ২ কোটি ৬০ লক্ষ কিন্তু পরিকল্পনায় কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৫ লক্ষ এবং কৃষি ক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ নূতন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে যখন চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হয় তখন দেশে পুরাতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ২০ লক্ষ। এরূপ অবস্থায় চতুর্থ পরিকল্পনায় নিয়োগ বৃদ্ধির উপর অগ্রাধিকার দেওয়াই যথেষ্ট নয়, অন্ততপক্ষে সকল পুরাতন কর্মপ্রার্থীর নিয়োগের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যকালীন অগ্রগতির পর্যালোচনা হইতে জানা যায় যে, কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ১৯৬১-৬৪ সালে প্রায় ৫০ লক্ষ (অর্থাৎ লক্ষ্যমাত্রার ৪৭ শতাংশ) অতিরিক্ত নিয়োগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

কর্মসংস্থান ও চতুর্থ পরিকল্পনা (Employment and the Fourth Plan): চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া হইতে জানা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে পুরাতন ও নূতন কর্মপ্রার্থীর মোট সংখ্যা হইবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ। ইহার মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ হইবে পুরাতন এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ হইবে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে মোট ২৩,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের এবং কৃষি ক্ষেত্রে ৪৫ হইতে ৫০ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট ১ কোটি ৯০ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য আশা করা যায় শিল্প এবং কৃষি ক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধি পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অধিক হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যদি অন্ততপক্ষে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের অতিরিক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে এই পরিকল্পনা আমাদের সম্মুখে আশার কোন নতুন আলোক দেখাইতে পারিবে না।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নিয়োগনীতির পরিপূর্ণ তাৎপর্য বুঝিতে হইলে দুই ধরনের নিয়োগের স্বরূপ জানা প্রয়োজন। যে নিয়োগের দরুন দেশের মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাকে উৎপাদনশীল নিয়োগ (productive employment) বলে। আর যে ধরনের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজের নীট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না তাহাকে অনুৎপাদনশীল (relief employment) নিয়োগ বলে। রাস্তাঘাট নির্মাণ, বাঁধ ও সেতু নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুৎপাদনশীল নিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজ দুইভাবে লাভবান হইবে—প্রথমত, ইহা নূতন আয় সৃষ্টি করিবে, এবং দ্বিতীয়ত, ইহা সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে। অপর পক্ষে যদি কুটির এবং হস্তচালিত

শিল্প-সম্প্রসারণের দ্বারা অধিক মূল্যে কারখানার তুলনায় নিকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করিয়া অল্পপাদনশীল নিয়োগ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে না।

মহলানবীশ মডেলের উপর ভিত্তি করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছিল। অধ্যাপক মহলানবীশ ভারীশিল্প উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল একই সঙ্গে দ্রুত শিল্পায়ণ এবং বেকার সমস্যা সমাধান করা। অধ্যাপক মহলানবীশ বলেন যে, ভারী-শিল্পে বিনিয়োগ

এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজসেবা খাতে ব্যয়ের দরুন যে নতুন ক্রয় ক্ষমতার সৃষ্টি হইবে এবং ভোগ্যপণ্যের চাহিদা বাড়িবে তাহা ভোগ্যপণ্যের পরিকল্পিত যোগান দ্বারা পূরণ করিতে হইবে। ইহা

শীঘ্রই উপলব্ধি করা গেল যে, ভারী-শিল্প সম্প্রসারণের জন্ত যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয়, নিয়োগ সেই অনুপাতে বাড়িবে না। এই কারণে ভোগ্যপণ্যের যোগান বৃদ্ধি এবং বেকার সমস্যা সমাধানের জন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কুটির এবং ক্ষুদ্র-শিল্পের উপর প্রধানত নির্ভর করা হইয়াছিল। কিন্তু পুরাতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্প যাহা উৎপাদন করিতে লাগিল তাহা সংগঠিত ক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনায় দামে অধিক এবং নিকৃষ্ট স্তরের হওয়ায় ইহার প্রতিযোগী ক্ষমতা হ্রাস পাইল। ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্পসমূহকে সাহায্য করিবার জন্ত সরকার বিভিন্ন কারখানার উৎপাদনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিলেন। ইহা ছাড়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলিকে সরকার অর্থসাহায্যও করিলেন। ইহাতে অল্পপাদনশীল নিয়োগের পরিমাণ কিছু বৃদ্ধি পাইলেও ভোগ্যপণ্যের যোগান বাড়ি নাই।

কুটিরশিল্পের নবজাগরণের বিরোধিতা না করিয়াও ইহা বলা যায় যে, পরিকল্পনা কমিশন যদি ভারী-শিল্পে বিনিয়োগের পরিমাণ কিছু কমাইয়া উহা সংগঠিত ভোগ্যপণ্য শিল্পে বিনিয়োগ করিতেন তাহা হইলে একই সঙ্গে ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীল নিয়োগের সম্প্রসারণ ঘটিত। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ হ্রাস পাইত এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থনীতির উপর যে চাপ পড়িয়াছিল তাহা লাঘব হইত।

ভারতে বেকার সমস্যা এরূপ চরম আকার ধারণ করিয়াছে যে, শুধুমাত্র উৎপাদনশীল নিয়োগের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করা যাইবে না। কিছুপরিমাণ অল্পপাদনশীল নিয়োগ দেশে বেকার সমস্যা সমাধানের জন্ত প্রয়োজন।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা (Comparative Analysis of the First and Second Plans) : প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধোত্তর অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং দেশ বিভাগজনিত সমস্যার সমাধান করা। প্রথম পরিকল্পনা যখন রচিত হইয়াছিল তখন দেশে খাজ সমস্যা বৃহত্তর সমস্যা ছিল

বলিয়া কৃষির উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সংভরণ বিভাগকে (Subsistence Sector) শক্তিশালী করার জন্ত কৃষির ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণ সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন এবং কার্যত কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে আংশিক সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। পরিকল্পনা কমিশন দ্রুত শিল্পায়নের প্রতি মনোযোগী ছিলেন না আর শিল্পের জন্ত নির্ধারিত অর্থ প্রশাসনিক বিলম্ব, দক্ষ শ্রমিকের অভাব এবং প্রয়োজনীয় মূলধনী সামগ্রীর ঘাটতির জন্ত ব্যয় করাও সম্ভব হয় নাই। শিল্পের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল বর্তমান শিল্পগুলির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ব ব্যবহার করা। পরিকল্পনার শেষের দিকে বেকার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার উদ্দেশ্যে ১১ দফা কর্মসূচী এবং পরিকল্পিত ব্যয়ের পুনর্বন্টন করা হইলেও উহা সফল হয় নাই। খাদ্য সমস্যার সমাধান প্রথম পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান—কিন্তু এই সাফল্যের জন্ত কৃষি-পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ অপেক্ষা অনুকূল মৌসুমীবায়ু প্রবাহ দায়ী। বলিষ্ঠ কর নীতির অভাব, বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের অসম্পূর্ণ ব্যবহার এবং অতি সংযত ঘাটতি ব্যয় এই সকল কারণে প্রথম পরিকল্পনা জাতীয় অর্থনীতিকে “উত্তোলন পর্যায়ে” (Take off Stage) লইয়া যাইতে পারে নাই—শুধুমাত্র দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের উপযোগী এক অনুকূল বাতাবরণ সৃষ্টিতে সহায়তা করিয়াছে। অধ্যাপক রোসটোর (Prof. Rostow) মতে “উত্তোলন পর্যায়ে” উল্লেখযোগ্য শিল্প-সম্প্রসারণ দ্বারা জাতীয় আয়ের ১২ শতাংশ বিনিয়োগিত হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের ৬ শতাংশ মাত্র বিনিয়োগ করা হইয়াছিল এবং শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অতি সামান্যই হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইল দ্রুত শিল্পায়ন। দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং উৎকট ধনবৈষম্য দূর করিতে হইলে সরকারী উত্তোগে মূল এবং ভারী শিল্পোন্নয়নের দায়িত্বকে এই পরিকল্পনায় স্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয়ের ১১ শতাংশ বিনিয়োগ করা হইয়াছে এবং দ্রুত শিল্পায়নের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার অতিরিক্ত সর্বক নীতির তুলনায় দ্বিতীয় পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে অধিকতর সাহসিকতাপূর্ণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইয়াছে—এবং অধিকতর বাঁকি গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব অপর পক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল উন্নয়ন।

প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১২ শতাংশ কিন্তু কৃষি উৎপাদন অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায় ১৮ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২৫ শতাংশ জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট ছিল কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির দরুন ঐ সময়ে প্রকৃতপক্ষে ২০ শতাংশ মাত্র জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে (১৯৫১-৬১)

জাতীয় আয় ৪২ শতাংশ, মাথাপিছু আয় ২০ শতাংশ, মাথাপিছু ভোগ ১৬ শতাংশ এবং জনসংখ্যা ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

দ্রুত শিল্পায়ণ ব্যতিরেকে দারিদ্র্য, বেকারী, অর্ধবেকারী, এবং ধনবৈষম্য দূর করা যাইবে না বলিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়ণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। মনে রাখা প্রয়োজন, প্রথম পরিকল্পনায় কোন নিয়োগনীতি (employment objective) ছিল না কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার একটি মূল লক্ষ্যই হইল কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটানো। প্রথম পরিকল্পনাকালে ৪৫ লক্ষ লোকের প্রত্যক্ষ নিয়োগের ব্যবস্থা হয়, অপরপক্ষে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৮০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের নীতি গ্রহণ করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা অনেক বেশি উচ্চাভিলাষী। প্রথম পরিকল্পনায় সরকারী ক্ষেত্রে সংশোধিত ব্যয়বরাদ্দ ছিল ২৩৭৮ কোটি টাকা আর দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয়বরাদ্দ হইল ৪৮০০ কোটি টাকা অর্থাৎ সরকারীখাতে মোট ব্যয়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করা হইয়াছে। দ্রুত শিল্পসম্প্রসারণের নীতি গৃহীত হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার ত্রুটি (Defects of the Second Plan) : দ্বিতীয় পরিকল্পনা পর্যালোচনা করিলে উহার কতকগুলি ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, প্রকৃত জাতীয় আয়ের পরিবর্তে অনুমিত জাতীয় আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া পরিকল্পনার আয়তন স্থির করা হইয়াছিল। দ্বিতীয়ত, খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ছিল। পরিকল্পনা কমিশন অনুমান করিয়াছিলেন যে, প্রতি বৎসর ১.২৫% হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল প্রায় ২% হারে। সুতরাং এই হিসাব বহির্ভূত অতিরিক্ত জনসংখ্যার জঘা অতিরিক্ত খাদ্যের চাহিদা পূরণের মত প্রয়োজনীয় খাদ্য দেশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। ইহা ব্যতীত প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়ার দরুন খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হইয়াছিল। তৃতীয়ত, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার না করিয়া বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনে এবং ভাবপ্রবণতার সহিত বিচার করিয়া অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। চতুর্থত, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রতম লক্ষ্য বলিয়া বিধোষিত হইলেও এই কর্মসংস্থান নীতিও বিশেষ উৎসাহজনক নয়। কমিশনের মতে পরিকল্পনাধীন সময়ে এক কোটি লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হইতে পারিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে ২০ লক্ষ লোকের নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় এক কোটি নূতন বেকারের সৃষ্টি হইবে অর্থাৎ পরিকল্পনা শেষ হইবার পরও পরিকল্পনা শুরু হইবার সময় যে পরিমাণ বেকার ছিল তাহাই থাকিবে। পঞ্চমত, প্রভূত পরিমাণ অর্থসংগ্রহের জঘা বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করা আদৌ উচিত হয় নাই।

ইহা ছাড়া ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণও অত্যধিক হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন।
অধ্যাপক ক্যালডরের মতে ভারতীয় অর্থনীতি ৭৫০ কোটি টাকা (অর্থাৎ বৎসরে
১৫০ কোটি টাকা) পর্যন্ত ঘাটতি ব্যয়ের চাপ বহন করিতে পারিবে। মূল্যস্তরের
উর্ধ্বগতি হইতেই বুঝা যায় যে, ঘাটতি ব্যয় অতিরিক্ত হইয়াছে।

সপ্তম অধ্যায় ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (India's Third Five Year Plan)

পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে ভারতীয় অর্থনীতির যে সম্প্রসারণশীল সম্ভাবনার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহারই উপর নির্ভর করিয়া এবং পূর্বতন দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করিয়া ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রচিত হয়। ১৯৬১ সালের ১লা এপ্রিল তারিখ হইতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হয় এবং ১৯৬৬ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ইহার কার্যকাল শেষ হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্যের পথে দুইটি বিরাট বাধা আসিয়া পড়ে। ১৯৬২ সালে অতর্কিতে ভারত চীন কর্তৃক আক্রান্ত হয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে পাক-ভারত সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই অবস্থায় ভারতের পক্ষে প্রতিরক্ষা ব্যয়-বৃদ্ধি অপরিহার্য হইয়া পড়ে এবং ইহার ফলে স্বভাবতই উন্নয়নী কার্যসূচী ব্যাহত হয়।

এক প্রতিকূল পটভূমিতে ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনার যাত্রা শুরু হয়। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৃতীয় পরিকল্পনার সফল রূপায়ণের পথে বাধার সৃষ্টি করে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতের প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স; দ্বিতীয়ত, ১৯৬২ সালে চীনা-আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি; তৃতীয়ত, মৌসুমী বারিপাতের অভাবে পাঞ্জাব এবং দক্ষিণ ভারতে প্রবল খরা; চতুর্থত, মূল্যস্ফুরের ধাবমান ঊর্ধ্বগতি এবং মজুরী মুদ্রাস্ফীতির (wage inflation) ব্যাপকতা; পঞ্চমত, পাক-ভারত সংঘর্ষের দরুন ১৯৬৫ সাল ভারতে মার্কিন সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়। এই সকল প্রতিকূল কারণের জ্ঞাত তৃতীয় পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে জাতিকে অধিকতর ত্যাগ-স্বীকারের সংকল্প গ্রহণ করিতে হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার আয়তন এবং উদ্দেশ্য (Objectives and Size of the Third Plan) : তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হইল স্বয়ং-নির্ভরশীল সম্প্রসারণের পথ (self-sustaining growth) সৃষ্টি করা। আত্মনির্ভরশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ৪৪ কোটি নরনারীকে সুন্দর এবং স্বচ্ছল জীবন-যাপনের সুযোগ প্রদান করাই তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্যকে কার্যকরী করার

জ্ঞাত তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পাঁচটি পন্থা অবলম্বন করা হইয়া-
 পাঁচটি মূল উদ্দেশ্য ছিল। প্রথমত, পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৎসরে ৫ শতাংশ হারে, ভোগব্যয় ৪ শতাংশ হারে এবং সঞ্চয় ১৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, খাতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানির ক্রমবর্ধমান

চাহিদা মিটাইবার মত কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি। তৃতীয়ত, ইম্পাত, জালানি, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ করিয়া মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন এরূপ পরিমাণ বাড়াইতে হইবে যাহাতে আগামী দশ বৎসর বা অনুরূপ সময়ের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বারা শিল্পায়ণ করা যায় ও চতুর্থত, দেশের জনসম্পদের পূর্ণ ব্যবহার করিয়া সর্বাধিক কর্মসংস্থান বৃদ্ধি। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে ৩৫ লক্ষ এবং কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রে এক কোটি ৫ লক্ষ অর্থাৎ মোট এক কোটি ৪০ লক্ষ অতিরিক্ত কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে। পঞ্চমত, সুযোগ প্রদানের ব্যাপারে অধিকতর সমতা আনিয়া আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের হ্রাস করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন প্রতিরোধ করা।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে কার্যকরী করিতে তৃতীয় পরিকল্পনায় মোট ব্যয়বরাদ্দ করা হয় ১০,৪০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সরকারী খাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ হইল ৬৩০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে ব্যয়বরাদ্দ হইল ৪১০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় ও প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হইল যথাক্রমে ৬৭৫০ কোটি টাকা এবং ৩৩৬০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭৫০০ কোটি টাকা, অপর পক্ষে দ্বিতীয় এবং প্রথম পরিকল্পনায় উহা যথাক্রমে ৪৬০০ কোটি টাকা এবং ১২৬০ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মোট পরিকল্পিত ব্যয় হইবে ১১,৬০০ কোটি টাকা (সরকারী খাতে ৭৫০০ কোটি টাকা + বেসরকারী খাতে ৪১০০ কোটি টাকা) কিন্তু উৎপাদনের যে বস্তুগত লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে তাহা পূরণ করিতে হইলে ১২,৭০০ কোটি টাকা লাগিবে। দেশের সঙ্কটকালীন জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ সংশোধন করা হয়। অনুমান করা যাইতেছে যে সরকারী খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,৫০০ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮,৬০০ কোটি টাকা হইবে। যদি ইহার সহিত বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ (৪১০০ কোটি টাকা) যোগ করা হয় তাহা হইলে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১২,৭০০ কোটি টাকা। ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত সরকারী খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০০০ কোটি টাকা এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬৫-৬৬) উহার পরিমাণ ২৬৩০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

ভারতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা (Lessons of Indian Planning) :

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম পর্ষায়ে চীন আক্রমণ এবং পরিকল্পনার শেষ পর্ষায়ে পাক সংঘর্ষের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে পরিকল্পনা রচয়িতাগণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহিত প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি করিবার জন্ত জনগণকে অধিকতর ত্যাগস্বীকার করা ভিন্ন অগ্র পথ নাই। সুতরাং ইহা জানা প্রয়োজন যে, দেশে ভবিষ্যতে সঙ্কয়ের হার বৃদ্ধির জন্ত কাহাদের অধিক ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উচ্চশ্রেণীর উপর পরিকল্পিত চাপ বিশ্লেষণ করিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। পরিকল্পিত বিনিয়োগ এবং সরকারের প্রশাসনিক ব্যয়বৃদ্ধির ফলে সমাজের উচ্চশ্রেণী (U-sector) লাভবান হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহলানবীশ কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করেন তাহাতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, ভারতে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে একরূপভাবে পরিচালনা করা হইয়াছে যাহাতে বৃহৎ ব্যবসায়ী সাহায্য এবং সুবিধা লাভ করিয়া অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে উৎসাহিত হইয়াছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে পরিকল্পিত ব্যয় যতই বৃদ্ধি পাইবে উচ্চশ্রেণীর ভোগ ব্যয় ততই হ্রাস পাইবে।

উচ্চশ্রেণীর ভোগের ধরন হইতে দেখা যায় যে, উহা প্রধানত বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ (conspicuous consumption) ভোগ। এই সকল দ্রব্যের দাম সাধারণত অতি উচ্চ হয় এবং ইহার শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অহংকার চরিতার্থ করে। উচ্চশ্রেণীর ভোগব্যয় বৃদ্ধির ফলে যে সম্পদ দ্বারা পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার-প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারিত তাহা বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। ইহা পরিকল্পিত মূলধন গঠনের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়া পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিতে পারে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণীর ভোগের জন্ত সম্পদ বাহ্য আড়ম্বরপূর্ণ ভোগে নিয়োজিত হয় আর আয়বৈষম্য এই পদ্ধতিকে বিশেষ সহায়তা করে। ইহার ফলে উচ্চশ্রেণী তাহার সক্রিয় চাহিদার দ্বারা বাজারকে নিজের অনুকূলে প্রভাবিত করিতেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় যে প্রভূত পরিমাণ বিনিয়োগ করা হইতেছে উহার দরুনও উচ্চশ্রেণী অধিকতর ক্ষমতাশালী হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই শ্রেণীর কার্যাবলীর উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা, নিয়োগ এবং মূল্যস্তর সংক্রান্ত ব্যাপারে যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়াছে তাহা পরবর্তী পরিকল্পনাকালে আমাদের সহায়তা করিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সাধারণ মূল্যস্তর বাৎসরিক ৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর আরও অধিকহারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু—বৎসরে ৯ শতাংশ হারে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ভারতের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াইবে ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ এবং তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়াইবে ৪৯ কোটি ২০ লক্ষ। ক্রমবর্ধমান মূল্যস্তর এবং জনসংখ্যার প্রচণ্ড “বিস্ফোরণের” দরুন জীবনযাত্রার সাধারণ মান হ্রাস পাইতেছে আর ইহার দরুন পরিকল্পনা সম্পর্কে জনসাধারণের বিশ্বাস ধীরে ধীরে শিথিল হইয়া যাইতেছে। এই কারণে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কঠোরভাবে মূল্যস্তরের উদ্ধার গতি প্রতি-রোধ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, চতুর্থ পরিকল্পনাধীন সময়ে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে সঠিক নীতি নির্ধারণ করিয়া অতি দৃঢ়ভাবে উহাকে কার্যে রূপায়িত করা প্রয়োজন।

নিয়োগের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার সাফল্য আদৌ উৎসাহবাজক নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনা ৫৩ লক্ষ পুরাতন বেকার লইয়া শুরু হয় আর ঐ সময়ে এক কোটি নূতন বেকারের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কেবল মাত্র নূতন বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিবার নীতি গৃহীত হয় এবং পুরাতন বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা পরবর্তী পরিকল্পনাসমূহে করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে পরি-সংখ্যান হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৬৫ লক্ষ লোকের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট বেকারের সংখ্যা ৮৮ লক্ষে দাঁড়ায়। পরিকল্পনায় কমিশনের হিসাবানুযায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন তৃতীয় পরিকল্পনা কালে নূতন কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা এক কোটি ৭০ লক্ষে পৌঁছায় আর ইহার সহিত পুরাতন ৯০ লক্ষ কর্মপ্রার্থী যোগ করিলে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে ২ কোটি ৬০ লক্ষ। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় মাত্র এক কোটি ৪০ লক্ষ নূতন নিয়োগ সৃষ্টির লক্ষ্য গৃহীত। হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরিমিত লক্ষ্যমাত্রাও পূরণ হয় নাই—নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৬০ ভাগ মাত্র নিয়োগ সৃষ্টিকরা সম্ভবপর হইয়াছিল। ইহার অর্থ হইল চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বেকারসমষ্টি সমাধানের জন্য কঠিন সংগ্রামের প্রয়োজন হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জাতীয় প্রয়াসকে সর্বাধিক করা প্রয়োজন। পরিকল্পিত প্রয়াসের তিনটি প্রধান দিক—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচী, মূল্যনীতি এবং নিয়োগ-নীতি—ইহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার উল্লিখিত উদ্দেশ্যগুলির কথা মনে রাখিয়া বিনিয়োগ করা হয়। জলসেচ সমেত কৃষি, বিদ্যুৎ সমেত ভারী এবং মূলশিল্প এবং কারিগরী শিক্ষার উপর প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। মোট বিনিয়োগের ২৩ শতাংশ কৃষি, সমষ্টিউন্নয়ন এবং জলসেচ খাতে ধার্য করা হইয়াছে। মোট বিনিয়োগের ৩৩ শতাংশ ভারী এবং মাঝারিশিল্প, খনি এবং বিদ্যুৎ খাতে বরাদ্দ হইয়াছে। অপরপক্ষে পরিবহন ও সংসরণ খাতে বিনিয়োগের অনুপাত দ্বিতীয় পরিকল্পনা অপেক্ষা তৃতীয় পরিকল্পনায় কম হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে মোট বিনিয়োগের ২১ শতাংশ বরাদ্দ ছিল কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় উহা ছিল ২০ শতাংশ।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি (Agriculture in the Third Plan) : প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন যথাক্রমে ১৭ শতাংশ এবং ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে বাৎসরিক ৩.৩ শতাংশ হারে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উন্নত উৎপাদন কৌশল অথবা সংগঠনের দরুন এই উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটে নাই,—ইহা ঘটিয়াছিল জলসেচের প্রসার এবং কষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধির দরুন।

তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল কৃষি উৎপাদনের হার বাৎসরিক ৩ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬ শতাংশ করা। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে খাতোৎপাদন

অত্যন্ত নৈরাশুজনক হইয়াছিল। ১৯৬৪-৬৫ সালে খাটোৎপাদন ছিল ৮ কোটি ৮০ লক্ষ টন কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনে নামিয়া আসে। খাটোৎপাদনের ক্ষেত্রে এই ব্যর্থতার জ্ঞাত দায়ী প্রতিকূল প্রাকৃতিক আবহাওয়া, অনিয়মিত বারিপাত এবং সর্বোপরি ক্রটিপূর্ণ কৃষিসংগঠন ও পরিকল্পনা। কৃষকদিগকে অধিক পরিমাণ ঋণ প্রদান করিলেই কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে না। কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির জ্ঞাত প্রধানত প্রয়োজন উন্নত উৎপাদন-কৌশল এবং সংগঠন।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি খাতে ১২৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প, ভূমিসংরক্ষণ এবং সমবায় ইহার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ৬৬৭ কোটি টাকা। সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমবায় খাতে ২০৬ কোটি টাকা এবং কৃষি উৎপাদন কার্যসূচীর জ্ঞাত ২২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ছাড়া বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্পের জ্ঞাত ৭৭৬ কোটি টাকা এবং ভূমিসংরক্ষণের জ্ঞাত ৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

ভারতে কৃষিউন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক অর্থাভাব নয়—সংগঠনের অভাব। সংগঠন ক্রটিপূর্ণ হইলে শ্রমের দক্ষতা, মূলধনের যোগান অথবা জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি কোনই কাজে আসিবে না।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নতি (Industrial Development in the Third Plan) : পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসর শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পের ক্ষেত্রে মোট ব্যয়বরাদ্দ ছিল ১০৯৪ কোটি টাকা কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল ১৫৪৫ কোটি টাকা অর্থাৎ পরিকল্পিত ব্যয় অপেক্ষা ৩৫ শতাংশ বেশি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্প উৎপাদনের সূচী বাৎসরিক ৭ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সালে শিল্পউৎপাদনের সূচী ছিল ৭৪, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৬ সালে ১৮২-তে আসিয়া দাঁড়ায় অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসরে ১৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট, জাতীয় সঞ্চয় এবং মূলধন গঠনের স্বল্পতা, কারিগরী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব প্রভৃতি বাধা সত্ত্বেও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পসম্প্রসারণের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিউন্নয়নের উপর উল্লেখযোগ্য অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে যে, এক বিশেষ পর্যায় অতিক্রম করিবার পর কৃষি উন্নয়ন শিল্পোন্নতির উপর নির্ভর করে। এই কথা স্মরণ রাখিয়াই তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প এবং খনি খাতে ১৫২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনায় ভারী এবং মূল-শিল্প নির্মাণের বিভিন্ন প্রকল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

লৌহ ও ইস্পাত, যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প যাহা

অর্থনীতির স্বয়ং-নির্ভরশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে তৃতীয় পরিকল্পনায় সেইগুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে যন্ত্রপাতি নির্মাণ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। বেসরকারী উদ্যোগে যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পেরও যথেষ্ট সম্প্রসারণ হয়।

কিন্তু চীনা-আক্রমণ এবং পাক-ভারত সংঘাতের দরুন শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দের কিছু পরিবর্তন করা হয়। লৌহ ও ইস্পাত, মূল ধাতু, তৈল শোধনাগার এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। লৌহ ও ইস্পাত এবং যন্ত্রপাতি নির্মাণের চাহিদা পরিবহণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে।

প্রতিরক্ষা, উন্নয়ন এবং জরুরী অবস্থা (Defence, Development and the Emergency) : চীনা-আক্রমণ এবং পাকিস্তান যুদ্ধের ফলে যে জরুরী অবস্থার উদ্ভব হয় তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, একই সঙ্গে উন্নয়ন এবং প্রতি-রক্ষার কাজ করিতে হইবে। অবস্থার প্রবল চাপে পড়িয়া ভারত প্রতিরক্ষাকে শক্তি-শালী করিবার নীতি গ্রহণ করে। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে ভারত ১০,১০০ কোটি টাকা মোট বিনিয়োগ করে এবং প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় হয় ২০৭৪ কোটি টাকা। চীনা-আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষা-ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া প্রায় দ্বিগুণ হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হয় ৩৪৩.৩৭ কোটি টাকা, ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭০৮.৫১ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়, ১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৫-৬৬ এই পাঁচ বৎসরে মোট বিনিয়োগ ও জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে—১০,৪০০ কোটি টাকা এবং ৮২,৮৫০ কোটি টাকা আর ঐ সময়ে প্রতিরক্ষাখাতে ব্যয় হয় ২৮৮৪ কোটি টাকা। পাক-ভারত সংঘর্ষের ফলে প্রতিরক্ষা ব্যয় আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৬-৬৭ সালে ২০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

দেশের প্রতিরক্ষার ক্ষমতা বিশেষভাবে উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। জাতীয় প্রতি-রক্ষা এবং উন্নয়ন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল বলিয়া উভয় ক্ষেত্রে অগ্রগতি সমান তালে চলিবে। প্রতিরক্ষা প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর পরি-বর্তন করিতে হইবে। পর পর দুইবার বিদেশী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া আমরা এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, প্রতিরক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহণ, তৈল এবং মূল শিল্পগুলির উপর যথোচিত গুরুত্ব দিয়া শিল্পের ভিত্তি প্রস্তুত এবং খাতোৎ-পাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ভারতের গ্রায় উন্নতিকামী অল্পমত দেশে ব্যাপক প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির ফলাফল কি তাহা জানা প্রয়োজন। মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে সমাজের উৎপাদন ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয় কিন্তু প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের বৃদ্ধি হইলে উহা ঘটে না, কারণ, উহা ক্রেতাদের চূড়ান্ত ভোগ পূরণ করে না। কোন নির্দিষ্ট সময়ে জাতি প্রদত্ত সম্পদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ ভোগাদ্রব্য অথবা অধিক পরিমাণ প্রতিরক্ষা দ্রব্য উৎপাদন

করিতে পারে। দেশে সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার থাকিলে অধিক পরিমাণ প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন করিলে অসামরিক ভোগ্যবস্তু উৎপাদন বাহত হইবে। এইরূপ ক্ষেত্রে অসামরিক ভোগ্যবস্তুর চাহিদা হ্রাস না পাইলে অবাধ মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে বিপর্যয় সৃষ্টি করিবে। যাহাতে অর্থনৈতিক বিনিয়াদ বিপর্যস্ত না হয় তাহার জ্ঞত কর বৃদ্ধি এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় (forced saving) নীতি প্রবর্তন করিতে হইবে। অসামরিক ভোগ্যবস্তুর চাহিদা দূর করিতে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উল্লিখিত দুইটি পদ্ধতিই অবলম্বন করা হইয়াছিল।

ভারতের সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারের (under utilization) দরুন সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহারের কারণ হইল অর্থনৈতিক সংগঠনে দক্ষতার অভাব। অসম্পূর্ণ বাজার, দাম ও মজুরীহারে অনমনীয়তা শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতার অভাব, শৈথিল্য প্রভৃতি কারণে দক্ষতার অভাব ঘটিয়া থাকে। দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে হইলে অর্থনীতিতে গতিবেগের সৃষ্টি করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Resources for the Third Plan) :
তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিবার সময় ৭,৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। অল্প সময়ের মধ্যে দুইবার বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় পর সংশোধিত হিসাবে দেখা গেল যে, তৃতীয় পরিকল্পনার রূপায়ণের জ্ঞত ৮৫০০ কোটি টাকা প্রয়োজন হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী অতিরিক্ত করে মাধ্যমে ১৭১০ কোটি টাকা আয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার মধ্যে কেন্দ্রের অংশ ১১০০ কোটি টাকা এবং রাজ্যগুলির অংশ ৬১০ কোটি টাকা। এই অতিরিক্ত কর রাজস্ব সংগ্রহের জ্ঞত কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রতিবৎসর গড়ে ২২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত করে মাধ্যমে আদায় করিতে হইবে। কিন্তু চীনা-আক্রমণের দরুন ১৯৬৩-৬৪ সালে কর রাজস্ব (Tax Revenue) বৃদ্ধি পাইয়া ২৭৬ কোটি টাকা হয়। কর রাজস্বের অনুপাত ছিল মোট রাজস্বের ৭০ শতাংশ (১৯৬২-৬৩), ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮২ শতাংশ হয়। প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নের প্রয়োজনে অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহের জ্ঞত পরবর্তী বাজেটগুলিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করে উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

চীনা-আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে সঞ্চয়ের হার বিশেষভাবে বৃদ্ধি করার প্রয়োজন দেখা দেয়। জনসাধারণের নিকট হইতে স্বেচ্ছামূলক ঋণ সংগ্রহে বিশেষ সাড়া না বাধ্যতামূলক পাওয়ায় ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম বাধ্যতামূলক সঞ্চয় মূলক সঞ্চয় বা আমানত পরিকল্পনার প্রবর্তন করেন। ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে ইহার বিলোপসাধন করিয়া ১৫,০০০ টাকার অধিক আয়বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme)

প্রবর্তন করা হয়। এই পরিকল্পনাটি পূর্ববর্তী বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা অপেক্ষা উত্তম, কারণ, ইহাতে নিম্নআয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে।

বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের স্বপক্ষে কতকগুলি শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমত, পরিকল্পনার ব্যয়নির্বাহের জ্ঞা শুধুমাত্র করের উপর নির্ভর করিলে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে না—জনসাধারণের বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের স্বপক্ষে যুক্তি উপরও নির্ভর করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, ইহা দেশে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে, ফলে, সঞ্চয়ের হার বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়ত,

করের ছায় বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ও ব্যয়যোগ্য আয়ের (disposable income) পরিমাণ হ্রাস করে। চতুর্থত, ইহা জনগণের আয় সৃষ্টিকারী সম্পদের সৃষ্টি করিবে। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা ভারতের ক্ষেত্রে নূতন হইলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের কয়েকটি দেশে প্রবর্তন করা হইয়াছিল। লর্ড কেন্স তাঁহার বিখ্যাত How to pay for the war গ্রন্থে গ্রেট ব্রিটেনের জ্ঞা বাধ্যতামূলক সঞ্চয়কে বিশেষভাবে সমর্থন করেন।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্ফুর্তকে স্থিতিশীল রাখিবার উদ্দেশ্যে ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করার

সিদ্ধান্ত করা হইলেও প্রকৃত ঘাটতি ব্যয় হয় ১১৫০ কোটি টাকা।

ঘাটতি

এই বিপুল পরিমাণ ঘাটতি ব্যয়ের দরুন তৃতীয় পরিকল্পনাকালে

ব্যয়

মূল্যস্ফুর্ত এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যতদূর

সম্ভব ঘাটতি ব্যয় পরিহার করিতে চেষ্টা করা হইবে।

আর্থিক এবং ফিস্ক্যাল অস্ত্রের ব্যবহার করিয়া মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে হইবে, কারণ, মূল্যস্ফুর্ত বৃদ্ধি পাইলে উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টা ব্যাহত হইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য দুইটি সর্তের উপর নির্ভরশীল :

সাফল্যের

সর্ত

প্রথমত, প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান অব্যাহত রাখিতে হইবে এবং

দ্বিতীয়ত, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কঠোরভাবে হ্রাস করিতে হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের সূত্রগুলি এখানে তালিকাভুক্ত করা হইল :

	প্রাথমিক হিসাব কোটি টাকা	চূড়ান্ত হিসাব কোটি টাকা
১। কর রাজস্ব হইতে উদ্ভূত	৫৫০	৪৭০
২। রেলপথ প্রদত্ত অর্থ	১০০	৮০
৩। অগ্রান্ত সরকারী বাণিজ্য- প্রতিষ্ঠানের মুনাফা	৪৫০	৩২৫
৪। জনসাধারণের নিকট হইতে নীট ঋণ	৮০০	২১৫
৫। স্বল্প সঞ্চয়	৬০০	৫৮৫
৬। প্রতিভেদেট ফাণ্ড (Unfounded debt)	২৬৫	৩৪০
৭। বাধ্যতামূলক আমানত এবং বাৎসরিক আমানত	—	১১৫
৮। ইস্পাত সমীকরণ তহবিল (Steel Equalization Funds)	১০৫	৩৫
৯। বিবিধ মূলধন আয় (Capital Receipts)	১৭০	১৫০
১০। অতিরিক্ত কর	১৭১০	২৮৮০
১১। বৈদেশিক সাহায্য	২২০০	২৪৫৫
১২। ঘাটতি ব্যয়	৫৫০	১১৫০
মোট	৭৫০০	৮৬৩০

তৃতীয় পরিকল্পনার দোষত্রুটি (Some Defects of the Third Plan) :

তৃতীয় পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটি যে, কয়েকটি বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা হইলেও পরে উহাদের কার্যকরী করিতে ইতস্তত করা হয়। মূল্যনীতি এবং নিয়োগনীতির ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। পরিকল্পনায় বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে আত্ম-বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। তৃতীয় পরিকল্পনার কতকগুলি দোষত্রুটি নির্দেশ করিয়া আমরা উহার মূল্যায়ন করিব।

প্রথমত, কৃষিপরিিকল্পনার পরস্পর নির্ভরশীল দুইটি পর্ষায় আছে। একদিকে জনগণের শ্রমজাত বস্তুর ব্যবহার, শিল্পের প্রয়োজন এবং রপ্তানির চাহিদা আর অপর-দিকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের কথা চিন্তা করিয়া বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করিতে হইবে। কৃষিপরিিকল্পনার দ্বিতীয় পর্ষায়ে জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিবার জগ্ন সাংগঠনিক কর্মসূচী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার এই পর্ষায়ে অতি সতর্কতার সহিত উৎপাদনসূচীকে কার্যে রূপায়িত করিতে হইবে যাহাতে বরাদ্দকৃত অর্থ সর্বাধিক দক্ষতার

সহিত নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-সংক্রান্ত নীতি এবং কর্মসূচী প্রণয়নের সময় সাংগঠনিক দিকটির প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। প্রথমত, পরিকল্পনা কমিশন উপলব্ধি করেন যে, বর্তমান কার্যপদ্ধতিতে গ্রাম, ব্লক এবং জেলা পর্যায়ে বিস্তারিত সংগঠনমূলক পরিকল্পনা, সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত হইয়াছে। এই নীতি অনুসরণ করিলে তৃতীয় পরিকল্পনার কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা যাইবে না। দ্বিতীয়ত, কোন রকম সাংগঠনিক পরিবর্তন না করিয়াই কৃষিখাতে বিপুল ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় সঠিক সংগঠনগত নীতির অভাবে কৃষি কর্মসূচী নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়ত, ১৯৬১ সালের আদমশুমারী হইতে দেখা যায় যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুমিত হার অপেক্ষা প্রায় ৫০ শতাংশ অধিক এবং ইহার ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপরেখায় যে রদবদল করা হয় তাহা খাতিয়ারপাদনের হিসাবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নৈরাশ্রের সৃষ্টি করে। বস্তুতপক্ষে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অনিয়মিত বারিপাতের দরুন খাদ্যসমস্যা দেখা দেয় এবং সফট এড়াইবার জগ্ন প্রভূত খাদ্যশস্য আমদানি করিতে হয়। এই কারণে চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মনে রাখা প্রয়োজন, যে দুইটি সর্বোত্তম উপর অর্থনীতির সম্প্রসারণ নির্ভর করে কৃষি তাহার অগ্রতম এবং খাদ্যসমস্যা ও তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি ঘটিলে মূলধন গঠনের হার ব্যাহত হইবে।

তৃতীয়ত, দ্রুত রপ্তানি বৃদ্ধি না করিতে পারিলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হইবে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে ভারতীয় বাণিজ্যের পরিমাণ রপ্তানি বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পায়। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের বাণিজ্য বিশ্বের মোট বাণিজ্যের ২.১ শতাংশ ছিল। ১৯৬১-৬২ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১.২ শতাংশে আসিয়া দাঁড়ায়। রপ্তানি বৃদ্ধির জগ্ন দায়িত্বপূর্ণ দুঃসাহসিকতার প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তৃতীয় পরিকল্পনায় রপ্তানি সম্প্রসারণের জগ্ন যথার্থ কর্মসূচী অথবা সঠিক নীতি নির্ধারণ করা হয় নাই। এমন কি সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রেও রপ্তানি 'কোটা' নির্ধারিত হয় নাই।

সংক্ষেপে বলা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনা কতকগুলি অসম্বদ্ধ, পরস্পরবিচ্ছিন্ন কার্যসূচী মাত্র, কোথাও উহাদের মধ্যে পরিমাণগত সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা নাই। ফলে তৃতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ্যগুলিই অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে। মোটের উপর, তৃতীয় পরিকল্পনার কলাফল সন্তোষজনক নয়।

তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যকালীন পর্যালোচনা (A Mid-term Appraisal of the Third Plan) : ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয়

পরিকল্পনার তিন বৎসরের অগ্রগতির একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ইহাতে কমিশন স্বীকার করেন যে, অর্থনীতির সম্প্রসারণের হার অত্যন্ত মন্দ। পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতীয় আয় বৃদ্ধি আশানুরূপ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ের বাৎসরিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করা কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে জাতীয় আয় ২.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, জনসংখ্যা বৎসরে ২.২ শতাংশ হারে বাড়িতেছে আর ঐ একই হারে যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মাথাপিছু আয় আর্দ্র বৃদ্ধি পাইবে না।

প্রশ্ন হইল, জাতীয় আয় বৃদ্ধির পথে কোন্ কোন্ বিষয় অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে? তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর মন্ডর গতিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির কারণ অন্বেষণ করিবার সময় মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ, পরিবহণ এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হইলেও এখনো জাতীয় আয়ের বেশির ভাগ কৃষি হইতে আসে। দুইটি কারণে জাতীয় আয় বৃদ্ধির উপর কৃষি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে—প্রথমত, জাতীয় আয়ের অধিকাংশ কৃষি হইতে আসে, এবং দ্বিতীয়ত, সমাজের প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তু ও কাঁচামালের যোগান কৃষির উপর নির্ভর করে। দ্রুতহারে কৃষি উন্নয়ন না হইলে জাতীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণ ব্যাহত হইবে, কারণ, কৃষি-উৎপাদন হ্রাস পাইলে অগ্রাগ্র ক্ষেত্রেও কাঁচামালের যোগান হ্রাস পাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশ ধার্য করা হয়। কিন্তু কার্যত ১৯৬১-৬২ সালে কৃষি-উৎপাদন মাত্র একশতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং পরবর্তী বৎসরে ৩ শতাংশ হ্রাস পায়। কৃষিব্যবস্থায় বিভিন্ন খাণ্ডশস্ত্রের উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গতি লক্ষ্য করা যায়। খাণ্ডশস্ত্রের সামগ্রিক উৎপাদন পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ৭ কোটি ২৭ লক্ষ টন ছিল অর্থাৎ উহা কোনরূপ বৃদ্ধি পায় নাই কিন্তু পরবর্তী বৎসরে উহা হ্রাস পাইয়া ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়, ১৯৬২-৬৩ সালে ধান এবং গমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। বাণিজ্য ফসলের মধ্যে ইক্ষুর উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় তৃতীয় পরিকল্পনার দুই বৎসরেই কম হয়।

শিল্পের ক্ষেত্রে বাৎসরিক ১১ শতাংশ শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর যথাক্রমে ৭ শতাংশ এবং ৭.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য ইহা সত্য যে তৃতীয় পরিকল্পনায় মূলধনী দ্রব্য উৎপাদক নূতন শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং ইহাদের উৎপাদনের হার শিল্পের সাধারণশ্রুটি অপেক্ষা অধিক হইলেও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় নাই।

দুইটি কারণে চতুর্থ পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ন কঠিন হইবে। প্রথমত, কৃষিক্ষেত্রে ব্যর্থতার দরুন যে সমস্তা দেখা দিবে তাহার সমাধান করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, অনুমিত পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য অপেক্ষা কম মূলধনী দ্রব্য লইয়া কাজ শুরু করিতে

হইবে। কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন, কারণ, কৃষির তুলনায় শিল্পের ক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি অধিকতর আশাপ্রদ হইয়াছে।

কৃষি উৎপাদনের ব্যর্থতার কারণ প্রতিকূল আবহাওয়া এবং অনিয়মিত বারিপাত। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসর সম্পর্কে ইহা সত্য হইলেও দ্বিতীয় বৎসর সম্পর্কে ইহা সত্য নয় আর এই বৎসর (১৯৬২-৬৩) কৃষি-উৎপাদন ৩ শতাংশ হ্রাস পায়।

জাতীয় স্যাম্পল সার্ভে (National Sample Survey) পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, যদিও তিন-চতুর্থাংশ কৃষি-পরিবারের হয় কোন জমি নাই, নতুবা উহার আয়তন পাঁচ একর অপেক্ষ কম, কিন্তু দেশের দুই-তৃতীয়াংশ জমি চাষের ক্ষেত্রে জোতের আয়তন ১০ একর বা ততোধিক। এইগুলি সংভরণ জোত (Subsistence holdings) অপেক্ষা বৃহৎ। অত্যাধিক বলা যায়, ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ক্ষুদ্র কৃষক কিন্তু ক্ষুদ্র জোত নয়। অপেক্ষাকৃত বড় জোতগুলির সমস্যা হইল অপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা (excess capacity) উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ ও বৈজ্ঞানিক কৃষিপদ্ধতির অভাবে উৎপাদন ক্ষমতা অপূর্ণ থাকিয়া যায় এবং প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতার এক-চতুর্থাংশ উৎপাদন করে।

ইহা অনস্বীকার্য যে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে সাংগঠনিক পরিবর্তন আশানুরূপ হয় নাই; সেই কারণে চতুর্থ পরিকল্পনায় সাংগঠনিক পরিবর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব

সাংগঠনিক	আরোপ করিতে হইবে। শুধুমাত্র সাংগঠনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে
পরিবর্তন	জমির উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি করা যাইবে না। আধুনিক কৃষি-
আশানুরূপ	কৌশল এবং জ্ঞান কাজে লাগাইতে সাংগঠনিক পরিবর্তন কতখানি
হয় নাই	সহায়তা করে তাহার সাহায্যে উহার সাক্ষ্য বিচার করিতে হইবে।

সংক্ষেপ বলা যায়, কৃষি উন্নয়নের জন্ত প্রয়োজন সমবায় ও সমষ্টি উন্নয়নের দ্রুত সম্প্রসারণ, কৃষি-গবেষণাগার স্থাপন করিয়া অধিক ফসল প্রদানকারী বীজ সংক্রান্ত গবেষণা চালান এবং সার উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থা করা। ইহার সহিত মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা এবং প্রশাসনিক সংস্কার সাধনের কর্মসূচীও তৈয়ারী করা প্রয়োজন।

প্রথম পরিকল্পনায় প্রধানত, বৃহৎ সেচ প্রকল্পগুলির খাতেই কৃষি বিনিয়োগ করা হয়। কিন্তু এই প্রকল্পগুলিতে প্রভূত বিনিয়োগের প্রয়োজন হওয়ায় দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সার উৎপাদন এবং ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অধিক ফসল উৎপাদনকারী বীজ এবং সার উৎপাদন বৃদ্ধির নূতন নীতি চাড়াও কৃষি-উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার এবং বৃহদায়তন জোতের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। প্রসঙ্গতঃ মনে রাখা প্রয়োজন যে সাংগঠনিক পরিবর্তনের মাধ্যমেই কৃষির ক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্চারিত হইতে পারে।

মধ্যকালীন পর্যালোচনা হইতে আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি এবং ক্রটি বিচুতি উপলব্ধি করিতে পারি। তৃতীয় পরিকল্পনার কার্যকাল শেষ হইয়া দেশে চতুর্থ পরিকল্পনার

কার্যকাল শুরু হইয়াছে সুতরাং এখন আমরা তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য এবং ব্যর্থতার চূড়ান্ত মূল্যায়ন করিতে পারি।

তৃতীয় পরিকল্পনার সাফল্য এবং ব্যর্থতার চূড়ান্ত পর্যালোচনা (A Final Assessment of the Achievements and Failures of the Third Plan) : ভারত তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে চীন আক্রমণ এবং শেষ বৎসরে পাকিস্তানযুদ্ধ এই দুইটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। ইহার ফলে ভারতীয় অর্থনীতিকে মুদ্রাস্ফীতি, খাদ্য সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট, শিল্পে কাঁচামালের অভাব, অপূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করিতে হয়।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের জন্য এক বৎসরের পরিকল্পনা করেন এবং পরে ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া রূপরেখা দাখিল করেন। ইহা স্বীকার করা হয় যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি, সেচ, বিদ্যুৎ, সংগঠিত শিল্প এবং গৃহনির্মাণ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। আরও বলা হয় যে, তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৮৬৩০ কোটি টাকা।

কৃষিক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতা দেখা যায়। ১৯৬৫-৬৬ সালে খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি টনে ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন। তৈলবীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২৮ লক্ষ টন ধার্য ছিল

কৃষি কিন্তু পরিকল্পনার শেষ বৎসরে উৎপাদন হয় মাত্র ৬১ লক্ষ টন। পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৬২ লক্ষ গাঁটে ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৪৫ লক্ষ গাঁট। তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৭১ লক্ষ গাঁটে ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৬২ লক্ষ গাঁট। ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ না হওয়ার কারণ শুধুমাত্র প্রতিকূল আবহাওয়া নয়—সেচ, সার, উন্নত বীজ এবং কীটনাশক ঔষধের অভাবও সমান দায়ী। ইহা ছাড়া কৃষিগত প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমন্বয়ের অভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। সঠিক মূল্যনীতি, বিক্রয়নীতি এবং ভূমি-সংস্কার নীতির অভাবে পরিকল্পনার প্রথম কয়েক বৎসর পরিকল্পনার কাজ ব্যাহত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিক্ষেত্রে শোচনীয় ব্যর্থতা, অস্বাভাবিক মূল্যস্তর বৃদ্ধি এবং জনগণের ভোগের পরিমাণ হ্রাসের জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী ॥

সার এবং সেচের ক্ষেত্রেও নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণের ব্যর্থতা বিশেষভাবে প্রকট। তৃতীয় পরিকল্পনায় রাসায়নিক সার উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় প্রকৃতপক্ষে তাহার অর্ধেক মাত্র উৎপাদিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে

সেচ ও

সার

১ কোটি ২৮ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবার কথা বলা হয়, কিন্তু কার্যত মাত্র ৬০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়।

ভূমি সংরক্ষণ কর্মসূচীর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রেও তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা স্পষ্ট। ১ কোটি ২৭ লক্ষ
কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট হইলেও প্রকৃত
বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় মাত্র এক কোটি দুই লক্ষ কিলোওয়াট।

সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি অপেক্ষাকৃত আশাশ্রিত।
১৯৬৫-৬৬ সাল ব্যতীত পরিকল্পনার অপর সকল বৎসরে শিল্প উৎপাদন বার্ষিক শতকরা
৭ হইতে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধির হার এইরূপ
শিল্প ছিল : ১৯৬১-সালে ৭%, ১৯৬২-৬৩ সালে, ৭.৭%, ১৯৬৩-৬৪
সালে ৮.৫%, ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭% এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪%। তৃতীয় পরি-
কল্পনায় শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১১ শতাংশ। অবশ্য মূলধনী শিল্পের
উৎপাদনের হার শিল্প উৎপাদনের সাধারণসূচী অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল।
এ্যালুমিনিয়াম, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, বস্ত্রবয়নের যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎচালিত পাম্প এবং চিনি
শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইলেও সিমেন্ট, কয়লা এবং লৌহ আকরিক
উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। সিমেন্ট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা এককোটি ৩০ লক্ষ
টন হইলেও ১৯৬৫-৬৬ সালে প্রকৃত উৎপাদন হয় এক কোটি ৮ লক্ষ টন, কয়লা
উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টন, কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৭
কোটি টন এবং লৌহ আকরিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩ কোটি টন ধার্য থাকিলেও
প্রকৃত উৎপাদন হয় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন মাত্র।

পরিবহণ এবং সংসরণ ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক।
শিক্ষার ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার অগ্রগতি আশাতিরিক্ত হইয়াছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে
পরিবহণ নাস এবং মিডওয়াইফ ছাড়া অত্র সকল লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইয়াছে।
গৃহ নির্মাণ ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অগ্রগতি বিশেষ উৎসাহজনক নয়।
৪ লক্ষ গৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ২ লক্ষ গৃহ নির্মিত
হয়।

নানা আকস্মিক এবং অস্বাভাবিক চাপ সত্ত্বেও তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প, পরিবহণ
সংসরণ, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা কতগুলি প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জিত হইয়াছে। কিন্তু
সমাজসেবা কৃষি, সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আমরা ব্যর্থ হইয়াছি।
বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং পরিকল্পনার ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও একটি
বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়াছে যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন,
নূতন কারিগরী এবং প্রশাসনিক দক্ষতার প্রসার এবং নূতন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের
আবির্ভাব ঘটিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

(India's Fourth Five Year Plan)

বিশেষ সঙ্কটকালীন অবস্থার মধ্যে চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া রচনা করা হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত-সংঘর্ষ, আকাশ-ছোয়া মূল্যস্ফুর, বাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ এবং ক্রমাগত প্রতিকূল বাণিজ্য ব্যালান্স এই সকল কারণে পরিকল্পনার পটভূমি এবং স্বল্পকালীন লক্ষ্যমাত্রায় অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়, আর ঐ বৎসর আগস্ট মাসেই চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া রিপোর্ট দাখিল করা হয়। পরিকল্পনা রচনার শেষ মুহূর্তে মুদ্রামান হ্রাস হওয়ায় পরিকল্পনার সকল ক্ষেত্রে হিসাবের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা সম্ভবপর হয় নাই।

ভারতীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে চতুর্থ পরিকল্পনা এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। তৃতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং নৈরাশ্যের পটভূমিকায় ইহা উন্নয়নীয় ব্যয় দ্বিগুণ করিবার নীতি গ্রহণ করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উত্তোগের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ ছিল ৮৬৩১ কোটি টাকা, চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা বৃদ্ধি করিয়া ১৬,০০০ কোটি করা হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় মোট ২৩,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইয়াছে—ইহার মধ্যে সরকারী ক্ষেত্রে ১৬,০০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে ৭,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

বর্তমানে অর্থনৈতিক সঙ্কটের দরুন অর্থনীতির উপর যে চাপ পড়িয়াছে তাহাতে মনে হয়, সরকারী খাতে বিনিয়োগের পরিমাণ ৪,০০০ কোটি টাকা হ্রাস করিতে হইবে। সরকারী উত্তোগের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ ১৬,০০০ কোটি টাকা হইতে হ্রাস পাইয়া ১২,০০০ কোটি টাকা হইলে শিল্প এবং সমাজসেবার খাতে অগ্রাধিকারের কিছু রদ-বদল করার প্রয়োজন হইলেও কুণিক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন হইবে না।

চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন (Size of the Fourth Plan) : চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সরকারী এবং বেসরকারী উত্তোগে মোট ব্যয় হইবে ২৩,৭৫০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ১৬,০০০ কোটি টাকা সরকারী উত্তোগের ক্ষেত্রে এবং ৭,৭৫০ কোটি টাকা বেসরকারী উত্তোগের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হইবে। সরকারী উত্তোগের ক্ষেত্রে ৪,০০০ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করা হইলে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১২,০০০ কোটি টাকা। বেসরকারী খাতে যে ৭,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত করা হয় তাহার কোনরূপ পরিবর্তন হইবে না। চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে (১৯৬৬-৬৭) যে পরিমাণ ব্যয় হইয়াছিল দ্বিতীয় বৎসরেও সেই পরিমাণই ব্যয় হইবে। ১৯৬৬-৬৭

সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় ২,০৮১.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হয় ২,১০০ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাইকারী দামের স্থচী ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনা কালে উহা ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্তর দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনা

রচনার সময় ৪ শতাংশ হইতে ৫ শতাংশ মূল্যস্তর বৃদ্ধি অপরিহার্য মূল্য সঙ্কট বলিয়া মনে হইয়াছিল। ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাস হইতে মূল্যস্তর এরূপ বৃদ্ধি পাইতে এবং অর্থনৈতিক অবস্থার এরূপ অবনতি ঘটিতে থাকে যে, ইহাকে “মূল্য সঙ্কট” (Price crisis) বলিয়া বর্ণনা করা হয়।

এখন প্রশ্ন হইল, অবাধ মুদ্রাস্ফীতির পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পরিকল্পনার সরকারী উদ্যোগের খাতে ১৬০০০ কোটি টাকার বিপুল ব্যয় কি সমর্থনযোগ্য? জনগণের দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং ইহার জ্ঞাত পরিকল্পনার আয়তন বৃহৎ হওয়া আবশ্যিক। অর্থসংস্থানের দিক হইতে বিবেচনা করিলে চতুর্থ পরিকল্পনা অবশ্য অতিরিক্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কিন্তু জনগণের প্রয়োজনের দিক হইতে বিচার করিলে ইহার লক্ষ্যমাত্রাকে বিশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলা চলে না। পরিকল্পনার আয়তন বৃহৎ না হইলে উন্নয়নের “উত্তোলন পর্যায়” দ্রুত অতিক্রম করিয়া “স্থায় নির্ভরশীল সম্প্রসারণের” গতিবেগ স্থাপ্তি করা যাইবে না। চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন বৃহৎ না হইয়া ক্ষুদ্র হইলে মুদ্রাস্ফীতি পরিহার করা যাইবে বলিয়া যে মুক্তি দেখানো হয় তাহাও ভিত্তিহীন। খাদ্যশস্যের মূল্যের কথাই ধরা যাক। সাধারণ অবস্থায় ক্ষুদ্রায়তন পরিকল্পনার সাহায্যে খাদ্যের যোগান বিশেষ বৃদ্ধি করা যাইবে না এবং ইহার ফলে মূল্য বৃদ্ধি অনিবার্য। মূল্য বৃদ্ধির ফলে নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে কিন্তু ধনীদিগের কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে না।

খাদ্যশস্যের ঘাটতির জ্ঞাত মূল্যের যে উর্ধ্বগতি তাহাকে দুইটি পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। প্রথমত, খাদ্যের যোগান বৃদ্ধি করা আর ইহার জ্ঞাত পরিকল্পনাকে বৃহদায়তন করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, চাহিদাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। দাম নিয়ন্ত্রণের উপায় দীর্ঘকালীন প্রভাবের কথা বিচার করিলে প্রথম পদ্ধতিই গ্রহণযোগ্য। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচী সমন্বিত বৃহদায়তন পরিকল্পনা সামগ্রিক চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপ্তি করিয়া অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব আনিতে পারিবে। ক্ষুদ্রায়তন পরিকল্পনা অর্থনীতির মূল সমস্যা সমাধান করিতে পারিবে না।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি এবং শিল্প (Agriculture and Industry in the Fourth Plan) : তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি কর্মসূচীর ত্রুটির জ্ঞাত খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দেয়। এই কারণে চতুর্থ পরিকল্পনায় এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ

করা হইয়াছে। ইহাতে সারের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করিয়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় যে পরিকল্পিত কৃষি-বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অসম্পূর্ণ এবং প্রয়োজনের তুলনায় অপর্ধাপ্ত। উন্নতদেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং উন্নত উৎপাদন-কৌশল কৃষিক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া কৃষি-বিপ্লব ঘটানো হইয়াছে। ভারতের গ্রায় সংরক্ষণশীল দেশের কৃষি-ব্যবস্থায় বিজ্ঞান এবং আধুনিক উৎপাদন-কৌশল প্রয়োগ করা বেশ কঠিন ব্যাপার। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে এই কঠিন কাজ শুরু করিতে হইবে এবং ভারতীয় কৃষিকে গতিশীল করা ও অতিক্রম কৃষি-বিপ্লব সম্পূর্ণ করার জন্য সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা শুরু করিতে হইবে। এইজন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় সার, কৃষি-যন্ত্রপাতি, উদ্ভিদ-খাত, কীটনাশক ঔষধ প্রভৃতি উৎপাদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় ব্যাপক কৃষির (extensive cultivation) পরিবর্তে প্রগাঢ় কৃষির (intensive cultivation) উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। উন্নতবীজ এবং অধিক পরিমাণ সার ব্যবহার করিয়া কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে যত অধিক সংখ্যক জেলায় প্রগাঢ় কৃষি-উন্নয়ন কর্মসূচী প্রয়োগ করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইহার সহিত অগ্রদান-খাত, শাকসব্জি, পশুপালন প্রভৃতিও প্রসার করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইলেও দ্রুত শিল্পায়নের যে নীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা অব্যাহত থাকিবে। ভারতের গ্রায় দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে কৃষি এবং শিল্পের উন্নয়ন একত্রে হওয়া উচিত। সম্প্রসারণশীল শিল্পক্ষেত্রের জন্য প্রয়োজন কৃষি-বিপ্লব, যাহার ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে খাত-শস্ত্র এবং কাঁচামালের যোগান অব্যাহত থাকিবে। আবার শিল্পের উন্নতি না হইলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। এইজন্য চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপর উচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার সহিত শিল্পের কর্মসূচীকে এরূপভাবে রচনা করা হইয়াছে যাহাতে শিল্প হইতে কৃষির প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান অব্যাহত থাকে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় খাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১২ কোটি টনে ধার্য হইয়াছে। এই লক্ষ্যমাত্রা সকল করিবার জন্য ৪৫ লক্ষ টন ইম্পাত, ৫৫ লক্ষ টন সিমেন্ট, ৩৫ লক্ষ টন সার, ৭ লক্ষ ৫০ হাজার বিদ্যুৎ চালিত কর্ণযন্ত্র এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাতে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। পরিকল্পনায় ২০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন সার, ১০ লক্ষ টন ফসফেটিক সার এবং ৩৫ লক্ষ টন পটাশিক সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা আছে। এই সময়ে ৮০ হাজার টন কীটনাশক ঔষধ উৎপাদনও করা হইবে।

শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নের চাহিদা পূরণের জন্যই নয়, কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি এবং শিল্পায়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিবার জন্য পরিকল্পনা বৃহদায়তন হওয়া প্রয়োজন।

এইজ্ঞা শিল্প এবং কৃষির ক্ষেত্রে সমতায়ুক্ত উন্নয়নের বিশেষ প্রয়োজন। কৃষিক্ষেত্রে প্রগাঢ় চাষ প্রবর্তন করিয়া শিল্পক্ষেত্রে কার্যসূচীর উপর এরূপ অগ্রাধিকার দিতে হইবে যাহাতে কৃষি-উন্নয়নের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।

পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, কৃষি-উৎপাদনের স্বল্পতার দরুন মূল্যস্ফুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। যাহাতে অতীতের ব্যর্থতার পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেইজ্ঞা চতুর্থ খসড়া পরিকল্পনায় কৃষির উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি এবং সমাজ উন্নয়ন খাতে সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৬৬০ কোটি টাকা, চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা বৃদ্ধি করিয়া ১৫৭৫ কোটি টাকা করিতে হইবে। কৃষিখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিবার গুরুত্ব উপলব্ধি করিলেও পরিকল্পনা কমিশন কার্যত তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-বিনিয়োগের অনুপাত হ্রাস করিয়াছেন। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-বিনিয়োগের অনুপাত ছিল মোট বিনিয়োগের ১৪ শতাংশ—চতুর্থ পরিকল্পনায় উহা হ্রাস পাইয়া ১১.৬ শতাংশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, কৃষিখাতে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ব্যতীত শিল্পোন্নয়ন কর্মসূচীতে সার, কীটনাশক ঔষধ এবং কৃষি-সরঞ্জাম উৎপাদনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় খাত-উৎপাদন বৃদ্ধির তথাকথিত “নূতন কোর্সলের” উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই নীতি অনুসারে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমিতে প্রগাঢ় চাষের প্রসার করা হইবে। কৃষি পরিকল্পনার নূতন কোর্সল প্রয়োগ করিয়া জমির-উৎপাদন সর্বাধিক করিবার চেষ্টা করা হইতেছে। কৃষিক্ষেত্রে এই নূতন কোর্সল অবলম্বন করার ফলে আশা করা যায় যে, ১৯৭০-৭১ সালে ৩ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমি হইতে অতিরিক্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য পাওয়া যাইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে খাত-উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১২ কোটি টনে ধার্য করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা খাতোৎপাদন ২ কোটি ৭০ লক্ষ টন কম হয় এবং চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে দেশের বিভিন্ন স্থানে

খাতের
লক্ষ্যমাত্রা

প্রচণ্ড খরা এবং প্লাবন হওয়ায় ১৯৭০-৭১ সালের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। খাতের উৎপাদনই

যে শুধু ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২ কোটি টন করিতে হইবে তাহা নয়, তৈলবীজের উৎপাদন ৬১ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ৭ লক্ষ টন, তুলার উৎপাদন ৪৭ লক্ষ গাঁট হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮৬ লক্ষ টন এবং পাটের উৎপাদন ৪৫ লক্ষ গাঁট হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৯০ লক্ষ গাঁট করিতে হইবে। উৎপাদনের এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইতে হইলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার শতকরা ৩.৫ ভাগ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬ ভাগ করিতে হইবে। ইহা অবশ্যই একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

বারিপাতের অভাব এবং খরার দরুন ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষি উৎপাদন ১৫.৭ শতাংশ হ্রাস পায় আর ইহার দরুন জাতীয় আয় ৫.৯ শতাংশ কমিয়া যায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে খাদ্যশস্যের উৎপাদন সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি (৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন হইতে ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন হয়) পাইলেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। উন্নয়নের গতিধারা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়নের যে হার স্থির করা হইয়াছে প্রকৃত অগ্রগতি তদপেক্ষা মন্দরহারে হইতেছে। কৃষির মন্দর অগ্রগতি ধরিয়া লইলে দেশের সামগ্রিক উন্নতি শিল্পায়নের উপর নির্ভর করিবে। কৃষির ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আনিতে হইলে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ এবং বণ্টননীতি অপরিহার্য।

পূর্ববর্তী দুইটি পরিকল্পনার মত চতুর্থ পরিকল্পনাও শিল্পের ক্ষেত্রে মূলধনী শিল্পের দ্রুত উন্নয়নের জ্ঞত আগ্রহী। মূল এবং ভারীশিল্পের উপর জোর দেওয়ায় ভোগ্যদ্রব্যের স্বল্পকালীন ঘাটতি এবং মুদ্রাস্ফীতি অনিবার্হভাবে দেখা দিবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-সরঞ্জাম সরবরাহকারী শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্প ও খনিখাতে মোট ৬২৮৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হইবে। ইহার মধ্যে সরকারী উদ্যোগের খাতে ৩৯৩৬ কোটি টাকা এবং বেসরকারী উদ্যোগের খাতে ২০৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

সার, কীটনাশক ঔষধ, কৃষিযন্ত্রপাতি প্রভৃতি কৃষিসরঞ্জাম উৎপাদনকারী শিল্প, পেট্রোলিয়ম, কয়লা, সিমেন্ট প্রভৃতি মাধ্যমিক দ্রব্যশিল্প (intermediate goods industries) এবং ধাতু ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্পগুলির উপর চতুর্থ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে লৌহপিণ্ডের উৎপাদন ৬২ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এক কোটি ১৭ লক্ষ টন হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত ইস্পাত কারখানাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বোকোরোতে সরকারী উদ্যোগে যে চতুর্থ ইস্পাত-কারখানা স্থাপন করা হইতেছে উহা ১৭ লক্ষ টন ইস্পাত পিণ্ড এবং ৮৮০,০০০ টন কাঁচা লোহা উৎপাদন করিবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে লৌহ আকরিকের উৎপাদন ২ কোটি ৩০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন, পেট্রোলিয়ম পরিশোধন ৯৯ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি টন এবং সিমেন্ট ১ কোটি ৮ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২ কোটি টন হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসর হইতে শিল্পক্ষেত্রে এক অভূত দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মোট যোগান অপেক্ষা মোট চাহিদা অধিক হারে বাড়ায় মূল্যস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন হ্রাস এবং অসম্পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা অর্থাৎ মন্দার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে

কৃষকদের আয় হ্রাস পাওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদায় অবনতি দেখা যাইতেছে এবং এই অবস্থায় কোন কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান উৎপাদন হ্রাস করিতেছে। কিন্তু শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতার অসম্পূর্ণ ব্যবহারের মূল কারণ হইল কৃষিজাত কাঁচামালের অভাব, এবং আমদানিকৃত যন্ত্রপাতির স্বল্পতা। চতুর্থ পরিকল্পনায় এই সমস্যাটিকে কার্যকরীভাবে সমাধান করা প্রয়োজন। কৃষি অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হইতেছে, ইহার সহিত যদি শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হয় তাহা হইলে সমগ্র পরিকল্পিত কার্যক্রম বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

চতুর্থ পরিকল্পনার অর্থসংস্থান (Financial Resources for the Fourth Plan) : চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া হইতে দেখা যায় যে, সরকারী খাতে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৪,২০০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৬৩০০ কোটি টাকা হইবে বৈদেশিক সাহায্য। মোট ব্যয়বরাদ্দ এবং সংগৃহীত অর্থের মধ্যে যে, ১৮০০ কোটি টাকার ফাঁক থাকিয়া যাইতেছে তাহা অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া বা অন্য কোন উপায়ে সংগ্রহ করা হইবে। মূল্যস্ফুরের ঊর্ধ্বগতি রোধ করিবার জন্ত চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কোনরূপ ঘাটতি ব্যয় করা হইবে না এবং সঞ্চয়ের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। রেলপথ হইতে ২৬০ কোটি টাকা, অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা হইতে ১০৮৫ কোটি টাকা, জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে ১৫০০ কোটি টাকা, এবং বাধ্যতামূলক সঞ্চয় ও বার্ষিক আমানত প্রকল্প হইতে ১৫০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। বৈদেশিক সাহায্য বাবদ ৪৩৪০ কোটি টাকা এবং পি, এল, ৪৮০ হইতে ৩৬০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে ঘাটতি-ব্যয় সঙ্কোচ করা এবং বাজেটে সমতা আনার উপর জোর দেওয়া প্রয়োজন। তৃতীয় পরিকল্পনার আয়তন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হওয়া সত্ত্বেও সেখানে ১১৫০ কোটি টাকার ঘাটতি-ব্যয় করা হয় (বলা হইয়াছিল ৫৫০ কোটি টাকা ঘাটতি-ব্যয় করা হইবে), সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনায় ঘাটতি-ব্যয় সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না। যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে কোনরূপ ঘাটতি-ব্যয় করা হইবে না এবং ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ, তাহা হইলে উন্নয়নের ব্যয় মিটাইবার জন্ত করের হার বৃদ্ধি করিতেই হইবে। খসড়া পরিকল্পনায় অতিরিক্ত কর ধার্য করিয়া ২৭৩০ কোটি টাকা সংগ্রহের প্রস্তাব করা হয়। ইহার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৭৪৫ কোটি টাকা এবং রাজ্যসরকার সমূহ ৯৪৮ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবে।

ভারতীয় অর্থনীতি এরূপ চাপ সহ্য করিতে পারিবে না একথা আমরা বলি না। কিন্তু এইরূপ বিপুল পরিমাণ করধার্যের ফলে পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণ ব্যাহত হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে অর্থ নৈতিক সংগঠন এরূপভাবে উন্নত করিতে হইবে যাহাতে সরকারী অর্থের সামান্যতম অপচয়ও প্রতিরোধ করা যায়। বর্তমানে উন্নয়ন এবং পরিকল্পনা

বহির্ভূত ব্যয় মোট বাৎসরিক ব্যয়ের ৫ শতাংশ। ইহাকে হ্রাস করিয়া ৩ই শতাংশে নামাইয়া আনিতে পারিলে পরিকল্পনার জ্ঞাত এইভাবে ৩৩৫ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে।

প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় দেশের কিছু উন্নতি হইলেও দেশের দরিদ্র জনগণের জীবনযাত্রার মান এখনো মানবিক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছায় নাই। দ্রুত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নতির জ্ঞাত বৃহদায়তন পরিকল্পনা গ্রহণে বিরোধিতা করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। পরিকল্পনার আয়তন ছোট করিলে ভবিষ্যতে অসুবিধা দেখা দিবে। বৃহদায়তন পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে যে কঠিন আর্থিক সঙ্কট দেখা দিবে তাহা সমাজের সকল শ্রেণীই নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে ভাগ করিয়া লইবে। পরিকল্পনা হইল এক সাহসিকতাপূর্ণ অভিযান এবং ইহার সার্থক ও সফল রূপায়ণের জ্ঞাত সমাজের সকল ব্যক্তিকেই অল্লবিস্তর ত্যাগস্বীকার এবং দুঃখবরণ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

উন্নয়ন পরিকল্পনার সমীক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা

(Survey of Development Projects with special reference
to Community Development Projects)

সেচ সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সমাজোন্নয়নের ব্যাপকতর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইলে উহা বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসাধারণের সুবিধার সৃষ্টি করে। সমাজের সাধারণ কল্যাণের জন্ত সকলকে মিলিতভাবে কাজ করিতে শিক্ষা দেওয়া এবং কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক কৃষি-পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করিয়া গ্রামীণ সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচনার উদ্দেশ্যে ভারতে স্বাধীনতা লাভের পরই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হইয়াছিল। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা প্রারম্ভকালে নবভারতের সার্থক প্রতীক বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল এবং আশা করা হইয়াছিল যে, ইহা এক “মানবিক বিপ্লব” সৃষ্টি করিবে। কিন্তু সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার বিগত চৌদ্দ বৎসরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিলে আমরা ইহার স্মৃহান উদ্দেশ্যের সার্থকতা দেখিতে পাই না। সমাজের অপেক্ষাকৃত অর্থশালী ব্যক্তিগণই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা লাভবান হইয়াছে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের নিজেদের উপর আস্থা ফিরিয়া পাইবার এবং নূতন কর্মোত্তোগ বৃদ্ধি পাইবার যে ধারণা ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা সার্থক হয় নাই।

১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে এই পরিকল্পনা ৫৬৬২০ গ্রাম এবং ৪০ কোটি ৫০ লক্ষ লোককে ইহার আওতায় লইয়া আসে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সমাজোন্নয়ন কার্যসূচীর বৈশিষ্ট্য হইল গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ—গ্রাম, ব্লক এবং জেলা পর্যায়ের স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজ নিজ এলাকায় উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিবার জন্ত সেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইহার কৃষি-উন্নয়নে, নূতন শিল্প স্থাপনে এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে সহায়তা করে। এই পরিকল্পনাগুলি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নূতন বিনিয়োগের সুযোগ করিয়া দিয়া এবং নূতন বাজার সৃষ্টি করিয়া অল্পমত অঞ্চলকে উন্নত করিয়া তোলে। বহুমুখীন নদী পরিকল্পনাগুলি এইভাবে জাতির উন্নয়নে সহায়তা করে। দামোদর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দামোদর উপত্যকায় অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের অল্পমত অঞ্চলগুলিতে নূতন কর্মচাকল্য এবং উদ্বীপনা দেখা দিয়াছে। বহুমুখীন পরিকল্পনাগুলিকে কেন্দ্র করিয়া নূতন শহর, নূতন সমাজ এবং নূতন সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Community Development Projects) :

পঞ্চদশ বৎসর পূর্বে, ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে পরিকল্পিত উন্নয়নের অঙ্গ হিসাবে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতে প্রথম প্রবর্তন করা হয়। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে সারা ভারতের গ্রামীণ জনসাধারণ এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। সমগ্র

দেশকে ৫৩৮টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়; ইহাদের মধ্যে ১৯৬৫ সালের

উদ্দেশ্য

জানুয়ারী মাসে ৫২৪০টি ব্লক কার্যকরী ছিল। সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা জনসাধারণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করে এবং উহাদের ভিতর জীবনযাত্রার উচ্চমানের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করিয়া দেয় আর সেই আকাঙ্ক্ষাকে সফল করিবার মত ইচ্ছা এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি করে বলিয়া সমাজোন্নয়ন কর্মসূচী একাধারে শিক্ষামূলক এবং গঠনমূলক। ইহার লক্ষ্য হইল গ্রামীণ জনগণকে উন্নত জীবন লাভের জগ্ৰ উৎসাহিত করা এবং কি ভাবে আত্ম-নির্ভরশীলতার মাধ্যমে উহা লাভ করা যায় তাহার নির্দেশ দেওয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের জগ্ৰ গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং প্রয়োজনানুসারে নূতন প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা প্রয়োজন। কৃষি, গ্রামীণশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি গ্রাম্যজীবনের সকল দিকই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলিতে গ্রামাঞ্চলের উদ্ভূত শ্রমিক নিয়োগ করিয়া বেকারসমস্যা সমাধানে সহায়তা করিবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রথম দিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অপেক্ষা কল্যাণমূলক কাজের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, কারণ, ইহাদের কার্যকরী করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কিন্তু শীঘ্রই ইহা উপলব্ধি করা গেল যে, কল্যাণমূলক কাজ অপেক্ষা অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিশেষ করিয়া কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি এবং উদ্ভূত জনশক্তির অপচয় রোধের উপর গুরুত্ব দিতে হইবে। ১৯৬৬ সালে পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে ধান এবং গম উৎপাদক অঞ্চলে ব্লক স্থাপন করিতে নির্দেশ দেন। গ্রাম-সেবকগণকে তাহাদের কাজের অধিক সময় কৃষি-উন্নয়নের জগ্ৰ ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কৃষি-কর্মসূচীর লক্ষ্য হইল সেচ, সার, উন্নত বীজ এবং নূতন উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে একর প্রাতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং কৃষককে জমির উৎপাদনক্ষমতা সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করিয়া দেওয়া।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা উন্নয়নের ক্রমবিকাশে এক নূতন এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মনে হয় ইহার অর্থনৈতিক মূল্য অপেক্ষা মনস্তাত্ত্বিক মূল্য অধিক। প্রথম পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ খাতে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ৪৬ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল ১২৪ কোটি টাকা। তৃতীয় পরি-

সংগঠন,
কর্মপদ্ধতি
এবং প্রশাসন

কল্পনাকালে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাধাতে ২২৪ কোটি টাকা এবং পঞ্চায়েতের জুতা ২৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিকে প্রধানত দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় : মূল প্রকল্প (basic projects) এবং মিশ্র প্রকল্প (composite projects) : মূল প্রকল্পগুলিতে প্রধানত কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কৃষি উন্নয়ন ব্যতীত জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, রাস্তানির্মাণ, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি মূল প্রকল্পগুলির অন্তর্ভুক্ত। ৩০০ গ্রাম, ২ লক্ষ জনসংখ্যা, ৫০০ বর্গমাইল এবং ১৫০,০০০ একর কষিত জমি লইয়া পরিকল্পনা এলাকা (project area) গঠিত। প্রত্যেক পরিকল্পনা এলাকা তিনটি উন্নয়ন ব্লকে (Development Block) বিভক্ত। প্রত্যেক ব্লকে ১০০টি করিয়া গ্রাম থাকিবে এবং একজন ব্লক উন্নয়ন অফিসার থাকিবেন। ইহাদের সাহায্য করিবার জুতা ১২ জন বিশেষজ্ঞ রহিয়াছেন। প্রতিটি উন্নয়ন ব্লক আবার ৫টি গ্রাম লইয়া ২০টি অংশে বিভক্ত থাকিবে এবং প্রতি ৫টির দায়িত্ব থাকিবে একজন করিয়া গ্রামসেবকের উপর। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ব্যক্তি হইতেছেন গ্রামসেবক। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পরিচালনার জুতা কতকগুলি উপদেষ্টা কমিটিও (Advisory Committee) থাকিবে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার শীর্ষদেশে যে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকিবেন তিনি উন্নয়ন কমিশনারদিগের (Development Commissioners) মাধ্যমে কাজ করিবেন।

মিশ্র প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য হইল একই সঙ্গে কৃষি এবং কুটিরশিল্পের উন্নতি-সাধন করা। এই ধরনের প্রকল্পে কৃষকদের কাজ দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৫৮ সালে বলবস্তি মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম (National Extension Service), মূল সমাজোন্নয়ন (Community Development Proper) এবং পরবর্তী কাল (Post Intensive Period) এই তিন পর্যায়ের কার্যক্রম পরিবর্তন করা হয়। বর্তমানে প্রতিটি পর্যায় পাঁচ বৎসর করিয়া দুইটি পর্যায়ে কার্যক্রম বিভক্ত করা হইয়াছে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার জুতা প্রয়োজনীয় অর্থ ভারত সরকারের সমাজ পরিকল্পনা বিভাগ, রাজ্যসরকারসমূহ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে পাওয়া যাইবে। প্রথম পরিকল্পনাকালে সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ খাতে ২০ কোটি টাকা, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে যথাক্রমে ২০০ কোটি এবং ২২৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় সমাজোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতের জুতা ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা (National Extension Service) : পঞ্চবার্ষিক

পরিকল্পনা যে পদ্ধতি ও যাহার মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ জীবনের পরিবর্তন আনিবার চেষ্টা করিয়াছে তাহা হইল সমাজোন্নয়ন, এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম। ১৯৫২ সালে “অধিক খাদ্য ফলাও” অনুসন্ধানকারী কমিটি (Grow More Food Enquiry Committee) উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্ত জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম ভারতের সর্বত্র স্থাপনের সুপারিশ করেন। এই কমিটি মনে করেন যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত সম্প্রসারণ কার্যক্রমের কাজ গ্রাম-সমাজের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবে। সমাজোন্নয়ন প্রকল্প এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম এরূপ এক পরিবেশ সৃষ্টি করিবে যাহাতে জাতীয় পরিকল্পনার পক্ষে গ্রাম-জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সহজসাধ্য হইবে। সামাজিক কঠামোর পরিবর্তন ব্যতিরেকে অনুন্নত দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হইতে পারে না। জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজোন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এই সকল দেশে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনা সম্ভব।

প্রত্যেক জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকে একজন করিয়া ব্লক উন্নয়ন অফিসার আছেন, তিনি ৬ জন বিশেষজ্ঞের সাহায্যে ব্লকের কার্য পরিচালনা করেন।
সংগঠন অবস্থা এখানেও গ্রাম সেবকের ভূমিকাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, গ্রামের জনগণ এবং জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের মধ্যে তিনিই যোগসূত্র স্থাপন করেন।

১৯৫৩ সালের ২রা আগস্ট তারিখ হইতে ১১২ টি ব্লকে ১৫,৩৩৬ গ্রাম লইয়া জাতীয় সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। ১৯৫৪-৫৫ সালে উহার কাজ ২৪৫টি অগ্রগতি ব্লকে সম্প্রসারিত হয় এবং ইহার ফলে ৩৪,৭০৪ টি গ্রাম ইহার সুবিধা লাভ করে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ৩৩,২২০ টি গ্রাম লইয়া ২৫৯ টি ব্লকে জাতীয় সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ৪২৫ টি ব্লকে এবং ১৯৫৭-৫৮ সালে ৫২৭ টি ব্লকে ইহা সম্প্রসারিত হয়। শেষ দুই বৎসরে ৪৪০ টি সম্প্রসারণ ব্লক সমাজোন্নয়ন ব্লকে রূপান্তরিত হয়। জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের পাঁচ বৎসরের অগ্রগতি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, এই সকল পরিকল্পনার সুবিধা কেবলমাত্র কয়েকটি গ্রামকেই সাহায্য করিতে পারে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন ব্লক প্রদত্ত সুবিধার মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। এই ত্রুটি দূর করিবার জন্ত ১৯৫৮ সালে পরিবর্তিত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় (Revised Community Development Plan) সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণের মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দিয়া দুইটি পাঁচ বৎসরব্যাপী উন্নয়ন প্রকল্পের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Consequences of N.E.S. and Community Projects) :
গ্রামীণ সমাজের সুস্থ সম্ভাব্যশক্তি পুনরুদ্ধার এবং জনগণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সৃষ্টি করা হইয়াছিল। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সফল হইলে আমরা

গ্রাম্যজীবনের প্রগতি এবং সমৃদ্ধির এক নূতন চিত্র দেখিব। শস্ত্র-শ্যামল ক্ষেত্র কৃষকের মনে এক উজ্জ্বল প্রেরণার স্বপ্ন আনিয়া দিবে, জীবনের এক নূতন উদ্দীপনার স্পন্দন সৃষ্টি করিবে। ভারতে সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ প্রকল্পগুলির উদ্দেশ্য হইল গ্রামীণ জনগণের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করিয়া তাহাদের মনে জীবনযাত্রার উচ্চ মানের আকাঙ্ক্ষা আর সেই আকাঙ্ক্ষাকে কার্যে পরিণত করার মত মনোভাব এবং সংকল্পের সৃষ্টি করা। এই পরিকল্পনার অর্থনৈতিক ফলাফলগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল।

প্রথমত, সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়নের বেগ সৃষ্টি করিলেও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও ইহা উৎসাহ এবং কর্মপ্রেরণা সঞ্চার করিয়া দিবে।

ফলাফল

দ্বিতীয়ত, উন্নত ধরনের সার, বীজ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, এই বর্ধিত উৎপাদনের ফলে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ কি বৃদ্ধি পাইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দুইটি সর্তের উপর নির্ভর করে—গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং ভোগব্যয়ের প্রকৃতি। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির ফলে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পাইতেছে কিন্তু জন্মহার ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে। আর ইহার দরুন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ধিত উৎপাদন বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মিটাইতেই ব্যয়িত হইয়া যাইবে বলিয়া বিক্রয়যোগ্য পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না। কিন্তু এই সন্দেহ মনে রাখা প্রয়োজন যে, উন্নয়নকালে জনসংখ্যা গ্রাম হইতে শহরাভিমুখী হইতেছে এবং সেই জন্ম জীবনধারণের বিভিন্ন উপাদান ও কৃষি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য কৃষকদিগকে বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতেই হইবে। স্মরণ্য দেখা যাইতেছে যে, দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির প্রভাবে বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূতের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। মৃত্যু হার হ্রাস পাওয়ার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়িয়া গিয়াছে এবং ইহা বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূতের পরিমাণ হ্রাস করিতেছে; অপরপক্ষে গ্রাম হইতে শহরে আগমন বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গ্রামীণ জনগণের ভোগব্যয়ের প্রকৃতি পরিবর্তিত হওয়ার ফলে বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। নীচ ফলাফল নির্ভর করিবে উভয় শক্তির আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর। তৃতীয়ত, শুধুমাত্র কৃষি-উন্নয়ন এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সরাসরি রাস্তাঘাট, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, গৃহনির্মাণ, বাঁধনির্মাণ প্রভৃতি করা হইলেও গ্রামীণ শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করাও ইহার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। সর্বতোভাবে এক সমৃদ্ধ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সৃষ্টি করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। চতুর্থত, সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণের প্রধান অবদান মনস্তাত্ত্বিক—অর্থনৈতিক নয়। এই পরিকল্পনায় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি অপেক্ষা সরকারী কর্মচারী এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

ভারতের গ্রাম অল্পমত দেশে যেখানে মূলধনের অভাব এবং শ্রমিকের প্রাচুর্য রহিয়াছে

সেখানে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শুধুমাত্র মূলধন গঠনই আমাদের লক্ষ্য নয়, এরূপভাবে মূলধন গঠন করিতে হইবে যাহাতে সর্বাধিক জনসংখ্যার লাভজনক নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায়। রাস্তাঘাট নির্মাণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি, হাসপাতাল, স্কুল প্রভৃতি নির্মাণ এবং ছোট ছোট শিল্পের পুনর্গঠন করিয়া সমাজোন্নয়ন কর্মসূচী বৃহত্তর জনসংখ্যার লাভজনক নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে। অবশ্য প্রথম পাঁচ বৎসরের কাজের ফলাফল আশানুরূপ না হওয়ায় পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ পরিবর্তিত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল্যায়ন (Appraisal of the Progress of Community Development Programme) : ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করা হয়। প্রথমে ২৭,৩৩৮টি গ্রাম সমন্বিত ৫৫টি ব্লক এবং এককোটি ৬৭ লক্ষ লোক লইয়া ইহার কাজ আরম্ভ হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে ১,৪০,০০০ গ্রাম, ২২৮টি উন্নয়ন ব্লক এবং ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক ইহার আওতায় আসে। ১৯৬১ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সারা ভারতের গ্রামাঞ্চলকে জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার অধীনে আনিবার লক্ষ্য গৃহীত হয়। ইহার মধ্যে অন্তত ৪০ শতাংশ হইবে সমাজোন্নয়ন ব্লক। কিন্তু ১৯৫৮ সালে স্থির করা হয় যে, সমাজোন্নয়ন প্রকল্প এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মধ্যে যে পার্থক্য তাহা তুলিয়া দিতে হইবে এবং সমাজোন্নয়নের শেষ কাজ ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে আরম্ভ করা হইবে।

জাতীয় সম্প্রসারণ এবং সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজের মূল্যায়ন করিবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন একটি কর্মসূচী মূল্যায়ন সংগঠন (Programme Evaluation Organization) প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন এতাবৎকাল ১২টি বার্ষিক রিপোর্ট দাখিল করিয়াছে। আমরা ইহার চতুর্থ এবং পঞ্চম রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার সাফল্য বিচার করিব।

কর্মসূচী মূল্যায়ন সংগঠনের চতুর্থ বার্ষিক রিপোর্টে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কতকগুলি দোষত্রুটির উল্লেখ করা হয়। অধিকাংশ গ্রামে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ আশানুরূপ হয় নাই। উন্নত কৃষিপদ্ধতি ব্যাপক ভাবে গৃহীত হইলেও জলসেচ, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, ভূমি সংরক্ষণ এবং খণ্ড জোতের একত্রিকরণ প্রভৃতি কৃষি-উৎপাদনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কুটির-শিল্প, স্কুল, সমবায় এবং পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে অগ্রগতি নৈরাশ্রজনক। গ্রামীণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পসমূহে সরকারী সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা সমাজোন্নয়নের মূল আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে আত্মনির্ভরতার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল ক্রটি হইল সুবিধা-বন্টনের ব্যাপক তারতম্য। ব্লকের অন্তর্ভুক্ত গ্রামগুলির মধ্যে শহরের নিকটস্থ গ্রাম এবং

দূরবর্তী গ্রামের মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়াছে। গ্রামের মধ্যেও আবার কৃষিজীবী এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আবার কৃষকদের মধ্যেও ক্ষুদ্র চাষী অপেক্ষা বড় বড় জোতদারগণই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বারা বিশেষ লাভবান হইয়াছে। সমাজোন্নয়নের ফলাফল সুবিচার এবং সামাজিক বিচারবোধকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে।

কর্মসূচী মূল্যায়ন সংগঠনের পঞ্চম বার্ষিক রিপোর্টে (১৯৫৮ সাল) নির্দিষ্ট পঞ্চায়েতগুলির অর্থসংক্রান্ত অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, উন্নয়নমূলক কার্যের জ্ঞান পঞ্চায়েতের সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ অতি অল্প। সমবায়ের আর্থিক অবস্থাও সন্তোষজনক নয়। সমবায় ঋণদানের ক্ষেত্রে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্যবন্টন ব্যাপারে পঞ্চায়েত এবং সমবায়ের উপর নির্ভর করা মোটেই উচিত হইবে না।

এই দুইটি রিপোর্ট হইতে আমরা সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার দুইটি বৈশিষ্ট্য নিতুলভাবে দেখিতে পাই। প্রথমত, গ্রামীণ জনগণের মধ্যে উচ্চ জীবন যাত্রার মানের আকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান, এমন কি জাতীয় সম্প্রসারণ সেবাও দ্বি-পাক্ষিক সংযোগ (two-way communication) স্থাপনে ব্যর্থ হইয়াছে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করিয়াছে। কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতির কিছু উন্নতি হইলেও জনগণের মধ্যে উদ্যোগ এবং আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করিতে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়াছে। এই পরিকল্পনার প্রধান ত্রুটি হইল যে, ইহা ধনীকে অধিকতর ধনী করিয়াছে। দরিদ্র জনসাধারণ পরোক্ষভাবে কিছু সুবিধালাভ করিয়াছে মাত্র। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে সমতার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে সমাজোন্নয়নের ফলাফল তাহার পরিপন্থী।

বলবন্তী মেহতা কমিটির সুপারিশ (Balwantraai Mehta Committee's Recommendations) : সমাজোন্নয়ন এবং জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনার কার্যসূচীকে অধিকতর দক্ষ এবং সুসংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে পরিকল্পনাকমিশন শ্রীবলবন্তী মেহতার সভাপতিত্বে একটি অনুশীলনকারী দল (Study Team) গঠন করিতে নির্দেশ দেন। এই কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ :

[এক] জিলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কাজের দায়িত্ব লইবার জন্য পঞ্চায়েৎ সমিতি গঠন করিতে হইবে। পঞ্চায়েৎ সমিতি গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণের প্রাণিস্বরূপ। গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলি পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পঞ্চায়েৎ সমিতি গঠন করিবে আর পঞ্চায়েৎ সমিতি এবং উন্নয়ন ব্লক পাশাপাশি থাকিবে। এই কমিটি তিন পর্যায়ে কার্যক্রমের সুপারিশ করেন—গ্রাম

সুপারিশ-
সমূহ

পর্ষায়ে গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ব্লক পর্ষায়ে পঞ্চায়েত সমিতি এবং জিলা পর্ষায়ে জিলা পরিষদ। একই সঙ্গে সমগ্র জিলায় এই তিন পর্ষায়ের কাজ আরম্ভ হইবে। এই ভাবে পঞ্চায়েতি রাজের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন সার্থক করা সম্ভবপর হইবে।

[দুই] গ্রামসেবক গ্রাম পঞ্চায়েত অথবা পঞ্চায়েৎ সমিতির সম্পাদকরূপে কাজ করিবেন। তাঁহার এলাকায় সাধারণত ৪০০০-এর অধিক ব্যক্তি থাকিবে না।

[তিন] স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বহুমুখীন সমবায় সমিতি খুলিতে হইবে। সমবায় কর্মীদের এরূপভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হইবে যাহাতে তাহারা ঋণ প্রদানের পরিবর্তে সমাজোন্নয়নকেই মুখ্য অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে।

[চার] এই কমিটির মতে এতাবৎ সমাজোন্নয়নের সকল দিক কল্যাণমূলক কাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া অর্থনৈতিক দিকটির প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিও সমান দৃষ্টি দিয়া পানীয় জল সরবরাহ, সমবায় চাষ, কুটির শিল্প এবং স্বাস্থ্যের উন্নয়নমূলক কাজে হাত দিতে হইবে।

[পাঁচ] কমিটি যখন তাহার কাজ শুরু করে তখন ভারতের অর্ধেক এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং আশা করা হইয়াছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে সমগ্র দেশ এই পরিকল্পনার আওতায় আসিবে। কিন্তু কমিটি মনে করেন যে, অর্থের স্বল্পতা, এবং কারিগরী জ্ঞান ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির অভাবের জন্ত এই লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হইতে আরও তিন বৎসর সময় লাগিবে। কমিটি তিন পর্ষায়ের কার্যসূচীর পরিবর্তে ছয় বৎসর ব্যাপী একটানা কার্যসূচী গ্রহণের সুপারিশ করেন।

[ছয়] ব্যয়সঙ্কোচ, দক্ষতাবৃদ্ধি এবং দ্রুত কর্ম সম্পাদনের জন্ত যে সমস্ত পরিকল্পনা রাজ্যসরকার পরীক্ষা করিয়া অনুমোদন করিবে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখার প্রয়োজন নাই।

এই কমিটির গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ নীতিকে এক অবাস্তব স্বপ্ন বলিয়া তীব্রভাবে সমালোচনা করা হইয়াছে। যে পঞ্চায়েৎ সমিতির উপর এত জোর দেওয়া হইয়াছে তাহা যে দলীয় রাজনীতির লীলাক্ষেত্রে পরিণত হইবে না তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। মনে রাখা দরকার যে, গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ কোন যাহুমন্ত্রবলে রাতারাতি দেশের উন্নতি করিতে পারিবে না। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন কারণ গণতন্ত্র মানুষকে কাজে উৎসাহ দিতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র উৎসাহই উন্নয়নের সকল বাধা অপসারণ করিতে পারে না। উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে সফল করিতে হইলে ইহার সহিত প্রয়োজন বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুসম্বন্ধ নীতির অনুসরণ করা।

পরিবর্তিত সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা (Revised Community Development Plan) : মেহ্তা কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৮ সালের এপ্রিল মাসে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবর্তিত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরিবর্তিত পরিকল্পনার প্রধান প্রধান নীতিগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

[এক] বর্তমানের তিন পর্যায় কার্যসূচীর পরিবর্তে দুই পর্যায়ের কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রতি পর্যায়ে পাঁচ বৎসর করিয়া কাজ চলিবে। প্রথম পর্যায়ে প্রত্যেক ব্লক ১২ লক্ষ টাকা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫ লক্ষ টাকা পাইবে।

[দুই] সকল গ্রামসেবকগণ একই স্থান হইতে প্রশিক্ষণ পাইবে। ইহা তাহাদের মধ্যে একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করিবে।

[তিন] ব্লক উন্নয়ন কার্যসূচীতে বিকেন্দ্রীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে এবং মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের দায়িত্বসম্পন্ন তিনটি সংস্থার উন্নয়ন কার্য পরিচালিত হইবে। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি হিসাবে গ্রামপঞ্চায়েৎকে অধিকতর শক্তিশালী করিতে হইবে।

[চার] সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কর্মসূচীর পরিবর্তনের ফলে সমগ্র দেশকে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় না আনিয়া স্থির করা হয় যে ১০৭৫টি সমাজোন্নয়ন ব্লকের কাজ তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গ্রহণ করা হইবে। ইহাতে উন্নয়নকার্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে চলিবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা হইতে সর্বাধিক সুফল পাইতে হইলে কতকগুলি বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, গ্রামে কোন সাধারণ প্রয়োজন দেখা দিলে স্থানীয় জনসাধারণ উহা আলোচনা করিয়া উপযুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণ করিবেন। দ্বিতীয়ত, বিচ্ছিন্ন, পরস্পর অসম্বন্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া স্থানীয় উন্নয়নের জ্ঞাত সুসম্বন্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে হইবে। তৃতীয়ত, অব্যবহৃত জনশক্তিকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগাইতে হইবে এবং আত্মনির্ভরশীলতার নীতিকে সফল করিবার জ্ঞাত সর্বাধিক চেষ্টা করিতে হইবে। চতুর্থত, স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে অনুপ্রেরণা সঞ্চারিত করিয়া দিতে হইবে এবং সমাজোন্নয়ন কার্যসূচী সম্প্রসারণের জ্ঞাত উহাদের মনে আকাজক্ষা এবং সংকল্পের সৃষ্টি করিতে হইবে।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার চূড়ান্ত পর্যালোচনা (Final Observation of Community Development) : সম্প্রতি ভারত সরকারের অনুরোধে আন্তর্জাতিক কারিগরী সাহায্য প্রশাসন বিভাগ (United Nations Technical Assistance Administration) সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ফলাফল বিচার করিবার উদ্দেশ্যে একটি অনুসন্ধানকারী মিশন পাঠান। মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে যখন সমাজোন্নয়ন কার্যসূচীর পরিবর্তন এবং সম্প্রসারণ হইতেছিল তখন এই মিশন অনুসন্ধান কার্য শুরু করে। মেহতা কমিটির সুপারিশ অনুসারে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যসূচী দুই বৎসর বিলম্বিত হওয়ায় এই মিশন সন্তোষ প্রকাশ করিলেও ইহা মনে করেন যে সমাজোন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে চলিতেছে। দ্রুত সম্প্রসারণ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া মিশন বলেন যে সম্প্রসারণের হার অবাস্তব এবং অতি দ্রুত হইলে নূতন নূতন অসুবিধা হইবে এবং সাফল্য সম্পর্কে এক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিবে।

এই মিশন বর্তমান অনুদান-নীতির (grants-in-aid) সমালোচনা করেন এবং সুপারিশ করেন যে কার্যসূচীর মোট ব্যয় এবং সম্ভাব্য আয়ের কথা চিন্তা করিয়া রাজ্য সরকারসমূহ অনুদান মঞ্জুর করিবেন।

মিশন লক্ষ্য করেন যে এতাবৎকাল পর্যন্ত সমাজোন্নয়ন কর্মসূচীতে যোগাযোগ এবং অগ্রাধিকার গ্রামীণ সুবিধার প্রতি যে পরিমাণ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে কৃষি উন্নয়নে তাহা দেওয়া হয় নাই। মিশন এই মত পোষণ করেন যে আগামী কয়েক বৎসর সরকার খাজানা-পাদনের প্রতিই তাহার সমস্ত প্রচেষ্টা সংহত করিবে এবং এই উদ্দেশ্যে গ্রামসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে।

মিশন দেখেন যে কতকগুলি কারণের জন্ত বর্তমান যোগাযোগের পথগুলি অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের লোকের অভাব-অভিযোগ শুনিবার মত ধৈর্য এবং ক্ষমতা উচ্চস্তরের অফিসারদের থাকিলেও নিম্নপর্ষায়ের অফিসারদের ছিল না। খুব কম অফিসারই গ্রামের লোকের আশা-আকাজ্জার খবর রাখিত। মিশন মনে করেন যে গ্রামসমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে উচ্চ পর্ষায় হইতে নিম্ন পর্ষায়ে এবং নিম্ন পর্ষায় হইতে উচ্চ পর্ষায়ে ধ্যান-ধারণার গতি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন।

১৯৫২ সালে যে ১৮টি ব্লকে অনুসন্ধান কার্য চালানো হয় তাহার মধ্যে ১৩টি ব্লকের লোকেরা সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনাকে গ্রামকল্যাণের সরকারী পরিকল্পনা বলিয়া মনে করে। ইহাদের মধ্যে দুইটি ব্লক এই পরিকল্পনার কোন উপযোগিতা স্বীকার করে না। অপর সকল ব্লকের লোকেরা এই পরিকল্পনার অনুকূলে মত প্রকাশ করে। সাধারণ জন-কল্যাণমূলক কাজে গ্রামবাসীদের উৎসাহের অভাবও দেখা গিয়াছে। সপ্তম মূল্যায়ণ রিপোর্ট (১৯৬০) মন্তব্য করিয়াছেন যে, পর্যালোচনা করিলে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে সমাজোন্নয়ন অসম্পূর্ণ প্রয়াস, জনকেন্দ্রিক না হইয়া সরকার-কেন্দ্রিক এবং সাফল্য অপেক্ষা আশাই ইহার অস্তিত্ব বহন করিতেছে।

সংক্ষেপে, একই সঙ্গে বহুসংখ্যক দীর্ঘকালীন অস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ এবং অপ্রয়োজনীয় প্রাত্যহিক খুঁটিনাটির উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ—এইগুলিই হইল সমাজোন্নয়ন ক্ষেত্রে সরকারী প্রয়াসের ত্রুটি। সাম্প্রতিককালে কৃষির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে কিন্তু সরকারী নীতি এবং কাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠতার সমন্বয় না ঘটিলে কাম্য ফললাভ করা যাইবে না।

যে সকল অঞ্চলে পঞ্চায়েতি রাজ প্রবর্তিত হইয়াছে তাহাদের সাম্প্রতিক রিপোর্ট হইতে উন্নতির লক্ষণ দেখা যাইতেছে। ১৯৫২ সালে প্রথম রাজস্থানে পঞ্চায়েতিরাজ প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে ইহা সকল রাজ্যেই প্রসারিত হইয়াছে। সকল রাজ্যে পঞ্চায়েতিরাজ প্রসারিত হওয়ায় আশা করা যায় জনসাধারণ সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার প্রতি অধিকতর উৎসাহ দেখাইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষি ও পরিবার

পরিকল্পনার দ্বারা জাতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচীর জন্ত আরও কার্যকরী ভাবে সমাজোন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতিরাজের প্রসার করা হইবে।

সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প (Irrigation and Power Projects) : ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে সেচ ও বিদ্যুৎ প্রকল্প বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ৫ কোটি ১৫ লক্ষ একর অর্থাৎ মোট কর্ষণযোগ্য জমির ১৭.৫ শতাংশ জমিতে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় ৮৫ লক্ষ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিবার লক্ষ্য গৃহীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে মাত্র ৪০ লক্ষ একর জমিকে সেচ ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অতিরিক্ত এক কোটি ২০ লক্ষ একর জমি সেচব্যবস্থার আওতায় আনিবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাত্র এক কোটি ১৫ লক্ষ একর জমি জল সেচের সুবিধা পায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ২ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমিকে জলসেচের আওতায় আনিবার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইলেও ১৯৬৫-৬৬ সালে মাত্র এক কোটি ৮১ লক্ষ একর জমি জলসেচের সুবিধা পায়। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে বৃহৎ এবং মাঝারি সেচ প্রকল্পগুলি হইতে অতিরিক্ত ২০ লক্ষ একর জমি জলসেচের সুবিধা পাইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। ইহার ফলে বৃহৎ এবং মাঝারি আকারের প্রকল্পগুলি হইতে মোট ৫ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমি জলসেচের সুবিধা পাইতেছে। প্রথম পরিকল্পনার পর ৩ কোটি ১০ লক্ষ একর জমি সেচের সুবিধা পাইয়াছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি মোটামুটি সন্তোষজনক। ১৯৫০-৫১ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট, ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৫৮ লক্ষ কিলোওয়াট হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এক কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হইলেও প্রকৃত উৎপাদন হইল এক কোটি ২ লক্ষ কিলোওয়াট। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ২ কোটি কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদিত হইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে সেচ ব্যবস্থা (Irrigation Projects in the Five Year Plans) : পাঁচটি বৃহৎ সেচ এবং বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রথম পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল : (১) ৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে চম্বল পরিকল্পনা (২) ৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে বিহারে কোশী পরিকল্পনা, (৩) ৪৫ কোটি টাকা ব্যয়ে উত্তর প্রদেশে রিহান্দ পরিকল্পনা ; (৪) ৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মহারাষ্ট্রে কয়না পরিকল্পনা এবং (৫) ২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে অন্ধ্র প্রদেশে কৃষ্ণা পরিকল্পনা। এই পাঁচটি পরিকল্পনাখাতে মোট ২১০ কোটি টাকা মোট ব্যয় হইবে বলিয়া হিসাব করা হয় এবং প্রথম পরিকল্পনা-কালে এই খাতে ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎখাতে মোট ২৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ; ইহার মধ্যে সেচ প্রকল্পের জন্ত ৬২০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়। অবশ্য

পরে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭২০ কোটি হয়। অবশ্য পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই ৮০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় জলসেচ খাতে ৩৮০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল এবং অবশিষ্ট বরাদ্দ রূত অর্থ দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সেচ ও বিদ্যুৎখাতে ৩৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ঐ খাতে মোট ব্যয় হয় ৪৩৬ কোটি টাকা আর অবশিষ্ট ২১৪ কোটি টাকা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ১০৫টি মাঝারি পরিকল্পনার জন্ম ব্যয়বরাদ্দ হইয়াছিল ৩৭০ কোটি টাকা। এই সকল পরিকল্পনাগুলি এক কোটি ২০ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ করিবে। বৃহৎ সেচ পরিকল্পনার জন্মও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় সুতরাং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৃহৎ এবং মাঝারি সেচ পরিকল্পনা বাদে ৩৭৫ কোটি টাকা মোট ব্যয় হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৃহৎ এবং মাঝারি জলসেচ পরিকল্পনার জন্ম ৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় সেচ প্রকল্পের জন্ম ৮৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

প্রতিটি সেচ প্রকল্পকে সফল করিবার জন্ম একটি করিয়া অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি প্রকল্পটির কার্যাবলী পর্যালোচনা করিবে এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় অগ্রাধিকারের নির্দেশ দিবে।

প্রথম পরিকল্পনায় এইরূপ তথ্যানুসন্ধানের অভাব ছিল বলিয়া সেচ প্রকল্পগুলি আশানুরূপ সাফল্য লাভ করে নাই। ইহা সুত্বের বিষয় যে সম্প্রতি সকল রাজ্যে এই ধরনের অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হইয়াছে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প (Power Projects in the Five Year Plans) : পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াটের মত জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব। প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি ব্যবহৃত হইত। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা ; ইহার মধ্যে সরকারী উত্থোগের ক্ষেত্রে ১১ লক্ষ কিলোওয়াট এবং বেসরকারী উত্থোগের ক্ষেত্রে ২ লক্ষ কিলোওয়াট উৎপাদিত হইবে। ইহার মধ্যে সরকারী উত্থোগে ৮ লক্ষ কিলোওয়াট এবং বেসরকারী উত্থোগে ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ প্রথম পরিকল্পনাকালে উৎপাদিত হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময় স্থির করা হইয়াছিল যে বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা এরূপভাবে করা হইবে যাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ৭০ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হইতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি

করিয়া এক কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট করা হয়। এই সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইতে হইলে বাৎসরিক শতকরা ২০ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৪ লক্ষ কিলোওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎশক্তির চাহিদা দেখা দিবে। ইহা ব্যতীত শিল্পোন্নয়নের নূতন কর্মসূচীর জন্ত অতিরিক্ত ১৩ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োজন হইবে। সামগ্রিকভাবে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ৩৫ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। পরে বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচী এরূপভাবে বৃদ্ধি করা হয় যে ১৯৬১ সালের মার্চের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া ৬৯ লক্ষ কিলোওয়াট করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি আমদানি করিবার মত প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের দরুন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ বিশেষ ব্যাহত হয়। সেইজন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রকৃত উৎপাদন ৫৮ লক্ষ কিলোওয়াট হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫৮ লক্ষ কিলোওয়াট হইতে বৃদ্ধি পাইয়া এক কোটি ২৭ লক্ষ কিলোওয়াট হইবে বলিয়া স্থির করা হয়। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হয় অনেক কম— এক কোটি ২ লক্ষ কিলোওয়াট মাত্র। চতুর্থ পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দুই কোটি কিলোওয়াট করা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ-উৎপাদন কার্যসূচীর জন্ত মোট ৪২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহার মধ্যে প্রথম পরিকল্পনায় নির্ধারিত কাজগুলির জন্ত ১৬০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। যে সমস্ত বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র হইতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যাইবে তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ করিতে ২৪৫ কোটি টাকা লাগিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরম্ভ হইলেও যাহাদের ফল তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পাওয়া যাইবে এরূপ প্রকল্পগুলির জন্ত প্রয়োজন হইবে ২২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জন্ত ৩২০ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্ত প্রায় ৪৪৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচীর জন্ত ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১০১২ কোটি টাকা। চতুর্থ পরিকল্পনায় সরকারী উত্তোগে বিদ্যুৎ উন্নয়নের জন্ত ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মূল এবং ভারী শিল্পের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় চতুর্থ পরিকল্পনাকালে শিল্পে বিদ্যুতের ব্যবহার বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে।

লেনিন একদা বলিয়াছিলেন যে শিল্পের উন্নতি নির্ভর করে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উপর। সোবিয়ত রাশিয়ায় প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়ন অপেক্ষা বিদ্যুৎ-উৎপাদনের হার অধিক হওয়ায় তৃতীয় পরিকল্পনার শিল্পোন্নতি দ্বরাধিত হইয়াছিল। ইহা সম্ভাব্যের কথা যে ভারতেও শিল্পোন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা

শিল্পোন্নয়ন
ও বিদ্যুৎ

হইয়াছে। প্রসঙ্গত মনে রাখা প্রয়োজন যে বিদ্যুৎ-উৎপাদন শুধুমাত্র ভারী এবং সংগঠিত শিল্পের জন্তই অপরিহার্য নয়। ইহা হাঙ্গা এবং ক্ষুদ্র শিল্প বিকাশের জন্তও অপরিহার্য।

বহুমুখীন পরিকল্পনা (Multi-purpose Projects) : বহুমুখীন পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল নদী উপত্যকা অঞ্চলের সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধার পরিপূর্ণ ব্যবহার করা। বহুমুখীন পরিকল্পনা-সমূহ হইতে নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়া যায় :

(ক) বহা নিয়ন্ত্রণের ফলে অধিক নিরাপদভাবে সংলগ্ন জমিখণ্ডগুলি ব্যবহার করা যায়।

(খ) সেচ-সম্প্রসারণের জন্ত জমির দাম বাড়ে এবং অধিকতর প্রগাঢ়ভাবে চাষ করা সম্ভবপর হয়। অর্থনৈতিক কার্যবলী বৃদ্ধি পাওয়ায় আয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দরুন নিকটবর্তী অঞ্চলের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।

(গ) জলপথের অধিকতর ব্যবহারের ফলে ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হয় এবং কৃষিজ দ্রব্য অধিকতর লাভজনক স্থানে ব্যবহার করা যায়।

(ঘ) জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হইতে স্বল্প ব্যয়ে স্থানীয় শিল্পগুলির জন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে। ফলে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের যে ব্যয় সঙ্কোচ হইবে তাহা অন্যত্র উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগ করা যাইবে ও অর্থনৈতিক কার্যবলীর সম্প্রসারণ ঘটবে।

(ঙ) গাছপালা প্রয়োজনে এবং শিল্পের জন্ত যে জল সরবরাহ প্রয়োজন তাহা এই পরিকল্পনাগুলি হইতে পাওয়া যাইবে।

(চ) নদী-পরিকল্পনাগুলি মৎস্য চাষের বিশেষ অনুকূল এবং জল পথে ভ্রমণের সুবিধা করিয়া দেয়।

সংক্ষেপে বলা যায়, যে বহুমুখীন পরিকল্পনাগুলি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় উন্নয়নের পরিপোষক। ইহারা একই সঙ্গে কৃষি, শিল্প এবং পরিবহনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটায়, নিকটবর্তী অঞ্চলে বিনিয়োগে উৎসাহ দেয় এবং নানা ধরনের অর্থনৈতিক কার্যবলীর সৃষ্টি করে। বহুমুখীন পরিকল্পনাগুলি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি করে এবং জাতির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ সম্প্রসারিত করে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখীন পরিকল্পনা (Important Multi-Purpose Projects) : এক্ষেপে আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বহুমুখীন পরিকল্পনার আলোচনা করিব।

[এক] দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Projects) : দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা বিহার, পশ্চিমবঙ্গের বরাকর এবং দামোদর নদী উপত্যকা অঞ্চলের একত্র উন্নয়নের জন্ত বহুমুখীন পরিকল্পনা। দামোদর বাংলা ও বিহারের নদী। এই নদীর উপর বাঁধ বাঁধিয়া সেচ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বহা নিয়ন্ত্রণ এবং সারা বৎসর নৌচালাচলের উপযোগী করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি

হইল : (১) তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেং পাহাড়ে চারিটি জলধার বাঁধ এবং ইহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা ; (২) বোকারোতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও ২২৫,০০০ কিলোওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন করা। (৩) ৮০০ মাইল দীর্ঘ বিদ্যুৎ পরিবাহক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা এবং (৪) দুর্গাপুরে ১৫৫০ মাইল দীর্ঘ সেচখালের সহিত একটি বাঁধ এবং ৮৫ মাইল দীর্ঘ একটি নাব্যখাল খনন করা। এই খালটি কলিকাতা হইতে ৩৫ মাইল দূরে গঙ্গার সহিত মিলিত হইবে। আমেরিকার টেনেসি উপত্যকা পরিকল্পনার (T. V. A.) অনুকরণে ১৯৪৮ সালে ৭ই জুলাই দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন গঠিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে দামোদর পরিকল্পনাখাতে ১৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ১০ কোটি টাকা দামোদর পরিকল্পনার জন্ত ব্যয় করা হয়। দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনার অগ্রগতি নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল :

১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিলাইয়া বাঁধ এবং বিদ্যুৎকেন্দ্র সম্পূর্ণ হয়। ঐ সময় বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রও কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কোনার বাঁধ সম্পূর্ণ হয়। ইহা বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বোকারোর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে শীতল জল সরবরাহ করিবে। ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ১৬ কোটি ৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাইথন বাঁধ ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে পাঞ্চেং বাঁধের কাজ আরম্ভ হয় এবং উহা ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৭ কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫২ সাল হইতেই পাঞ্চেং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হয় ; ১৯৬০ সালের নভেম্বর মাসে দুর্গাপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বোকারোর চতুর্থ ইউনিটটি কাজ আরম্ভ করে। ১৯৫৫ সালের মধ্যভাগে দুর্গাপুর বাঁধের কাজ শেষ হয়। নৌচালনোপযোগী করিবার কাজও বেশ সন্তোষজনক। প্রধান খালের ১৩৭ কিলো-মিটার পর্যন্ত নৌচালনোপযোগী হইয়াছে।

[তুই] হিরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা (Hirakud Dam Project) : উড়িষ্যার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত ১৯৫৭ সালে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে হিরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে প্রধান বাঁধ নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ইহা পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম মাটির বাঁধ। ইহার জলাধার এখনো পর্যন্ত ভারতের বৃহত্তম জলাধার। এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায় ১৯৬৪ সালের মার্চমাসে সম্পূর্ণ হয় এবং দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয় ১৯৬৫ সালের শেষে। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত মোট ব্যয় হইয়াছিল ৮০ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা। হিরাকুদ বাঁধ কটক এবং পুরীজেলার ৮০০০ বর্গমাইল এলাকায় বন্যানিয়ন্ত্রণ, ১৯৬৫ সালের শেষ পর্যন্ত ইহা ২ লক্ষ ৭০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং সম্বলপুর ও বোলানগীর অঞ্চলের ৩ লক্ষ ৮০ হাজার একর জমিতে জলসেচের প্রসার করিবে।

[তিন] ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা (Bhakra Nangal Project) :

পাঞ্জাব ও রাজস্থানের উন্নয়নের জন্ত এই পরিকল্পনার সৃষ্টি। শতদ্রু নদীর উপর ভাকরা বাঁধ, ৮ মাইল দূরে নাঙ্গাল বাঁধ, নাঙ্গাল হাইডেল খাল, নাঙ্গাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ভাকরা খাল এবং কোটলা ও গান্ধুওয়ালে দুইটি বিদ্যুৎকেন্দ্র লইয়া ভাকরা-নাঙ্গাল পরিকল্পনা।

এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হয় ১৯৪৬ সালে এবং ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে নাঙ্গাল বাঁধ এবং হাইডেল খালের কাজ সম্পূর্ণ হয়। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে নাঙ্গাল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ শেষ হওয়ায় এই পরিকল্পনা হইতে ৪৮,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। পরে ১৯৫৬ সালের জুলাইমাসে কোটলা এবং গান্ধুওয়াল বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের কাজ সম্পূর্ণ হইলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করা হয়। এই পরিকল্পনা বাবদ মোট ব্যয় হয় ১৭৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ইহা হইতে ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জল সেচ হইবে এবং ৬০৪,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাইবে।

এই সকল বৃহদায়তন পরিকল্পনা ব্যতীত আরও কতকগুলি বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে : (ক) **বিহারের কোশী পরিকল্পনা**—এই পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় হয় ৬৪ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা এবং ইহা সম্পূর্ণ হইলে বিহারের ৫ লক্ষ ৬২ হাজার হেক্টর জমিতে জল সেচের সুবিধা হইবে। (খ) **অন্ধ্রের নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা**—প্রথম পরিকল্পনা কালে কৃষ্ণা নদীর উপর বাঁধ বাঁধার কাজ আরম্ভ হয়। বাঁধ এবং দুইটি খাল নির্মাণের কাজ ১৯৭০-৭১ সালে সম্পূর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। (গ) **মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানের চম্বল পরিকল্পনা**—কোটা বাঁধের কাজ ১৯৫২ সালে আরম্ভ হয় এবং উহা ১৯৬০ সালে সম্পূর্ণ হয়। ঐ সময়ে গান্ধী-সাগর বাঁধের কাজও সম্পূর্ণ হয় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হয়। সামগ্রিক ভাবে পরিকল্পনাটি ১৯৬৮ সালের শেষে সম্পূর্ণ হইবে, (ঘ) **উত্তর প্রদেশের রিহান্দ পরিকল্পনা**—১৯৫৫ সালে মার্কিন সহায়তায় এই পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। একটি বাঁধ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র লইয়া এই পরিকল্পনা গঠিত। ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়। এই বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সম্ভাব্য উৎপাদন ক্ষমতা ৩ লক্ষ কিলোওয়াট। ইহা হইতে ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক বিদ্যুতের সুবিধা পাইবে।

এই সকল পরিকল্পনাগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনা করিলে কতকগুলি ক্রটি-বিচ্যুতি দৃষ্ট হয়। প্রথমত, অধিকাংশ বহুমুখী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নানাবিধ

মূল্যায়ন

কার্যসূচীর মধ্যে সামগ্রিক ভাবে কোনরূপ সমন্বয় সাধন করা হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনার ক্রটি এবং পরিচালনার অব্যবস্থার ফলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ এবং যন্ত্রপাতির অপচয় হইয়াছে। তৃতীয়ত, অধিকাংশ পরিকল্পনার জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করার সময় কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় নাই। চতুর্থত, বেসরকারী কনট্রাক্টরগণ সরকারী প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া অত্যধিক মুনাফা অর্জন করিয়াছে। এই অবস্থা প্রতিরোধ করিবার জন্ত সরকার জাতীয় সংগঠন কর্পোরেশন

(National Construction Corporation) গঠন করিয়াছেন। পঞ্চমত, পরিকল্পনার কাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্থরগতিতে অগ্রসর হইয়াছে। বর্তমানে সরকার এই সকল ত্রুটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইয়াছেন এবং স্থানীয় অনুসন্ধান কমিটি গঠনের জুগু সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর সংকেত

(Questions and Answer-Hints)

1. What is Economic Planning ? Discuss its aims and objects.
[পৃষ্ঠা ৩৬-৪১]
2. Distinguish between Communist and Democratic Planning techniques. Which do you think is more applicable in the case of India ?
[পৃষ্ঠা ৩৬-৪১]
3. What are the main features of the planning technique for accelerating economic growth in a backward economy like India ?
[পৃষ্ঠা ৩৭-৪১]
4. Give a brief survey of the progress of the Indian economy during the First Five Year Plan. (C. U. B. A. '57) [পৃষ্ঠা ৪২-৪৮]
5. "The Indian Economy has made remarkable progress under the First Five Year Plan." Examine the statement, noting the progress of the First Five Year Plan. (C. U. B. Com. '56)
[পৃষ্ঠা ৪২-৪৮]
6. The First Five Year Plan has accorded the highest priority to agriculture. How far do you think this emphasis on agriculture is justified. (C. U. B. A. '53) [পৃষ্ঠা ৪২-৪৮]
7. Give an outline of the main features of the First Five Year Plan prepared by the Indian Planning Commission.
(C. U. B. A. '52) [পৃষ্ঠা ৪২-৪৮]
8. Analyse the main differences between the Indian First and Second Five Year Plans and explain why the Second Plan is facing difficulties which did not appear during the First Plan Period.
(C. U. B. Com '59) [পৃষ্ঠা ৬১-৬৩]

9. "Deficit finance in underdeveloped countries tends to be inflationary finance." Discuss the statement in the present Indian context. (C. U. B. A. '59) [পৃষ্ঠা ৪৬, ৫৪]

10. Discuss the main features of India's Second Five Year Plan. In what important respects does the Second Plan differ from the First Five Year Plan. (C. U. B. A. '58) [পৃষ্ঠা ৪২-৫০, ৬১-৬৩]

11. Examine the causes of the recent increase in unemployment of India. How far would the Second Plan help to solve the problem ? (C. U. B. Com. '57) [পৃষ্ঠা ৫৭-৫৯]

12. Examine the justification for the relatively greater emphasis placed in the Second Plan on small scale industries on the one hand and heavy basic industries on the other hand, than on the large scale consumer's goods industries. (C. U. B.A. 57) [পৃষ্ঠা ৫০-৫১, ৫৫-৫৬]

13. What are the main types of unemployment to be witnessed in India to-day ? What measures would you suggest for the solution of the unemployment problem in India ? (C. U. B. A. '56) [পৃষ্ঠা ৫৭-৬১]

14. Analyse the causes of growing unemployment in India. Suggest remedies for removing the same. (C. U. B. Com. '54) [পৃষ্ঠা ৫৭-৬১]

15. Give a brief estimate of the achievements of the Second Five Year plan in India. (C. U. B. Com. '62.) [পৃষ্ঠা ৫৪-৫৬]

16. Give a critical estimate of the progress of Industrialisation in India since the introduction of the First Five Year Plan. (C. U. B. A. '62). [পৃষ্ঠা ৪৫, ৫০, ৬২-৭০]

17. Discuss the main objectives of the Third Five Year Plan. In what respects do these objectives differ from those of the Second Plan ? (C. U. B. Com '63), [পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬]

18. "In its approach and objective the Third Plan is essentially a continuation of the Second Plan but there are some important distinguishing features." Explain and illustrate. (B. U. B.A. '64) [পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬]

19. Write a note on the methods adopted to finance India's Third Plan. (C. U. B. Com '65 ; B. U, B. A. '65) [পৃষ্ঠা ৭১-৭৩]
20. Indicate the main features and objectives of India's Third Plan. In what respects, if any, does the Third Plan differ from the two previous Plans. (C. U. B. A. '62) [পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬]
21. Describe briefly the aim and objectives of the Draft Fourth Five Year Plan of India. [পৃষ্ঠা ৭২-৮০]
22. Write a note on the size of the Fourth Five Year Plan.
(C. U. B. A '66) [পৃষ্ঠা ৭২-৮০]
23. Describe the main features of the Community Development Projects in India. (C. U. B. Com. '59) [পৃষ্ঠা ৮৭-৮৯]
24. Write a note on Community Development Projects.
(C. U. B. Com. '63) [পৃষ্ঠা ৮৬-৮৯]
25. Give a critical estimate of the progress of achievements of the Community Development Projects in India. (C. U. B. Com. '65)
[পৃষ্ঠা ৯১-৯২]
26. Comment on the measures that have been adopted in India during the Plan period for the development of agriculture.
(C. U. B. Com. '64) [পৃষ্ঠা ৪৪, ৫১, ৬৮-৬৯, ৮০-৮৪]
27. Describe briefly the power resources of India.
(C. U. B. Com. '62) [পৃষ্ঠা ৯৭-৯৯]

তৃতীয় খণ্ড

দশম অধ্যায়

ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ

(India's Natural Resources)

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন উহার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বিশেষ নির্ভরশীল। এই সম্ভাব্য সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হইবে। প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার দেশের শিল্পায়ণে সহায়তা করে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাজারের আয়তন সম্প্রসারিত হইলে প্রাকৃতিক সম্পদকে অধিকতর দক্ষতার সহিত শিল্পোন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয়। উন্নয়নের প্রথম

পর্ষায়ে হস্তচালিত শিল্প গড়িয়া উঠে, দ্বিতীয় পর্ষায়ে হাঙ্কা ধরনের ভোগ্যশিল্প এবং তৃতীয় পর্ষায়ে বৃহদায়তন ভারী-শিল্প গড়িয়া উঠে। ভারতে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ব্রিটিশ যুগে ইহার যথোচিত ব্যবহার হয় নাই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সর্বদাই প্রাকৃতিক সম্পদের পথ ধরিয়া অগ্রসর হয়। বর্তমানে পর পর কয়েকটি

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করায় ভারতে সুসমৃদ্ধ শিল্পায়ণের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরম্ভ হইলে কারিগরী জ্ঞানের বিনিময় ঘটিবে এবং উহার ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের নূতন সম্ভাবনা দেখা দিবে। ভারতে প্রভূত খনিজ সম্পদ রহিয়াছে। খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জগ্ন সুসমৃদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদের একটি বিশেষ স্থান রহিয়াছে। ইহা কেবলমাত্র ধাতু এবং বিভিন্ন জ্বালানি দ্রব্যই সরবরাহ করেনা, ইহা রাসায়নিক শিল্পে কাঁচামাল সরবরাহ করিয়া দেশের শিল্পায়ণে প্রভূত সাহায্য করে। ভারতের তৃতীয় পরিকল্পনায় খনিজ সম্পদ সংক্রান্তনীতি বিশেষ-গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে কারণ এই নীতির সফল রূপায়ন হইলে ভারীশিল্পে কাঁচামালের কোন অভাব হইবে না এবং ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে। “দূরপ্রাচ্য ও এশিয়ার খনিজ সম্পদের উন্নয়ন” নামক ECFAE রিপোর্টে দেখানো হইয়াছে কিভাবে খনিজ শিল্প দেশের উন্নয়নকে প্রভাবিত করে। প্রথমত, ইহা ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল যোগান দিয়া শিল্পায়ণ ত্বরান্বিত করে। দ্বিতীয়ত, ইহা নূতন নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণের সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত,

খনিজ শিল্পগুলি সৃষ্টি হওয়ায় যে সুবিধা পাওয়া যায় তাহা অল্প বাজার গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে এবং চতুর্থত, ইহা রপ্তানীযোগ্য উদ্ভূত সৃষ্টি করিয়া দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা আহরণে সহায়তা করে।

ভারতের খনিজ সম্পদ (India's Mineral Resources) : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্ত কয়লা, লৌহ আকরিক, ম্যাংগানিজ, অল, স্বর্ণ, ইলমেনাইট, বক্সাইট প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য পর্যাপ্ত পরিমাণে ভারতে পাওয়া যায়। অবশ্য গন্ধক, তাম্র, টিন, নিকেল, সীসা, দস্তা, পারদ, এবং পেট্রোলিয়ম দেশের প্রয়োজনের তুলনায় অগ্রচুর। জনসংখ্যার তুলনায় ভারতের প্রধান খনিজ সম্পদগুলির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়।

প্রথম পরিকল্পনাকালে ইণ্ডিয়ান বুরো অফ মাইন্স এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়ার উন্নয়নের জন্ত মোট ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। অবশ্য প্রকৃত ব্যয় অনেক কম হইয়াছিল, মাত্র ৬২ লক্ষ টাকা। বিশেষ আশার কথা যে প্রথম পরিকল্পনাকালে সিংভূম এবং রাজস্থানে দুইটি ইউরেনিয়াম খনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আনবিক শক্তির প্রধান উৎস হইল ইউরেনিয়াম।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন খনিজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল ইহা মনে রাখিয়া বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় খনিজ সম্পদ উন্নয়নের জন্ত বরাদ্দ ব্যয়ের খনিজ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনায় খনিউন্নয়ন খাতে ১ কোটি টাকা এবং ১৪৮ কোটি টাকা বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প খাতে বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় খনি উন্নয়ন খাতে ৭০ কোটি টাকা এবং বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের খাতে ৬১৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অর্থাৎ শিল্প ও খনি খাতে মোট ৬২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও মোট ব্যয় ২০০ কোটি টাকা হইয়াছিল। তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্প ও খনি খাতে মোট ১৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে শিল্পায়ণ অগ্রাধিকার লাভ করিয়াছে। ৬০ লক্ষ টন ইস্পাত সরবরাহ করিতে হইলে লৌহ আকরিক, কয়লা, চুণা পাথর, ডোলামাইট প্রভৃতি প্রয়োজনীয় ধাতুর উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এ্যালুমিনিয়াম শিল্পের উন্নয়নের জন্ত বক্সাইটের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। সিমেন্ট শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণের ফলে চুণা পাথর, জিপসাম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের চাহিদা বাড়িয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ব্যাপকভাবে খনিজ সম্পদ সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্য চালাইয়া যাওয়া হয়। কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত নূতন নূতন খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করা প্রয়োজন। লৌহ ও ইস্পাতের গ্রায় মূল শিল্পক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণের ফলে প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহার ফলে জিওলজিক্যাল সার্ভে এবং ব্যুরো অফ মাইন্সের অনুসন্ধান কাজ সম্প্রসারিত হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পায়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে খনিজ সম্পদ উত্তোলন এবং উন্নয়ন কর্মসূচী সম্প্রসারণ করার প্রয়োজন দেখা দিবে। খনিজ সম্পদ উন্নয়নকল্পে তৃতীয় পরিকল্পনাকালে সরকারী খাতে ৪৭৮ কোটি টাকা এবং বেসরকারী খাতে প্রায় ৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন তৈলখনি আবিষ্কারের জ্ঞান ব্যাপক অনুসন্ধান কার্য চালানো হয়। নূতন খনি অঞ্চল আবিষ্কার, তৈল উত্তোলন এবং তৈল শোধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের আগষ্ট মাসে তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন (Oil and Natural Gas Commission) স্থাপিত হয়। এই কমিশন দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তিনটি তৈলখনি অঞ্চল আবিষ্কার করে। প্রথমটি কাশ্মীরে, দ্বিতীয়টি আফগানিস্তান এবং তৃতীয়টি রুদ্রসাগর অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয়।

পেট্রোলিয়মের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া চলিয়াছে এবং তৃতীয় পরিকল্পনা কালে উহা ১ কোটি টন হয়। একমাত্র আসামের ডিগবয় অঞ্চল হইতে অতি সামান্য পরিমাণ পেট্রোলিয়ম পাওয়া যায় (৪ লক্ষ টন মাত্র)। প্রধানত, রপ্তানি করিয়াই তৈলের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটানো হয়। নাহারকাটিয়া এবং বারাউনি তৈল শোধনাগার দুইটির সম্প্রসারণ এবং কোয়েলি (গুজরাট) ও কোচিনে দুইটি নূতন শোধনাগার স্থাপিত হইলে দেশে তৈলের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করা যাইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে তৈল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশন তৈলের অনুসন্ধান কার্য আরও ব্যাপকভাবে চালাইয়া যাইবে। ইহা বাবদ ২২৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ১১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে তৈল অনুসন্ধান কার্যে ব্যয় হইয়াছিল ২৬ কোটি টাকা।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বার্ষিক অয়েল কোম্পানীর সহযোগিতায় অয়েল ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠিত হয়। এই কোম্পানী আসামের নাহারকাটিয়া তৈলখনি অঞ্চল হইতে তৈল উত্তোলন এবং ৭২০ মাইল দীর্ঘ, পাইপলাইন স্থাপন করিবে। তৈল পরিশোধনের উদ্দেশ্যে সরকারী উত্তোগে নুনমাটি ও বারাউনিতে দুইটি শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। তৈলের বিক্রয়ব্যবস্থা সরকারী সংস্থার মাধ্যমে হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। গোঁহাটির নিকটস্থ নুনমাটি শোধনাগারটি ১৯৬২ সালের জানুয়ারী মাসে সম্পূর্ণ হয় আর বারাউনির শোধনাগার সম্পূর্ণ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে। ১৯৬৩ সালে ভারতে প্রথম পাইপ লাইনটির কাজে আরম্ভ হয়। এই পাইপ লাইনটি নাহারকাটিয়ায় তৈল খনি অঞ্চলের সহিত বারাউনি শোধনাগারের সংযোগ স্থাপন করিতেছে। এই ৭৫০ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইনটি বসাইতে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

ভারতের বনসম্পদ এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (Forestry Resources and Five Year Plans) : বনভূমি দেশের একটি প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ।

ইহা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জাতীয় জীবনের উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। খনিজ সম্পদের পরিমাণ নির্দিষ্ট বলিয়া উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে কিন্তু মানুষ চেষ্টা করিলে বন সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারে। ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের তাগিদে যেমন বনভূমি ধ্বংস করা হইতেছে সেইরূপ উহা পূরণ করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় বন সৃষ্টি করাও আবশ্যক।

পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী ভারতে মোট বনভূমির পরিমাণ হইল ২ লক্ষ ৭৪ হাজার বর্গমাইল। ইহা দেশের মোট আয়তনের ২২ শতাংশ। ব্যক্তির মাথাপিছু বনভূমির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ হেক্টর মাত্র।

বনভূমি হইতে দুই ধরনের সুবিধা পাওয়া যায়—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। বনভূমির প্রত্যক্ষ সুবিধা সাধারণত তিন ধরনের : (ক) বনজ দ্রব্যসামগ্রী শিল্পে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নানা ধরনের কাঠ, কাষ্ঠমণ্ডের উপযোগী কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি বন

হইতে পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া চন্দন, রজন, বেত, গাঁদের আঠা, লাক্ষা, হরীতকি, ধুনা, মধু, চামড়া প্রভৃতি উপজাত দ্রব্যসমূহ বন হইতে পাওয়া যায়। (খ) অগভীর বনভূমি গো-মহিষাদির চারণক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং (গ) বনজ শিল্পে কাঠুরিয়া, পত্রগুন্ডা সংগ্রহকারী প্রভৃতি বহুলোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। ভারতে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার লোক বনভূমি সংক্রান্ত কাজকর্ম হইতে জীবিকা নির্বাহ করে।

বনভূমির পরোক্ষ সুবিধা প্রত্যক্ষ সুবিধা অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বনভূমি ছায়া বিস্তার করিয়া আবহাওয়ার চরমভাব রোধ করে। বাতাসের জলকণাকে আকর্ষণ করিয়া বনভূমি অধিক বৃষ্টিপাত ঘটায়। বৃক্ষলতার শিকড় মৃত্তিকার বন্ধন দৃঢ় করে বলিয়া বনভূমি মরুভূমির প্রসার বাহত করে, ভূমিক্ষয় রোধ করে এবং বন্যার বেগ প্রতিহত করে।

ভারতের মোট ভূমিভাগের মাত্র ২২ শতাংশ বনভূমি। বিশেষজ্ঞদিগের মতে দেশের উন্নয়নের জন্ত অন্ততঃপক্ষে মোট জমির ঠিক অংশ বনভূমি হওয়া প্রয়োজন। ১৮২৪ সালে তৎকালীন সরকার প্রথম বনসংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতি অনুসারে বনভূমিকে চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় এবং সরকারের একটি বনভূমি সংক্রান্ত দপ্তর স্থাপন করা হয়। ইহা ছাড়া একটি বনভূমি বিষয়ক বিজ্ঞালয় এবং বন সংক্রান্ত গবেষণাগার স্থাপন করা হয়। রাজস্ব আদায় এবং বন সংরক্ষণ এই দুইটি বিষয়কে ভিত্তি করিয়া সরকারের বন নীতি নির্ধারিত হইয়াছিল। স্বাধীনতালভের পর জাতীয় সরকার পুরাতন সংকীর্ণ ভূমিনীতি পরিত্যাগ করিয়া দেশের দীর্ঘকালীন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে এক অথগু বন নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই নূতন নীতিতে বন সংরক্ষণ এবং বন উন্নয়নের উপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

১৯৫২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যসরকারগুলির সহিত পরামর্শক্রমে ভারত সরকার যে জাতীয় বন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

- (ক) ভারতে বনভূমির আয়তন প্রয়োজনের তুলনায় কম বলিয়া উহা বৃদ্ধি করিয়া বন-নীতি মোট ভূমিভাগের এক-তৃতীয়াংশকে বনভূমিতে পরিণত করিতে হইবে।
- (খ) পার্বত্য এবং নদী উপত্যকা অঞ্চলে নতুন বনভূমি সৃষ্টি করিতে হইবে। পার্বত্য অঞ্চলে ৬০ শতাংশ এবং সমভূমি অঞ্চলে ২০ শতাংশ বনাঞ্চল থাকিবে।
- (গ) যুদ্ধের সময় যে সকল বন বিনষ্ট হইয়াছিল তাহাদের পুনর্গঠন করিতে হইবে। সমপরিমাণ নতুন বন সৃষ্টি না করিয়া পুরাতন বন ধ্বংস করা চলিবে না।
- (ঘ) কৃত্রিম অরণ্যবলয় সৃষ্টি করিয়া মরুভূমির প্রসার রোধ করিতে হইবে।
- (ঙ) বন্যপ্রাণীসমূহ সংরক্ষণ করিবার জন্ত সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে।
- (চ) বে-সরকারী বনভূমির পরিচালনা সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনিতে হইবে।

(ছ) বনজাত দ্রব্যাদি ব্যবহারের উপায় আবিষ্কার এবং বৃক্ষ রোপণ প্রণালীর উন্নয়নের জন্ত ব্যাপক গবেষণা চালাইতে হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় বনভূমি উন্নয়নের জন্ত ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। এই সময় ৭৬ হাজার একর উষ্ণ ভূমিকে বনভূমিতে পরিণত করা, বনভূমির ভিতর যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করা এবং বনসংক্রান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুসম্বদ্ধ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বনভূমির উন্নয়নের জন্ত ২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল মাত্র ১২ কোটি ৩ লক্ষ টাকা। এই পরিকল্পনাকালে ৪ লক্ষ একর নষ্ট বনভূমিকে পুনরুদ্ধার, ২ লক্ষ ৫০ হাজার একর জমিতে বনভূমির সৃষ্টি এবং প্রায় ৫ হাজার মাইল বনপথ নির্মাণ করা হইয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনায় বনভূমি উন্নয়নের জন্ত মোট ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। আমরা মনে করি যে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে একটি বনভূমি সংক্রান্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিশন ১৯৫২ সালে গৃহীত জাতীয় বন নীতি কমিশন গঠন কার্যকরী করার দায়িত্ব লইবে। জানা গিয়াছে যে পরিকল্পিত কার্যসূচী গ্রহণ না করিলে আগামী ১৫ বৎসরে কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে উহার যোগানে বিশেষ ঘাটতি দেখা দিবে।

একাদশ অধ্যায়

জাতীয় আয়

(National Income)

অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার অগ্রতম লক্ষ্য হইতেছে জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি সাধন করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা। জাতীয় আয়ের পরিমাণ জাতীয় অগ্রগতির মানদণ্ড। অল্পমত দেশের অনগ্রসরতার স্বরূপ তাহার জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা পড়ে। ভারতে পরিকল্পনা কমিশন বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি অগ্রতম উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে বিশেষ সময়ে জাতীয় আয়ের পরিমাপ এবং উহার উপাদানসমূহ জানিতে পারা যায়। কিন্তু জাতীয় আয়ের পরিমাণ অগুরুপ না হইয়া কেন এইরূপ হইল তাহা জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে জানা যায় না। জাতীয় আয়ের হিসাব এরূপভাবে করা উচিত যাহাতে উন্নয়নের গতি এবং অর্থনৈতিক কল্যাণের পরিবর্তিত হার সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়। ভারতের গ্রাম অল্পমত দেশে ইহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ কারণ ভারত জীবনযাত্রার মান এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন।

অধ্যাপক মার্শালের মতে দেশের শ্রমশক্তি ও মূলধন প্রাকৃতিক সম্পদে প্রযুক্ত হইয়া নির্দিষ্ট বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্য সমষ্টি এবং সেবামূলক কাজের সৃষ্টি করে তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টি হইল মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। মোট জাতীয় আয় হইতে অপচয় জনিত খরচ (depreciation) বাদ দিলে নীট আয় (Net National Income) পাওয়া যাইবে।

জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সাধারণত দুইটি পদ্ধতি আছে—উৎপাদন পদ্ধতি (Output Method) এবং আয় পদ্ধতি (Income Method)। দেশের অধিবাসীগণ নির্দিষ্ট বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবামূলক কাজ উৎপাদন করে চলতি বাজার মূল্যে তাহাদের অর্থমূল্যের সমষ্টি হইল জাতীয় উৎপাদন বা মোট জাতীয় আয়। মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যাইবে। এই পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ উৎপন্ন পদ্ধতি (Final Products Method) বলে। দ্বিতীয়ত, কোন নির্দিষ্ট সময়ে উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদান-সমূহ যাহা আয় করে তাহাদের সমষ্টির দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। ইহাকে আয় পদ্ধতি বা উপাদান পারিশ্রমিক সমষ্টি (Factor Payments Total) পদ্ধতি বলা হয়। কতকগুলি লোক দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকে যেমন ভূমি, শ্রম, মূলধন এবং সংগঠকের মালিকেরা। ইহার পাঁচ খাজনা, মজুরী, সুদ এবং

মুনাফ। আবার কতকগুলি লোক পেশাগত উপজীবিকার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে, যেমন উকিল, চিকিৎসক, অধ্যাপক প্রভৃতি। এই উভয় প্রকার আয়ের সমষ্টিই হইল জাতীয় আয়।

জাতীয় আয় পরিমাপের এই পদ্ধতিগুলি আমেরিকার National Bureau of Economic Research-এর আবিষ্কার। ভারতের গ্রায় অল্পমত দেশে ইহাদের প্রয়োগ করিতে হইলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব (Importance of National Income Analysis) : নিম্নলিখিত কারণগুলির জগ্ন সকল দেশেই জাতীয় আয় বিশ্লেষণের গুরুত্ব অপরিসীম।

(ক) জাতীয় আয় জাতীয় অগ্রগতির মানদণ্ড। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি হইতেছে কিনা, অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার কিরূপ অথবা উন্নয়ন কাম্য পথে চলিতেছে কিনা তাহা জানিতে হইলে জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ করিতে হইবে। পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে ভারতের জাতীয় আয় ১৯৫৬ সালে ১০,৮০০ কোটি টাকা, ১৯৬১ সালে ১৩,৪৮০ কোটি টাকা, ১৯৬৬ সালে ১১,২৬০ কোটি টাকা, ১৯৭১ সালে ২১,৬৮০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৬ সালে ২৭,২৭০ কোটি টাকা হইবে। জাতীয় আয়ের হিসাব হইতে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতির হার বুঝিতে পারা যায়।

(খ) দুইটি দেশের এবং একই দেশের বিভিন্ন সময়ে অর্থনৈতিক অবস্থার হিসাব উহাদের জাতীয় আয় (এবং মাথাপিছু আয়) হইতে জানা যায়। ১৯৬০ সালে ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৩৩১ টাকা, অপর পক্ষে ঐ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৯৭৩০ টাকা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারত কত অনগ্রসর তাহা মাথাপিছু আয়ের হিসাব হইতেই জানা যায়।

(গ) জাতীয় আয় দ্বারা জাতীয় কল্যাণ (National Welfare) পরিমাপ করা যায়। সাধারণ ভাবে বলা চলে যে জাতীয় কল্যাণ জাতীয় আয়ের উপর নির্ভর করে অর্থাৎ জাতীয় আয় বাড়িলে জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং জাতীয় আয় কমিলে জাতীয় কল্যাণ হ্রাস পাইবে। অবশ্য সব ক্ষেত্রে ইহা সত্য নাও হইতে পারে কারণ এরূপ অনেক কাজ আছে (যেমন দেশরক্ষা খাতে ব্যয় বৃদ্ধি) যাহাদের পরিমাণ বাড়িলে জাতীয় আয় বাড়িবে কিন্তু জাতীয় কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে না।

(ঘ) জাতীয় পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের হিসাব অপরিহার্য। জাতীয় আয়ের পরিমাণ জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ, বিনিয়োগের পরিমাণ, করভার-জাতীয় আয়ের অনুপাত—প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জগ্ন অপরিহার্য। অধ্যাপক বাওলে বলিয়াছেন যে ভারতীয় সরকারী পরিসংখ্যান অসম্পূর্ণ, অসংবদ্ধ এবং বিভ্রান্তিকর। এইরূপ পরিসংখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করিলে তাহা যে ত্রুটিপূর্ণ হইবে ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

(ঙ) জাতীয় আয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতের জাতীয় আয় ও তাহার উৎসগুলি এইরূপ ছিল—

		জাতীয় আয়ের %
১। কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্য	৬৫০০	৪৩.২
২। শিল্প ও খনি	২৫৫০	১৬.৭
৩। ব্যবসায়, বাণিজ্য ও পরিবহন	২২৭০	১২.৫
৪। সেবামূলক কার্য	৩১৩০	২০.৬
	১৫,১৫০	১০০.০

কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কার্য হইতে ভারতের জাতীয় আয়ের ৪৩.২ শতাংশ পাওয়া যায়। ইহারাই ভারতের জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। শিল্প ও খনি হইতে জাতীয় আয়ের ১৬.৭ শতাংশ পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে ভারত কৃষি প্রধান এবং শিল্পে অনগ্রসর দেশ।

(চ) ভারতের গ্রায় যুক্তরাষ্ট্রীয় রাজ্যে জাতীয় আয়ের হিসাবের উপর ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলিকে অনুদানের (Grants-in-Aids) পরিমাণ নির্ধারণ করেন।

ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধা (Difficulties of National Income Calculations in India): ভারতে জাতীয় আয় পরিমাপের অসুবিধাগুলিকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—ধারণাগত অসুবিধা (Conceptual difficulties) এবং পরিসংখ্যানগত (Statistical difficulties) অসুবিধা।

দেশের অল্পমত প্রকৃতি প্রধানত, ধারণাগত অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছে। প্রথমত দেশের উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশ অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্রে (non-monetized sector) থাকিয়া যায়। জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার সময় আমরা ধরিয়া লই যে উৎপন্ন

ধারণাগত
অসুবিধা

সকল দ্রব্যই অর্থের বিনিময়ের জন্ত বাজারে আসে। কিন্তু ভারতে কৃষি-প্রধান অসংগঠিত অংশের উৎপাদনের এক বিরাট অংশ বিক্রয়ের জন্ত বাজারে আসে না—হয় কৃষক নিজেই উহা ভোগ করে

নতুবা অল্প দ্রব্য সামগ্রীর সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিনিময় করে। এই কারণে উৎপন্ন দ্রব্যের অতি অল্প অংশই বাজারে টাকার বিনিময়ে বিক্রয়ের জন্ত আসে। ভারতে কৃষকেরা সাধারণত জীবনধারণের জন্ত কৃষিকার্য করিয়া থাকে বলিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূত প্রায় কিছুই থাকেনা। এই অর্থ বহির্ভূত ক্ষেত্রের উৎপাদনের সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন। এই অসুবিধা থাকার দরুন জাতীয় আয় কমিটি জাতীয় অর্থনীতিকে আর্থিক (Monetary) এবং অর্থ-বহির্ভূত (Non-Monetary)—এই দুইভাবে বিভক্ত করিয়া জাতীয় আয়ের হিসাব করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশের বহুসংখ্যক উৎপাদনকারী তাহার উৎপাদিত দ্রব্যের মোট মূল্য এবং পরিমাণের সঠিক হিসাব রাখে না। পাশ্চাত্যদেশসমূহে সকল উৎপাদকই তাহার আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব রাখে। কিন্তু ভারতের কৃষক অশিক্ষিত, তাহারা তাহাদের উৎপাদনের হিসাব রাখে না এবং উৎপাদিত দ্রব্যের গুণগত মান সম্পর্কেও সচেতন নয়। সুতরাং এই সকল ক্ষেত্রে আয়ের হিসাব করিতে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক কাজের শ্রেণীবিভাগের অভাব থাকায় জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন হয়। জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিতে হইলে বিভিন্ন প্রকার কাজের শ্রেণীবিভাগ করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর কাজ হইতে প্রাপ্ত আয়ের হিসাব করা হয়। ভারতে সারা বৎসর কৃষি কাজ চলে না বলিয়া কৃষকেরা কিছু সময় অত্যাশ্রয় ধরনের কাজ করে। একই লোক বিভিন্ন ধরনের কাজ করে বলিয়া অর্থনৈতিক কাজের পেশাগত শ্রেণীবিভাগ করা বিশেষ অসুবিধাজনক।

চতুর্থত, কৃষিপণ্যের মূল্যের তারতম্য জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাবের পথে বাধার সৃষ্টি করে। কৃষক যে মূল্যে তাহার ফসল বিক্রয় করে তাহা ভারতের গ্রাম্য বিশাল দেশের সকল অঞ্চলেই একরূপ থাকে না এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে একই পণ্যের দামের তীব্র তারতম্য দেখা যায়। এই সকল কারণে পণ্যের মূল্য হিসাব করিবার সময় অসুবিধা দেখা দেয়।

এই সকল ধারণাগত অসুবিধা ব্যতীত জাতীয় আয় পরিমাপের আরও কতকগুলি পরিসংখ্যানগত অসুবিধা আছে।

প্রথমত, ভারতে যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তাহা অসম্পূর্ণ। কৃষি-উৎপাদন, শিল্প-উৎপাদন, সরকারের আয়-ব্যয়, কর্মে নিযুক্ত জনসংখ্যা, আমদানি পরিসংখ্যানগত ও রপ্তানি—এই সকল প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির নির্ভরযোগ্য হিসাব অসুবিধা পাওয়া যায় না। এই সকল অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়া জাতীয় আয়ের যে হিসাব পাওয়া যায় তাহা কিছুতেই নির্ভুল হইতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ভারতের গ্রাম্য দেশে নির্ভুল পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা বিশেষ কঠিন। ভারতীয় পরিসংখ্যান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সঙ্কীর্ণ প্রশাসনিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রচনা করা হইয়াছিল বলিয়া উহার অর্থনৈতিক প্রয়োজনের উপযোগী নয়। অশিক্ষিত জনসাধারণও প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিতে সরকারের সহিত সহযোগিতা করে না।

তৃতীয়ত, কৃষি একং সংশ্লিষ্ট কাজের নির্ভুল পরিসংখ্যানগত হিসাব পাওয়া খুবই দুর্লব। গ্রামীণ জনগণের ভোগব্যয় এবং সঞ্চয় সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। শহরের জনগণের ভোগব্যয় এবং সঞ্চয়ের হিসাবও বিশেষ আশাশ্রিত নয়।

চতুর্থত, ভারতের একটি অঞ্চলের সহিত অপর একটি অঞ্চলের পার্থক্য এতই

ব্যাপক যে, একটি অঞ্চলের তথ্য পাইলে Random Sampling পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া সারা দেশের হিসাব পাওয়া যাইবে না।

ভারতে জাতীয় আয়ের হিসাব (National Income Estimates in India) : ১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে ভারত সরকার অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সভাপতিত্বে জাতীয় আয় কমিটি গঠন করেন এবং এই কমিটি ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহার চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। পরিসংখ্যানের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করিবার উদ্দেশ্যে এই কমিটি জাতীয় আয় পরিমাপের উদ্দেশ্যে উৎপাদন পদ্ধতি এবং আয় পদ্ধতি এই উভয় পদ্ধতিকেই অনুসরণ করিয়াছে। কৃষি, শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হইয়াছে আর বাণিজ্য পরিবহণ, প্রশাসন প্রভৃতি ক্ষেত্রেগুলিতে আয় পদ্ধতি ব্যবহার করা হইয়াছে।

জাতীয় আয় কমিটি গঠিত হইবার বহু পূর্বেই সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টায় জাতীয় আয়ের হিসাব করা হইয়াছে। দাদাভাই নৌরজী প্রথম ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব করেন। তাঁহার হিসাবানুসারে ১৮৬৮ সালে ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২০ টাকা। কিণ্ডলে সিরাসের হিসাবানুসারে ১৯১১ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৪২ টাকা। ডঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর হিসাবানুসারে ১৯৩১-৩২ এবং ১৯৪২-৪৩ সালে ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫ টাকা এবং ১১৪ টাকা। ভারত সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের হিসাবানুসারে ১৯৪৭-৪৮ সালে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ১৭২ টাকা। ইস্টার্ন ইকনমিস্টের হিসাবানুসারে ১৯৪২-৫০ সালে ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ২১৪ টাকা।

ধারাবাহিক ভাবে জাতীয় আয়ের হিসাব প্রস্তুত করার জন্ত ভারত সরকার ১৯৪২ সালে জাতীয় আয় ইউনিট (National Income Unit) স্থাপন করেন এবং ইহাকে নির্দেশ দিবার জন্ত জাতীয় আয় কমিটি গঠন করা হয়। অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাভগিল, ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও, অধ্যাপক সাইমন কুজনেট্‌স্‌ প্রভৃতি প্রখ্যাত অর্থনৈতিবিদ লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি ১৯৫১ সালে প্রথম এবং ১৯৫৪ সালে চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে। ইহার পর হইতে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠন (Central Statistical Organization) নিয়মিত ভাবে ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব প্রকাশ করিয়া আসিতেছে।

১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যস্তর অনুযায়ী ভারতের মোট জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় এইরূপ ছিল :—

বৎসর	জাতীয় আয়
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০ কোটি টাকা
১৯৪৯-৫০	৮,৮২০ , ,
১৯৫০-৫১	৮,৮৫০ , ,

বৎসর	জাতীয় আয়	
১৯৫১-৫২	২,১০০	কোটি টাকা
১৯৫২-৫৩	২,৪৬০	,, ,,
১৯৫৩-৫৪	১০,০৩০	,, ,,
১৯৫৪-৫৫	১০,২৮০	,, ,,
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০	,, ,,
১৯৫৬-৫৭	১১,০০০	,, ,,
১৯৫৭-৫৮	১০,৮২০	,, ,,
১৯৫৮-৫৯	১১,৬৫০	,, ,,
১৯৫৯-৬০	১১,৮৬০	,, ,,
১৯৬০-৬১	১২,৭৩০	,, ,,
১৯৬১-৬২	১৩,০৬০	,, ,,
১৯৬২-৬৩	১৩,৩১০	,, ,,

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু আয় (১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যসূত্র অনুযায়ী) ২৫০ টাকা ৩ পয়সা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬৭ টাকা ৮ পয়সা হয় অর্থাৎ শতকরা ৭.৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে এবং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ এইরূপ ছিল :

১৯৫৬-৫৭	২৭৫.২	টাকা
১৯৫৭-৫৮	২৬৭.৩	,,
১৯৫৮-৫৯	২৮০.১	,,
১৯৫৯-৬০	২৭২.২	,,
১৯৬০-৬১	২৯৩.২	,,
১৯৬১-৬২	২৯৪.৩	,,
১৯৬২-৬৩	২৯৩.৪	,,

উপরের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যাইতেছে যে, প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় শতকরা ১২.২ ভাগ এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শতকরা ১৮.৪ ভাগ বৃদ্ধি পায়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল যথাক্রমে ৭.৩ ভাগ এবং ৮.২ ভাগ। ১৯৬০-৬১ সালে ফসল ভাল হওয়ায় এবং শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় এক বৎসরেই জাতীয় আয় ৮০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়। ১৯৬২-৬৩ সালে জাতীয় আয় ১৩,৩১০ টাকা হয়। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ইহা ২৫০ কোটি টাকা অধিক। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের প্রাথমিক হিসাব অনুসারে ১৯৬৩-৬৪ সালে জাতীয় আয় ১৩,২৭০ কোটি টাকা এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫,০৫০ কোটি টাকা হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালে মাথাপিছু আয় ছিল

৩০১১ টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৭ টাকা হয়। সুতরাং তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ২.৬ ভাগ হারে এবং দ্বিতীয় বৎসরে শতকরা ১.২ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। তৃতীয় পরিকল্পনার তৃতীয় এবং চতুর্থ বৎসরে জাতীয় আয় যথাক্রমে শতকরা ৫ ভাগ এবং ৭.৭ ভাগ হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিকল্পনার পঞ্চম বৎসরে (১৯৬৫-৬৬) অভূতপূর্ব খরা এবং পাক-ভারত যুদ্ধের জগ্ন ভারতের জাতীয় আয় শতকরা ৩.৭ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় শতকরা ৫.২ ভাগ হারে হ্রাস পায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় বৎসরে শতকরা ৫ ভাগ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি উহার অর্ধেক হারে হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কোনরূপ অলৌকিক পরিবর্তন সাধন না করিলেও জাতীয় আয়ের অগ্রগতির ধারাকে অন্ততঃ ১৯৬৪-৬৫ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছে।

১৯৫১-৫২ সালে অর্থাৎ পরিকল্পনার প্রারম্ভে জাতীয় আয় ২,১০০ কোটি টাকা ছিল, ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫,০৫০ কোটি টাকা হয়। এই চৌদ্দ বৎসরে মাথাপিছু আয় (১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্যান্তর অনুযায়ী) ২৫০ টাকা ৩ পয়সা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৭ টাকা হয়। অর্থাৎ এই সময়ে জাতীয় আয়ের অগ্রগতির হার ছিল শতকরা ৪ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১.৫ ভাগ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় শতকরা ২.৫ ভাগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির জগ্ন প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা অল্প হইয়াছে—শতকরা ২.০ ভাগ। ১৯৬১ সালের আদমশুমারীর পর উন্নয়নের নূতন পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় জাতীয় আয় কমিটি গঠন করা উচিত ছিল।

ভারতের জাতীয় আয়ের বৈশিষ্ট্য (Highlights of India's National Income) : প্রথমত, ভারতে মাথাপিছু আয় অগ্নাগ্ন পাশ্চাত্য দেশের তুলনায় অবিশ্বাস্য ভাবে অল্প। ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারতে মাথাপিছু আয় ছিল ৩১৭ টাকা। মার্কিন ডলারের অঙ্কে ইহা হয় ৬৩.৮ ডলার। ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং ক্যানাডায় মাথাপিছু আয় যথাক্রমে ১৪৫৩ ডলার এবং ৮৭০ ডলার ছিল। অবশ্য ভারতের সংগঠিত ক্ষেত্রে মাথাপিছু আয় গড় আয় অপেক্ষা অধিক।

দ্বিতীয়ত, ভারত একটি সম্প্রসারণশীল অর্থনীতি (Expanding Economy) অর্থাৎ ভারতের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১৯৫১-৫২ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ২,১০০ কোটি টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫,০৫০ টাকা হয়। এই সময়ে মাথাপিছু আয় ২৫০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩১৭ টাকা হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালের তুলনায় ১৯৫০-৫১ সালে “প্রকৃত” জাতীয় আয় শতকরা ১.২৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রকৃত জাতীয় আয় এবং প্রকৃত মাথাপিছু আয় যথাক্রমে শতকরা ২০.৪ ভাগ এবং ৮.৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়ত, জাতীয় আয়ের উৎসসমূহ বিশ্লেষণ করিলে ভারতীয় অর্থনীতির ভারসাম্য-হীনতার (lopsided nature) রূপটি ধরা পড়ে। কৃষি হইতে আমাদের মোট জাতীয় আয়ের ৫০ ভাগ পাওয়া যায়। বাণিজ্য, পরিবহণ এবং সংসরণ হইতে জাতীয় আয়ের ১৮ ভাগ আসে। শিল্প ও খনি হইতে জাতীয় আয়ের ১৭ ভাগ পাওয়া যায়। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ভারতে কৃষি-ক্ষেত্রের তুলনায় অগ্রাগ্র বিভাগ জাতীয় আয়ের কিরূপ সামান্য অনুপাত সরবরাহ করে। অপর পক্ষে গ্রেট ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের প্রায় ৫৪ ভাগ আসে শিল্প হইতে। জাতীয় আয়ের উৎসগুলি বিশ্লেষণ করিলে ভারতীয় অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধির গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

চতুর্থত, জাতীয় আয় স্থিতির উৎস হিসাবে ক্ষুদ্রশিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে। ১৯৫০-৫১ সালে মোট দেশীয় উৎপাদনের ৬৫.৮ ভাগ ক্ষুদ্রশিল্প হইতে এবং ১০.৭ ভাগ মাত্র বৃহদায়তন শিল্প হইতে পাওয়া যায়। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকাকে স্বীকার করা হইয়াছে এবং এই শিল্পগুলির পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

পঞ্চমত, ১৯৪৮-৪৯ সাল হইতে ১৯৫০-৫১ সাল পর্যন্ত কৃষি-উৎপাদন অর্থনীতির অগ্রাগ্র বিভাগের তুলনায় অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কোরিয়া যুদ্ধের সময় খাদ্য-শস্ত্রের সঠিক মূল্যে ক্রয়করণ উৎসাহিত হইয়া উৎপাদন বৃদ্ধি দ্বারা জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়তা করে।

ষষ্ঠত, আমাদের জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশী খাদ্যবস্তু ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যায়। দেশের গ্রামাঞ্চলের জনগণের মোট ব্যয়ের ৬ অংশ খাদ্য এবং ১ অংশ বস্ত্র ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যায়। সুতরাং খাদ্য এবং বস্ত্র এই দুইটি বস্তু ক্রয় করিতেই জাতীয় আয়ের অধিকাংশ ব্যয় হইয়া যায়। মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে হইলে খাদ্য এবং বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

জাতীয় আয় এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (National Income and Perspective Plans) : পরিকল্পনা একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস বলিয়া জাতীয় অর্থনীতির উপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করিতে হইলে স্বল্প প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। প্রথম এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে পরিকল্পনা কমিশন ইহা উপলব্ধি করিয়া এক দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন। প্রথম পরিকল্পনার রিপোর্টে আগামী ২৫ বৎসরে ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির গতির হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৫০-৫১ সালে ভারতের জাতীয় আয় (১৯৫২-৫৩ মূল্যসূত্রে) ২,১১০ কোটি টাকা ছিল, ১৯৬৭-৬৮ সালে অর্থাৎ ১৮ বৎসর পরে ইহা দ্বিগুণ হইবে। অবশ্য ১৯৭৩-৭৪ সালের পূর্বে মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করা যাইবে না।

প্রথম পরিকল্পনায় ১২ ভাগ জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত

আয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল শতকরা ১৮ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২৫ শতাংশ আয় বৃদ্ধির লক্ষ্য ধার্য ছিল কিন্তু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায় ২০ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয়ের ২৫ শতাংশ এবং মাথাপিছু আয়ের ১৭ শতাংশ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছিল প্রকৃত আয় বৃদ্ধি তাহার অর্ধেক হইয়াছে।

পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জাতীয় উন্নয়নের হার ৭ ভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইহার ফলে ১৯৭৫-৭৬ সালে মাথাপিছু মাসিক আয় ২০ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইয়া ১২,০০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, প্রকৃত আয় ১৮,০০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। ১৯৭৫-৭৬ সালে মাথাপিছু মাসিক আয় ২০ টাকা করিতে হইলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিয়া ৩৭,০০০ কোটি টাকা করিতে হইবে। জাতীয় অর্থনীতি ৭ ভাগ হারে সম্প্রসারিত হইলে জাতীয় আয় ১৯৭০-৭১ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ২৫,০০০ কোটি টাকা এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ৩৭,৫০০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৭০-৭১ সালে ৫৫ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে উহা ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে।

নিচের তালিকায় আয় বিনিয়োগ এবং জনসংখ্যার সম্ভাব্য গতি দেখানো হইল :

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় আয়, বিনিয়োগ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখানো হইতেছে :

(১৯৫১-৫৬ হইতে ১৯৭১-৭৬)

	প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬)	দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১)	তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬)	চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৬-৭১)	পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭১-৭৬)
১। পরিকল্পনার শেষে জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	১০,৮০০	১৩,৪৮০	১৭,২৬০	২১,৬৮০	২৭,২৭০
২। মোট নীট বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	৩,১০০	৬,২০০	৯,৯০০	১৪,৮০০	২০,৭০০
৩। পরিকল্পনার শেষে বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের শতাংশ	৭.৩	১০.৭	১৩.৭	১৬.০	১৭.০
৪। পরিকল্পনার শেষে জনসংখ্যা (মিলিয়ন হিসাবে)	৩৮.৪	৪০.৮	৪৩.৪	৪৬.৫	৫০.০
৫। মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত	১'৮৫:১	২'৩৩:১	২'৬৫:১	৩'৪৫:১	৩'৭৫:১
৬। পরিকল্পনার শেষে মাথাপিছু আয় (টাকার অঙ্কে)	২৮১	৩৩১	৩৯৬	৪৬৬	৫৪৬

মহালানবীশ কমিটির রিপোর্ট (Report of the Mahalanobis Committee) : জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি জানা-ই সব নয়, পরিকল্পনার ফলে আয় ও সম্পদ বণ্টনে এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে যে পরিবর্তন

ঘটিতেছে তাহাও জানা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা কমিশন অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবীশের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মহলানবীশ কমিটির রিপোর্টের প্রথম অংশ প্রকাশিত হয়। এই কমিটির প্রধান প্রধান সিদ্ধান্তগুলি বর্ণনা করা হইল।

প্রথমত, কমিটি জাতীয় সাম্পল-সার্ভে এবং রিজার্ভ-ব্যাঙ্কের তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ১৯৫২-৫৭ সালের পারিবারিক আয় বণ্টনের হিসাব করা হয়। ইহা হইতে দেখা গিয়াছে যে, উচ্চ পর্যায়ে ১০ ভাগ এবং নিম্ন পর্যায়ে ২০ ভাগ পরিবারের আয়ের অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা তুলনামূলকভাবে খারাপ হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, আয়কর সংক্রান্ত পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, ১৯৫১ হইতে ১৯৫৯ সালে কনট্রাকটরগণের আয় সর্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বিভিন্ন চাকুরীতে নিযুক্ত ব্যক্তির মাথাপিছু আয়ের তুলনায় কনট্রাকটরগণের আয় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাইয়াছে। ব্যবসায় স্বনিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ (self-employed person) এবং বেতনভুক্ত কর প্রদায়ী শ্রেণীর আয়ও বৃদ্ধি পাইয়াছে তবে এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের সমান। পেশাগত ব্যক্তিদের আয় বৃদ্ধির হার জাতীয় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা অল্প হইয়াছে। সম্পত্তির মালিকগণের আয় হ্রাস পাইয়াছে।

তৃতীয়ত, শেয়ার লভ্যাংশ আয়ের ভিত্তিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ৫ ভাগ পরিবার মোট শেয়ারের ৫০ শতাংশ দখল করিয়া আছে। আয়কর দাতাদের উচ্চ-পর্যায়ের ১০ ভাগ মোট লভ্যাংশ আয়ের (dividend income) ৫৫ শতাংশ ভোগ করে আর আয়কর দাতাদের নিম্ন-পর্যায়ের ১০ ভাগ মোট লভ্যাংশ আয়ের ২ শতাংশ ভোগ করে (১৯৫৫-৫৬)। ১৯৫৯-৬০ সালে উচ্চ-পর্যায়ের ১০ ভাগ এবং নিম্ন-পর্যায়ের ১০ ভাগ যথাক্রমে মোট লভ্যাংশ আয়ের ৫২ শতাংশ এবং ২৫ শতাংশ ভোগ করিত। শেয়ার মালিকানার দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষমতা এবং সম্পদ কেন্দ্রীভবনে বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই।

চতুর্থত, শহরে জমি বণ্টনের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিমাণ কেন্দ্রীভবন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে উচ্চপর্যায়ের ৫ ভাগ লোক শহরের মোট জমির ৫২ শতাংশ ভোগ করিত। উচ্চপর্যায়ের ২০ ভাগ পরিবার শহরের মোট জমির ৯৩ শতাংশ ভোগ করিত এবং নিম্নপর্যায়ের ২০ ভাগ পরিবারের কোন বাসভূমি নাই।

পঞ্চমত, কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, পরিকল্পনার দশ বৎসর অতীত হওয়ার পর এবং উচ্চ-শ্রেণীর উপর অধিক মাত্রায় করদার্য করা সত্ত্বেও আয়ের কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কমিটির মতে দুইটি কারণে আয়ের কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে—অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বল্পতা এবং কর ফাঁকি।

মহলানবীশ কমিটি স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে যে, আয় বণ্টনে বৈষম্য পূর্বাপেক্ষা

বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং দুইটি পরিকল্পনা অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

মহলানবিশ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার এক বৎসর পরে ফলিত অর্থনীতি গবেষণার জাতীয় পরিষদ (National Council of Applied Economic Research) একটি সংক্ষিপ্ত রচনা প্রকাশ করেন। ইহাতে ঘোষণা করা হয় যে, পরিকল্পনার ১১ বৎসর পরেও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন অপরিবর্তিত রহিয়া গিয়াছে এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র অথবা গ্রেট ব্রিটেনের হ্রাস উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় অধিক। স্বাধীনতা লাভের ১৫ বৎসর পরেও সমাজের শীর্ষদেশের ১ ভাগ পরিবার জাতীয় আয়ের ১০ শতাংশ ভোগ করিত, অপরপক্ষে নিম্নদেশের ৫০ ভাগ পরিবার জাতীয় আয়ের মাত্র ২২ শতাংশ ভোগ করিত।

সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চশ্রেণী (U-Sector) উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই পরিকল্পিত উন্নয়নের সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা ভোগ করিয়াছে; সুতরাং আগামী যুগে উন্নয়নের জগ্ন ইহাদেরই সর্বাধিক ত্যাগস্বীকারে বাধ্য করা প্রয়োজন। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাজের ফলে সম্পদ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতারই শুধুমাত্র কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নয়,—ইহার। ইম্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ এবং বৈদেশিক মুদ্রার মত দুপ্রাপ্য সম্পদগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া পরিকল্পনার অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে তাহার ফলে এই শ্রেণী অধিকতর ক্ষমতালালী হইয়া উঠিবে। সুতরাং জাতীয় অর্থনীতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করিয়া ইহাদের কার্যের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা প্রয়োজন।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর-সংকেত

(Questions and Answer-Hints)

1. Explain the economic importance of forests and suggest measures for improving the forest resources of India.

(C.U. B.A. '50) [পৃষ্ঠা ১০৭-১০৯]

2. Enumerate the mineral products of India and state which of them can be profitably used for industrial purposes in India.

(C.U. B. Com. '48) [পৃষ্ঠা ১০৫-১০৭]

3. Give an account of the forest-policy of the Government of

India. Discuss in this connection the importance of forest in the economic life of India.

(C.U. B. Com. '48) [পৃষ্ঠা ১০৭-১০৯]

4. Write a note on the National Income of India.

(C.U.B. Com. '65) [পৃষ্ঠা ১১৪-১১৭]

5. Discuss the importance of National Income estimation in India and consider the difficulties involved.

(B. U. B. A. '63) [পৃষ্ঠা ১১০-১১৪]

চতুর্থ খণ্ড

দ্বাদশ অধ্যায়

জনসংখ্যা (Population)

ভারত এক বিশাল জনবহুল দেশ। এখানে জনগণের জীবনযাত্রার মান অবিস্থাপ্য রকমের অনুন্নত হওয়া সত্ত্বেও ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে, জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ১২২১ সালের পূর্বে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মন্দ্র ছিল, কিন্তু ১২২১ সালের পর হইতেই উহা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ইহার কারণ হিসাবে বলা যায় যে, ১২২১ হইতে ১২৫১ এই ত্রিশ বৎসরে মৃত্যুহার পূর্ববর্তী যুগ অপেক্ষা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল কিন্তু জন্মহার অপরিবর্তিত ছিল। ১২৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ১২৫১ সালের তুলনায় ১২৬১ সালে জনসংখ্যা ২১.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অর্থাৎ বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৬ শতাংশ। ১২৪১-৫১ সালের তুলনায় ১২৫১-৬১ সালে ভারতে জনসংখ্যা ৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১২৫১-৬১ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি এবং জনস্বাস্থ্যকার্যসূচীর সম্প্রসারণের ফলে মৃত্যুহার বিশেষভাবে হ্রাস পায় বলিয়া জনসংখ্যা পূর্বের তুলনায় অধিকহারে বৃদ্ধি পায়।

১২৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ। জীবনধারণের জ্ঞান ন্যূনতম প্রয়োজন ১৪০০ ক্যালোরীর ভিত্তিতে ভারতে যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তাহা দ্বারা ৩০ কোটি লোকের অন্নসংস্থান করা যায়। সুতরাং ১৩ কোটি ২০ লক্ষ লোক অনশনে বা অর্ধাশনে দিন কাটাইতেছে। ১২৬১ সালের আদমশুমারীর হিসাবানুসারে ১২৬৭ সালে ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি অতিক্রম করিয়া যাইবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই ভয়াবহ অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে খাওয়ার যোগান এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিবার জ্ঞান ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-সমূহের ভূমিকা কি? পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে দ্বিমুখী অভিযান চালাইতেছে। আমরা একই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানিবার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ বাড়ানিবার চেষ্টা করিতেছি।

ভারতীয় অর্থনীতির অনুন্নত প্রকৃতি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নানা ধরনের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করিতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশে এক ভয়াবহ সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতে জনগণের এক বৃহত্তর অংশ অশিক্ষিত, ফলে, কুসংস্কারাজ্ঞ হওয়ার ফলে পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। ব্যাপকতর প্রয়াস এবং অধিকতর কঠোর সংকল্প লইয়া জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হইতে অতি সতর্কতার সহিত

জনসংখ্যা পরিকল্পনা করা ভারতের পক্ষে প্রয়োজন নতুবা অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোন প্রভাবই উপলব্ধি করা যাইবে না।

জনসংখ্যা এবং কৃষি (Population and Agriculture) : ভারতে তিনজন লোকের যে গড় আয় তাহার দ্বারা দুইজন লোককে খাওয়ানো যায় মাত্র। জনগণের দারিদ্র্যের প্রধান কারণ হইল কৃষি এবং শিল্পের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব। প্রথম পরিকল্পনার সূচনাকালে ৭০ শতাংশ লোক কৃষি হইতে জীবিকা অর্জন করিত এবং প্রায় ৮৫ শতাংশ লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। মাত্র ১ শতাংশ লোক সংগঠিত শিল্প হইতে এবং ৫ শতাংশ লোক ক্ষুদ্রশিল্প হইতে জীবিকা অর্জন করিত। ধীরে ধীরে সক্রিয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতির ভারসাম্যহীনতা দূর হইতেছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষি পুনর্গঠনের লক্ষ্য ছিল কর্ষণ-যোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না করিয়া উন্নত কৃষি পদ্ধতির সাহায্যে একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি করা। জমির উপর চাপ কমাইবার এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিয়া জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনা শিল্পায়ণের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। তৃতীয় পরিকল্পনায় উন্নয়ন এবং প্রতিরক্ষার চাহিদা মিটাইবার জন্য শিল্পায়ণের কর্মসূচী অব্যাহত রাখিতে হইবে।

জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং খাদ্য সরবরাহ (Population Growth and Food Supply) : ক্রমবর্ধমান জন্মহার এবং ক্রমহ্রাসমান মৃত্যুহারের দরুন জনসংখ্যার প্রবল চাপ ভারতের জাতীয় অর্থনীতিতে এক ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকিলে ১৯৬৭ সালে ভারতের জনসংখ্যা ৫০ কোটি অতিক্রম করিয়া যাইবে। প্রখ্যাত জনসংখ্যাতত্ত্ববিদ ডঃ চন্দ্রশেখর হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অব্যাহত থাকিলে ১৯৯৯ সালে ভারতের জনসংখ্যা ১০০ কোটি হইয়া ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি নির্ভর করে জন্মহার এবং মৃত্যুহারের উপর। বর্তমানে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে জন্মহার এবং মৃত্যুহার পরিবর্তিত হইতেছে। বর্তমানে মৃত্যুহার বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে কিন্তু জন্মহারের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই আর ইহার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্রুততর হইয়াছে। এই কারনেই দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রথম পরিকল্পনাকাল অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল। আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোয়েল (Prof. Coale) এবং অধ্যাপক হুভার (Hoover) হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতে জনসংখ্যা বৎসরে ২ শতাংশ হারে অর্থাৎ বৎসরে ৮০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি (National Sample Survey) দেখাইয়াছে যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে ৪০ এবং মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে ২২ অর্থাৎ বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১.৮ শতাংশ। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ভারতের

জনসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ—১২৫১ সালের তুলনায় ২১.৬৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং গত দশকে বার্ষিক ২.১৬ শতাংশ হারে জনসংখ্যার বৃদ্ধি পায়।

অপরপক্ষে প্রথম পরিকল্পনা রচনা কালে পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করিয়াছিলেন যে, ১২৫১ হইতে ১২৬১ এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা ১২.৫ শতাংশ (অর্থাৎ বৎসরে ১.২৫ শতাংশ হারে) বৃদ্ধি পাইবে। অত্যাধিক বলা যায় যে, কমিশন আশা করিয়াছিলেন জনসংখ্যা বার্ষিক ৫০ লক্ষ হিসাবে বাড়িবে। কিন্তু ১২৬১ সালের আদমশুমারী হইতে দেখা যাইতেছে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব বিভ্রান্তিকর।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, নবজাতকদিগের কিভাবে খাদ্যসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইবে? ইহা সত্য যে, মানুষ পৃথিবীতে একটি শূণ্য উদর লইয়া আসে না—কাজ করিবার জ্ঞান দুইটি হাতও সঙ্গে আনে। জন্মমূহূর্ত হইতেই খাওয়ার প্রয়োজন হয় কিন্তু কাজ আরম্ভ করিতে অন্ততঃ ১৫.১৬ বৎসর অপেক্ষা করার প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, শিল্পায়ণের সহিত শ্রমিকগণ অধিক হারে গ্রাম হইতে শহরাঞ্চলে আসিতে থাকিবে। ইহার ফলে নগরাঞ্চলে খাওয়ার চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়ত, আরো এক কারণে খাওয়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। দারিদ্র্যের জ্ঞান জনগণের এক বিরাট অংশ অধ্বংসিত অবস্থায় দিন কাটাইতেছে, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের খাওয়ার চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মূল সমস্যা হইল পরিকল্পনাকালে কিভাবে খাওয়ার যোগান এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য স্থাপন করা যায়।

এই সমস্যা সমাধানের দুইটি পদ্ধতি আছে। প্রথমত, কৃষি সম্প্রসারণ এবং পুনর্গঠন করিয়া খাওয়ার উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, জনসংখ্যা হ্রাস করিয়া খাওয়ার চাহিদা কমানিতে হইবে। জনসাধারণকে পরিবার পরিকল্পনায় উৎসাহিত করিতে হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রথম পদ্ধতিটির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল এবং কৃষি উন্নয়নের জ্ঞান ২৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই সময় খাওয়াপাদন ১ কোটি ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পায় বলিয়া সাময়িকভাবে খাদ্যঘাটতি পূরণ হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর জ্ঞান মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল।

যদি একই সঙ্গে দ্বিমুখী অভিযান চালানো হয় অর্থাৎ খাওয়ার যোগান বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের সক্রিয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে জনসংখ্যা এবং খাওয়ার যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যাইবে। পরিবার পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সত্য যে, অশিক্ষিত এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনগণের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয় করা বিশেষ ব্যয়সাপেক্ষ। তথাপি, ইহা না করিয়া গত্যন্তর নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনা আংশিকভাবে এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা

কর্মসূচীর জন্ম ৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এই সময় শহরাঞ্চলে ৫৪৯টি এবং গ্রামাঞ্চলে ১১০০টি পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর জন্ম ২৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ হইতে হ্রাস করিয়া ২৫ করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় ৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

জনসংখ্যা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Population and Economic Growth) :—দেশের জনসংখ্যা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে। অন্তর্ভুক্ত দেশের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, এখানে জন্মহার এবং মৃত্যুহার উভয়ই অধিক। অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরম্ভ হওয়ার সহিত দেশে মৃত্যুহার কমিতে থাকে। জনসংখ্যার উন্নতিই ইহার কারণ। দ্বিতীয়ত, উন্নয়ন প্রক্রিয়া চলিতে থাকিলে জনগণের আয় বৃদ্ধির দরুন জনসংখ্যাও কিছু বৃদ্ধি পাইবে যদি না জনগণের জীবনদর্শনের পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রাথমিক পর্ষায় মৃত্যু হার যত দ্রুতহারে হ্রাস পায়, জন্মহার তত দ্রুত হ্রাস পায় না, ফলে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। যুগ-প্রাচীন সংস্কার এবং সামাজিক বিশ্বাস পরিবর্তন করিয়া পরিবার পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করা বিশেষ সময়সাপেক্ষ বলিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং আশা করা যায় যে, উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রথম যুগে মৃত্যুহার হ্রাস এবং জন্মহার বৃদ্ধির দরুন জনসংখ্যা অতি দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাইবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি করিয়া জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, স্বল্পকালীন ব্যবস্থা

স্প্যাংলারের
অভিমত

হিসাবে পরিবার পরিকল্পনার বিশেষ কোন উপযোগিতা নাই।
জে. জে. স্প্যাংলারের মতে (J. J. Spangler) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ শতাংশ হইলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার ৫ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় ২.৫ শতাংশ, সুতরাং স্প্যাংলারের মতানুযায়ী ভারতের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের হার ১২.৫ শতাংশ হওয়া প্রয়োজন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম যুগে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু পরবর্তী স্তরে জনসংখ্যা হ্রাস পাইবে। জনসংখ্যা হ্রাস পাইবার কারণ, (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন; (খ) নূতন জীবনদর্শনের ফলে পরিবার পরিকল্পনা জনপ্রিয়তা অর্জন করিবে, ফলে, জন্মহার হ্রাস পাইবে, (গ) শিল্পায়নের দরুন জনসংখ্যার যে নগরীকরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে তাহার ফলে সন্তান সম্পদের পরিবর্তে ভারস্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হইবে। ফলে জন্মহার কমিবে। এবং (ঘ) মৃত্যুহার একটি নির্দিষ্ট পর্ষায় আসার পর আর উহাকে হ্রাস করা যায় না বলিয়া জন্মহার এবং মৃত্যুহারের মধ্যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হইবে।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে বিভিন্ন প্রকার উপজীবিকার মধ্যে জনসমষ্টির পুনর্বণ্টন হইবে। অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক উপজীবিকাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত

করিয়াছেন—প্রাথমিক উপজীবিকা (Primary Occupations), যেমন, কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি ; মাধ্যমিক উপজীবিকা (Secondary Occupations) যেমন, বিভিন্ন ধরনের শিল্প ; তৃতীয় পর্যায়ের উপজীবিকা (Tertiary Occupations) যেমন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, পরিবহণ, শিক্ষকতা, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি । অনুরূপ দেশে জনসমষ্টির অধিকাংশই প্রাথমিক পর্যায়ের জীবিকায় নিযুক্ত থাকে, অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের উপজীবিকার আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে থাকে ।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে মাথাপিছু আয় এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয় । জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলে শিক্ষা, বাসস্থান, এবং অধিকতর খাওয়ার সুবন্দোবস্ত হওয়ার দরুন জনগণের গুণগত উন্নতি (Qualitative improvement) সাধিত হয় ।

চতুর্থত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে বলিয়া গ্রাম হইতে ক্রমবর্ধমান হারে জনসমষ্টি জীবিকার সন্ধানে শহরের দিকে আসিতে থাকে বলিয়া গ্রাম ও নগরাঞ্চলের মধ্যে জনসংখ্যার পুনর্বণ্টন হইতে থাকে । অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে শুধু মাত্র নূতন নূতন শিল্পই প্রতিষ্ঠিত হয় না, পরিবহণ ব্যবস্থারও বিশেষ উন্নতি ঘটে । ইহাতে শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়, উহাও আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে ।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেমন জনসংখ্যাকে প্রভাবিত করে, জনসংখ্যাও আবার অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করিতে পারে ।

অত্যাগত অবস্থা অনুকূল হইলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করে । এই বক্তব্যের সমর্থনে যে যুক্তি দেখানো হয় তাহা এইরূপ : দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে মোট চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে আর ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন হইবে । জন সংখ্যার বৃদ্ধি একদিকে যেমন চাহিদার সৃষ্টি করিবে অপরদিকে সেইরূপ শ্রমের যোগান বৃদ্ধি করিবে । এইভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের মোট উৎপাদন তথা আয় বৃদ্ধির সহায়ক হয় । অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে তাহা নির্ভর করে মূলধন গঠন এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর । কিন্তু যেখানে মূলধন গঠন প্রয়োজনের তুলনায় অল্প সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করে । এইজন্য অনেক অর্থনীতিবিদের মতে, নানাকারণে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অন্তরায় স্বরূপ ।

প্রথমত, ভারতে জনসংখ্যা অধিক হওয়ায় দেশে খাণ্ড সমস্তা তীব্র আকার ধারণ করিয়াছে । দেশ খাণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলিয়া বৎসরে বিদেশ হইতে ১০০ কোটি টাকার খাণ্ডশস্ত্র আমদানি করিতে হয় । খাণ্ড আমদানী না করিতে হইলে ঐ টাকায় বিদেশ হইতে মূলধনী দ্রব্য ক্রয় করা যাইতে পারিত এবং ইহার দরুন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইত ।

দ্বিতীয়ত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে যে অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি হইতেছে তাহা অতিরিক্ত জনগণের ভরণ-পোষণের জন্ত ব্যয় হওয়ায় মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে না।

তৃতীয়ত, ভারতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুনই লোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা লাভে বঞ্চিত হইতেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যতই কমিবে ততই অধিক পরিমাণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফল ভোগ করা যাইবে।

চতুর্থত, দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অধিক পরিমাণে খাদ্যশস্ত্রের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় শিল্পগুলির জন্ত যথেষ্ট পরিমাণে কাঁচামাল উৎপাদন করা অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে।

পঞ্চমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে যে হারে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পাইবার কথা ভারতে তাহা হইতেছে না। ভারতে মাথা পিছু আয় অল্প বলিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কোন সক্রিয় চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে না।

ভারতীয় জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (High Lights of Indian Population) :

(ক) আয়তন (Size) : ১৯৬১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ৯০ লক্ষ। ১৯৫১ সালে উহা ছিল ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ। ১৯৬১ সালে ভারতের জনসংখ্যা বিশ্বের জন সংখ্যার $\frac{1}{5}$ অংশ ছিল অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতি ৮ জন লোকের ১ জন ভারতবাসী। জনসংখ্যার আয়তনের দিক হইতে চীন প্রথম এবং ভারত দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৫৩ সালে চীনের জনসংখ্যা ছিল ৫৮ কোটি ২৫ লক্ষ।

(খ) জন ঘনত্ব (Density) : জনসংখ্যার বন্টন সকল স্থানেই সমান নয়। কেরল এবং পশ্চিম বাংলায় জনঘনত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক আবার মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে ইহা অত্যন্ত কম। সর্বভারতীয় হিসাবের ভিত্তিতে ১৯৬১ সালে ভারতে প্রতিবর্গ-মাইলে ৩৭০ জন লোক বাস করে। ১৯৫১ সালে ইহা ছিল ২৮৭। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবর্গমাইলে ৫৬ জন এবং জাপানে প্রতি বর্গমাইলে ৫৮১ জন লোক বাস করে।

(গ) বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যার গঠন (Age Composition) : ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে ১ হইতে ১৪ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪১.১ শতাংশ, ১৫ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স্ক নরনারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৫১.১ শতাংশ। এই শ্রেণীর লোকেরাই দেশের কর্মক্ষম জনসমষ্টি। ৫৫ বা তদূর্ধ্ব বয়স্ক নরনারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৭.৮ শতাংশ।

(ঘ) স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত (Sex Ratio) ভারতে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশী। ১৯০১ সালে ভারতে প্রতি হাজার পুরুষে নারীর সংখ্যা ছিল ৯৭২, ১৯৬১ সালে উহা আরও কমিয়া ৯৪১-এ আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬১ সাল এই দশ বৎসরে আসাম এবং বিহারে স্ত্রী-পুরুষ অনুপাত স্থিতিশীল ছিল কিন্তু পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে সামান্য উন্নতি দেখা যায়। কেরল এবং উড়িষ্যায় অগ্রাগ্র

রাজ্যের তুলনায় জ্বীলোকের অল্পপাত বেশী। ১৯৫১ সালে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি ১১ লক্ষ, ইহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি ৬৫ লক্ষ (অর্থাৎ ৫০.১ শতাংশ) এবং নারীর সংখ্যা ছিল ১৭ কোটি ৪৬ লক্ষ (অর্থাৎ ৪৯.৯ শতাংশ) অগ্রভাবে বলা যায় যে পুরুষের সংখ্যা নারীর সংখ্যা অপেক্ষা এক কোটি ১৯ লক্ষ বেশী ছিল। ১৯৬১ সালের আদম শুমারীতেও ঐ একই প্রবণতা অব্যাহত রহিয়াছে। ১৯৬১ সালে দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ; ইহার মধ্যে ২২ কোটি ৬৫ লক্ষ পুরুষ এবং ২১ কোটি ২৫ লক্ষ জ্বীলোক ছিল। অর্থাৎ জ্বীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা ১ কোটি ৪০ লক্ষ বেশী ছিল। নারীর সংখ্যালত্তার সহিত বিধবার পুনর্বিবাহ যুক্ত হইয়া ভারতে এক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে।

(ঙ) গড় আয়ু (Average Expectation of Life) :

১৯৫১ হইতে ৬০ সালে ভারতের নর ও নারীর গড় আয়ু ছিল যথাক্রমে ৪১.৯ এবং ৪০.৬ বৎসর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গড় আয়ুর সহিত তুলনা করিলে বুঝা যায় ইহা কিরূপ স্বল্প। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পুরুষ ও নারীর গড় আয়ু যথাক্রমে ৬৫ এবং ৭০ বৎসর। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনাকালে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীর উন্নতি হওয়ায় ভারতে গড় আয়ুর পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। চতুর্থ পরিকল্পনার খসড়া হিসাবানুসারে বর্তমানে (১৯৬৬-৬৭) গড় আয়ু হইল ৫০ বৎসর।

(চ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (Rate of Growth) :

১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে ভারতের জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪১ লক্ষ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ঐ দশকে জনসংখ্যা ১৩.৪ শতাংশ হারে বা বার্ষিক ১.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ১২.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৬১ সাল হইতে ১৯৭০ সালে জনসংখ্যা ১৩.৩ শতাংশ এবং ১৯৭১ সাল হইতে ১৯৮০ সালে জনসংখ্যা ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। এই বৃদ্ধির হার অনুসারে ১৯৬০-৬১ সালে জনসংখ্যা ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ, ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪৩ কোটি ৪০ লক্ষ, ১৯৭০-৭১ সালে ৪৬ কোটি ৫০ লক্ষ এবং ১৯৭৫-৭৬ সালে ৫০ কোটি হইবে। কিন্তু ১৯৬১ সালের আদমশুমারী হইতে দেখা যায় যে, গত দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনুমিত হার অপেক্ষা অনেক বেশি হইয়াছিল। অনুমিত হার ছিল ১২.৫ শতাংশ কিন্তু প্রকৃত হার হইয়াছিল ২১.৬৪ শতাংশ। ইহা হইতে দেখা যায় যে, ঐ দশকের প্রতি বৎসর জনসংখ্যা ২.১৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনার হিসাবানুযায়ী ১৯৬১ হইতে ৬৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বার্ষিক ২.৪ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৬৫ সাল হইতে ৭০ সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২.৫ শতাংশ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

(ছ) জন্ম ও মৃত্যুহার (Birth and Death Rates) :

১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতে (১৯৫১-৬০) হাজার প্রতি জন্ম হার

ও মৃত্যুহার যথাক্রমে ৪২ এবং ২৩ ছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, হাজার প্রতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ১২; পূর্ববর্তী দশকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল হাজার প্রতি ১৩। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনার হিসাবানুসারে ১৯৬১-৬৫ সালে ভারতে হাজার প্রতি জন্ম ও মৃত্যুহার যথাক্রমে ছিল ৪০ এবং ১৭। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ভারতে উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ফলে মৃত্যুহার বিশেষভাবে হ্রাস পাইতেছে। মৃত্যুহার হ্রাস পাইতেছে কিন্তু জন্মহার কমিতেছে না বলিয়া আমরা ভয়াবহ “জনসংখ্যা বিস্ফোরণের” (population explosion) সম্মুখীন হইয়াছি।

(জ) গ্রাম ও শহরে জনসংখ্যার বণ্টন (Rural vs. Urban Population) : ভারতে মোট জনসংখ্যার অধিকাংশই গ্রামে বাস করে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৮২ শতাংশ গ্রামে বাস করে এবং মাত্র ১৮ শতাংশ শহরে বাস করে। এখনো পর্যন্ত যদিও অধিক লোকই গ্রামে বাস করে তথাপি গ্রামের তুলনায় নগরবাসীর অনুপাত ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। নগরের সংখ্যাও ৪৮ হইতে (১৯৪১) বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫১ সালে ৭৫ হইয়াছিল। চতুর্থ ও পরবর্তী পরিকল্পনায় শিল্পায়ণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় জনসমষ্টির নগরমুখীতা আরও প্রবল হইয়া উঠিবে।

(ঝ) উপজীবিকা (Occupation) : ১৯৬১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ভারতে প্রায় ৭০ জন লোক প্রত্যক্ষভাবে কৃষিকার্ষে নিযুক্ত আছে অর্থাৎ প্রতি দশজন লোকের মধ্যে ৭ জন লোক কৃষিজীবী। শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১০.৫ শতাংশ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবহণে নিযুক্ত লোকের সংখ্যা ৮ শতাংশ আর বাকী লোক অগ্রান্ত জীবিকায় নিযুক্ত আছে।

ভারতে আত্মনির্ভরশীল উপার্জনকারী (self-supporting), উপার্জনশূন্য নির্ভরশীল (non-earning dependents) এবং উপার্জনকারী নির্ভরশীল (earning dependents) লোকের অনুপাত হইল যথাক্রমে ২৯.৩ শতাংশ, ৬০.১ শতাংশ এবং ১০.৬ শতাংশ।

(ঞ) সাক্ষর ব্যক্তির অনুপাত (Literacy) : ১৯৫১ সালে সাক্ষর লোকের সংখ্যা ছিল ১৬.১ শতাংশ, ১৯৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩.৭ শতাংশ হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সাক্ষর লোকের অনুপাত ক্রমশই বাড়িতেছে। কেবলে সাক্ষর লোকের অনুপাত সর্বাপেক্ষা অধিক। ভারতে সাক্ষর পুরুষ এবং নারীর অনুপাত হইল যথাক্রমে ৩৩.৯ এবং ১২.৮ শতাংশ।

ভারতে কি জনাধিক্য ঘটিয়াছে? (Is India Overpopulated?) : ভারত একটি অনুরত দেশ। ভারতের অনুরতির কারণ সম্পর্কে দুইটি মতবাদ প্রচলিত আছে। একদলের মতে বিগত দুইশত বৎসর ধরিয়া বিদেশী শাসন এবং শোষণ ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ। আর একদল লোক আছেন যাহারা মনে করেন

আমাদের দারিদ্র্যের কারণ জনাধিক্য। জনসংখ্যা অতিরিক্ত বলিয়াই মাথাপিছু আয় স্বল্প এবং ইহা যে কোন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। আমরা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিব ভারতে সত্যই জনাধিক্য ঘটয়াছে কিনা।

জনাধিক্য সম্পর্কে আলোচনার প্রারম্ভে এই শব্দটির সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সাধারণত জনাধিক্য পরিমাপের দুইটি মানদণ্ড আছে। ম্যালথাসপন্থীগণের মতে দেশের খাতোৎপাদন যে জনসমষ্টিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে প্রকৃত জনসংখ্যা তদপেক্ষা অধিক হইলে দেশে জনাধিক্য ঘটিবে। অত্যাধিক বলা যায় যে, জনসংখ্যা দেশের খাত সর্ববরাহকে অতিক্রম করিলে দেশে জনাধিক্য দেখা দিবে। সুতরাং এই মতাবলম্বীগণের মতে খাত ঘাটতিই হইল দেশে জনাধিক্যের প্রধান লক্ষণ। এই অবস্থায় দেশে অন্নকষ্ট, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি দেখা দিবে অর্থাৎ প্রকৃতি অগ্রসর হইয়া জনসংখ্যার চাপ কমাইয়া পুনরায় খাতোৎপাদন এবং জনসমষ্টির মধ্যে সমতার স্থাপ্তি করিবে। দ্বিতীয়ত, কাম্য জনসংখ্যাতত্ত্বের (Theory of Optimum Population) সমর্থকগণ জনসংখ্যার সমস্তকে জাতীয় এবং মাথাপিছু আয়ের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া থাকেন। জনসংখ্যা কাম্য আয়তনের হইলে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় সর্বাধিক এবং উৎপাদন ব্যয় সর্বনিম্ন হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলেও জনাধিক্য ঘটে নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইলে জনাধিক্য ঘটয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে।

ম্যালথাসের মতে জনাধিক্য একটি চূড়ান্ত (absolute) পর্যায়। কিন্তু কাম্যতত্ত্ব অনুসারে জনসংখ্যা কোন চূড়ান্ত অবস্থা বুঝায় না, আপেক্ষিক অবস্থা নির্দেশ করে। যে পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহৃত হইতেছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে আজ যে জনসংখ্যাকে অতিরিক্ত বলিয়া মনে হইতেছে আগামীকাল নূতন প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কৃত হইলে তাহা আর অতিরিক্ত বলিয়া না-ও মনে হইতে পারে। এই মতবাদের সমর্থকগণ জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র খাতোৎপাদনের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার না করিয়া দেশের সামগ্রিক সম্পদের (অর্থাৎ জাতীয় আয়) পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করেন।

ম্যালথাসপন্থীগণ মনে করেন যে, ভারতে জনাধিক্য ঘটয়াছে। এই যুক্তির সমর্থনে নানা প্রমাণ এবং তথ্য উপস্থাপিত করা হইয়াছে।

প্রথমত, ভারতে জনসংখ্যা খাতোৎপাদন অপেক্ষা দ্রুতগতিতে বাড়িতেছে। ১৯২১ সাল হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু কৃষিত জমির পরিমাণ মাত্র ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আর এই সময়ের মধ্যে কৃষিপদ্ধতির উন্নয়ন করিয়া জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধিরও কোন প্রচেষ্টা করা হয় নাই।

দ্বিতীয়ত, ম্যালথাসের মতে খাত ঘাটতি দেশে জনাধিক্যের প্রধান লক্ষণ। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেও

ভারতে খাণ্ডঘাটতি বর্তমান ছিল। ১৯৪৩ সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় হইতেই এই ধারণা বন্ধমূল হয় যে, ভারতে খাণ্ডাভাব রহিয়াছে এবং বিদেশ হইতে নিয়মিতভাবে খাণ্ড আমদানি করিতে না পারিলে খাণ্ডের যোগানে ঘাটতি দেখা দিবে। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে খাণ্ড ঘাটতির পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের তুলনায় শতকরা ৭ ভাগ। খাণ্ডশস্ত্র অনুসন্ধানকারী কমিটির মতে খাণ্ডঘাটতি মিটাইবার জন্ত প্রতি বৎসর ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাণ্ডশস্ত্র আমদানি করিতে হইবে।

তৃতীয়ত, উচ্চ জন্মহার এবং মৃত্যুহার জনাধিক্যের লক্ষণ। ভারতে অগ্রাণ্ড পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই অধিক। ভারতে বর্তমানে জন্মহার ও মৃত্যুহার প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৪০ এবং ২৭।

চতুর্থত, প্রাকৃতিক নিরোধের (positive checks) প্রাদুর্ভাব জনাধিক্যের সূচনা করে। ম্যালথাসের মতে জনসংখ্যা খাণ্ডসরবরাহকে অতিক্রম করিয়া গেলে দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিগ্রহ, আগ্নেয়তা প্রভৃতি দেখা দিবে অর্থাৎ প্রকৃতি অগ্রসর হইয়া জনাধিক্যের চাপ হ্রাস করিবে। ম্যালথাস উল্লিখিত প্রাকৃতিক নিরোধ ভারতে প্রাত্যহিক ঘটনা।

পঞ্চমত, জনাধিক্যই দেশের ব্যাপক বেকার সমস্তার কারণ বলিয়া মনে হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেশে ৬০ লক্ষের জায় বেকার ছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বেকারের সংখ্যা হইবে ৯০ লক্ষ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে ১ কোটি ২০ লক্ষ বেকার হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ভারতের মোট বেকারের সংখ্যা হইবে ১ কোটি ৬০ লক্ষ। ইহা ব্যতীত কৃষিক্ষেত্রে ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যাও প্রভূত।

ভারতীয় অর্থনীতির সংগঠিত এবং অসংগঠিত এই দুইটি বিভাগ বিশ্লেষণ করিলে জনাধিক্য সমস্তার স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ভারতীয় অর্থনীতিতে যে সীমিত সুসংগঠিত শিল্প-বিভাগ রহিয়াছে সেখানে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্ধিত আয়ের একাংশ খাণ্ড ক্রয় করিতে ব্যয় হইয়া যাইবে। দ্রুত শিল্পায়নের ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রটি সম্প্রসারিত হইয়া খাণ্ডের চাহিদা বৃদ্ধি করিবে। ঐ চাহিদা মিটাইবার জন্ত কৃষিবিভাগের বিক্রয়যোগ্য উদ্ধৃত্ত ক্রমশ বাড়াইতে হইবে। কিন্তু এই অসংগঠিত কৃষিবিভাগেই খাণ্ডের যোগানের তুলনায় জনসংখ্যা অতিরিক্ত। কৃষিবিভাগে যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়ন না করা যায় তাহা হইলে খাণ্ড সরবরাহ এবং জনসংখ্যার মধ্যে ভারসাম্য আসিবে না।

যাঁহারা কাম্যজনসংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তাঁহাদের মতে ভারতে জনাধিক্য ঘটে নাই। তাঁহারা তাঁহাদের বক্তব্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেন।

প্রথমত, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অগ্রাণ্ড দেশের তুলনায় বেশি নয়। ভারতে জনসংখ্যা বৎসরে ২.১৬ শতাংশ হারে বাড়িতেছে। অষ্ট্রেলিয়া এবং ক্যানাডায় জনসংখ্যা যথাক্রমে ২.৩ এবং ২.৫ শতাংশ হারে বাড়িতেছে। অপরপক্ষে ভারতে মৃত্যুহার অগ্রাণ্ড

দেশের তুলনায় অনেক উচ্চ। দ্বিতীয়ত, ভারতে জনঘনত্ব পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় কম। ভারতে প্রতি বর্গমাইলে ৩৮৪ জন লোক বাস করে কিন্তু ইংলণ্ডে প্রতি বর্গমাইলে ৫৩৬ জন, জাপানে প্রতি বর্গমাইলে ৫৭২ জন এবং জার্মানীতে প্রতি বর্গমাইলে ৪৫০ জন লোক বাস করে। তৃতীয়ত, ভারতে জনগণের মাথাপিছু আয় ধীরে ধীরে বাড়িয়া চলিয়াছে। লর্ড কার্জনের হিসাবানুযায়ী ১২০০ সালে ভারতে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল ৩০ টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩২৬ টাকা হইয়াছে। চতুর্থত, জনাধিক্য একটি আপেক্ষিক ধারণা। ভারতে চূড়ান্ত জনাধিক্য ঘটে নাই, তবে বর্তমানে ব্যবহৃত সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে আপেক্ষিক জনাধিক্য ঘটিয়াছে। ভারতে যে পরিমাণ অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে তাহার পূর্ণ ব্যবহার হইলে বর্তমান জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি জনসংখ্যাকে পোষণ করা যাইবে।

শেষ যুক্তিটি ব্যতীত কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের সমর্থকদিগের অগ্রাগ্র যুক্তিগুলি সন্দেহভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অগ্রাগ্র পাশ্চাত্যদেশের তুলনায় কম হইলেও মোট বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই বেশি—বৎসরে ৮০ লক্ষের গ্রায়া। অগ্রাগ্র পাশ্চাত্য দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ভারতের তুলনায় অধিক হইলেও উহাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার জনসংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা অনেক বেশি। দ্বিতীয়ত, শিল্পোন্নত দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি তাহার কারণ উহার অধিক পরিমাণ জনসংখ্যা পোষণ করিতে পারে কিন্তু ভারতের গ্রায়া কৃষিপ্রধান দেশে জনঘনত্ব বৃদ্ধি পাইলে কৃষিতে ছদ্মবেশী বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে চূড়ান্ত জনাধিক্য না ঘটিলেও আপেক্ষিক অর্থে জনাধিক্য ঘটিয়াছে। গ্রামসেবকের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনার বার্তা গ্রামের কৃষকদিগের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনার প্রচারকার্য চালাইতে হইবে আর একই সঙ্গে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কৃষি হইতে ছদ্মবেশী বেকারদের সরাইয়া অগ্রা উৎপাদনশীল কাজে নিয়োগের কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। কৃষিবিভাগের অচলাবস্থার ফলেই ভারতে জনসমস্যা ঘটিয়াছে। মাদ্রাসা আমলের কৃষিপদ্ধতি এবং জনগণের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্ভবপর হয় নাই।

অর্থনীতির অচলাবস্থায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা সত্যই বিপজ্জনক। ব্রিটিশ শাসনকালে সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করিবার এবং কৃষিক্ষেত্রকে উন্নত করিবার কোন প্রচেষ্টাই করা হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সর্বপ্রথম জনাধিক্য সমস্যার মূলে আঘাত করেন। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-উন্নয়ন কার্যসূচী এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়ন কার্যসূচীর উপর অগ্রাধিকার দিয়া দীর্ঘকালের অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-সংগঠন এবং শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচী একই সঙ্গে গ্রহণ করিয়া দ্বিমুখী অভিযান চালানো হইয়াছে। উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সাহায্যে ভারত সরকার সূচু এবং যথাযথ

ভাবে দেশের সকল সম্পদ ব্যবহার করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সম্পদের যথাযথ ব্যবহার হইলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং দেশ অধিক সংখ্যক জনসংখ্যাকে পোষণ করিতে পারিবে। অত্যাধিক বলা যায় যে, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এবং দক্ষতা সহকারে সম্পদের ব্যবহার হইলে নূতন কাম্য জনসংখ্যার সৃষ্টি হইবে—ইহা পূর্বতন কাম্য জনসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশি হইবে।

ভারতে জনসংখ্যার আয়তনই যে বিপুল তাহাই একমাত্র সমস্যা নয়—বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণও সমান বিপজ্জনক। ১৯৪১ হইতে ১৯৫১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ হইতে ১৯৬১ সালের মধ্যে জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার ভারতের জনাধিক্য সমস্যাকে তীব্রতর করিয়াছে। শুধুমাত্র কৃষি-পুনর্গঠন এবং শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যা সমস্যার সমাধান করা যাইবে না—দেশব্যাপী পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীও গ্রহণ করিতে হইবে।

পরিবার পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ (Family Planning in the Five Year Plans) : প্রথম পরিকল্পনাকালে সর্বপ্রথম আমাদের দেশে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরিবার পরিকল্পনার কথা সরকারী পর্ষায়ে আলোচিত হয়। প্রথম পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনার জন্ত মাত্র ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। দেশব্যাপী প্রয়োজনের তুলনায় এই ব্যয়বরাদ্দ অত্যন্ত নগণ্য। অবশ্য এই সময় পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হইয়াছিল।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জনসংখ্যা পরিকল্পনার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ৫০ হাজার লোক পিছু একটি করিয়া পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবার পরিকল্পনা খাতে ৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এবং ঐ সময়ে নগরাঞ্চলে ৫৪৯ এবং গ্রামাঞ্চলে ১১০০টি পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর জন্ত ২৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনায় ঐ খাতে ৯৫ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের চাবিকাঠি রহিয়াছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর সফল রূপায়নের উপর।

জনসংখ্যা সম্পর্কে সরকারী নীতি (Population Policy for India) : দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান রহিয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য হইল জনগণের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধি। সাধারণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার পূর্বে জনসংখ্যা সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র জনসংখ্যার বর্তমান আয়তন জানিলেই চলিবে না, কি হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাও

জানিতে হইবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার এবং সম্পদ ব্যবহারের সহিত সমতলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি কাম্য। জনসংখ্যা সম্পর্কে সুসম্বদ্ধ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দুইটি : (ক) উৎপাদনশীল কাজে বর্তমান জনসংখ্যার নিয়োগের ব্যবস্থা করা এবং (খ) নবজন্মের উত্তাল তরঙ্গ রোধ করা।

দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করিবার জ্ঞাত ভারতে গণতান্ত্রিক, ব্যাপক এবং সক্রিয় জন্মনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ভয়াবহ হার যদি প্রতিরোধ না করা যায় তাহা হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ব্যাহত হইবে। দেশের উন্নয়নের ফলে যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা উদ্ভূত জনগণের খাণ্ডসংগ্রহে ব্যয়িত হওয়ায় দেশবাসী উন্নয়নের কোন সুফলই ভোগ করিতে পারিবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার ঠায়া চতুর্থ পরিকল্পনাও “জনসংখ্যা-বিস্ফোরণের” (population explosive period) পর্যায়ের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবে। এই পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হইল উচ্চ জন্মহার এবং স্বল্প মৃত্যুহার। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে জনসংখ্যার উন্নয়নমূলক কার্যসূচীর দরুন অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম পর্যায়ে মৃত্যুহার হ্রাস পায়—জন্মহার হ্রাস পাইতে অনেক সময় লাগে। পরিকল্পনাধীন সময়ে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের যে বিপদাশঙ্কা আছে সে সম্পর্কে আমাদের পরিকল্পনা-রচয়িতাগণের সচেতন থাকা উচিত। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জ্ঞাত পরিবার পরিকল্পনার নীতি সরকারীভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। তিনটি সন্তানই পরিকল্পিত পরিবারের আদর্শ। অবশ্য পরিবার পরিকল্পনা কার্যকররূপে “জনসংখ্যার বিস্ফোরণ” প্রতিরোধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

সকল দিক হইতে জনসংখ্যার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইতে ভারতের পক্ষে অধিকতর সক্রিয় এবং বলিষ্ঠ জনসংখ্যা সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় “জনসংখ্যা বিস্ফোরণ” পর্যায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জ্ঞাত সর্বাঙ্গিক নীতি গ্রহণ করিয়া উহাকে রূপায়িত করিতে হইবে। জাতীয় জননীতি রচনার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে :

(ক) বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জনসংখ্যা সম্পর্কে এরূপ পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহাতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হইবে এবং অধিক সংখ্যক জনগণ যথাশীঘ্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা ভোগ করিতে পারে।

(খ) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জ্ঞাত এক ব্যাপক এবং সুসম্বদ্ধ কর্মসূচী গ্রহণ করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে জন্মহার প্রতি হাজারে ৪০ হইতে হ্রাস করিয়া ২৫ করিতে হইবে।

(গ) জনসংখ্যা বিশেষজ্ঞ, পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ এবং অর্থনীতিবিদগণকে লইয়া একটি জনসংখ্যা পরিকল্পনা কমিশন গঠন করিতে হইবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রতিরোধ

করিবার জন্য উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করিয়া উহাকে কার্যে রূপায়িত করার দায়িত্ব এই কমিশনের।

(ঘ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত পরিবার পরিকল্পনাকে যুক্ত করিয়া আন্দোলনকে জোরদার করিতে হইবে। পরিকল্পিত পরিবার পরিকল্পিত অর্থনীতির ভিত্তিস্তম্ভ স্বরূপ, জনগণের মধ্যে এই চেতনার সৃষ্টি করিতে হইবে।

(ঙ) গ্রামাঞ্চলে অধিক মাত্রায় পরিবার পরিকল্পনাকেন্দ্র স্থাপন করিতে হইবে। প্রতি চারিটি গ্রামে একটি করিয়া পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র থাকা প্রয়োজন।

(চ) সমগ্র দেশে, বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক-শিক্ষা প্রবর্তন করা প্রয়োজন, কারণ শিক্ষাই জনগণের কুসংস্কার দূর করিয়া দৃষ্টি প্রসারিত করিতে সহায়তা করিবে এবং পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করিবে।



ত্রয়োদশ অধ্যায়

কৃষি উৎপাদন, সরকারী নীতি এবং খাদ্য সমস্যা

(Agricultural Production, Government Policy and Food Problem)

ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকিলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, খরা, অনিয়মিত বারিপাত, শস্ত্যনাশক কীটপতঙ্গের উৎপাত প্রভৃতি কারণে একর প্রতি কৃষি উৎপাদন অত্যন্ত স্বল্প এবং দেশ ক্রমাগতই খাদ্য আমদানির উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেছে। দুর্ভিক্ষের পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভাব এবং ক্রমাগত খাদ্য ঘাটতি ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। ১৯৫১ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২০ লক্ষ টন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভের উপর অগ্রাধিকার দেয়। ইহার ফলে প্রথম পরিকল্পনাকালে খাদ্যের উৎপাদন ১ কোটি ১০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পায়। খাদ্যে মোটামুটিভাবে স্বয়ংস্বরতা অর্জন করায় নিয়ন্ত্রণ উঠিয়া যায়। কিন্তু এই অবস্থা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের আবির্ভাবে পুনরায় বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি করিতে হয় এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যে তীব্র উর্ধ্বগতি দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিকর্মসূচীর উপর যথোচিত অগ্রাধিকার দেওয়া হয় নাই বলিয়া উহার রদবদল করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে ব্যাপকভাবে খরা দেখা দেওয়ায় খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন ১০ শতাংশ হ্রাস পায়। ১৯৫৮-৫৯ সালে খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে (১৯৫৯-৬০) অনিয়মিত বারিপাতের দরুন পুনরায় খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পায়। যাহা হউক, ১৯৬০-৬১ সালে অবস্থার কিছু উন্নতি ঘটে এবং খাদ্যশস্ত্রের মোট উৎপাদন হয় ৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টন।

তৃতীয় পরিকল্পনার মধ্যকালীন পর্যালোচনা হইতে জানা যায় যে, ১৯৬১-৬২ সালে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পায় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটে। ১৯৬২-৬৩ সালে খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী দুই বৎসরে অবস্থার কিছু উন্নতি হয় কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে অবস্থার পুনরায় অবনতি ঘটে। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট খাদ্যশস্ত্রের উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টন, ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি ২ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়, ১৯৬৪-৬৫ সালে আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টন হয় কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা হ্রাস পাইয়া

৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনে নামিয়া আসে। ১৯৬৬-৬৭ সালে উৎপাদন সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ৭ কোটি ৭০ লক্ষ টনে পৌঁছায়। উপযুক্ত পরি দুই বৎসর থরা এবং অনিয়মিত বারিপাতের দরুন কৃষিউৎপাদনের অবস্থা নৈরাশাজনক। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৬ শতাংশ ধরা হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত-উৎপাদন বৃদ্ধি মাত্র ২ শতাংশ হারে হইয়াছে।

ভারতীয় কৃষির এই অধর্ অচলাবস্থা বিশেষ উদ্বেগের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মনে হয় কৃষি সংগঠনের ত্রুটি ভারতে কৃষি উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। উন্নতবীজ, সার, কীটনাশক ঔষধপত্র এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ-আবাদ করিতে পারিলে কৃষি উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা যাইবে।

ভারতীয় কৃষির সমস্যাসমূহ (Main Problems of Indian Agriculture) : ভারতীয় কৃষির সমস্যা প্রধানত দুইটি : প্রথমত, এই বিরাট দেশে মৃত্তিকা, জলবায়ু, এবং রোপণ পদ্ধতির তারতম্যের জ্ঞাত চাষের পদ্ধতি প্রতি রাজ্যেই ভিন্ন ধরনের। বৃটিশ যুগে সুসম্বদ্ধ কৃষি পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজ্যে কৃষি প্রণালীর মধ্যে একরূপতা আনিয়নের কোন চেষ্টা করা হয় নাই। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহে সর্বপ্রথম কৃষি উন্নয়নের প্রতিবন্ধকগুলিকে দূর করিয়া কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিবার আন্তরিক চেষ্টা করা হয়।

দ্বিতীয়ত, অগ্রাগ্র দেশের তুলনায় ভারতে একর প্রতি উৎপাদন অত্যন্ত কম। নিম্ন-লিখিত কারণগুলি স্বল্প উৎপাদনশীলতার জ্ঞাত দায়ী :

(ক) কৃষকের উন্নত সার কিনিবার অক্ষমতা এবং ক্রমাগত জমির অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে উহার উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশই হ্রাস পাইতেছে।

(খ) দোফসলী এবং পাল্টা ফসল উৎপাদনের (rotation of crops) সুবিধা না থাকায় উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাইতেছে।

(গ) মৌসুমী বারিপাতের অনিশ্চয়তা এবং পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থার অভাব ভারতীয় কৃষির বৃহত্তর সমস্যা।

(ঘ) বলিষ্ঠ বলদ, উন্নত বীজএবং আধুনিক কৃষি-যন্ত্রপাতির অভাবে উন্নত প্রণালীতে চাষ করা যায় না।

(ঙ) জমির খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার দরুন জোতের আয়তন ক্রমশ ক্ষুদ্র হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার ফলে অপচয়, উৎপাদনের স্বল্পতা এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ব্যাক ব্যবস্থার অভাবে ঋণের জ্ঞাত কৃষককে গ্রাম্য মহাজনের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং অসং প্রকৃতির মহাজনেরা কৃষকদের দুরবস্থার সুযোগ লইয়া তাহাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করে। আর্থিক দুরবস্থার দরুন চাষের উন্নয়নকল্পে কৃষকেরা কিছুই করিতে পারে না এবং অনেকক্ষেত্রেই ঋণের দায়ে মহাজনের নিকট জমি বিক্রয় করিতে

বাধ্য হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, গ্রামীণ ব্যাঙ্কব্যবস্থার অভাব পরোক্ষভাবে ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার জন্ম দায়ী।

(চ) পরিবহণ ও সংসরণের অবস্থা, ফসল সংরক্ষণের অভাব এবং ফড়িয়ার অস্তিত্বের দরুন কৃষকদের অবস্থার বিশেষ অবনতি ঘটয়াছে। যে বৎসর ফসল পাওয়া যায় না সেই বৎসর কৃষকেরা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় আবার ভালো ফসল হইলেও তাহারা লাভবান হয় না—মুনাফার মোটা অংশটি ফড়িয়ারা আত্মসাৎ করিয়া লয়।

(ছ) জমিদারী প্রথার মতো অনমনীয় ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা জমিদারের আয় এবং কৃষকের দারিদ্র্য বৃদ্ধি করিয়াছে। ফসল হইতে লব্ধ নীট আয়ের মাত্র ২০ শতাংশ কৃষক পায় আর বাকী ৮০ শতাংশ যায় জমিদারের ঘরে — যাহার সহিত জমির কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই।

প্রতিবিধান (Remedies) : ভারতীয় কৃষি উন্নয়নের প্রধান বাধা হইতেছে মূলধনের অভাব। কৃষি উন্নয়নের জন্ম সাংগঠনিক ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত অনিশ্চিত মৌসুমী বারিপাতের উপর কৃষির একান্ত নির্ভরশীলতা কমাইতে হইবে। ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাংগঠনিক পরিবর্তনের অন্তর্ভুক্ত। জমিতে কৃষকের স্বত্ব স্বীকার এবং সমবায় চাষ প্রবর্তন করিয়া কৃষি সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। নগর প্রবাসী জমিদার শ্রেণীর উচ্ছেদ, গ্রামীণ ঋণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং ফসল সংরক্ষণের সুব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষির প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন সাধিত হইবে।

সাংগঠনিক পরিবর্তনের সহিত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন। কৃষি যন্ত্রিকরণ করিবার পূর্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসম্বদ্ধ জোতের সংহতি সাধন করিতে হইবে। কৃষি যন্ত্রিকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে এবং বহু কৃষি-শ্রমিক উদ্ধৃত হইয়া পড়িবে। এই সকল অতিরিক্ত শ্রমিকদিগকে অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিচ্ছিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি উন্নয়নের দুরতিক্রমণীয় প্রতিবন্ধকগুলি অতিক্রম করা যাইবে না। কৃষি পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে একই সঙ্গে কৃষি এবং শিল্প সম্প্রসারণের জন্ম সূক্ষ্মদ কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যদি জমির অতিরিক্ত লোক শিল্পে কর্মসংস্থানের সুবিধা পায় তবেই জোতের সংহতি সাধন এবং যন্ত্রিকরণ করা চলিবে। জাতীয় সরকার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সূক্ষ্মদ পদ্ধতিতে কৃষি উন্নয়নের পথে অগ্রসর হইয়াছে।

সরকারী নীতি এবং কৃষি-পরিকল্পনা (Government's Policy and Agricultural Planning) : ব্রিটিশ শাসকগণ বহুদিন যাবৎ ভারতীয় কৃষির প্রতি উদাসীন ছিলেন। ১৯৩৭ সালে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় হইতেই প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষৎ কৃষি উন্নয়নের জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু সামগ্রিক কৃষি-পরিকল্পনার অভাবে অগ্রগতি আশানুরূপ হয় নাই। কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারের কার্যাবলী ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার এবং ঋণভার লাঘবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় খাত আমদানি বন্ধ হওয়ায় খাত উৎপাদনের ব্যাপারে দেশের অসহায় অবস্থা স্পষ্ট হইয়া উঠে।

তীব্র খাত সংকটের সম্মুখীন হইয়া ১৯৪৩ সালে সরকার “অধিক খাত ফলাও” (Grow-More-Food Campaign) আন্দোলন শুরু করেন। এই অভিযান আংশিকভাবে সফল হইলেও খাতের উৎপাদন পূরণ করিতে পারে নাই। এই সময় খাত সরবরাহে বরাদ্দ বণ্টনিত না হওয়ায় খাতের চাহিদা নামাইয়া রাখা হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার ফলে খাতসমস্যা আরো তীব্র আকার ধারণ করে কারণ কৃষিপ্রধান উদ্ভূত অঞ্চলগুলি (যেমন-পূর্ব বাংলা, পশ্চিম পাকিস্তান) পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়।

খাতশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া খাতের আমদানি হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৪৯ সালে খাত শস্যসম্পূর্ণতার অভিযান শুরু করেন। ইহার পর ১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাপক কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষিউৎপাদনের উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উন্নতির জন্য ২৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি-সংস্কার এবং সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের কোন কোন অংশে সাফল্যের সহিত জাপানী পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হয়। ইহা ছাড়া এই সময় কতকগুলি বহুমুখী নদী পরিকল্পনা, ভূমিক্ষয় নিবারণ এবং পতিত জমি পুনরুদ্ধারের কার্যসূচীও গ্রহণ করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে খাত উৎপাদন ১ কোটি ১০ লক্ষ টন এবং কৃষি উৎপাদন ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রথম পরিকল্পনা দেশে প্রথম সর্বতোমুখী কৃষি পরিকল্পনার প্রথম প্রয়াস। প্রথম পরিকল্পনা রচনার সময় কোন ব্যাপক কৃষিক্ষণ পরিকল্পনা না থাকায় ভূমিনীতির সহিত কৃষিক্ষণ নীতির কোন সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর হয় নাই। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ সমবায় চাষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ঐ আন্দোলনকে জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Co-operative Village Management) প্রকল্পের সৃষ্টি করেন। কিন্তু সরকারের অসমর্থ কার্যসূচীর অভাবে সমবায় কৃষি আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করে নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়ন অপেক্ষা শিল্পায়নের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মোট ৪৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে মাত্র ২৭৬ কোটি টাকা কৃষিক্ষেত্রে বরাদ্দ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষি উৎপাদন প্রায় ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই সময়ে খাতশস্যের উৎপাদন ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি টন হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১০ কোটি টন হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল।

তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের (ভূমি সংরক্ষণ, সমবায়, ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ জলসেচ প্রকল্প ইহার অন্তর্ভুক্ত) উন্নয়নের জন্ত ১২৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। কিন্তু কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। এই সময়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ৬ শতাংশ হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল কিন্তু প্রকৃত বৃদ্ধির হার হইয়াছিল মাত্র বাৎসরিক ২ শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ-বৎসরে খাত্তশস্ত্রের মোট উৎপাদন ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন হইয়াছিল। চরিয় লয়।

ভারতীয় কৃষি-পরিকল্পনা রচয়িতাদের একথা স্বরণ রাখা প্রয়োজন এবং কৃষিকল্পনার দীর্ঘ পনেরো বৎসরেও কৃষির সাংগঠনিক পরিবর্তন আশাহীন হয় নাই আর এই কারণেই কৃষি অনগ্রসর রহিয়াছে। সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন করিয়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাই আশু প্রয়োজনীয় বিষয়। আর ইহার জন্ত সর্বাঙ্গিক সংগঠন প্রয়াস অপরিহার্য। প্রথম পরিকল্পনা এই বিষয়ে প্রাথমিক পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় অবস্থার বিশেষ উন্নতি না হইবার কারণ—ইহাদের কৃষিকর্মসূচীতে সমন্বয়ের বিশেষ অভাব ছিল। সামগ্রিকভাবে কৃষিক্ষেত্রে তৃতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতি বিশেষ হতাশাব্যঞ্জক। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে কৃষি উৎপাদন-সূচী দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরের কৃষি উৎপাদন-সূচী অপেক্ষা কম হইয়াছিল। কৃষি-পুনর্গঠনের গুরুত্ব আশু উপলব্ধি করিয়া গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিবেগ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে নূতন কৃষি-নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

প্রাক-পরিকল্পনা যুগের খাত্তনীতি (Food Problem and Policy up to the First Plan Period) :—১৯৪২ সালে কেন্দ্রীয় খাত্ত দপ্তর স্থাপনের পর খাত্ত সমস্তার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯৪৩ সালে বাংলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের পর সরকার খাত্ত সমস্তা সমাধানে মনোযোগী হন। অবশ্য কোন সুসম্বদ্ধ সামগ্রিক উন্নয়ন মূলক পরিকল্পনা দ্বারা কৃষিব্যবস্থার পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই। খাত্ত সমস্তা সমাধানের দীর্ঘকালীন নীতি হিসাবে কৃষ্যমচারী কমিটির সুপারিশগুলি গ্রহণ করা হয়। খাত্ত বরাদ্দ এবং নিয়ন্ত্রণ স্বল্পকালীন কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৪৩ সালে কৃষ্যমচারী কমিটির রিপোর্টে উৎসাহিত হইয়া প্রাদেশিক সরকারসমূহ “অধিক খাত্ত ফলাও” অভিযান আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল :

- | | |
|-----------|---|
| অধিক | (ক) নূতন এবং পতিত জমিতে চাষের পত্তন করা, (খ) উন্নত |
| খাত্তফলাও | ধরনের বীজ ও সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং (গ) জলসেচ ব্যবস্থার |
| আন্দোলন | সম্প্রসারণ। অধিক খাত্ত ফলাও আন্দোলনকে সফল করিবার জন্ত |
| | কেন্দ্রীয় সরকার ঋণ এবং সাহায্য বাবদ ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করেন। |

কিন্তু কৃষিউন্নয়ন এবং পুনর্গঠনের কোন সুসম্বদ্ধ নীতি না থাকায় এই আন্দোলন প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। এই আন্দোলনের ব্যর্থতার আর একটি কারণ যে, ইহাকে কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার মত কোন সংস্থা ছিল না।

১৯৪৩ সালের ছুভিফের পর ওয়াশেল সরকার খাণ্ড নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সূচনা করেন। ১৯৪৭ সালে যখন ব্রিটিশ সরকার ভারত পরিত্যাগ খাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করেন তখন ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ ভারতবাসী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আওতায় অসিয়াছিল। এই সময় দুর্নীতি, মূনাফাশিকার এবং কালোবাজারী ব্যাপকভাবে দেখা দেয়।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার খাণ্ডনীতির ক্ষেত্রে ক্রমিক বিনিয়ন্ত্রণ প্রথা (Gradual Decontrol Policy) গ্রহণ করেন। এই নীতির সহিত অধিক খাণ্ড ফলাও আন্দোলন এবং খাণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভিযান যুক্ত করা হয়। পরে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া সমস্যার মূলে আঘাত করা হয়।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজীর নির্দেশে নিয়ন্ত্রণ প্রথা তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু ইহার ফলে খাণ্ডমূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রথার পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। যাহা হউক, খাণ্ডে স্বয়ংসম্পূর্ণতার অভিযান সাফল্য লাভ করায় এবং প্রথম পরিকল্পনার খাণ্ডোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হওয়ায় পুনরায় ১৯৫২ সালের মধ্যভাগ হইতে বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৪ সালের ১০ই জুলাই তারিখের মধ্যে সমগ্র দেশ হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর অধিক খাণ্ড ফলাও অভিযানকে প্রথম পরিকল্পনার সমাজ উন্নয়ন এবং কৃষিকর্মসূচীর সহিত যুক্ত করা হয়। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় খাণ্ডশস্ত্র নীতি কমিটির (Second Foodgrains Policy Committee) সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া অধিক খাণ্ড ফলাও অভিযানকে পুনর্গঠিত করা হয়। এই পুনর্গঠিত অধিক খাণ্ড ফলাও আন্দোলন নিবিড় চাষ পদ্ধতির উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে এবং প্রতি-রাজ্যের অতিরিক্ত বার্ষিক খাণ্ডোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করিয়া দেয়। প্রথম পরিকল্পনা প্রবর্তনের পূর্বে তদানীন্তন খাণ্ড ও কৃষিমন্ত্রী শ্রী কে. এম. মুন্সী খাণ্ডে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অভিযান শুরু করিয়াছিলেন। সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণ, কীটের আক্রমণ হইতে ফসল রক্ষা এবং ফসল প্রতিযোগিতার বন্দোবস্ত এই অভিযানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪২-৫০ এবং ১৯৫০-৫১ সালে অতিরিক্ত ৭২ লক্ষ টন খাদ্যশস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হইলেও প্রকৃত উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রার মাত্র ২৫ শতাংশ হইয়াছিল।

প্রথম পরিকল্পনায় কৃষি এবং সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর জন্ত ৩৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দৈনিক মাথাপিছু ১৪ আউন্স খাণ্ডগ্রহণের ভিত্তিতে প্রথম পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ৭৬ লক্ষ টন খাণ্ডশস্ত্র উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। মৌসুমীবায়ুর আবহুকূল্য এবং পরিকল্পিত কৃষি কর্মসূচী গ্রহণ করার ফলে প্রকৃত উৎপাদন নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ছাড়াইয়া যায়। মোট উৎপাদন ৫ কোটি ৪০ লক্ষ টন হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টন হয়। ইহার ফলে খাণ্ড আমদানি ৪৭ লক্ষ টন (১৯৫১ সাল)

হইতে হ্রাস পাইয়া ১৯৫৫ সালে ৭ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। অবস্থা দেখিয়া সকলেরই একথা মনে হইয়াছিল যে, আমরা খাদ্য-সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছি। এই সময় খাদ্য-নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়।

উন্নয়নশীল ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির ভূমিকা (Importance of Foodgrains in a Developing Economy like India) : ভারতের গ্রায় উন্নয়নকামী কৃষিপ্রধান দেশে খাদ্যের এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। যে হারে শিল্পায়ন ঘটিবে তাহা প্রধানত নির্ভর করে খাদ্যশস্যের বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূতের উপর। শিল্পায়নের ফলে কৃষি-বহির্ভূত ক্ষেত্রের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় খাদ্যের চাহিদা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে। দ্রুত শিল্পায়ন প্রক্রিয়া মূল এবং ভারী শিল্পের উপর অধিক অনুপাতে বিনিয়োজিত হইয়া অর্থনীতির বিভিন্নক্ষেত্রে আংশিক ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টি করে। ইহার ফলে ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে ঘাটতি দেখা দিবে এবং খাদ্যসমগ্র্য তীব্র আকার ধারণ করিবে। সুতরাং কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্ত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা খাদ্যোৎপাদনের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিয়াছে। ১৯৫১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৬ কোটি ১০ লক্ষ, ১৯৬১ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ হয়। অর্থাৎ এই দশ বৎসরে জনসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লক্ষ বৃদ্ধি পায়—ইহা গ্রেট ব্রিটেন অথবা পশ্চিম জার্মানীর মোট জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। ‘এ্যালিস ইন ওয়াগার ল্যান্ড’ গল্পের রেড্‌কুইন-এর মত ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইবার জন্ত চলার গতিবেগ ক্রমশই বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করিতেছে। ১৯৬০-৬১ সালে জনসংখ্যা ছিল ৪৩ কোটি ২০ লক্ষ আর খাদ্যোৎপাদন ছিল ৭ কোটি কোটি ২৭ লক্ষ টন। ইহা ছাড়া আমদানির পরিমাণ ছিল ৩০ লক্ষ টন। সুতরাং মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ৮ কোটি ৩০ লক্ষ টন। মোট খাদ্যশস্য মোট জনগণের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলে মাথাপিছু খাদ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭ আউন্স। স্বাস্থ্যবিদগণের মতে কমপক্ষে একজনের ২৫ আউন্স খাদ্যের প্রয়োজন। এই হিসাবানুযায়ী বৎসরে মাথাপিছু ৭ মন খাদ্য প্রয়োজন কিন্তু পাইত মাত্র ৫ মন। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রারম্ভে পরিকল্পনা কমিশন হিসাব করেন যে, ভারতের ৬০ শতাংশ ব্যক্তি গড় মাথাপিছু মাসিক ২৫ টাকা অপেক্ষা কম উপার্জন করে; অপরপক্ষে স্বাস্থ্যবিদগণের মতে স্বাস্থ্যের সর্বনিম্ন মান বজায় রাখিতে ব্যক্তির মাসিক ৩৫ টাকার খাদ্য প্রয়োজন। মিঃ ডি কাষ্ট্রো (De Castro) তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ *Geography of Hunger*-এ প্রমাণ করিয়াছেন যে, ক্ষুধার্ত মানুষের প্রজনন ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক। ভারতের গ্রায় কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে ক্ষুধার বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালানো প্রয়োজন। ক্রমবর্ধমান জনগণের পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্ত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ফলে সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইহার সহিত জীবনধারণের প্রাথমিক প্রয়োজন হিসাবে খাতশস্ত্রের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের গ্রায় উন্নয়নকারী দেশে খাতোৎপাদনকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। ভারতে পরিকল্পিত উন্নয়নের প্রধান বাধা হইল খাত ঘাটতি যদি ইহা অপসারণ করিতে হয় তাহা হইলে কৃষি-উৎপাদন পদ্ধতি এবং কৃষির সাংগঠনিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

খাতসমস্যা ও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনা (Food Problem and Policy during the Second and Third Plans) : প্রথম পরিকল্পনায় ৭৬ লক্ষ টন অতিরিক্ত খাতোৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য ছিল। প্রথম পরিকল্পনায় খাতোৎপাদন আশাতিরিক্ত হওয়ার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় উহার উপর বিনিয়োগের অনুপাত হ্রাস করা হয়। প্রথমে মোট ১ কোটি টন খাতোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। কিন্তু ১৯৫৬ সালের মে মাসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিলের (National Development Council) অধিবেশনে এই লক্ষ্যমাত্রা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। কৃষিউন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দিলে জাতীয় উন্নয়ন ব্যাহত হইবে ইহা উপলব্ধি করিয়া পরিকল্পনা কমিশন খাতোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টন ধার্য করেন। এই সময় অবশ্য প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ টন—নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৫ লক্ষ টন কম। তৃতীয় পরিকল্পনায় খাতোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০ কোটি টনে ধার্য করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনার শেষ বৎসরে প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল মাত্র ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন। ১৯৬৩-৬৪ সালে খাতোৎপাদন ছিল ৮ কোটি ২ লক্ষ টন, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৪-৬৫ সালে ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে (১৯৬৫-৬৬ সালে) অবস্থার অবনতি ঘটে এবং উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনে নামিয়া আসে।

খাত ঘাটতির ফলে খাতশস্ত্রের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে। প্রধানত তিন কারণে খাতশস্ত্রের ঘাটতি দেখা দিয়াছে : (ক) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পশ্রমিকের আয়বৃদ্ধিজনিত ক্রমবর্ধমান চাহিদা, (খ) প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জন্ত খাতোৎপাদনের স্বল্পতা এবং (গ) উৎপাদনকারী ও ব্যবসায়ীর বিক্রয়যোগ্য খাত মজুত করার প্রবণতা বৃদ্ধি।

খাতঘাটতি প্রসঙ্গে খাতশস্ত্র অনুসন্ধানকারী কমিটির (Foodgrains Enquiry Committee, 1957) বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। এই কমিটি খাতসঙ্কটের তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন : (ক) উৎপাদনকারীগণ নিজেরা পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাত গ্রহণ করিতেছে, (খ) ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা চিন্তা করিয়া বর্তমান বিক্রয় হইতে বিরত থাকার প্রবণতা বৃদ্ধি এবং (গ) খাতশস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধির দরুন কৃষক এখন অল্প পরিমাণ শস্ত বিক্রয় করিয়া প্রয়োজনীয় পরিমাণ নগদ টাকা পাইতেছে।

এই কমিটির নির্দেশিত শেষ দুইটি কারণ আমাদের বিশ্লেষণের তৃতীয় কারণের সমর্থক। কিন্তু কমিটির প্রথম কারণটির পক্ষে সন্দেহাতীত প্রমাণ না পাওয়ার দরুন সাধারণভাবে ইহাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না। মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকেরা পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে পারে কিন্তু অধিকাংশ দরিদ্র কৃষক সম্পর্কে ইহা সত্য নয়।

১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাস হইতে ধান ও গমের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় সরকার ব্যাঙ্ক ঋণের সাহায্যে খাদ্যশস্যের ফটকা করবার বন্ধ করিবার জ্ঞপ্তি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। ব্যাঙ্ক ঋণ লইয়া খাদ্যশস্য প্রতিবিধান মজুত বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের মে মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই মর্মে বাণিজ্য-ব্যাঙ্কসমূহের উপর এক নির্দেশনামা জারি করে যে, ধান ও চালের জামিনে বন্ধকী মার্জিন (Margin requirements) বৃদ্ধি এবং ৫০,০০০ টাকার অধিক ঋণ মঞ্জুর বন্ধ করিতে হইবে। ১৯৫৭ সালের ৭ই জুন তারিখে খাদ্যশস্যের জামিনে বন্ধকী মার্জিন বৃদ্ধি করিয়া কমপক্ষে ৪০ শতাংশ করা হয়। পরে এই সম্পর্কে আইনগত ব্যবস্থা করা হয় যে কোন ব্যাঙ্ক ধান ও চালের জামিনে তাহার মোট ঋণের ৬৬ শতাংশ এবং অগ্রাণু খাদ্যশস্যের জামিনে তাহার মোট ঋণের ৭৫ শতাংশ অধিক দিবেন না। ঋণদানের উপর নানা ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হইলেও খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পায় নাই।

অগ্রাণু স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী হিসাবে বড় বড় চাল ব্যবসায়ীদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করা হয় এবং ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যদ্রব্য বণ্টনের উদ্দেশ্যে গ্রাম্যমূল্যের দোকান স্থাপন করা হয়। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে দেশে খাদ্যের অবস্থা পর্যালোচনা করা এবং সমস্তা সমাধানের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিবার জ্ঞপ্তি সরকার শ্রীঅশোক মেহ্‌তার সভাপতিত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংস্থার (Foodgrains Stabilization Organization) মাধ্যমে খাদ্যমূল্য স্থিতিকরণ নীতি অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন। গ্রাম্যমূল্যের দোকান অথবা সমবায় সমিতির মাধ্যমে খাদ্যদ্রব্য বণ্টন কমিটি সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল স্বল্প-মেয়াদী কর্মসূচী প্রধানত যোগানের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না যে, ইহার দ্বারা কোন স্থায়ী সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে। প্রাপ্তিযোগ্য খাদ্যশস্য কি পদ্ধতিতে বণ্টন করা যায় সেকথা চিন্তা করা অপেক্ষা প্রাপ্তিযোগ্য খাদ্যশস্যের পরিমাণ কি পদ্ধতিতে বৃদ্ধি করা যায় এবং কিভাবে অধিকতর চাহিদা দমন করা যায় তাহা চিন্তা করাই প্রয়োজনীয়। জ্বোতের উৎপাদন নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন; ইহার ফলে বড় বড় জ্বোতদারদের মজুত করিবার প্রবণতা হ্রাস পাইবে। ইহা ব্যতীত খাদ্য লইয়া ফাটকাবাজী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করিতে হইবে।

পরিশেষে, এ দেশে কৃষিউৎপাদন প্রধানত মৌসুমীবায়ুর গতিবিধির উপর নির্ভর

করে বলিয়া এখানে শস্যবীমা (Crop Insurance) অপরিহার্য। অনিশ্চিত আবহাওয়ার ফলে কয়েকজন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে শস্যবীমা পদ্ধতির মাধ্যমে উহা সকল কৃষক বিভিন্ন মাত্রায় ভাগ করিয়া নইতে পারিবে। শস্যবীমার মূল উদ্দেশ্য হইল কৃষককে বন্যা, খরা, অগ্নিসংযোগ অথবা শস্য হানিকর কীটের উপদ্রবের ক্ষতিকারক প্রভাব হইতে রক্ষা করা।

ইহা আশার কথা যে শস্যবীমা চতুর্থ পরিকল্পনার কৃষিকর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহা প্রথম পাঞ্জাবে প্রবর্তন করা হইবে এবং তথায় সম্ভাব্যজনক বলিয়া বিবেচিত হইলে অগ্রাগ্র রাজ্যেও প্রসারিত হইবে। প্রস্তাবিত শস্যবীমা পরিকল্পনায় বন্যা, খরা, শস্যনাশক কীটের ক্ষতি প্রতি কৃষকের ক্ষমতা বহির্ভূত সকল বিপর্যয়গুলি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। যদি মোট শস্যের ২৫ শতাংশ অপেক্ষা অধিক শস্যহানি ঘটে তবেই কৃষক ক্ষতিপূরণ পাইবে। কোন ক্ষেত্রেই ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয় টাকা মোট ক্ষতির ৫০ শতাংশ অপেক্ষা অধিক হইবে না।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ (Factors responsible for the rise in Foodgrains Prices during the Second Plan) : খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটির মতে সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অত্যধিক পরিমাণ ঘাটতি ব্যয় এবং অবাধ ঋণ সম্প্রসারণের ফলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা তথা চাহিদা বৃদ্ধি সাম্প্রতিক খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধির কারণ। জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তাহাদের খাদ্য গ্রহণের অভ্যাস পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যাহারা পূর্বে টাপিয়োকা এবং মিষ্টি আলু খাইয়া জীবন ধারণ করিত এখন তাহারা আয় বৃদ্ধির ফলে জোয়ার এবং মোটা চাল খাইতেছে, পূর্বে যাহারা জোয়ার খাইত এখন তাহারা চাল এবং গম খাইতেছে। দ্বিতীয়ত, মজুতের প্রবণতা বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে।

খাদ্যশস্যের যোগানের দিক বিশ্লেষণ করিয়া কমিটি বলিয়াছেন যে, ১৯৫৫-৫৬ সালে জোয়ারের উৎপাদন ৩০ লক্ষ টন হ্রাস পাওয়ায় মূল্যস্তর উর্ধ্বগামী হয় এবং চাল ও গমের চাহিদার উপর চাপ সৃষ্টি করে। অনিয়মিত মোসুমীবায়ু প্রবাহ এবং প্রতিকূল আবহাওয়া অবস্থার অবনতি ঘটায়।

১৯৫৫ সালের মধ্যভাগ হইতে আর্থিক ও অগ্রাগ্র কতকগুলি সাধারণ শক্তি এরূপ ভাবে প্রতিক্রিয়া করিয়াছে যাহার ফলে চাহিদা বৃদ্ধি ও যোগান হ্রাস পাইয়া খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে। চাহিদা ও যোগানের অস্থায়ী ভারসাম্যহীনতাকে খাদ্য ঘাটতির কারণ হিসাবে নির্দেশ করাই যথেষ্ট নয়। সমস্তার ভিতর গভীর ভাবে প্রবেশ করা প্রয়োজন এবং সমতাহীন সম্প্রসারণ (unbalanced growth) নীতি গ্রহণ করায় যে সাংগঠনিক অসামঞ্জস্য দেখা দিয়াছে তাহা বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।

খাদ্যমূল্য স্থিতিকরণের জন্য মেহতা কমিটির কার্যসূচী (Mehta Committee's measure for stabilizing Foodgrains Prices) : খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিকরণের উদ্দেশ্যে মেহতা কমিটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংস্থা (Foodgrains Stabilization Organization) গঠনের নির্দেশ দেন। এই সংস্থাটি খাদ্যশস্যের একটি মজুত ভাণ্ডার (buffer stock) সৃষ্টি করিবে এবং খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয় করিয়া উহার দাম স্থিতিশীল রাখিবে। খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে এই সংস্থাটি তাহার মজুত খাদ্যশস্য গ্রায্য মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিবে, আবার বাজারে খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস পাইলে বাজার হইতে খাদ্যশস্য ক্রয় করিবে—এইভাবে মূল্যের উঠানামা রোধ করা সম্ভবপর হইবে। ইহা ব্যতীত পরিকল্পনাকালে মূল্যস্ফুরের স্থায়িত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে কমিটি মূল্য স্থিতিকরণ পর্ষৎ (Price Stabilization Board) নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। এই পর্ষৎটি মধ্যে মধ্যে দেশের সাধারণ মূল্যস্তর সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে এবং কি নীতি গ্রহণ করিলে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশ দিবে।

মূল্য স্থিতিকরণ নীতি নির্ধারণের সময় ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, খাদ্যশস্যের মূল্যের স্থিতিশীলতা প্রধানত নির্ভর করে খাদ্যশস্য এবং বাণিজ্য্যশস্যের আপেক্ষিক মূল্য সম্পর্কের উপর। এখন, দেশের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এরূপ একটি সুসম্বন্ধ মূল্য-কাঠামো সৃষ্টি করা যেখানে বাণিজ্য্যশস্য এবং খাদ্যশস্য উভয় মূল্যের অনুপাত স্থিতিশীল থাকিবে এবং সাধারণভাবে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের সহিত শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য অনুপাতের স্থিতিশীলতা বজায় থাকিবে। ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গঠিত কৃষি মূল্য কমিশন (Agricultural Prices Commission) এই সমস্ত সম্পর্কে চিন্তা করিবেন বলিয়া মনে হয়। এই কমিশন বর্তমানে কৃষিজদ্রব্য সম্পর্কে উপযুক্ত মূল্যনীতি নির্ধারণে সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতেছে।

খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Foodgrains Enquiry Committee, 1957) : খাদ্যসমস্তার কারণ বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে শ্রীঅশোক মেহতার সভাপতিত্বে খাদ্যশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি গঠন করেন এবং কমিটি ঐ বৎসর নভেম্বর মাসেই তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিটির রিপোর্টে সাধারণভাবে খাদ্য সঙ্কটের পর্যালোচনা করা হইয়াছে।

[এক] খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখাকেই কমিটি খাদ্যনীতির প্রধান লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ দিয়াছেন। সাধারণভাবে খাদ্যশস্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখিবার জন্য কমিটি মূল্যস্থিতিকরণ পর্ষৎ (Price Stabilization Board) নামে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থা গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত খাদ্যশস্য ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চালাইয়া মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে কমিটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংস্থা (Foodgrains

Stabilization Board) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি সরকারের একটি পৃথক বিভাগ হিসাবে অথবা সরকারী কর্মচারী পরিচালিত একটি স্বয়ংশাসিত কর্পোরেশন হিসাবে কতখানি কার্যকরী হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন।

[দুই] কমিটি বলেন যে, খাদ্যদ্রব্য এবং মূল্যস্থিতিকরণ পর্ষৎকে সাহায্য করিবার জন্ত বেসরকারী ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা পরিষদ (Central Food Advisory Council) গঠন করা উচিত। অনুরূপভাবে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উচ্চপদস্থ অফিসারের নেতৃত্বে মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ বিভাগ (Price Intelligence Division) গঠন করা প্রয়োজন। মূল্য স্থিতিকরণ পর্ষৎ কেন্দ্রীয় খাদ্য উপদেষ্টা পরিষদ এবং মূল্য সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ বিভাগের সহায়তায় দেশের মূল্যস্তরের গতি সম্পর্কে সতর্ক দৃষ্টি রাখিবে এবং কিভাবে মূল্যস্তর স্থির রাখা যায় সে সম্পর্কে নির্দেশ দিবে। অধিক সংখ্যক নতুন সংস্থা গঠনের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। কারণ এতগুলি সংস্থা একত্রে সুষ্ঠুভাবে কাজ না করিয়া বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিতে পারে।

[তিন] কমিটি যে খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংস্থা (Foodgrains Stabilization Organization) গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন তাহা খাদ্যশস্যের একটি মজুত ভাণ্ডার স্থাপন করিবে। কমিটি মনে করেন যে, ভবিষ্যতে প্রতিবৎসর ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করার প্রয়োজন থাকিবে। বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের সময় এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানি করা হইলে উহা ভারতীয় অর্থনীতির উপর কি প্রবল চাপ সৃষ্টি করিবে কমিটি তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই।

[চার] স্বল্পকালীন কর্মসূচী হিসাবে কমিটি গ্রায়সদ্ধত ভাবে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাতিল করিয়া আংশিক নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন। গ্রায্য মূল্যের দোকান অথবা সমবায় বিক্রয় কেন্দ্রের মারফৎ খাদ্যশস্য বণ্টন করিতে হইবে।

[পাঁচ] খাদ্যশস্যের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধান হিসাবে কমিটি খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সম্ভাব্য সকল প্রকার কর্মসূচী গ্রহণের উপর জোর দিয়াছেন। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প গ্রহণ, উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই সকল কর্মসূচীর গুরুত্ব বহু পূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে সুতরাং এই ব্যাপারে কমিটি কোন অভিনব পন্থা দেখান নাই।

সাম্প্রতিক খাদ্য সঙ্কট : কারণ ও প্রতিবিধান (Recent Food Crisis—Causes and Remedial Measures) : ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতের খাদ্যোৎপাদন ৮ কোটি টনে আসিয়া নিম্নোক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টনে পৌঁছায়। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে (১৯৬৫-৬৬) খাদ্যোৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনে নামিয়া আসে। ইহার

ফলে যোগানের স্বাভাবিক নিয়মানুসারেই খাতশস্ত্রের মূল্যে অস্বাভাবিক উদ্বীর্ণগতি লক্ষ্য করা যায়। দেশ চরম খাতসঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ব্যাপক আকারে খরা দেখা দেওয়ায় চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে খাতশস্ত্রের উৎপাদন অতি সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে খাতোৎপাদনের পরিমাণ হয় মাত্র ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন।

খাতসঙ্কটকে অর্থনীতির ভাষায় যোগানের তুলনায় চাহিদার আধিক্য বুঝায়। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ক্রমবর্ধমান আকারে নতুন বিনিয়োগের ফলে যে আয় বৃদ্ধি ঘটনাচ্ছে তাহা খাতশস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করিয়াছে। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাবানুসারে আয় বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯৭০-৭১ সালে খাতশস্ত্রের চাহিদা দাঁড়াইবে ১০ কোটি ৩০ লক্ষ টন; ১৯৬০-৬১ সালে চাহিদা ছিল ৭ কোটি ২০ লক্ষ টন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, চাহিদা বৎসরে ৩.৬৫ শতাংশ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে।

যোগানের দিক লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ১৯৬১-৬২ হইতে ১৯৬৩-৬৪ এই তিন বৎসর খাতোৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদনের সমান ছিল। ১৯৬০-৬১, ১৯৬১-৬২, ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে খাতশস্ত্রের উৎপাদন ছিল ৮ কোটি টন। ১৯৬৫-৬৬ সালে উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টন হয়। আমদানি সমেত মোট যোগান প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল অবশ্য ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে উহা যথাক্রমে ৭০ লক্ষ টন এবং ৪০ লক্ষ টন হ্রাস পায়। এই প্রকৃত ঘাটতির সহিত মুনাফা শিকারী এবং মজুতদারগণ যে কৃত্রিম দুস্ত্রাপ্যতা সৃষ্টি করে তাহা একত্রে খাতসঙ্কটের কারণ। খাতসঙ্কট সৃষ্টি করিতে যেসকল শক্তি কাজ করিয়াছে তাহাদিগকে স্বল্পস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। দীর্ঘস্থায়ী কারণগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

(ক) প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নের জন্ত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ব্যয়ের দক্ষন জনসাধারণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি এবং তজ্জন্তে খাতশস্ত্রের দীর্ঘকালীন কারণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) জনসংখ্যার দ্রুতবৃদ্ধি (২.২ শতাংশ হারে) এবং আয়বৃদ্ধির ফলে খাতগ্রহণের অভ্যাস পরিবর্তন খাতশস্ত্রের চাহিদা বৃদ্ধি করিয়াছে।

(গ) দ্রুত শিল্পায়ণ এবং নগরীকরণের ফলে খাতশস্ত্রের বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইলেও কৃষি পরিকল্পনার ক্রটির জন্ত ইহা সম্ভবপর হয় নাই।

(ঘ) কৃষিক্ষেত্রে সুসম্বন্ধ পরিকল্পনার অভাবে তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরের মধ্যে চার বৎসর খাতশস্ত্রের উৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদন স্তরের উপরে উঠিতে পারে নাই।

এই খাতসঙ্কটের স্বল্পস্থায়ী কারণগুলি এইরূপ :

প্রথমত, যখন খাতশস্ত্রের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং অধিকতর বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন অসং ব্যবসায়ীগণ মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্যে খাতশস্ত্র ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিম দুস্ত্রাপ্যতা সৃষ্টি করায় সঙ্কট মারাত্মক আকার ধারণ করে।

স্বল্পকালীন কারণ

দ্বিতীয়ত, ঘন ঘন সরকারী নীতি পরিবর্তনের ফলে খাদ্যশস্যের যোগান ব্যাহত হয় এবং ইহা সঙ্কট সৃষ্টিতে সহায়তা করে। ১৯৬২-৬৩ সাল পর্যন্ত উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির সহিত বিক্রয়যোগ্য খাদ্যশস্যের পরিমাণেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু ১৯৬৩-৬৪ সালে কৃষকের আচরণে অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যায়। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় এই বৎসর ধানের উৎপাদন ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পায় কিন্তু বিক্রয়যোগ্য ধানের পরিমাণ ১৬ শতাংশ হ্রাস পায়। ঐ বৎসর গমের উৎপাদন ১০ শতাংশ হ্রাস পায় কিন্তু বিক্রয়যোগ্য গমের পরিমাণ ২১ শতাংশ হ্রাস পায়। কৃষকের এই অস্বাভাবিক আচরণের জ্ঞাত দায়ী ভ্রাম্যক সরকারী নীতি। নির্বিচারে বাজারে হানা, কৃত্রিম সরকারী দাম নির্ধারণ এবং খাদ্যশস্যের স্থানান্তরকরণে কঠোর বিধিনিষেধ কৃষকদের স্বাভাবিক ক্রয়-বিক্রয়ের বাধাদান করে। খাদ্যশস্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভারসাম্যহীনতা আরও ব্যাপক করিয়া এই সঙ্কটের সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, বড় বড় জোতদারগণ খাদ্যশস্য মজুত করিয়া কৃত্রিম দুস্প্রাপ্যতার সৃষ্টি করে। স্বাভাবিক ঘাটতির সহিত এই কৃত্রিম ঘাটতি যুক্ত হইয়া খাদ্য সমস্যার তীব্রতা বৃদ্ধি করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কৃষিক্ষেত্র ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ফলে প্রধানত বড় বড় কৃষকগণই লাভবান হইয়াছে। ইহাদের মজুত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে সুতরাং সঙ্কট আসন্ন বৃষ্টিয়া ইহারা যে খাদ্যশস্য মজুত করিতে থাকিবে ইহা স্বাভাবিক।

সুতরাং খাদ্যসঙ্কটের মূল কারণ হইল দেশে খাদ্যোৎপাদনের স্বল্পতা। কিন্তু অসং-ব্যবসায়ীগণ অস্বাভাবিক মূল্যের অর্জনের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম দুস্প্রাপ্যতার সৃষ্টি করিয়া সমস্যাতে আরও তীব্রতর করিয়া তুলিয়াছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি উহার দুস্প্রাপ্যতার একটি লক্ষণ। চাহিদা হ্রাস অথবা যোগান বৃদ্ধি করিয়া খাদ্যশস্যের মূল্য হ্রাস করা যাইতে পারে। চাহিদাকে দমিত রাখার শ্রেষ্ঠ পন্থা হইতেছে বরাদ্দ ব্যবস্থা। কিন্তু ভারতীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া সকল বড় বড় সহর এবং ঘাটতি অঞ্চলে পরিপূর্ণ বরাদ্দ প্রথা চালু করা সম্ভবপর হইবে না। সুতরাং পশ্চিমবাংলা অথবা কেরালার গ্রায় দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি অঞ্চল ব্যতীত অন্যান্য স্থানে গ্রায়া মূল্যের দোকান এবং সাধারণ খুচরা দোকান এই দুই ধরনের দোকান থাকিবে। স্থায়ী ঘাটতি অঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশানিং প্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। স্বল্পকালীন কর্মসূচী হিসাবে খাদ্য 'জোন' (food zone) সৃষ্টি, রেশানিং প্রথার প্রবর্তন, বড় শহর কর্ডন করা, লাইসেন্স ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতির উপযোগিতা থাকিলেও কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিই সমস্যার সত্যকার সমাধান।

খাদ্যসমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন :

(ক) খাদ্যশস্যের ঘাটতি দেখা দিলে রেশানিং প্রথা প্রবর্তন করিতে হইবে। ইহার ফলে প্রত্যেকেই গ্রায় দামে খাদ্যশস্য পাইবে। কিন্তু কেবলমাত্র দীর্ঘস্থায়ী ঘাটতি

অঞ্চলেই বিধিবদ্ধ রেশানিং প্রথা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। অত্যাচ্ছ অঞ্চলে গ্রাযাদামের দোকান এবং সাধারণ খুচরা দোকান পাশাপাশি বর্তমান থাকিবে।

(খ) আভ্যন্তরীণ খাণ্ডোৎপাদন যতদিন পর্যন্ত মোট সক্রিয় চাহিদা অপেক্ষা কম থাকিবে ততদিন পর্যন্ত খাণ্ড আমদানি বন্ধ করা চলিবে না। ১৯৬৫-৬৬ সালে বিদেশ হইতে খাণ্ডশস্য আমদানি বাবদ ৪৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালে খাণ্ডশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৮০ লক্ষ টন। শুধুমাত্র গম আমদানি করিলেই চলিবে না, চাল আমদানি করিবার জ্ঞাত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে। খাণ্ডশস্য আমদানীর সুবিধার্থে বন্দর এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের উপর অগ্রাধিকার দিতে হইবে।

(গ) খাণ্ডশস্যের উপযুক্ত মূল্যনীতি গ্রহণ করিয়া কৃষকদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন কারণ ইহার ফলে গ্রাম হইতে শহরে খাণ্ডশস্যের যোগান অব্যাহত থাকিবে। কৃষকদের আচরণ হইতে বুঝা গিয়াছে যে খাণ্ডশস্যের উপযুক্ত মূল্য পাইলে তাহারা যোগান বৃদ্ধি করিতে তৎপর হইবে। খাণ্ডশস্যের মূল্য একপভাবে স্থির করিতে হইবে যাহাতে চাষের ব্যয় এবং ঝুঁকি উহার অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় খাণ্ড কর্পোরেশন (Food Corporation of India) সর্বনিম্ন মূল্য (floor price) প্রাপ্তিযোগ্য খাণ্ডশস্য ক্রয় করিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কৃষি মূল্য কমিশন (Agricultural Prices Commission) মূল্য নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

(ঘ) খাণ্ডশস্য মজুত করার উদ্দেশ্যে সরকার একটি মজুত ভাণ্ডার (buffer stocks) সৃষ্টি করিবেন। ইহার জ্ঞাত গুদামঘরের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করিতে হইবে। আশা করা যায় যে, আগামী তিন চার বৎসরের মধ্যে সরকার একটি মজুত ভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবেন। ১০ লক্ষ টন চাল এবং ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন গম ইহার মজুতের পরিমাণ হইবে। এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইলে সরকার এক স্থিতিশীল এবং দৃঢ় খাণ্ডনীতি অনুসরণ করিতে পারিবে যাহার উপর পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত খাণ্ড কর্পোরেশন মজুত ভাণ্ডার সৃষ্টির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিবে।

(ঙ) খাণ্ডশস্যের ক্ষেত্রে এক সুসম্বদ্ধ জাতীয় নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। প্রত্যেক রাজ্য লইয়া একটি খাণ্ড অঞ্চল (zone) গঠিত হইলে খাণ্ডসমস্যা অধিকতর দক্ষতার সহিত সমাধান করা যাইবে। প্রত্যেক রাজ্যই উত্তমরূপে জানে সে কতখানি উৎপাদন করিতে পারিবে এবং তাহার কতখানি প্রয়োজন হইবে। ষাটটি রাজ্যের ক্ষেত্রে উদ্ভূত রাজ্য হইতে অথবা বিদেশ হইতে খাণ্ডশস্য আমদানি করিয়া ষাটটি পূরণের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে সরকার ঘোষণা করেন যে, একটি রাজ্য লইয়া একটি খাণ্ড অঞ্চল গঠনের নীতিই অনুসরণ করা হইবে।

(চ) খাণ্ডশস্যের দামের ব্যাপক উঠানামা বন্ধ করার জ্ঞাত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য অপরিহার্য।

জাতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা প্রয়োজন হইলেও গ্রামাঞ্চলের স্বাভাবিক বাণিজ্য পথ অব্যাহত রাখা হইবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ মজুত লইয়া রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য আরম্ভ করিলে ইহা খোলা বাজারের মূল্যকে প্রভাবিত করিবে। যদি সরকার খাতশস্যের প্রধান ক্রেতা হয় তাহা হইলে ইহার ক্রয়বিক্রয় খোলা বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করিবে। খাত কর্পোরেশনের সর্বনিম্ন মূল্যে প্রধান ক্রয় (floor purchase) এবং বাজার মূল্যে পরিপূরক ক্রয় করা উচিত। বিদেশ হইতে খাতশস্যের সকল আমদানি এই কর্পোরেশনের মাধ্যমে হওয়া উচিত। এই কর্পোরেশন হইতে গ্রায্য মূল্যের দোকানে খাতশস্য সরবরাহ করা হইবে। এই কেন্দ্রীয় খাত কর্পোরেশন ব্যতীত প্রতিরাজ্যে যথাসময়ে খাতশস্য ক্রয়, মজুত এবং বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে খাতশস্য বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠন করা প্রয়োজন। কৃষকদিগের সমবায় বিক্রয় সমিতিতে এরূপভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে তাহার বাণিজ্য কর্পোরেশনের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিতে পারে। গুদামঘর এবং সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য নীতির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

সংক্ষেপে, খাতশস্য সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক রাজ্যকে একটি পৃথক খাত অঞ্চল হিসাবে গণ্য করিতে হইবে, আভ্যন্তরীণ ক্রয় ও আমদানির মাধ্যমে খাতশস্যের মজুত ভাণ্ডার সৃষ্টি করিতে হইবে, গ্রায্য মূল্যের দোকান ও সাধারণ খুচরা দোকান এই দুই ধরনের দোকান স্থাপন করিতে হইবে, ঘাটতি অঞ্চলে বিধিবদ্ধ রেশনিং চালু করিতে হইবে, দক্ষ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হিসাবে খাত কর্পোরেশন পরিচালনা করিতে হইবে এবং পরিশেষে দীর্ঘকালীন সুসম্বদ্ধ কৃষি পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া উহাকে কার্যকরী করিতে হইবে।

খাতশস্যের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading in Foodgrains) : খাতশস্যের ব্যবসায় ফড়িয়াদের হাতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলে অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় তাহারা এরূপভাবে যোগান নিয়ন্ত্রণ করিবে যাহাতে দেশের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন বানচাল হইয়া যাইতে পারে। খাতশস্য অনুসন্ধানকারী কমিটি ইহার বিপজ্জনক পরিণতি উপলব্ধি করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবিত খাতশস্য স্থিতিকরণ সংস্থাটি দেশের খাতশস্যের পাইকারী ব্যবসায়ের এক বৃহৎ অংশ ধীরে ধীরে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবে এবং সরকারী নীতির চরম লক্ষ্য হইবে ধীরে ধীরে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে খাতশস্যের বাণিজ্য সমাজতান্ত্রীকরণ করা। ১৯৬৩-৬৪ সালের তীব্র খাতসঙ্কট দেখা দিলে সরকার আংশিকভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাস হইতে খাত কর্পোরেশন তাহার কাজ আরম্ভ করে। সরকার বিশ্বাস করেন যে, রাজ্যগুলি যদি নূতন ফসল বাজারে আসার সহিত কর্পোরেশনের মাধ্যমে উহার অধিক পরিমাণ বিধিবদ্ধ মূল্যে ক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে উহা খোলা বাজারের মূল্যকে প্রভাবিত করিতে পারিবে। খাত কর্পোরেশন সাধারণত স্বয়ংশাসিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। আশা করা যায় কর্পোরেশন ধীরে ধীরে দেশের খাতশস্যের বাণিজ্যক্ষেত্রে এক

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে। কর্পোরেশনের প্রারম্ভিক মূলধনের পরিমাণ হইল প্রায় ১০০ কোটি টাকা। ইহা প্রথম বৎসরে প্রায় ২০০শত কোটি টাকার ব্যবসায় করে। এই সময়ে ইহা সামান্য পরিমাণ মুনাফাও অর্জন করে। নবগঠিত খাত্ত কর্পোরেশন খাত্তশস্যের ব্যবসায়ের প্রথম সংগঠিত পদক্ষেপ।

ইহা দাবী করা হয় যে, খাত্তশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা হইলে জীবন ধারণের ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করা সম্ভব হইবে। উৎপাদনে উৎসাহ দিবার জন্ত মূল্যের সামান্য উঠানামা সমর্থনযোগ্য হইলেও উহা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে ফেলিয়া রাখা যায় না, বা ব্যবসায়ীদের বাজারে প্রাধান্য বিস্তার করিতে দেওয়া চলে না। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম খাত্তশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলেও ১৯৬০-৬৪ সালের পরই খাত্তশস্যের ক্ষেত্রে আংশিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের বাস্তব কার্যসূচী প্রণয়ন করা হয়।

—রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করা হইল :

(ক) প্রারম্ভিক পর্যায়ে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য শুধু মাত্র ধান এবং গমের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(খ) পাইকারী ব্যবসায়ীগণ খুচরা ব্যবসায়ীর নিকট নিয়ন্ত্রিত দামে খাত্তশস্য বিক্রয় করিবে কিন্তু খুচরা ব্যবসায়ীগণ কি মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করিবে তাহা স্থির করা হয় নাই। খুচরা মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে।

(গ) এই পরিকল্পনার দুইটি অংশ আছে—একটি প্রাথমিক পর্যায় অপরটি চরম পর্যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে খাত্তশস্য ক্রয় বিক্রয় করিতে হইলে ব্যবসায়ীদের লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে এবং কৃষকদের নিকট হইতে শস্য কিনিবার সময় একটি নির্ধারিত মূল্য দিতে হইবে। যদিও লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যবসায়ীর নিকট হইতে প্রয়োজন বোধ করিলে সরকার নিয়ন্ত্রিত মূল্যে মজুতের সমস্ত অথবা একাংশ ক্রয় করিতে পারিবেন, কিন্তু অবশিষ্টাংশ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রয়ের অধিকার ব্যবসায়ীর থাকিবে। পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে শহরাঞ্চলের জনগণের চাহিদা মিটাইবার জন্ত সরকার সমস্ত বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূত খাত্তশস্য কিনিবেন না। সরকার ধীরে ধীরে বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূতের অধিক অনুপাত ক্রয় করিবে এবং পরিশেষে পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তিত হইবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের শেষ পর্যায়ে সেবা সমবায়ের (service co-operatives) মাধ্যমে কৃষকদের নিকট হইতে বিক্রয়যোগ্য উদ্ভূত সংগ্রহ করা হইবে এবং ক্রেতা সমবায় সমিতির মাধ্যমে উহা জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

(ঘ) যে সকল কৃষকেরা একটি নির্দিষ্ট মূল্যে তাহাদের উদ্ভূত শস্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে চাহিবে তাহাদের নিকট হইতে শস্য কিনিবার জন্ত সরকার একটি এজেন্সি স্থাপন করিবেন। এই সংস্থার "লাভও নয়, ক্ষতিও নয়" (no profit no loss), এই নীতিতে ক্রয় বিক্রয় চালাইবে।

খাতশস্ত্রের রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সমর্থনে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য জীবনধারণের ব্যয়ের উপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, এই ব্যবস্থার ফলে ব্যবসায়িক স্বপক্ষে যুক্তি নিজেদের স্বার্থে বাজারমূল্যকে প্রভাবিত করিতে পারিবে না। তৃতীয়ত, ইহা কালোবাজার বন্ধ করিতে সহায়তা করিবে। চতুর্থত, খাত মজুত করিয়া মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা নষ্ট হইয়া যাইবে। পরিশেষে, এই ব্যবস্থা পরিকল্পিত উন্নয়নের সহায়ক হইবে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি উপস্থাপিত করা হয় তাহা প্রধানত প্রশাসনিক। বেসরকারী ব্যবসায়ীদের মতে খাতশস্ত্রের বাণিজ্য রাষ্ট্রীয়করণ করিতে হইলে যে অভিজ্ঞতা এবং সততা প্রয়োজন সরকারী কর্মচারীগণের বিপক্ষে যুক্তি তাহা নাই। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্র একটি বৃহৎ কর্পোরেশন এবং রাজ্যে ছোট ছোট কর্পোরেশনের মাধ্যমে এই ব্যবসায় পরিচালিত করার অর্থ হইল একটি বিরাট নূতন আর্থিক দায়িত্বের সৃষ্টি করা—ঐ অর্থ অত্র কোন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় লগ্নী করা হইলে দেশ অধিকতর লাভবান হইত।

খাতশস্ত্র রাষ্ট্রীয়করণের সাফল্য নির্ভর করিবে প্রধানত সমবায় শক্তির কার্যকারিতা ও সাংগঠনিক শক্তির উপর। বাণিজ্য কর্পোরেশনের এজেন্ট হিসাবে কৃষকদিগের সমবায় বিক্রয় বাজারের প্রয়োজনীয় ভূমিকা থাকিবে বলিয়া উহাকে জোরদার করিয়া তুলিতে হইবে। এইজন্ত গুদামঘর এবং সংরক্ষণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

কৃষি-উৎপাদনের স্থিতিশীলতার কারণ ও প্রতিবিধান (Quasi stagnation in Agricultural Production : Diagnosis and Basic Remedy) : সাম্প্রতিক কালে দেশের খাতোৎপাদনের দিকে লক্ষ করিলে একটানা ঘাটতির চিত্র পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষিউৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার চার বৎসরে খাতোৎপাদন ১৯৬০-৬১ সালের উৎপাদনের পর্যায়েই থাকিয়া যায়। ১৯৬২-৬৩ সালে মোট খাতোৎপাদন ছিল ৭ কোটি ৮৪ লক্ষ টন, ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি ২ লক্ষ টন হয়, পরবর্তী বৎসরে (১৯৬৪-৬৫) উহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টনে আসিয়া পৌঁছে কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬৫-৬৬) উহা হ্রাস পাইয়া ৭ কোটি ৩০ লক্ষ টনে নামিয়া আসে।

পরিপূর্ণ সাংগঠনিক পরিবর্তন করিয়া কৃষি বিপ্লব সৃষ্টির ব্যর্থতা খাতোৎপাদনের এই অচলাবস্থার জন্ত দায়ী। ভারত সরকারের একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে আবাদী

জমির ৬০ শতাংশ বড় বড় জোতদারগণের নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে। ভারত সরকারী-সমীক্ষা সরকারের ভূমি সংস্কার কর্মসূচী প্রবর্তনের পরেও কৃষিতে অসম জোত বণ্টন থাকায় ভূমিহীন কৃষকদিগকে জীবিকাসংস্থানের জন্ত বড় বড় জোতদারদের দ্বারস্থ হইতে হয়। এই বড় বড় জোতদারগণই গ্রামের প্রধান ব্যবসায়ী, কুসীদজীবী,

এবং পঞ্চায়েতের নেতা। সাধারণত অশিক্ষিত বলিয়া নিজেদের সংগঠিত করিবার মত যোগ্যতা অথবা সাহস কৃষকদিগের নাই। ইহারা সহজেই বড় জোতদারের শিকারে পরিণত হয়।

বড় বড় জোতদারগণ তাহাদের অধিকাংশ সময় কৃষি-বহির্ভূত কাজ এবং গ্রাম্য দলাদলিতে নষ্ট করে। ইহারা কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধিতে বিশেষ আগ্রহী নয়। ইহারা কৃষি হইতে একটি নির্দিষ্ট আয় আশা করে এবং তাহা পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে। গ্রামের অধিকাংশ ভোট ইহাদের মাধ্যমে পাওয়া যায় বলিয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল ইহাদের বিরুদ্ধে কিছু করিতে সাহস করে না। সরকারের জোতদার তোষণ নীতির ফল ভয়াবহ হইয়াছে। পরিকল্পনার বোল বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তবুও আমরা কৃষি উৎপাদন আশাহীনরূপে বৃদ্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছি। স্মরণ্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির দীর্ঘকালীন কর্মসূচী হইল গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা বিস্তার করা যাহার ফলে ভূমিহীন, দরিদ্র কৃষকগণ কাজে নবীন উদ্দীপনা পাইবে এবং জোতদারদের কবল হইতে নিজেদের মুক্ত করিতে পারিবে।

পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘকালীন কর্মসূচীর পরিবর্তে স্বল্পকালীন কর্মসূচীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। স্বল্পকালীন ব্যবস্থা হিসাবে উন্নত বীজ এবং অধিকতর সার সরবরাহের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষি-উৎপাদনের অচলাবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্ত দুইধরনের কার্যসূচীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। প্রথমত, ৩ কোটি ২৫ লক্ষ একর জমিতে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করিয়া চাষ প্রবর্তন করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, সারের যোগান বৃদ্ধি করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় ৩৩ লক্ষ ৫০ হাজার টন, রাসায়নিক সার উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ একযোগে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিবে। সার উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সরকার বিদেশী বেসরকারী উদ্যোক্তাদিগকে মূল্য নিধারণ এবং বণ্টনের ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা দিতে রাজী হইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এগুলি স্বল্পকালীন কার্যসূচী। বড় বড় জোতদারদের প্রভাব খর্ব করার মধ্যমী সমস্তার দীর্ঘকালীন সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

চতুর্দশ অধ্যায়

কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা এবং কৃষিক্ষণ

(Agricultural Marketing and Rural Credit)

ভারতীয় কৃষি পুনর্গঠনের জন্ত কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা এবং কৃষিক্ষণ সমস্যা সমাধান করা প্রয়োজন। সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটি (All India Rural Credit Survey Committee, 1951-52) সর্বপ্রথম কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা এবং কৃষিক্ষণ সম্পর্কে বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, বিক্রয় এবং কৃষিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্ত প্রয়োজন গ্রামাঞ্চলে সমবায় ঋণদান সমিতি এবং সমবায় বিক্রয় সমিতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে অনুপ্রাণিত হইয়া সরকার সর্বাধিক সংখ্যক কৃষকদিগকে ঋণদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে পরিকল্পনা কমিশন বার বার ঘোষণা করেন যে, পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষণ শুধুমাত্র জোতদারদিগকেই দেওয়া হইবে তাহা নয়, যাহারা ভূমিহীন চাষী তাহারাও ঋণের সুবিধা পাইবে। অধিকাংশক্ষেত্রেই ঋণদান সমিতি প্রত্যাশিত ফসলের পরিবর্তে ঋণ দান করে। এই কারণে সমবায় বিক্রয় সমিতির সহিত সমবায় ঋণদান সমিতির সম্পর্ক স্থাপন করা প্রয়োজন। সমবায় সমিতির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার সময় ঋণ গ্রহীতাকে এই মর্মে চুক্তি স্বাক্ষর করিতে হইবে যে, ঋণের সাহায্যে উৎপন্ন ফসল নিকটবর্তী বিক্রয় সমিতিতে লইয়া যাইবে। সমবায় বিক্রয় সমিতি তাহার গুদামে মজুত ফসলের জামিনেও ঋণদান করিতে পারিবে।

ভারতে কৃষিপণ্যের বিক্রয় সমস্যা (Problems of Agricultural Marketing in India) : কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা সংগঠিত না হইলে কৃষি উন্নয়নের ফলে যে আয় বৃদ্ধি পাইবে কৃষক তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। ভারতে কৃষিপণ্যের বিক্রয়ব্যবস্থা ক্রটিপূর্ণ বলিয়া কৃষক তাহার উৎপাদিত পণ্যের গ্রায্য মূল্য পায় না। দ্বিতীয়ত, কৃষক প্রধানত নিজ ভোগের জন্ত জমি চাষ করে বলিয়া বিক্রয়যোগ্য ফসলের পরিমাণ কম হয়। তৃতীয়ত, ফসলের মূল্যের তীব্র উঠানামার ফলে কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূল্যের তীব্র উঠানামার মধ্য দিয়া বাজারের অসংগঠিত রূপটি ফুটিয়া ওঠে। সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটির রিপোর্টে যথার্থই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় কৃষক উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট, উপযুক্ত দামে ফসল বিক্রয় করিতে পারে না।

ভারতে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের বাজারগুলিকে প্রধানত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়— প্রাথমিক বাজার বা হাট, মণ্ডি, খুচরা বাজার এবং মেলা। হাট গ্রামাঞ্চলে সপ্তাহে একদিন বা দুইদিন বসে। এই সকল হাটে কৃষিপণ্যের পাইকারী ও খুচরা ক্রয়বিক্রয়

চলে। কৃষিপণ্যের বড় বড় পাইকারী বাজার “মণ্ডি” নামে পরিচিত। এই ধরনের বাজারে প্রধানত পাইকারী ক্রয়বিক্রয়ই হইয়া থাকে। এইগুলিতে চার শ্রেণীর -
বাজার গুদামজাত করার সুব্যবস্থা, আধুনিক ব্যাঙ্ক ও বীমাকরণের সুবিধা রহিয়াছে। যুক্তপ্রদেশের হাপুর, মীরট, আগ্রা, গাজিয়াবাদ প্রভৃতি স্থানে এই মণ্ডিগুলি বিশেষ বিস্তার লাভ করিয়াছে। তৃতীয়ত, প্রত্যেক শহরে এক বা একাধিক দৈনন্দিন খুচরা বাজার রহিয়াছে। এইগুলি হইতে স্থানীয় জনগণ তাহাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করে। পরিশেষে রহিয়াছে অসংখ্য মেলা। ধর্মীয় অথবা সামাজিক উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া এই মেলাগুলি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রধানত গ্রামের মেলায় কৃষিপণ্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য উভয়ই বিক্রয় হইয়া থাকে।

নিম্নে ভারতীয় কৃষিপণ্য বাজারের ক্রেটিসমূহ ব্যাখ্যা করা হইল :

প্রথমত, দারিদ্র্যের চাপে এবং মহাজনের ঋণের তাগিদে কৃষকেরা অল্পদামে গ্রামেই, এমনকি কখনো কখনো ফসল মাঠে থাকিতেই বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়। সরকারী রিপোর্টের পরিসংখ্যান হইতে জানা যায় যে, মোট উৎপাদিত ফসলের ৬৫ শতাংশই গ্রামে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় হইয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, ফড়িয়াদের প্রাধাত্যের ফলে ফসলের প্রাথমিক মূল্য এবং চূড়ান্ত মূল্যের মধ্যে বিরাট তারতম্য থাকে। ফড়িয়ারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নামমাত্র মূল্যে কৃষকদিগের নিকট হইতে ফসল ক্রয় করিয়া শহরের বাজারে চড়া মূল্যে বিক্রয় করে। কখনো কখনো গ্রাম্য মহাজন কৃষককে দাদন দেয় এই সূত্রে যে, কৃষক তাহাকেই ফসল বিক্রয় করিবে। ইহার ফলে কৃষক ফসল বিক্রয়ের স্বাধীনতাও হারায়।

তৃতীয়ত, ফসলের নির্দিষ্ট গুণগত মান না থাকায় বাজারে লইয়া গেলে ভাল মূল্য পাওয়া যায় না। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালে কৃষিপণ্য আইন [মান নির্ধারণ এবং বিক্রয়] (Agricultural Produce Grading and Marketing Act, 1937) পাশ করা হয়। সরকার অনুমোদিত নির্দিষ্ট মানের পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রে AGMARK সীল ব্যবহার করা হয়।

চতুর্থত, পরিবহণ ও সংসরণ ব্যবস্থার অনুন্নতির জগ্ন শহরের বাজারে ফসল লইয়া গিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করা সম্ভবপর হয় না। এই অসুবিধার জগ্ন কৃষক গ্রামেই ফসল বিক্রয় করিতে বাধ্য হয়।

পঞ্চমত, গুদামঘরের অভাবে কৃষকগণ ফসল সংরক্ষণ করিতে পারে না। ফসল ধরিয়া রাখার সুবিধা না থাকায় কৃষকগণ সময়গত সুযোগ (time utility) সৃষ্টি করিয়া ভালো মূল্য পাইতে পারে না। ইহা ব্যতীত কোন্ বাজারে ফসলের কি মূল্য এসম্পর্কে কৃষককে ওয়াকিবহাল করার কোন সংস্থা না থাকায় কৃষক উপযুক্ত মূল্যে ফসল বিক্রয় করিতে পারে না।

ষষ্ঠত, বাজারে বহুপ্রকার ওজন ও মাপ প্রচলিত থাকায় হিসাব জটিল হয় এবং

অশিক্ষিত কৃষক সহজেই প্রতারিত হয়। ইহা ব্যতীত বাজারে বিভিন্ন ধরনের বাজার কর প্রচলিত থাকে। বারোয়ারী পূজার চাঁদা, দালানী, ওজনের ঢলতা, ধূলা মিশাল থাকার অজুহাতে গদী বাদ প্রভৃতি কারণে কৃষকের ফসলের একাংশ বাদ যায়।

সম্প্রতি, কৃষকগণ বিক্রেতা হিসাবে সংগঠিত নয়। তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে নিজেদের স্বল্পপরিমাণ ফসল বিক্রয় করে। সংগঠনের অভাবে তাহারা শক্তিশালী ব্যাপারী এবং ফড়িয়াদের সহিত সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না।

কৃষিপণ্য বিক্রয়সমস্যা সমাধানে সরকারী নীতি (Government's Policy for solving Agricultural Marketing Problems) : ১৯২৮ সালে রয়েল কমিশন কেন্দ্র এবং প্রদেশে বিক্রয়সংস্থা স্থাপনের সুপারিশ করিলেও কার্যত কিছু করা হয় নাই। ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার কৃষিপণ্য বিক্রয় সংক্রান্ত পরামর্শদাতা (Agricultural Marketing Advisor) নিযুক্ত করেন মাত্র। পর বৎসর বাজার এবং পরিদর্শন ডাই-রেক্টরেট (Directorate of Marketing and Inspection) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিক্রয় সংস্থাগুলির কাজ অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং স্তরবিহীন সমস্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সাধারণ কৃষকদের কষ্ট লাঘব করিবার জ্ঞা বিশেষ কিছুই করে নাই।

স্বাধীনতা লাভের পর সরকার সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটির সুপারিশ অনুসারে কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার সহিত কৃষিক্ষণ ব্যবস্থাকে যুক্ত করেন। ইহা সুখবর যে, বাজার এবং পরিদর্শন ডাই-রেক্টরেট তাহার কার্যপরিধি প্রসারিত করিয়াছে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দিয়াছে। দেশের ১৮০০টি গুরুত্বপূর্ণ বাজারের মধ্যে ১৫২৮ টিকেই ইতিমধ্যেই সুরক্ষিত (regulated) করা হইয়াছে। উৎপাদক, ব্যবসায়ী সমবায় এবং স্থানীয় পৌরপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত কমিটির হাতে বাজার পরিচালনার ভার দেওয়া হয়। এই ধরনের নিয়ন্ত্রিত বাজার সকলের স্বার্থচিন্তা করিয়া কাজ করিবে এবং সকল নিয়ন্ত্রিত বাজারেই এক ধরনের নিয়মকানুন প্রচলিত থাকিলে কৃষকেরা সুবিচার পাইবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে সাতটি রাজ্য কৃষি উৎপাদন (বিক্রয়) আইন [Agriculture Produce (Markets) Acts] কার্যকর করে। প্রথম পরিকল্পনাকালে আরও তিনটি রাজ্য অনুরূপ আইন পাশ করায় নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা ২৮৬ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪৭১ হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৯৩৭ সালের কৃষি উৎপাদন (মাননির্ধারণ ও বিক্রয়) আইনের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করার উপর জোর দেওয়া হয়। কারণ ইতিপূর্বে শুধুমাত্র ঘি এবং উদ্ভিজ্জ তেলের ক্ষেত্রেই মান নির্ধারণের ব্যবস্থা ছিল। দ্রব্যের মান এবং বিশুদ্ধতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রথম পরিকল্পনাকালে ল্যাবোরেটরী সুবিধা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়। এই উদ্দেশ্যে নাগপুরে কেন্দ্রীয় কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবোরেটরী এবং আটটি আঞ্চলিক কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবোরেটরী স্থাপন করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় কৃষি বাজার সংগঠন (Central Agricultural Marketing Organization) ৪০টি প্রধান প্রধান দ্রব্য সম্পর্কে সমীক্ষা প্রকাশ করে। এই সময় ১৯৫২ সালে আগাম চুক্তি (নিয়ন্ত্রণ) আইন [Forward Contracts (Regulation) Act 1952] পাশ হয় এবং পর বৎসর আগাম বাজার কমিশন (Forward Markets Commission) গঠন করা হয়। এই কমিশন অনুমোদিত আগাম নিয়ন্ত্রণ সংস্থাসমূহের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, হিসাব পরীক্ষা করে এবং বিভিন্ন আগাম বাজারের কার্যকলাপের উপর সর্তক দৃষ্টি রাখে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩০-এ পৌঁছায়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অবশিষ্ট বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই সময় কৃষি উৎপাদন (মান নির্ধারণ ও বিক্রয়) আইনের কার্যপরিধি সম্প্রসারিত করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে কৃষিপণ্য বিক্রয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই সময়ে ১৭৪৩টি বাজার সমিতি পরিপূর্ণরূপে সংগঠিত করা হয় এবং ইহা বাবদ ৫ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ বিভাগের মতে ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিক্রয় সমিতি স্থাপন করিলে ঋণ-গ্রহণকারী কৃষকগণ উহার মাধ্যমে তাহাদের পণ্যসামগ্রী বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবে। আমাদের মনে হয় দুইটি বিভিন্ন সংস্থার সৃষ্টি করিয়া অথবা অর্থের অপব্যয় না করিয়া একটি বহুমুখী সংস্থার মাধ্যমে কাজ করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইত।

আশা করা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মোট বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্যের ২৫ শতাংশ সমবায় সমিতির মাধ্যমে বিক্রয় হইবে। অবশিষ্ট কৃষিপণ্য অগ্রাগত ধরনের বাজারের মাধ্যমে বিক্রয় হইবে। সমবায় বিক্রয় সমিতি দ্রুত প্রসার করিবার ইচ্ছা সরকারের থাকিলেও সাংগঠনিক এবং আর্থিক অসুবিধার জগু উহা কার্যে পরিণত করা কঠিন হইবে বলিয়া মনে হয়।

১৯৫৬ সালে পার্লামেন্ট কৃষিপণ্য (উন্নয়ন এবং গুদামঘর) কর্পোরেশন [Agricultural Produce (Development and Warehousing) Corporations Act, 1956] আইন পাশ করেন। এই আইনানুসারে সারা ভারতে গুদামঘর কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহাদের কার্যকলাপ তদারক করিবার উদ্দেশ্যে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ও গুদামঘর পর্ষৎ (National Co-operative Development and Warehousing Board) গঠিত হইয়াছে। ১৯৬২ সালে জাতীয় সমবায় উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন (National Co-operative Development Corporation Act) এবং গুদামঘর কর্পোরেশন আইন (Warehousing Corporations Act, 1962) দ্বারা ১৯৫৬ সালের কৃষিপণ্য (উন্নয়ন এবং গুদামঘর) কর্পোরেশন আইন

কৃষিপণ্য
সম্পর্কে
আইন

বাতিল হইয়া যায়। ১৯৬২ সালের গুদামঘর কর্পোরেশন আইন, ১৯৬৩ সালের ১৮ মার্চ তারিখ হইতে বলবৎ হয় আর এই সময় কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দুইটি আইনের দ্বারা সুসম্বদ্ধ কৃষি ঋণ পরিকল্পনা, মজুতকরণ, মূল্যস্থিতিকরণ এবং বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থাপিত গুদামঘরের সংখ্যা ছিল ৪০ এবং ইহাদের সংরক্ষণ ক্ষমতা ছিল ৭০০২৩ টন। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য গুদামঘর সমূহের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪ লক্ষ টনে আসিয়া পৌঁছায়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৬০টি কেন্দ্রীয় গুদামঘর নির্মাণের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল তাহা পূরণ হইয়াছে।

কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার সাফল্য দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল : (ক) সমবায় বিক্রয় সমিতির সহিত সমবায় ঋণদান সমিতির সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। (খ)

বহু উদ্দেশ্যসাপেক্ষ সমবায় সমিতি ক্রেতা সমবায় সমিতির সহিত সাফল্যের সর্ভ সুরাসরি কারবার করিবে। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং জাতীয় সম্প্রসারণ সাধারণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সহিত সমবায় বাজার, গুদামঘর নির্মাণ এবং ঋণদান সংস্থাগুলিকে সুসম্বদ্ধ করিতে পারিলে এবং ষাট্টি ও উদ্ভূত অঞ্চলে লাইসেন্স-প্রাপ্ত গুদামঘর নির্মাণ করিতে পারিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে।

কৃষি ঋণ সমস্যা (Problems of Rural Credit) : সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটির (১৯৫১-৫২) [All India Rural Credit Survey Committee] মতে ভারতে কৃষকদের বৎসরে ৭৫০ কোটি টাকা ঋণের প্রয়োজন হয়। ব্যক্তিগত পেশাদারী মহাজনেরা কৃষিক্ষণের ৭০ শতাংশ, সমবায় ঋণদান সমিতিসমূহ ৩ শতাংশ এবং ব্যাঙ্ক ১ শতাংশ সরবরাহ করিয়া থাকে। ১৯৬১-৬২ সালে অর্থাৎ দশ বৎসর পরে সর্বভারতীয় ঋণ এবং বিনিয়োগ জরিপ (All India Rural Debt and Investment Survey) নামে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর একটি সমীক্ষা প্রকাশ করে। এই সমীক্ষা অনুসারে গড় কৃষিপরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ হইল ৪৭৩ টাকা। ১৯৬২ সালে ৩০শে জুন তারিখে কৃষি পরিবারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৭৮২ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ২৩৮০ কোটি টাকা (৮৫.০ শতাংশ) সেই সকল কৃষকদের ঋণের পরিমাণ যাহারা মোট গ্রাম্য কৃষিপরিবারের ৭৫ শতাংশ। কৃষি মহাজনেরা ১৫ শতাংশ, পেশাদার মহাজনেরা ১১ শতাংশ এবং সমবায় সমিতিসমূহ ১০ শতাংশ কৃষিক্ষণ সরবরাহ করিয়াছে। ভারতীয় কৃষিক্ষণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, গ্রাম্য মহাজনগণ কৃষকদের চিরস্থায়ী দারিদ্র্যকে মূলধন করিয়া যুগ যুগ ধরিয়া তাহাদিগকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। কৃষকগণ পুরাতন ঋণের সুদ দিবার জন্ত অথবা বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পন্ন করিবার জন্ত ঋণগ্রহণ করে। এই ঋণ অনুৎপাদনশীল বলিয়া পরিশোধের সম্ভাবনাও অল্প। ঋণ প্রাপ্তির কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকদিগকে সম্পূর্ণরূপে মহাজনদের উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া সুযোগ

বুঝিয়া তাহারাও স্ত্রদের চড়া হার আদায় করে। অবশ্য কৃষকগণ ক্রমাগত ঋণগ্রহণ করে বলিয়া মহাজনেরা প্রভূত অর্থ সংগৃহীত করিতে পারে না। কিন্তু কৃষকের জীবনের উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার ফলে সে অসংখ্য আর্থিক সুবিধা লাভ করে, যেমন, নামমাত্র দামে কৃষকের নিকট হইতে ফসল ক্রয় করে, ভূমির উপর আধিপত্য স্থাপন করে এবং এমন কি কৃষক আন্দোলনের উপরও কর্তৃত্ব স্থাপন করে।

ঋণই কৃষকের সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়াছে। ফরাসী ভাষায় একটি মর্মান্তিক প্রবাদ আছে যে, ফাঁসির দড়ি যেমন আসামীকে ঝুলাইয়া রাখে, ঋণও ঠিক সেইরূপ কৃষককে ঝাঁচাইয়া রাখে (credit supports the farmer as the hangman's rope supports the hanged) ফাঁসির আসামীর আশ্রয় যেমন দড়ি, সেইরূপ কৃষকের শেষ আশ্রয়ও ঋণ। উভয়ের পরিণামই সমান আত্মঘাতী। স্মার ম্যালকম ডালিং-এর হিসাব অনুসারে ব্রিটিশ যুগে পাঞ্জাবের মতো রাজ্যে যেখানে কৃষি মোটামুটি উৎপাদনশীল বলিয়া বিবেচিত হয় সেখানেও কৃষিঋণের মাত্র ৫ শতাংশ ভূমি উন্নয়নের জন্ত ব্যবহৃত হইত। ঋণের বোঝার দরুন কৃষক কৃষি উন্নয়নের প্রতি মনোযোগ দিতে পারে নাই। ঋণভারই কৃষককে জীবন সম্পর্কে উদাসীন করে, তাহার দক্ষতা খর্ব করে এবং কাজে উৎসাহ নষ্ট করে। স্বল্প উৎপাদনশীলতা, চিরস্থায়ী ঋণ এবং পূর্বপুরুষদিগের চাপানো ঋণ ইহারই কুফল। এই সকল শক্তিসমূহের প্রতিক্রিয়ার ফলে যে দুশ্চক্রের সৃষ্টি হয় তাহাই ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে।

কৃষিঋণ সম্পর্কে সরকারী ব্যবস্থা (Govt. measures for tackling the Problem of Rural Indebtedness) : উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে কৃষিঋণ সমস্যা তীব্রতর হইয়া উঠে। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় ইহা আশঙ্কার কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তৎকালীন ইংরেজ সরকার কিছু প্রতিরোধমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করিলেও তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। পাঞ্জাব জমি হস্তান্তর আইন (The Punjab Land Alienation Act, 1901) জমি হস্তান্তরের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু জমি হস্তান্তর আইন কার্যকরীভাবে বলবৎ না হওয়ায় কৃষিমহাজনদের কবল হইতে

ব্রিটিশযুগে
কৃষিঋণ

কৃষকদিগকে রক্ষা করা বেশ কঠিন হইয়া পড়ে। কৃষকদিগের ঋণভার লাঘব করার উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছামূলক আপস পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় কিন্তু ইহা বিশেষ সফল না হওয়ায় আইন পাশ করিয়া বাধ্যতামূলক

ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মাদ্রাজে পাঁচ কোটি টাকার কৃষিঋণ হ্রাস পাইয়া ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বাংলাদেশে আইনের সাহায্যে গ্রাম্য মহাজনদের বাধ্যতামূলকভাবে নাম রেজিস্ট্রিকরণ, মহাজনী কারবারের জন্ত লাইসেন্স গ্রহণ এবং স্ত্রদের সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়।

এই সকল কর্মসূচী গ্রহণের ফলে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কৃষিজ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুন কৃষিঋণের পরিমাণ বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার উপলব্ধি করেন যে, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে কৃষি পুনর্গঠন এবং উন্নয়নের পূর্বে কৃষিক্ষণ সমস্যা অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫১-৫২ সালে সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটি নিয়োগ করা হয়। কৃষিক্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে কমিটি মন্তব্য করেন যে, বর্তমানে কৃষিক্ষণ গ্রায্য পরিমাণের নয়, ইহা গ্রায্য প্রকৃতির নয়, ইহা গ্রায্য উদ্দেশ্য সাধন করে না এবং প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ইহা কদাচিৎ উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট যায়। ("To day the agricultural credit that is supplied falls short of the right quantity, is not of the right type, does not serve the right purpose and by criterion of need often fails to go to the right people".) কৃষিক্ষণের এই উদ্বেগজনক অবস্থার অবসানকল্পে কমিটি সুসম্বন্ধ কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে নির্দেশ দিয়াছেন। পরে এই কমিটির সুপারিশগুলি আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিব। লক্ষ্য করার বিষয় যে, এই কমিটির সুপারিশগুলি সমবায় কৃষিব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা (Reserve Bank and Rural Credit) : কৃষিক্ষণের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে ভূমিকা তাহা স্বীকার না করিলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। বিশেষ করিয়া, ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পর হইতে কৃষিক্ষণের ক্ষেত্রে উহার গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পায়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি কৃষিক্ষণ বিভাগ (Agricultural Credit Department) রহিয়াছে। এই বিভাগটি এই কাজগুলি করিয়া থাকে, (ক) কৃষিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে একদল কৃষিক্ষণ বিশেষজ্ঞ কর্মী নিয়োগ করা, (খ) কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলিকে এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য ব্যাঙ্কিং সংস্থাগুলিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শদান করা এবং (গ) প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ঋণদান সংস্থার মাধ্যমে কৃষিপণ্যের গতিশীলতা বৃদ্ধি করা।

সমগ্র ব্যাঙ্ক জগতের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বন্ধু, পথ প্রদর্শক এবং দার্শনিকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া থাকে। কৃষকগণ গ্রামীণ প্রাথমিক সমবায় সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ করে, প্রাথমিক সমিতিগুলি কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণ করে, আবার কেন্দ্রীয় সমিতিগুলি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করে। প্রয়োজন হইলে রাজ্য সমবায় সমিতি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পাইবে। অন্যান্য ঋণদান সংস্থার তত্ত্বাবধান, শিক্ষণের ব্যবস্থা, সমবায় ব্যাঙ্কের শেয়ার ক্রয়ের জন্ত রাজ্য সরকারকে ঋণদান এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে দাদনের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিকল্পনাকালে সমবায় আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ১৪ কোটি টাকা ঋণদান করে, ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৫১ কোটি টাকায় আসিয়া পৌঁছায়।

বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় স্তার ম্যালকম ডার্লিং কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা লইয়া অনুশীলন করেন। কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা সম্পর্কে ম্যালকম ডার্লিং রিপোর্টের সুপারিশ এবং সর্বভারতীয় কৃষিক্ষেত্র জরিপ কমিটির সুপারিশ মূলত একই প্রকার। সর্বভারতীয় কৃষিক্ষেত্র জরিপ কমিটি মন্তব্য করিয়াছে “কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সমবায় ব্যর্থ হইয়াছে, কিন্তু সমবায়কে সফল করিতেই হইবে।” (“In the field of rural credit co-operation has failed, but co-operation must succeed”.) কৃষিক্ষেত্র সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কমিটি সমবায় সমিতিতে রাজ্যসরকারের অংশ গ্রহণের সুপারিশ করেন। বিশ বৎসর পূর্বে স্তার ম্যালকম ডার্লিং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায় ব্যবস্থাই কৃষিক্ষেত্র পুনর্গঠন এবং শক্তিশালী করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিক্ষেত্র বিভাগ সমবায় আন্দোলনের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রক্ষা করিয়া চলে এবং প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে উপযুক্ত পরামর্শ দান এবং অর্থসাহায্য করে। নামমাত্র সুদের হারে ঋণ ও দান এবং পুনর্বাস্তার সুবিধা দেয়।

সম্প্রতি ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া ব্যাঙ্ক ঋণের পরিধি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। প্রথমত, ব্যাঙ্ক রেট ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলেও কৃষিক্ষেত্র ব্যাঙ্ক রেট অপেক্ষা সর্বদাই ১½ হইতে ২% কম রাখা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, অর্থপ্রেরণের হার যথেষ্ট হ্রাস করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, কৃষিপণ্য স্থানান্তরকরণে সহায়তা করিবার জগু ছাড় এবং প্রতিশ্রুতি পত্রের (promissory notes) মেয়াদ ২ মাস হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৫ মাস করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ১৯৫৪ সাল হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কসমূহকে মধ্য মেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিতেছে। ১৯৪২ সালের পর হইতে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের রাজ্যসরকারের গ্যারান্টিযুক্ত ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরোক্ষভাবে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে।

এই সকল কাজ ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষিক্ষেত্র সম্পর্কে গবেষণা এবং সমীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ১৯৩১-৩২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সর্বভারতীয় কৃষিক্ষেত্র এবং বিনিয়োগ জরিপ পরিচালনা করেন এবং ফলাফল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বুলেটিনে প্রকাশ করা হয়। দশ বৎসর পূর্বে, ১৯৫১-৫২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে শ্রী এ. ডি. গোরওয়ালার সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় কৃষিক্ষেত্র জরিপ কার্য পরিচালনা করা হয়। কৃষি ঋণদান কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষিক্ষেত্রের এক সুসঙ্গত নীতি গ্রহণ করেন।

কৃষিক্ষেত্র সমস্যা সমাধানের জগু ফসল বীমা পরিকল্পনার সহিত সমবায় ঋণদান সমিতির সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। ফসল বীমা পরিকল্পনা মূল্য স্থিতিকরণে সহায়তা করিবে এবং কোন কারণে ফসল নষ্ট হইলে কৃষককে নূতন ঋণ করিতে হইবে না। রাজ্যসরকারের সহায়তায় গঠিত জাতীয় ফসল বীমা পরিকল্পনার পরিচালনার ভার

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের উপর গ্রহণ করা যাইবে। কমিশন লইয়া বীমা পলিসি বিক্রয়ে সহায়তা করিবার জ্ঞান স্থানীয় সমবায় সমিতিগুলিকে অনুরোধ করা যাইতে পারে। ১৯৪৩ সালে দিয়ার রাজ্যে প্রথম ফসল বীমা প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয় কিন্তু ঐ প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। সম্প্রতি পাঞ্জাব সরকার ছয়টি কেন্দ্রে পরীক্ষামূলকভাবে ফসল বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছেন। ৫০০ গ্রাম এই ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করিবে। ফসল বীমাকরণ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিক্ষণ বিভাগের গভীরভাবে চিন্তা করার সময় আসিয়া গিয়াছে। এই বিভাগ সমস্তার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনুসন্ধানকার্য চালাইবে এবং জাতীয় ফসল বীমা পরিকল্পনার সহিত কৃষিক্ষণ ব্যবস্থাকে সুসম্বদ্ধ করিবে।

সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ (১৯৫১-৫২) এবং ভারতে কৃষিক্ষণের পুনর্গঠন (All India Rural Credit Survey and Reorganization of Rural Credit in India) : ১৯৫১-৫২ সালে ৭৫টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ৬০০ গ্রামে কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ. ডি. গোরওয়ালাকে সভাপতি এবং অধ্যাপক ডি. আর. গ্যাডগিলকে সদস্য করিয়া সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ১৯৫৪ সালে তাহার রিপোর্ট প্রকাশ করে।

(ক) কৃষিক্ষণের প্রকৃতি (Nature of Rural Credit as revealed by the Survey) : সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, গ্রাম্য-মহাজন, ব্যবসায়ী ও দালান, আত্মীয়স্বজন এবং জমিদার মোট কৃষিক্ষণের ৯৩ শতাংশ সরবরাহ করে। দ্বিতীয়ত, ঋণদান প্রতিষ্ঠানগুলির কাজ আশানুরূপ হয় নাই। সরকার কৃষিক্ষণের ৩০ শতাংশ, সমবায় সমিতিগুলি ৩১ শতাংশ এবং বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি ৯ শতাংশ সরবরাহ করিয়াছে। তৃতীয়ত, সমবায় সমিতি প্রদত্ত ঋণের অধিকাংশই পাইয়াছে বড় বড় জোতদারগণ। ছোট এবং মাঝারি কৃষকেরাই মোট কৃষকের ৭০ শতাংশ কিন্তু তাহারা সমবায় সমিতি হইতে ঋণগ্রহণের বিশেষ সুবিধা পায় নাই। সমবায় সমিতি হইতে ঋণগ্রহণ করিবার সময় জমি রাখার প্রয়োজন হয় বলিয়া ছোট ছোট ভূমিহীন কৃষকেরা স্বভাবতই ঋণ পায় নাই। চতুর্থত, মোট ঋণের মাত্র ৩২ শতাংশ কৃষির উপর মূলধন হিসাবে, ১৫ শতাংশ কৃষির উপর চলতি ব্যয় হিসাবে, ৪৭ শতাংশ পারিবারিক ব্যয় নির্বাহের জ্ঞান এবং বাকী অংশ অকৃষিগত ব্যবসায়ে ব্যয় করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মোট ঋণের অর্ধাংশ অনুপাদনশীল পারিবারিক ব্যয়নির্বাহের জ্ঞান এবং মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কৃষিউন্নয়নের জ্ঞান লগ্নী করা হইয়া থাকে। পঞ্চমত, জামিনের ব্যাপারে দেখা যায় যে, ৫০ শতাংশ পরিবার তাহাদের স্থাবর সম্পত্তিকে জামিন রাখিতে চান, ২৫ শতাংশ পরিবার ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ চান, বাকী ঋণগ্রহীতাগণ কি ধরনের জামিন দিতে চান তাহা নির্দেশ করিয়া বলেন নাই। ষষ্ঠত, কৃষি-পরিবার পিছু ঋণের পরিমাণ ২৯ টাকা হইতে ১২০০ টাকা পর্যন্ত আছে। ১৯৫১-৫২ সালে কৃষি-পরিবার প্রতি গড় ঋণের পরিমাণ ছিল ২১০ টাকা।

(খ) কৃষিক্ষণের ভিত্তি (Basis for a Rural Credit Scheme) : সর্ব-ভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যে সাংগঠনিক কাঠামোয় ভারতে সমবায় সমিতির পুনর্গঠনের চেষ্টা চলিতেছে তাহা সমবায় প্রসারের অল্পকূল নয়। ইহা ব্যতীত সমবায় বেসরকারী ঋণদাতাদের নিকট হইতে রীতিমত বাধা পাইয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্য হইবার কোন কারণ নাই যে, সমবায় সমিতি শুধুমাত্র সম্পদশালী কৃষকদিগকে ঋণদানের মধ্যেই তাহার কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। সমবায় আন্দোলন ভারতের মাটিতে শিকড় প্রসারিত করিতে পারে নাই—সরকারী আশ্রয়ে কোনরূপে টিকিয়া আছে মাত্র। (“Co-operation was a plant held in position with both hands by Government since its roots refuse to enter the soil.”)

সমবায় আন্দোলন অতীতে ব্যর্থ হইলেও কমিটি সমবায়কে কেন্দ্র এবং রাষ্ট্রীয় সাহায্যকে সর্ব করিয়া সুসম্বন্ধ ঋণব্যবস্থা গঠনের সুপারিশ করেন। কমিটি এই মত পোষণ করেন যে, একদিকে সরকারী সাহায্য এবং অপরদিকে সমবায় আন্দোলন যুক্ত হইলে কার্যকরী কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভবপর হইবে।

সুসম্বন্ধ কৃষিক্ষণ পরিকল্পনা দুইটি মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, সমবায় সমিতিগুলির ঋণদান নীতি এরূপভাবে পরিবর্তন করা প্রয়োজন যাহাতে শস্য ঋণব্যবস্থা (crop loan system) কার্যকরী করা যায়। এই ব্যবস্থায় যে কৃষকের বিক্রয়যোগ্য ফসল

দুইটি নীতি আছে সে সমবায় সমিতির সদস্য হইয়া প্রত্যাশিত ফসলের বিনিময়ে ঋণ লইতে পারিবে। দ্বিতীয়ত, সমবায় সমিতিতে রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবে। সমবায় সমিতিতে রাষ্ট্রের অংশীদারীর ফলে ক্ষুদ্র কৃষকের সমবায় সমিতিতে প্রবেশ সহজসাধ্য হইবে, সমবায় শুধুমাত্র সৌভাগ্যবান ব্যক্তিবর্গের আশ্রয়স্থল হইতে পারিবে না, গ্রাম্য মহাজন এবং ব্যবসায়ীদের কায়মী স্বার্থ প্রতিহত হইবে, এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলি উচ্চ পর্যায়ের সমবায় সমিতির নিকট হইতে অধিকতর ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটির প্রধান সুপারিশ : সুসম্বন্ধ গ্রাম্য ঋণ পরিকল্পনা (Main Recommendations : Integrated Scheme of Rural Credit) :

(ক) সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার সহিত সমবায় বিক্রয় সমিতির যোগসূত্র স্থাপন করিতে হইবে। কমিটি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে কৃষিক্ষণের ক্ষেত্র হইতে গ্রাম্য মহাজনের একচেটিয়ার অবসান ঘটাইতে হইবে। কোন বিকল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তীব্র প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না করিতে পারিলে মহাজন যথারীতি থাকিয়া যাইবে এবং জাতীয় উন্নয়ন প্রয়াস ব্যাহত করিবে। সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে ঋণদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিন্তু সরকারী কাজে দীর্ঘসূত্রতার এবং সময়ের অপব্যয় আশঙ্কা

করিয়া অতীত ব্যর্থতা সত্ত্বেও সমবায় সমিতির মাধ্যমেই কৃষিক্ষণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

দুর্বলতার জন্তই অতীতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহাকে সফল করিতে হইলে ইহার পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। প্রাথমিক সমবায় সমিতি হইতে শীঘ্র ব্যাঙ্ক পর্যন্ত যদি সমবায়ের সকল পর্যায়ে সরকারের সাহায্য পাওয়া যায় তাহা হইলে এই আন্দোলন সফল হইবে। যদি সমবায় ঋণদান সমিতি এবং সমবায় বিক্রয় সমিতি যুক্তভাবে কাজ করে তাহা হইলে সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে ফসল বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করা সহজ হইবে। সমবায় বিক্রয় সমিতির মাধ্যমে ফসল বিক্রয় হইবে এই প্রতিশ্রুতি পাইলে সমবায় ঋণদান সমিতি প্রত্যাশিত ফসলের বিনিময়ে কৃষকদিগকে ঋণ দিবে।

(খ) গুদামঘর পরিকল্পনা : সমবায় সমিতি কর্তৃক ঋণদান ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে গুদামঘর পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষক সর্বাপেক্ষা লাভজনক মূল্যে তাহার ফসল বিক্রয় করিবার সুবিধা পাইবে। গুদামঘর পরিকল্পনা সমবায় বিক্রয় সমিতির কাজকে সহায়তা করিবে। কমিটি একটি জাতীয় সমবায় উন্নয়ন এবং গুদামঘর পর্ষৎ (National Co-operative Development and Warehousing Board) গঠনের সুপারিশ করেন। রাজ্যসরকারগুলিকে দীর্ঘকালীন ঋণদানের উদ্দেশ্যে এই পর্ষতের জাতীয় সমবায় উন্নয়ন ফাণ্ড নামে একটি ফাণ্ড থাকিবে। ইহা ছাড়া এই কমিটি রাজ্য গুদামঘর কোম্পানী (State Warehousing Companies) এবং সর্বভারতীয় গুদামঘর কর্পোরেশন (All India Warehousing Corporation) স্থাপনের সুপারিশ করেন। সমবায় ঋণদান ব্যবস্থার সহিত রাষ্ট্রীয় সহায়তায় স্থাপিত গুদামঘর পরিকল্পনার সংযোগ সাধন হইলে ভবিষ্যতে সমবায় আন্দোলন সফল হইবে।

(গ) কৃষিক্ষণ ব্যবস্থার কেন্দ্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের অবস্থিতি। পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপর যেরূপ জোর দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মনে হয় কৃষকদিগের বাৎসরিক ঋণের পরিমাণ ৭৫০ কোটি টাকা অপেক্ষা অধিক হইবে। ব্যাঙ্কিং কার্যে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন যাহাতে নবগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গ্রাম্য এবং সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে। কমিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কে পরিণত করিবার সুপারিশ করেন।

(ঘ) তিনটি বিশেষ ধরনের ফাণ্ড গঠন : কমিটি রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে দুইটি এবং কেন্দ্রীয় খাতা ও কৃষিদপ্তরের অধীনে একটি বিশেষ ধরনের ফাণ্ড গঠনের নির্দেশ দেন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ প্রথম ফাণ্ডটির নাম হইল জাতীয় কৃষিক্ষণ তিনটি বিশেষ (দীর্ঘকালীন) ফাণ্ড [National Agricultural Credit (Long-Term Operations) Fund]। এই ফাণ্ডটি ৫ কোটি টাকা লইয়া কাজ শুরু করিবে এবং প্রতি বৎসর ইহাতে ৫ কোটি টাকা করিয়া জমা রাখা

হইবে। এই ফাণ্ড হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রাজ্যসরকারদিগকে সমবায় ব্যাঙ্কের অংশীদার হইবার জন্ত দীর্ঘকালীন ঋণ দান করিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ দ্বিতীয় ফাণ্ডটির নাম হইবে জাতীয় কৃষিক্ষণ (স্থায়িত্ববিধানকারী) ফাণ্ড [National Agricultural Credit (Stabilization) Fund]। এই ফাণ্ডটিতে প্রতিবৎসর ১ কোটি টাকা জমা রাখা হইবে। এই ফাণ্ড হইতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করা হইবে। কেন্দ্রীয় খাজ এবং কৃষিমন্ত্রণালয়ের অধীনে যে ফাণ্ডটি থাকিবে তাহার নাম হইবে জাতীয় কৃষিক্ষণ (ত্রাণ ও গ্যারান্টি) ফাণ্ড [National Agricultural Credit (Relief and Guarantee) Fund]। এই ফাণ্ডটিতে প্রতি বৎসর ১ কোটি টাকা জমা দেওয়া হইবে। বন্যা বা দুর্ভিক্ষের পর বকেয়া ঋণ পরিশোধ করিবার উদ্দেশ্যে এই ফাণ্ডটি ব্যবহার করা হইবে। এই তিনটি ফাণ্ডের সাহায্যে গ্রামাঞ্চলে সমবায়ের ভিত্তিতে সুসমৃদ্ধ ঋণ ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিবে। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে গ্রামীণ ঋণ কার্ঠামোয় স্থায়িত্ব আসিবে।

(৬) সুসমৃদ্ধ গ্রাম্য ঋণব্যবস্থার জন্ত দক্ষ কর্মী : সুসমৃদ্ধ কৃষিক্ষণ ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্ত সমবায় শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল দক্ষ কর্মীর প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় কর্মী শিক্ষণ-সংস্থা যাহাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অধিকতর অর্থ পায়—কমিটি তাহার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন।

কমিটির সুপারিশসমূহের মূল্যায়ন (An Appraisal of the Recommendations) : সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরিপ কমিটির সুপারিশসমূহ ভারত সরকার প্রথমে উৎসাহ এবং উদ্বীপনার সহিত গ্রহণ করিলেও পরে সহসা উহাদের বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৬১-৬২ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর একটি সমীক্ষা শেষ করিয়াছে বলিয়া পূর্বতন সমীক্ষার মূল্যায়ন সময়োচিত হইবে। ১৯৬১-৬২ সালের সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ এবং বিনিয়োগ জরিপ কমিটির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কৃষি পরিবার পিছু গড় ঋণের পরিমাণ হইল ৪০৬ টাকা। ভারত সরকার সর্বভারতীয় কৃষি কমিশন নিয়োগের কথা বিবেচনা করিতেছেন। কৃষিক্ষণ এই কমিশনের আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত থাকিবে।

আমরা সংক্ষেপে কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করিলাম। প্রথমত, রাজ্য সরকার অংশগ্রহণ করিলে সমবায় আন্দোলন নিঃসন্দেহে দৃঢ়তর হইবে কিন্তু তত্ত্বগত দিক ছাড়িয়া দিয়া ইহার কার্যকরী দিকের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় ভারত সমেত সকল অল্পদ্রুত দেশে স্বল্প পরিমাণ অর্থসরবরাহের সহিত অধিক পরিমাণ সরকারী কর্তৃত্বের সমস্যা থাকিয়া যায়। ইহা ব্যতীত অতীত ঋণ-সমস্যা সমাধান না করিয়া কৃষিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠন কতদূর সফল হইবে সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষির অগ্রাধিকার অনস্বীকার্য। পুনর্গঠিত কৃষি কাঁচামাল দিয়া দ্রুত শিল্পায়ণে সহায়তা করিবে। কৃষিক্ষণের পুনর্গঠন করিয়া

কৃষককে সস্তায় অর্থসরবরাহ করিলেই চলিবে না। কৃষকের আয় বৃদ্ধির ফলে যে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে তাহাও একত্রিকরণ করা প্রয়োজন। সমবায় ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শাখাসমূহ সকল কৃষককে স্পর্শ করিতেছে কিনা এ সম্পর্কে সন্দেহ আছে। মনে হয়, জাতীয় সম্প্রসারণ মাধ্যমে প্রদত্ত তত্ত্বাবধানকারী রাষ্ট্রীয় ঋণদান ব্যবস্থা (Supervised State Credit) কৃষকদের অধিকতর উপযোগী হইবে।

তৃতীয়ত, ১৯৫৭ সালে মিঃ চেস্টার ডেভিস (Mr. Chester C. Davies) পরিকল্পনা কমিশনের অনুরোধে কৃষিক্ষণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া ভারতীয় কৃষিক্ষণের ক্ষেত্রে গ্রামা মহাজনের ভূমিকার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কৃষকদিগের মোট ঋণের অধিক অংশ এই শ্রেণীর নিকট হইতে আসে বলিয়া রাজ্য সরকারের সহায়তায় এই ব্যক্তিগত ব্যবস্থাকে উন্নত করার সুপারিশ করা হইয়াছে। ভারতে কৃষিক্ষণ ব্যবস্থার পুনর্গঠনের জ্ঞাত প্রতিষ্ঠানগত ঋণদান ব্যবস্থার সহিত ব্যক্তিগত ঋণদান ব্যবস্থার সংযোগ সাধন করা প্রয়োজন।

চতুর্থত, সুসম্বদ্ধ কৃষিক্ষণ কাঠামোয় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বিনা ব্যয়ে টাকা পাঠাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে এবং সমবায় ব্যাঙ্ক সহজ সর্বোচ্চ কৃষকদিগকে ঋণদান করিবে। এই সুসম্বদ্ধ ঋণকাঠামোয় বাণিজ্য ব্যাঙ্কের কোন ভূমিকা নাই। অবশ্য বড় বড় ব্যাঙ্কগুলি প্রধানত শহরেই তাহাদের শাখা স্থাপন করে বলিয়া গ্রামের সহিত সংযোগ রক্ষা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে শাখা আছে এরূপ ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিকরণ করিয়া ঋণদান ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা যায়। এই ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলির উপর রিজার্ভব্যাঙ্কের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। ছোট ছোট ব্যাঙ্কগুলিকে একত্রিকরণ করিয়া উহার সহিত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সংযোগ স্থাপন করিলেই আদর্শ ব্যবস্থা হইবে।

সুপারিশগুলির কার্যে পরিণতকরণ (Implementation of the Recommendations) : ভারত সরকার সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ জরীপ কমিটির অধিকাংশ প্রধান প্রধান সুপারিশ গ্রহণ করিয়া কার্যে পরিণত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রথমত, ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই তারিখে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে জাতীয়করণ করিয়া স্টেট ব্যাঙ্ক গঠন করা হয়। ১৯৬০ সালের মধ্যে গ্রামাঞ্চলে ৪০০ টি নূতন শাখা স্থাপন করা হয়।

দ্বিতীয়ত, সমবায় আন্দোলনে সরকার যাহাতে অধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করা হইয়াছে। এই সংশোধনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনে জাতীয় কৃষিক্ষণ (দীর্ঘকালীন) ফাণ্ড গঠন করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে এককালীন ৫ কোটি টাকা ও বাৎসরিক জমা ৫ কোটি টাকা এই দশ কোটি টাকা লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিবৎসর এই ফাণ্ডে ৫ কোটি করিয়া টাকা জমা রাখিতেছে।

তৃতীয়ত, ১৯৫৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অধিকাংশ রাজ্যে গুদামঘর কর্পোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গুদামঘর কর্পোরেশন দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বিভিন্ন কেন্দ্রে ৪০টি বৃহদায়তন গুদামঘর নির্মাণ করে।

চতুর্থত, সমবায় সংক্রান্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হইয়াছে। এই কমিটি পুনরায় একটি কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত পুনা, রাঁচী, মীরাট, মাদ্রাজ এবং ইন্দোরে পাঁচটি আঞ্চলিক সমবায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

সুসম্বদ্ধ কৃষিক্ষণ পরিকল্পনার পুনর্বিচার (Reassessment of the Integrated Rural Credit Scheme) : ভারতে সমবায় আন্দোলন পুনর্গঠনের পদ্ধতি সম্পর্কে দুইটি মত প্রচলিত আছে। পুরাতনপন্থীরা মনে করেন যে, শিক্ষা ও অবাধ মেলামেশা এবং পারস্পরিক সাহায্যের ভিত্তিতে সমবায় গঠিত হইলে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন স্বার্থ-সংঘাতের অবসান ঘটিবে। এই কারণে ইহারা সমবায় আন্দোলনে রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের বিরোধিতা করেন। ইহারা ছোট ছোট সমবায় পছন্দ করেন, ইহাদের আদর্শ,—“একটি গ্রাম, একটি সমবায়।” আধুনিক মতাবলম্বীরা মনে করেন যে, সরকারের সহায়তায় সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে পারিলে ইহা অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে। কয়েকটি গ্রাম লইয়া একটি করিয়া বড় আকারের সমবায় সমিতি গঠন করা ইহাদের আদর্শ। ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সমবায় সংক্রান্ত আধুনিক মতই সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করে।

১৯৫৮ সাল হইতে পুনরায় সমবায় সংক্রান্ত পুরাতন মত সরকারী মহলে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। সরকার মনে করেন যে, সর্ব ভারতীয় কৃষি ঋণ জরিপ কমিটি সমবায়ের ক্ষেত্রে সরকারের অংশ গ্রহণের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করায় সকলেই সমবায়ের আত্মনির্ভরশীলতার নীতি ভুলিয়া সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছে। পুনরায় সরকারী নীতির পরির্তন ঘটে এবং একটি গ্রাম লইয়া একটি সমবায় গঠনের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। কিন্তু এই নীতির সফলতার জ্ঞাত বৃহৎ সমবায় এবং ক্ষুদ্র সমবায় গঠনের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা ও তাহার জ্ঞাত ব্যয়ের হিসাব করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ইহা করার প্রয়োজন ছিল, কারণ পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত সমবায়গুলি ঋণদান ব্যাপারে স্বেচ্ছাবেই তাহাদের দায়িত্ব পালন করিয়াছে। ১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসে জাতীয় উন্নয়ন কাউন্সিল দুই ধরনের সমবায় সমিতি গঠনের সিদ্ধান্ত করেন—(ক) একটি গ্রাম, একটি সমবায় এবং (খ) অনেক গ্রাম লইয়া বৃহৎ সমবায়। প্রথমটি অপেক্ষাকৃত উন্নত অঞ্চলে থাকিবে আর দ্বিতীয় ধরনের সমবায় সমিতি অনুন্নত অঞ্চলের অধিকতর উপযোগী হইবে।

সমবায় আন্দোলন যদি সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা হইলে উহাকে আর সমবায় আন্দোলন বলা চলে না, কারণ সমবায়ের আসল লক্ষ্যই হইল গণতান্ত্রিকতা এবং আত্মনির্ভরশীলতা। অতিরিক্ত সরকারী হস্তক্ষেপ অবশ্যই ক্ষতিকর কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, এই আন্দোলনে কোন সরকারী সাহায্য থাকিবে না। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সরকারের সহায়তা এক আর সরকারী হস্তক্ষেপ আর এক ব্যাপার। এমনকি, প্রস্তাবিত গ্রাম-কেন্দ্রিক ক্ষুদ্র সমবায়ের প্রাথমিক পর্যায়ে সরকারী সাহায্যের প্রয়োজন হইবে।

যাহা হউক, যতদিন পর্যন্ত সমবায় আন্দোলনে শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী এবং পর্যাপ্ত অর্থের অভাব থাকিবে ততদিন পর্যন্ত ইহাকে সরকারের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে। আমাদের মনে হয়, এরূপ অবস্থায় দুই তিনটি গ্রাম লইয়া মাঝারি আকারের সমবায় সমিতি গঠন করিলে কৃষকগণ অধিকতর লাভবান হইবে।

কৃষিউৎপাদন বৃদ্ধির যে কর্মসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিক্ষণের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, গৃহীত নীতির ফলাফল, ভবিষ্যত প্রয়োজন এবং উহা পূরণের উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণের জন্ত কৃষিক্ষণ ব্যবস্থাকে নতুন করিয়া পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কৃষিক্ষণ সরবরাহ ব্যবস্থার পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় কৃষিক্ষণ পর্যালোচনা কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ভূমিসংস্কার এবং ভূমিনীতি (Land Reforms and Policy)

ভারতে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা আইনগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় ইহা এরূপ এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যাহা দেশের অনগ্র-সরতার অগ্রতম কারণ। ভারতীয় অর্থনীতির পুনর্গঠন এবং উন্নয়নে ভূমিসংস্কারের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। দ্রুত শিল্পায়ণ পরিকল্পিত কৃষি-বিপ্লবের উপর নির্ভরশীল। আবার কৃষি বিপ্লবের উপযুক্ত ভিত্তিস্থাপনের জ্ঞাত ভূমি সংস্কার অপরিহার্য। এই কারণে ভারত সরকার ভূমি সংস্কারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন। ১৯৫২ সালে নাগপুর প্রস্তাবনায় কংগ্রেস সরকার যে নূতন ভূমি সংস্কার নীতি গ্রহণ করেন তাহারই ভিত্তিতে বর্তমান ভূমিসংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

পরিকল্পিত উন্নয়নের দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, ভূমি সংস্কারের কতকগুলি প্রত্যক্ষ ফলাফল আছে। প্রথমত, ইহার ফলে আয় বণ্টনে অধিকতর সমতা দেখা দিবে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাত হইতে ক্রয়ক্ষমতা বহুব্যক্তির নিকট হস্তান্তরিত হইলে চাহিদার পরিবর্তন ঘটবে। ধনীর তুলনায় দরিদ্র ব্যক্তির প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা অধিক বলিয়া আয়ের পুন-বণ্টনের দরুন চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ইহার ফলে সক্রিয় চাহিদার সৃষ্টি হইবে এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হইবে। কিন্তু কৃষকদের আয় বৃদ্ধির ফলে বিক্রয়যোগ্য ফসলের পরিমাণ কমিতে পারে এবং ইহা দেশের উন্নয়নে ব্যাধাত সৃষ্টি করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, জমির ভোগদখল সম্পর্ক কৃষকের মনে আস্থার ভাব আসিলে তাহারা অধিক পরিশ্রম এবং বিনিয়োগ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। অবশ্য নীট ফলাফল কি হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন, কারণ উহা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই শুধু বলা যায়।

ভারতের ভূমিস্বত্বব্যবস্থা (Land Tenure Systems in India) : ভারতে প্রধানত, তিন ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

(ক) **রায়তওয়াসী ব্যবস্থা :** এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রায়ত সরাসরিভাবে সরকারকে জমির খাজনা দিবে এবং যতদিন পর্যন্ত সে ঠিকভাবে খাজনা দিতে পারিবে ততদিন তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। এই ব্যবস্থায় কোন মধ্যস্থত্বভোগী নাই—রায়তগণ জমির খাজনার জ্ঞাত সরকারের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়ী থাকিবে। বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং মধ্যপ্রদেশে এই ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি

হইল যে, খাজনা নির্ধারণের জন্ত কিছুকাল পর পর জমি জরিপ করা হয়। সরকারী কর্মচারীগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেদের পছন্দমত খাজনার হার বৃদ্ধি করার দরুন কৃষকগণ অত্যধিক খাজনার ভারে প্রপীড়িত হইয়াছে।

(খ) **মহালওয়ারী ব্যবস্থা** : এই ব্যবস্থা অনুযায়ী কতকগুলি গ্রাম লইয়া গঠিত “মহালের” সহিত জমির বন্দোবস্ত করা হয়। এই ব্যবস্থায় সমগ্র গ্রাম বা মহালকে উহার সমুদয় জমির যুক্ত মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রত্যেক কৃষক ব্যক্তিগতভাবে এবং যুক্তভাবে খাজনা প্রদানের জন্ত সরকারের নিকট দায়ী থাকে। সাধারণত লস্করদার নামক গ্রামের মোড়ল নির্দিষ্ট সময়ান্তে খাজনা আদায় করিয়া সরকারী তহবিলে জমা দেয়। সমবায় চাষের জন্ত এই ধরনের ভূমিব্যবস্থা আদর্শ। পঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং আগ্রায় এই ধরনের ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

(গ) **জমিদারী ব্যবস্থা** : ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস ইংলণ্ডের অনুকরণে এদেশে জমিদারী ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থায় দেয় খাজনার পরিমাণ চিরকালের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে বলিয়া ইহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও বলা হয়। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে জমিদারী বন্দোবস্তেও দেয় খাজনার পরিমাণ ৪০ বৎসর পর পর পুনর্বিবেচনা করা হইত। এই ব্যবস্থায় জমিদারকে জমির একচ্ছত্র মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিয়মিতভাবে খাজনা দিতে পারিলে কোন জমিদারকে উৎখাত করা চলিবে না। এই ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলা, বিহার, অন্ধ্র এবং মধ্যপ্রদেশ ও যুক্তপ্রদেশের কিছু অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ১৯৩৮ সালে দেশের এক চতুর্থাংশে এই ব্যবস্থা বলবৎ ছিল।

এই জমিদারী ব্যবস্থা সরকার ও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্থত্বভোগী পরভোজী এবং নগর-প্রবাসী বিলাসী জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি করিয়া গ্রামীণ কৃষি ব্যবস্থায় এক অচলাবস্থা আনিয়া কৃষককে শোষণের শিকারে পরিণত করিয়াছে।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ (Abolition of the Zamindari System) : জমিদারী বন্দোবস্তে জমিদারেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র খাজনা আদায়কারীর ভূমিকা পালন করিয়াছে, জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্ত কিছুই করে নাই। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে কষিত জমির পরিমাণ বাড়িতে থাকে এবং উহার দরুন কর্ষণযোগ্য জমির চাহিদাও বাড়িয়া চলে। ইহার ফলে জমিদারদিগের খাজনার পরিমাণ বাড়িয়া চলে এবং কৃষক ও জমিদারের মধ্যে মধ্যস্থত্বভোগী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদার এবং মধ্যস্থত্বভোগীশ্রেণী লাভবান হয় কিন্তু সরকারের আয় চিরকালের জন্ত নির্দিষ্ট থাকায় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর কৃষক দরিদ্র হইতে অধিকতর দরিদ্র হইতে থাকে।

জমিদারী প্রথার এই কুফল দূর করিবার জন্ত স্বাধীনতার পর সরকার এই প্রথার উচ্ছেদের জন্ত আইন পাশ করেন। এই আইনের বলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়া

সরকার ভূমি স্বত্বের মালিক হইয়াছেন এবং জমির বিধিবদ্ধ মালিকের সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। জমিদারী উচ্ছেদ আইনের বলে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ একর জমি ইহাদের হাত হইতে মুক্ত হয় এবং ইহা বাবদ ৫০০ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে মার্চ মাসে মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, আসাম, গুজরাট, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্র, যুক্তপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিম বাংলা, বিহার এবং কেরালায় মধ্যস্বত্বভোগীদের সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা হয়।

বিভিন্ন রাজ্যে জমিদারী বন্দোবস্ত উচ্ছেদের জন্য যে সকল আইন পাশ হইয়াছে নিম্নে তাহাদের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হইল :

বৈশিষ্ট্য

প্রথমত, মধ্যস্বত্ব ব্যবস্থা উচ্ছেদ করিয়া জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। জমিদার জমি হইতে নীট আয়ের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ পাইবেন, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে গতিশীলতার নীতি অনুসরণ করা হইয়াছে, অর্থাৎ জমির নীট আয় যত বেশি হইবে ক্ষতিপূরণের হারও তত কম হইবে আর নীট আয় যত কম হইবে ক্ষতিপূরণের হারও ততই অধিক হইবে। পশ্চিম বাংলায় ক্ষতিপূরণের হার এইরূপ :

নীট আয়			ক্ষতিপূরণের হার	
প্রথম	৫০০	টাকা অথবা আংশিক	২০ গুণ	
পরবর্তী	৫০০	" " "	১৮ "	
পরবর্তী	১,০০০	" " "	১৭ "	
পরবর্তী	২,০০০	" " "	১২ "	
পরবর্তী	১০,০০০	" " "	১০ "	
পরবর্তী	১৫,০০০	" " "	৬ "	
পরবর্তী	৮০,০০০	" " "	৩ "	

দ্বিতীয়ত, ক্ষতিপূরণ আংশিকভাবে নগদ টাকায় এবং আংশিকভাবে সরকারী ঋণ-পত্রের দ্বারা দেওয়া হয়। ছোট জমিদারেরা সাধারণত নগদ টাকায় ক্ষতিপূরণ পাইবেন। পশ্চিম বাংলায় প্রথম ৫০০ টাকা নীট আয়ের উপর দেয় ক্ষতিপূরণ সম্পূর্ণ ভাবে নগদ টাকায় এবং অবশিষ্ট ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সরকারী ঋণপত্রে এবং আংশিকভাবে নগদ টাকায় দেওয়া হইবে।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত চাষের জন্য জমিদার জমি রাখিতে পারিবে কিন্তু জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিম বাংলায় কোন ব্যক্তি ২৫ একর পর্যন্ত কৃষি জমি এবং ২০ একর পর্যন্ত অকৃষিগত জমি রাখিতে পারিবে।

চতুর্থত, জমিদারী উচ্ছেদের পর রায়ত সরাসরি সরকারকে খাজনা দেয়। সরকারকে সামান্য খাজনা দিবার বিনিময়ে রায়ত জমির মালিকানা ভোগ করে। এই ব্যবস্থার ফলে রায়তের মনে এক নূতন আশা এবং উদ্বোধনার সৃষ্টি হয়, কারণ যে খাজনা

সে দিতেছে তাহা কোন মধ্যস্থত্ব ভোগীর পকেটে যায় না—উহা সরকার লাভ করে এবং পুনরায় তাহাদেরই কল্যাণের জন্ত ব্যয় করে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ফলাফল (Effects of Zamindary Abolition) : জমিদারী উচ্ছেদের ফলাফল লক্ষ্য করিলে আমরা উন্নয়নকারী অর্থনীতিতে ভূমিসংস্কারের প্রভাব ঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব।

প্রথমত, ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, জমিদারী উচ্ছেদের ফলে কৃষি উৎপাদন আপনা আপনি বৃদ্ধি পাইবে না। যদি জমির খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতা বন্ধ না করা যায় এবং মাস্কাতা আমলের কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন না করা যায় তাহা হইলে শুধুমাত্র জমিদারী উচ্ছেদ করিয়া বিশেষ কোন লাভ হইবে না। জমিদারী উচ্ছেদের পর কৃষি ব্যবস্থার পুনর্গঠন করা প্রয়োজন। ধীরে ধীরে স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সমবায় চাষকে এই নূতন কৃষিব্যবস্থার সহিত যুক্ত করিতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর জোতের সংহতিসাধনের দায়িত্ব সরকারের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। খণ্ড এবং অসম্বদ্ধ জোতের সংহতি সাধন করা হইলে বৃহৎ আকারে সমবায় চাষ প্রবর্তন করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। ইহা আশা করা যাইতেছে যে, খাজনার আকারে সরকার যাহা গ্রহণ করিবেন তাহার অধিকাংশই গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা এবং কল্যাণমূলক কাজে ব্যয়িত হইবে। কৃষকের স্বার্থ উপেক্ষিত হইলে ভূমি সংস্কারের দ্বারা কৃষিপ্রধান দেশের কোন মঙ্গলই সাধিত হইবে না।

তৃতীয়ত, জমিদারী উচ্ছেদের ফলে কৃষি-শ্রমিকের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না, উপরন্তু জমিদারের অধীনে যাহারা খাজনা আদায়ের কাজে নিযুক্ত থাকিত তাহারা বেকার হইবে। এই সকল বেকারদিগের বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব হইল সরকারের।

চতুর্থত, নগদ টাকায় জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দিলে উহা মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি করিবে। সরকার ইহা উপলব্ধি করিয়া ক্ষতিপূরণের সামান্য অংশ নগদ টাকায় এবং বেশি অংশ দীর্ঘমেয়াদী ঋণপত্রে দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সরকারী সহায়তায় অর্থ কর্পোরেশন গঠন করা যাইতে পারে। ইহা ভূতপূর্ব জমিদারদের নিকট হইতে সরকার প্রদত্ত ঋণপত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের অর্থ সাহায্য করিবে যাহাতে তাহারা ছোটো ছোটো ভোগাশিল্প গড়িয়া তুলিতে পারে। ইহার ফলে ভোগ্যবস্তুর যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমিবে।

জমিদারী প্রথার উচ্ছেদকে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন বলিয়া অভিহিত করা যায়। ইহা সমালোচনার উদ্দেশ্য নয়, তবুও বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের ফলে জমির মালিকানায় বৈষম্য হ্রাস পাইয়াছে এবং সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান ঘটিয়াছে।

পূর্বতন ভূমিস্বত্ব আইন (Tenancy Legislations in the Past) : জমির উপর জনসংখ্যার প্রবল চাপ এবং জমিদারের শোষণ ভারতীয় অর্থনীতির বিগত-

কালের বৈশিষ্ট্য ছিল। ভূমিসংস্কারের উদ্দেশ্য কৃষকদিগের কষ্ট লাঘব করা। প্রাক-স্বাধীনতাযুগে যে সকল ভূমিস্বত্ব আইন পাশ হইয়াছিল তাহাদের মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) জমির ভোগদখল সম্পর্কে নিরাপত্তা : বৃটিশযুগে বোম্বাই, পাঞ্জাব, হিমাচলপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে প্রজার জমি ভোগদখল নিরাপদ করিবার জ্ঞাত আইন পাশ করা হয়। এই সকল আইনে প্রজা যতদিন পর্যন্ত নিয়মিতভাবে খাজনা দিবে ততদিন পর্যন্ত তাহাকে উচ্ছেদ করা যাইবে না। জমির ভোগদখল নিরাপদ হওয়ায় ইহা কৃষকদের মনে অল্পপ্রেরণা সঞ্চার করে এবং তাহারা জমি-উন্নয়নের ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ দেখায়।

(খ) গ্রাযা খাজনা : পাঞ্জাব, হায়দ্রাবাদ এবং রাজস্থানে কৃষকগণের নিকট হইতে জমিদারদের আদায়ী খাজনার সর্বোচ্চ সীমা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারের শোষণের হাত হইতে আংশিকভাবে কৃষককে রক্ষা করা সম্ভব হয়। গ্রাযা খাজনা আইন বলবৎ হওয়ার ফলে কৃষকের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় এবং কৃষি উন্নয়নের জ্ঞাত সামান্য পরিমাণ বিনিয়োগ করিতে সমর্থ হয়।

(গ) ভূমির মালিকানা অর্জনের সুযোগ : বোম্বাই, পাঞ্জাব, দিল্লী, রাজস্থান, যুক্তপ্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদে কৃষক যে জমি চাষ করিত তাহা ক্রয় করিবার অধিকার তাহার ছিল। কৃষককে জমির স্বত্বাধিকারী হইতে উৎসাহিত করিবার জ্ঞাত পাঞ্জাবে কৃষক কোন জমি ১২ বৎসর চাষ করিলে তাহা ক্রয় করিবার অধিকার তাহাকে দেওয়া হইত। এই ধরনের আইনের ফলে কৃষকগণ ঋণগ্রহণ করিয়াও জমি ক্রয় করিত। এইভাবে তাহারা মহাজনের আয়ত্বে আসিয়া পড়ে বলিয়া তাহাদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। এই আইন অধিকতর কার্যকরী হইত যদি ইহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষককে সস্তায় ঋণদানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিত।

(ঘ) স্থায়ী উন্নয়ন বাবদ ক্ষতিপূরণ : কয়েকটি রাজ্যে জমির স্থায়ী উন্নতি-বিধান করিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিবার জ্ঞাত আইন পাশ করা হয়। এই ক্ষতিপূরণ আইন জমির ভোগদখলসংক্রান্ত আইনের সহিত যুক্ত হইয়া জমির উন্নয়নে কৃষকের মনে মৃদু অল্পপ্রেরণার সৃষ্টি করে। কিন্তু কৃষি কার্ঠামোর পরিবর্তন না হওয়ায় ইহার কোন সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখা যায় নাই।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভূমিস্বত্ব আইন (Tenancy Legislations under the Five Year Plans) : ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভূমিস্বত্ব আইনের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল : (ক) খাজনা হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ করা, (খ) প্রজার জমি ভোগদখল সম্পর্কে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং (গ) জোতের উৎকর্ষসীমা নির্ধারণ ও বাড়তি জমির পুনর্বন্টন। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে পনেরোটি রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জমির ভোগদখল সম্পর্কে নিরাপত্তামূলক আইন পাশ করা হয়।

আইন পাশ হইবার পূর্বে খাজনার সাধারণ হার ছিল মোট উৎপাদনের ৫০ শতাংশ এবং কৃষকই চাষের সকল ব্যয়ভার বহন করিত। প্রথম পরিকল্পনায় খাজনার হার মোট উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ (জলসেচের সুবিধা থাকিলে এক-তৃতীয়াংশ) করিবার জ্ঞাত নির্দেশ দেওয়া হয়। মহারাষ্ট্রে মোট উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ খাজনার সর্বোচ্চ হার হিসাবে নির্ধারিত হয়। সম্প্রতি অন্ধ্র এবং মাদ্রাজে যে ভূমিস্বত্ব আইন পাশ হয় তাহাতে রাজস্বের হার যথাক্রমে মোট উৎপাদনের ৪০ এবং ৪৫ শতাংশ করা হয়। কতকগুলি রাজ্যসরকার পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অগ্রাহ্য করিয়া জোতদারদের স্বার্থের অনুকূলে ভূমি-স্বত্ব আইন পাশ করিয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে মধ্যস্বত্বভোগীদের উচ্ছেদ, দূর প্রসারী ভূমিস্বত্ব আইন প্রথম পরিকল্পনার প্রণয়ন এবং জমিতে প্রজার স্বত্ব স্বীকার করিয়া নূতন কৃষি-ব্যবস্থার ভূমি-নীতি প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে খণ্ড জোতের সংহতিসাধন এবং খাজনা হ্রাস করিবার কর্মসূচীও গ্রহণ করা হয়।

মধ্যস্বত্ব ভোগীদের উচ্ছেদের ব্যবস্থা প্রথম পরিকল্পনাকালে সকল রাজ্যেই বেশ সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। বর্তমানের পরিবর্তিত অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পুরাতন ভূমিসংস্কার আইনের সংশোধন করা হয়। যুক্তপ্রদেশ এবং দিল্লীতে প্রজাদের জমি ভোগদখলের পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু খাজনা হ্রাস করার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় নাই। কয়েকটি রাজ্যে খাজনার পরিমাণ হ্রাস পাইলেও অধিকাংশ রাজ্যেই খাজনার পরিমাণ পরিকল্পনা কমিশনের নির্ধারিত হার অপেক্ষা অধিক ছিল। জোতের সংহতিসাধনও প্রথম পরিকল্পনাকালে বিশেষ সন্তোষজনক হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভূমিসংস্কার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল সমবায় গ্রাম পরিচালনা (Co-operative Village Management) ব্যবস্থার সৃষ্টি করা। সমবায় গ্রাম পরিচালনার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, ইহা জমিতে প্রজার দ্বিতীয় পরিকল্পনায় স্বত্ব স্বীকার করিবে। দ্বিতীয়ত, ইহা পরিচালনা বিভাগ এবং কর্মগত ভূমিসংস্কার বিভাগের (unit of operation) মধ্যে পার্থক্য রাখিবে। তৃতীয়ত, সমবায় গ্রাম পরিচালনা আরম্ভ হইলে জোতদার এবং ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে পার্থক্য দূর হইবে। কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্যিক গ্রামের সমুদয় সম্পদ উৎপাদন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সমবায়ের নীতিতে নিয়োগ করা সহজ হইবে।

সমবায় গ্রাম পরিচালনার রূপান্তরকালে তিনটি পদ্ধতিতে জমি পরিচালিত হইবে। প্রথমত, কৃষক ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব জমি চাষ করিবে। দ্বিতীয়ত, নিজেদের স্বার্থে কয়েকজন কৃষক স্বেচ্ছায় জমি একত্র করিয়া সমবায় পদ্ধতিতে জমি চাষ করিবে। তৃতীয়ত, গ্রাম্যসমাজের মালিকানায় কিছু জমি থাকিবে। সুতরাং সমবায় গ্রাম পরিচালনা পরিকল্পনায় প্রতি গ্রামে একটি ব্যক্তিগত ক্ষেত্র, একটি সমবায় ক্ষেত্র এবং

একটি সমষ্টিগত ক্ষেত্র থাকিবে। সমবায় ক্ষেত্রটির বৃদ্ধিসাধন এরূপভাবে করিতে হইবে যাহাতে গ্রামের সমগ্র জমি গ্রামের সমবায় দায়িত্বের উপর গৃহীত হয়। অন্ত্যভাবে বলা যায় যে, সম্প্রসারণশীল সমবায় ক্ষেত্র সামাজিক ক্ষেত্রে পরিণত হইবে এবং জোতদার ও ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে যে পার্থক্য তাহা বিলুপ্ত হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ভূমিনীতির তিনটি বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রথমত, জমির উপর প্রজার স্বত্ব স্বীকার করা হইয়াছে এবং কৃষকের অধীনে যে জমি আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য উহার উপর তাহার মালিকানা স্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়ত, ভূমিনীতির চরম লক্ষ্য হইল যে, ভূমি পরিচালনার দায়িত্ব সমগ্র গ্রাম সমাজের উপর গৃহীত করিতে হইবে। তৃতীয়ত, জমিচাষ ব্যক্তিগত অথবা সমবায়ের ভিত্তিতে পরিচালিত হইবে। জমির মালিকানা এবং চাষপদ্ধতি সম্পর্কে সরকারী নীতি সুস্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ভূমিনীতি একটি পরস্পরবিচ্ছিন্ন অসম্বদ্ধ প্রয়াস মাত্র।

তৃতীয় পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কার নীতির পূর্বসূরী হিসাবে বাড়তি জমি পুনর্বন্টনের নীতি গৃহীত হইলেও জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ব্যবস্থা ঠিকভাবে কার্যকরী করা হয় নাই। জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের দায়িত্ব রাজ্যসরকারের উপর তৃতীয় পরিকল্পনায় ভূমিনীতি ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বলা হইয়াছিল যে, বিভিন্ন অঞ্চলের পার্থক্য, ভূমির প্রকৃতি, সেচের সুবিধা প্রভৃতি বিষয়গুলি চিন্তা করিয়া পারিবারিক জোতের (Family holdings) আয়তন নির্ধারণ করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ এবং পারিবারিক জোতের আয়তন ধার্য করার ব্যাপারে অধিকতর বাস্তবায়ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হইয়াছিল। যে জমি চাষ করিয়া কৃষক বৎসরে নীট ১২০০ টাকা আয় করিতে পারে তাহাকেই পারিবারিক জোত বলা হয়। স্থির হইয়াছিল যে, পারিবারিক জোতের তিনগুণ পর্যন্ত জমি যে কোন ব্যক্তি রাখিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় ভূমিসংস্কার কমিটি জমির আয়তন অপেক্ষা আয়ের পরিমাণকেই মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ রাজ্যই জমির আয়তনের উপর সীমা ধার্য করেন।

প্রথম পরিকল্পনাকালে জোতের উপর সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের সুপারিশ করা হইলেও এই সম্পর্কে কোন আইন পাশ করা হয় নাই। ১৯৫৮ সালে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ হওয়ায় জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণের পথে যে সাংবিধানিক অসুবিধা ছিল তাহা অপসারিত হয়। ১৯৫৯ সালে কংগ্রেস দলের নাগপুর অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে, জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া রাজ্যসরকারসমূহ আইন পাশ করিবে। ইহার ফলে যে বাড়তি জমি পাওয়া যাইবে তাহা পঞ্চায়েতের উপর গৃহীত করা হইবে এবং ভূমিহীন কৃষকগণ কর্তৃক সমবায়ের ভিত্তিতে উহা পরিচালিত হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৫টি রাজ্যে জোতের ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করিয়া আইন পাশ করা হয়।

জোতের উর্ধ্বসীমা জম্মু ও কাশ্মীরে ২২ $\frac{১}{২}$ একরে, পশ্চিম বাংলায় ২৫ একরে, আসামে ৫০ একরে, যুক্তপ্রদেশে ৪০ একরে, মধ্যপ্রদেশে ২৮ একরে, বিহারে ২৪ একরে, রাজস্থানে ৩০ একরে, কেরালায় ১৫ একরে, গুজরাটে ১২ একরে, মাদ্রাজে ৩০ একরে, মহীশূরে ২৭ একরে, উড়িষ্যায় ২৫ একরে এবং পাঞ্জাবে ৩০ একরে নির্ধারিত হইয়াছে। দুইটি রাজ্যে আয়ের অঙ্কের উপর উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা অল্পে বাৎসরিক ৫৪০০ টাকা নীট আয়ের উপর এবং মহারাষ্ট্রে ৩৬০০ টাকা নীট আয়ের উপর নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের স্বপক্ষে কতকগুলি শক্তিশালী যুক্তি উপস্থাপিত করা হয়। জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে উৎকট ধনবৈষম্য

রহিয়াছে তাহা হ্রাস পাইবে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিঘোষিত

সমাজতান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজ গঠনের পথ প্রশস্ত হইবে। এই ব্যবস্থা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথে একটি প্রয়োজনীয় এবং দৃঢ় পদক্ষেপ। দ্বিতীয়ত, জোতের উর্ধ্বসীমা বাধিয়া না দিলে পুনরায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফলগুলি দেখা দিবে। ভূমিসংস্কার ব্যবস্থাকে কার্যকর করিয়া তুলিতে হইলে জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিয়াছে যে, রায়তের হাতে জোতের পরিমাণ অধিক হইয়া পড়িলে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ জমিতে কোর্ফা প্রজা (subtenants) বসাইয়াছে। এই সকল কৃষকদের সহিত সরকারের কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকে না। জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করিয়া দিলে এই ধরনের নূতন মধ্যস্থত্ব ভোগীর সৃষ্টি হইবে না। তৃতীয়ত, জোতের উর্ধ্বসীমা বাধিয়া দিলে যে অতিরিক্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া যাইবে। ইহার ফলে গ্রাম সমাজে এক বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন দেখা দিবে। ভূমিহীন কৃষকগণ জমি পাইলে তাহাদের মনে নবীন আশা, উদ্দীপনা এবং কর্মপ্রেরণার সৃষ্টি হইবে। ইহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। চতুর্থত, জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ফলে পঞ্চায়েত প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। বড় বড় ধনী জোতদার স্বভাবতই পঞ্চায়েতের উপর অবাঞ্ছিত প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। উর্ধ্বসীমা নির্দিষ্ট হইলে এই অবস্থার অবসান ঘটবে। ইহা সমবায় আন্দোলনের অধিকতর অনুকূল পরিবেশ রচনা করিবে।

জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের বিরুদ্ধেও যুক্তির অভাব নাই। প্রথমত, বলা হয় যে, জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করিলে ভূমিহীন কৃষকের বিশেষ উপকার হইবে না, অপরপক্ষে বড় বড় জমিদার ভাদ্রিয়া ছোট ছোট জোতের উদ্ভব হইবে আর ইহাতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে

চাষ সম্ভবপর হইবে না। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে যে সরকারী হিসাব

বিপক্ষে যুক্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের ফলে অতি অল্প পরিমাণ উদ্ভূত জমি পাওয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, উদ্ভূত জমির জগু

জমিদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার সমস্তা রহিয়াছে। বর্তমানে রাজ্যসরকারগুলির যেরূপ সঙ্কটজনক অর্থনৈতিক অবস্থা তাহাতে ইহা বিশেষ চাপের সৃষ্টি করিবে। আবার ক্ষতিপূরণের ফলে জমিদারদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে, উহা দেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বৃদ্ধি করিবে। তৃতীয়ত, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচীর মতে জোতের উর্ধ্বসীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়ার অর্থ হইল ভূ-স্বামীর আয় বাঁধিয়া দেওয়া। সারা দেশে অগাছ আয়ের ক্ষেত্রে উর্ধ্বসীমা না বাঁধিয়া ভূমির ক্ষেত্রে উহা ধার্য করার কি যুক্তি থাকিতে পারে? অবশ্য ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, জোতের সীমা ধার্য করা হইয়াছে মাত্র, জমি হইতে লব্ধ আয়ের সীমা নির্দিষ্ট করা হয় নাই। চতুর্থত, জোতের সীমা নির্দিষ্ট হইলে কৃষির দক্ষতা হ্রাস হইতে পারে। বৃহদায়তন জোত হইতে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যায়। জোতের আয়তন ছোট হইলে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জমি চাষ করা কঠিন হইয়া পড়িবে। অবশ্য এই যুক্তির উত্তরে বলা যায় যে, সমবায় পদ্ধতিতে গ্রামের সকল জমি একত্র করিয়া চাষ করিলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যাইবে।

নূতন কৃষিনীতি—নাগপুর প্রস্তাবনা (New Agrarian Policy—Nagpur Resolution) : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিনীতি বৈজ্ঞানিকভাবে রচিত হয় নাই। অবশ্য শীঘ্রই কংগ্রেসদল তাহাদের নীতির ক্রটি উপলব্ধি করিতে পারিলেন। কৃষির উন্নতি না হইলে অর্থনীতির অগাছ বিভাগও অচল হইয়া পড়িবে। ভারতের গ্রাম অল্পমত দেশে দ্রুত শিল্পায়নের জন্ত বিক্রয়যোগ্য খাদ্য এবং কাঁচামালের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ত একটি সুসম্বদ্ধ ভূমিনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নাগপুর প্রস্তাবনায় সমবায়কে নূতন কৃষিনীতির ভিত্তি বলিয়া বর্ণনা করা হয়। নূতন ভূমিনীতির লক্ষ্য হইল পঞ্চায়েৎ-কেন্দ্রিক যৌথ সমবায় চাষ প্রবর্তন করা। এই লক্ষ্যে পৌছিবার জন্ত সেবা সমবায় গঠন করা হইয়াছে। সেবা সমবায়গুলি সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী সংগঠন এবং ইহাদের মাধ্যমে কৃষকদের বীজ, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি এবং পরামর্শ দিবার ব্যবস্থা করা যাইবে। ইহারা ঋণদান এবং ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিবে। ১৯৫৯ সালের মধ্যেই রাজ্যসরকারসমূহ জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিয়া আইন পাশ করেন। ইহার কলে যে উদ্বৃত্ত জমি পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন কৃষকদিগের দ্বারা গঠিত সমবায় সমিতির উপর গ্রস্ত করা হইবে। এই বিষয়ে চরম লক্ষ্য হইবে অতি দ্রুত সারা দেশে একটি সমগ্র গ্রাম লইয়া একটি সমবায় যৌথ খামার প্রতিষ্ঠা করা।

নাগপুর প্রস্তাবনার মূল নীতি নিয়ে ব্যাখ্যা করা হইল।

[এক] গ্রাম পঞ্চায়েত এবং সমবায়ের ভিত্তিতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করিতে হইবে। পঞ্চায়েত এবং সমবায়ের হাতে যে কাজ দেওয়া হইবে তাহা সম্পাদন করিবার মত ক্ষমতা এবং অর্থ ইহাদের থাকিবে। কতকগুলি গ্রাম-সমবায় মিলিত হইয়া সম্ভব (union) গঠন করিতে পারে। জমি থাকুক আর না-ই থাকুক গ্রামের সকল স্থায়ী বাসিন্দা গ্রামসমবায়

সমিতির সদস্য হইতে পারিবে। সমবায় সমিতি কুটিরশিল্পকে উৎসাহ দান করিয়া এবং উন্নত কৃষিপদ্ধতির প্রবর্তন করিয়া সদস্যদের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে। ঋণদানের ব্যবস্থা করা ব্যতীত সমবায় সমিতি সদস্যদের কসল গুদামজাতকরণ এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে।

[দুই] ভবিষ্যৎ কৃষিকার্য্যমো সমবায় যৌথ চাষের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিবে। এই ব্যবস্থায় যুক্তভাবে চাষ করার জ্ঞাত একত্র করা হইবে, কিন্তু জমিতে কৃষকের স্বত্ব থাকিবে এবং জোতের আয়তন অনুপাতে উৎপাদনের অংশ পাইবে। যাহারা জমি চাষ করিবে তাহারা শ্রমের অনুপাতে উৎপাদনের অংশ (বা মজুরী) পাইবে।

[তিন] যৌথ চাষ প্রবর্তনের পূর্বে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সমগ্র দেশে সেবা সমবায় গঠন করিতে হইবে। তিন বৎসরের মধ্যে এই পর্যায় সম্পূর্ণ করিতে হইবে। সম্ভব হইলে এই সময়ের মধ্যেও যৌথ চাষ প্রবর্তন করা হইবে।

[চার] ভূমি-সংস্কার সম্পর্কে অনিশ্চয়তা দূর করিয়া কৃষিতে স্থায়িত্ব আনিবার উদ্দেশ্যে জোতের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করিবার এবং মধ্যস্বত্ব ভোগী উচ্ছেদের জ্ঞাত ১৯৫২ সালের মধ্যে সকল রাজ্যে আইন পাশ করিতে হইবে। উদ্ভূত জমি পঞ্চায়েতের উপর হস্ত হইবে এবং সমবায় সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত হইবে।

[পাঁচ] কৃষক যাহাতে গ্রাহ্য আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয় সে জ্ঞাত চাষের পূর্বেই প্রত্যেক কসলের সর্বনিম্ন মূল্য (floor price) নির্দিষ্ট করিয়া দিতে হইবে এবং প্রয়োজন হইলে ঐ মূল্যে সরাসরি উৎপাদিত কসল কিনিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

[ছয়] খাণ্ডশস্ত্রের পাইকারী ব্যবসায় ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যে প্রসারিত করিতে হইবে।

[সাত] অকর্ষিত এবং পতিত জমির পুনরুদ্ধার করিয়া উহাতে চাষ ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

ভারতের ভূমিনীতির সাফল্য তিনটি পূর্বসর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথমত, ভূমিনীতি কৃষকের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি করিবে। দ্বিতীয়ত,

এই নীতি গ্রামীণ অর্থনীতিকে এরূপ গতিশীল করিয়া তুলিবে যাহাতে তিনটি পূর্বসর্ত বিক্রয়যোগ্য কসলের এবং কৃষিজ কাঁচামালের যোগান ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়ত, ইহা আমাদের গণতান্ত্রিক জীবনধারাকে রক্ষা করিবে। এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধনের আদর্শ পন্থা হইল সমবায়।

কৃষি উন্নয়নের জ্ঞাত সমবায় গঠন সত্যিই প্রশংসনীয়। কিন্তু এই প্রকার সমবায় হইতে যৌথ সমবায় চাষ প্রবর্তন করা বেশ কঠিন কাজ হইবে। যৌথ সমবায় চাষের উপযোগী মানসিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত পরিবর্তন রাতারাতি ঘটিবে না, ইহা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

সমবায় চাষ সহজসাধ্য বা স্বয়ংক্রিয় কোন পদ্ধতি নয়। ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজন যোগ্য প্রস্তুতি, ব্যয়, তদারকী এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। মাঝাতা আমলের কৃষিপদ্ধতিতে বিশ্বাসী অশিক্ষিত কৃষকদিগকে সমবায় চাষের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। পঞ্চায়েতসমূহ উপযুক্ত শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তি লইয়া গঠিত হইলেই সমবায় চাষকে কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তোলা যাইবে।



ষোড়শ অধ্যায়

সমবায় চাষ এবং সমবায় আন্দোলন

(Co-operative Farming and the Co-operative Movement)

জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদের ফলে ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থায় যে মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে তাহার দরুন এক বিকল্প চাষ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। ভারতের মত গণতান্ত্রিক দেশে যৌথ চাষ (collective farming) প্রথা উপযোগী নয়। এই প্রণালীর বৈশিষ্ট্য হইল যে, কৃষকগণের জমি একত্র করিয়া কৃষিকার্য সম্পাদন করা। এই ব্যবস্থায় জমিতে কৃষকের স্বত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়। একবার যৌথ খামারে যোগদান করিলে কৃষকেরা আর ইহা পরিত্যাগ করিতে পারে না বা নিজ জমি ফিরিয়া পায় না। নূতন কৃষি প্রণালী প্রবর্তনের সময় মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় কৃষির অনগ্রসরতার প্রধান কারণই হইতেছে মাল্ধাতা আমলের চাষ ব্যবস্থা। সনাতন কৃষিপদ্ধতি গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে এবং ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রে অর্থনিয়োগ ভারসাম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্ত জোতের উদ্ধারসীমা নির্ধারণ করিয়া জমির পুনর্বণ্টন এবং অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জমির পুনর্বণ্টন হইলে ভারতীয় কৃষির সাংগঠনিক পরিবর্তন সাধিত হইবে। ভূমির পুনর্বণ্টন এবং ছোট ছোট কৃষকদিগকে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে সমবায় চাষের আদর্শ-পরিবেশ রচনা করা যাইবে। গণতান্ত্রিক দেশে সমবায় চাষের সাফল্যের জন্ত প্রয়োজন স্বচ্ছল কৃষক লইয়া গঠিত মাঝারি আকারের সমবায় সমিতি। ইহাতে রাষ্ট্রীয় সহায়তা থাকিবে, কিন্তু উহার হস্তক্ষেপ থাকিবে না।

সমবায় কৃষিপদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়া বলা হইয়াছে যে, সমবায় কৃষি সমিতি এমনই একটি সমিতি যেখানে নিজ জমিতে কৃষকের মালিকানা থাকিবে কিন্তু সকল জমি

একত্র করিয়া যৌথভাবে চাষ করা হইবে (“A co-operative farming society is a society where each cultivator would retain his right in his own land but cultivation

operations would be carried on jointly.”)। এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে সমবায় চাষের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ; (১) ছোট ছোট সকল জমি একত্র করিয়া একটি বৃহৎ ইউনিটে পরিণত করা হয়, (২) সভ্যগণ তাহাদের কাজের জন্ত পারিশ্রমিক পায়, (৩) জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকে, (৪) কৃষিকার্য সংযুক্তভাবে পরিচালনা করা হয়, (৫) রিজার্ভ ফাণ্ডের জন্ত লাভের একাংশ জমা রাখিয়া বাকী অংশ সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। শেয়ার বিক্রয়ের

টাকা হইতে সমিতির প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করা হয়। অবশ্য সদস্যগণ তাহাদের দেয় অর্থ সুদসমেত কিছুকাল পরে কিস্তিবন্দীতে ফেরৎ পাইবে। প্রাথমিক অবস্থায় সরকারী সহায়তা সমবায় কৃষি-সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করিবে।

সমবায় চাষের সুবিধাগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় : বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা, যৌথ পরিচালনার সুবিধা এবং ব্যক্তিগত মালিকানার সুবিধা।

ব্যক্তিগত বুঁকি থাকে না বলিয়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করা সহজ হয়। গভীর চাষ, পাল্টা শস্ত উৎপাদনের সুবিধা (rotation of crops), নূতন জাতের বীজ ব্যবহার, ভূমি সংরক্ষণ এবং অগ্ন্যানু নূতন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। জ্বোতের আয়তন বৃহৎ হওয়ায় মূলধনী যন্ত্রপাতির পরিপূর্ণ ব্যবহার হইতে পারে। যৌথ পরিচালনার ফলে স্বল্প ব্যয়ে গবাদি পশুর বাসস্থান, ফসল সংরক্ষণ এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে। সমবায় সমিতির সদস্যগণের ব্যক্তিগত মালিকানা অক্ষুণ্ণ থাকায় তাহাদের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পাইবে।

ভারতে সমবায় চাষের অগ্রগতি (Progress of Co-operative Farming in India) : স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সর্বপ্রথম সুসম্বদ্ধ পদ্ধতিতে যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত বাঁসি জেলায় সমবায় চাষ প্রবর্তন করা হয়। ইহার পর যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই, পাঞ্জাব এবং দিল্লীর বিভিন্ন অঞ্চলে সমবায় চাষ প্রবর্তিত হয়। এই সব অঞ্চলে পতিত জমি উদ্ধার করিয়া সমবায় চাষ প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং কোথাও কোথাও কৃষি যন্ত্রিকরণ করা হইয়াছে।

জাতিপুঞ্জের এক রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অনুল্লত দেশে সমবায় চাষের মধ্যেই কৃষকের জমি, শ্রম এবং মূলধনের সমন্বয় সাধনের আদর্শ সমাধান নিহিত রহিয়াছে।

১৯৫২ সালে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত ভারতীয় সমবায় কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমবায় চাষ প্রবর্তনের জ্ঞাত রাজ্যসরকারগুলি সক্রিয়ভাবে অগ্রসর হইবে। এই প্রস্তাবনায় উৎসাহিত হইয়া সরকার ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সকল রাজ্যের কৃষি এবং সমবায় মন্ত্রিগণকে লইয়া একটি অধিবেশন আহ্বান করেন।

পরিকল্পনা কমিশনও মনে করেন, যত শীঘ্র সম্ভব সমবায় চাষ প্রবর্তন করা যায় ততই মঙ্গল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ছোট ছোট কৃষকদিগকে স্বেচ্ছায় সমবায় চাষ প্রবর্তনের জ্ঞাত উৎসাহ দেওয়া হয়। ভারতীয় অবস্থার উপযোগী সমবায় চাষ পদ্ধতি আবিষ্কারের জ্ঞাত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুপারিশ করা হয়। রাজ্য সরকারগুলিকেও সমবায় চাষের কর্মসূচী প্রণয়নের জ্ঞাত অনুরোধ করা হয় কিন্তু কার্যত এই সময় বিশেষ কিছুই করা হয় নাই; ফলে লোকে সমবায় সমিতি গঠনের চেষ্টা করিয়া বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হইল সমবায় চাষের ভিত্তি একরূপ ভাবে স্থাপন করা যাহাতে তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট কর্ণিত জমির উল্লেখযোগ্য অংশে সমবায় চাষ প্রবর্তন করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সমবায় চাষের জ্ঞাত ব্যয়

হয় ৩৪ কোটি টাকা, তৃতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে ব্যয়-বরাদ্দের পরিমাণ ৮০ কোটি টাকা। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় সমবায় চাষের জন্য ২০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সালের শেষে দেশে ৫০০০ সমবায় কৃষি সমিতি ছিল। ইহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১০৩,০০০ এবং জমির পরিমাণ ছিল ৫৪৪,০০০ ; আশা করা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ১০,০০০ নতুন সমবায় কৃষি সমিতি স্থাপিত হইবে।

১৯৫২ সালে কংগ্রেস দলের নাগপুর প্রস্তাবনা গ্রহণের পর সমবায়ের ক্ষেত্রে নতুন কর্মপ্রেরণা দেখা যায়। সমবায় চাষের উন্নতিকল্পে কেন্দ্র এবং রাজ্যে জাতীয় সমবায় কৃষি উপদেষ্টা বোর্ড (National Co-operative Farming Advisory Board) গঠন করা হয় এবং ৩১৮টি পথ-প্রদর্শক পরিকল্পনাকে (pilot projects) উৎসাহদান করা হয়। প্রতিটি পথ-প্রদর্শক পরিকল্পনার অধীনে অন্তত ১০টি করিয়া সমবায় কৃষি সমিতি আছে। ইহা সমবায় চাষের সুবিধা সম্পর্কে কৃষকদের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবে।

পরিকল্পনা কমিশনের নিকট হইতে ২২টি সমবায় কৃষি সমিতির কার্যধারার যে বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিশেষ নৈরাশ্রজনক। সমবায়ের উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া নয়,—শুধুমাত্র ভূমিসংস্কার আইনের স্বার্থবিরোধী ফলাফল এড়াইবার জন্য অধিকাংশ সমবায় সমিতিগুলি প্রাক্তন জমিদারদিগের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। অধিকাংশই চাষের কাজে অংশগ্রহণ করে নাই। যেখানে তাহারা কাজ করিত সেখানেও তাহারা পরিচালনার কাজই করিত, ফলে সাধারণ চাষের কাজ করিবার জন্য ভাড়াটিয়া শ্রমিক নিয়োগ করা হইত। ম্যালকম ডার্লিং যথার্থই বলিয়াছিলেন যে, সমবায় সমিতিগুলি সমবায় আদর্শের প্রেরণায় নয়, শুধুমাত্র সরকারী সাহায্য পাইবার উদ্দেশ্যেই গঠিত হইয়াছিল।

পরিকল্পনা কমিশনের সাম্প্রতিক রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, বড় এবং ছোট সমবায় সমিতিগুলির কার্যপদ্ধতিতে বহু গলদ প্রকট হইয়া আছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বড় বড় সমিতিগুলির গলদ অপেক্ষাকৃত বেশি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মহাজন এবং ভূতপূর্ব জমিদারেরা বহু সমিতিগুলিতে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে এবং ইহাদের অগ্রগতির পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে।

এই সকল রিপোর্ট হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সমবায় সমিতি প্রধানত ধনী জোতদারদেরই অধিকতর উপকারে আসিয়াছে। দরিদ্র কৃষকগণ ইহা হইতে বিশেষ লাভবান হয় নাই। সাধারণ কৃষকের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বসূরী হিসাবে জমির পুনর্বণ্টন বিশেষ প্রয়োজন। ক্ষুদ্র কৃষক কৃষি-প্রধান ভারতীয় গণতন্ত্রের স্তম্ভস্বরূপ—সুযোগ পাইলে সমবায় চাষকে সফল করিবার জন্য সে চেষ্টা করিবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ অটো সিলার (Dr. Otto Schiller) সমবায় কৃষি সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করিয়াছেন। তিনি ছোট ছোট জোতে ব্যক্তিগত

চাষের পক্ষপাতী কিন্তু পরিকল্পনা, মূলধন বিনিয়োগ এবং ফসল বিক্রয় সমবায়ের ভিত্তিতে করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁহার মতে অটো সিলারের মত এইভাবে ক্ষুদ্রায়তন জ্যোত ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৃহদায়তন উৎপাদনের সুবিধা পাওয়া যাইবে। দেশের অধিকাংশ কৃষকদিগের জমির ক্ষুধা প্রবল হওয়ায় এবং সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত প্রতিকূল অবস্থার দরুন সমবায় চাষ সফল করা কঠিন হইবে; এই অবস্থায় ডাঃ অটো সিলারের প্রস্তাব অধিকতর বাস্তবোচিত এবং প্রাথমিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। পরে অবশ্য অগ্রগত ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন সাফল্যলাভ করিলে সমবায় যৌথ চাষ প্রবর্তন করা যাইবে।

যৌথ সমবায় কৃষি (Joint Co-operative Farming) : ১৯৫২ সালে নাগপুর অধিবেশনে নূতন ভূমি সংস্কার ব্যবস্থা গৃহীত হইবার পর যৌথ সমবায় চাষের সম্ভাবনা এবং সমস্তা লইয়া আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। পঞ্চায়েৎ-কেন্দ্রিক যৌথ সমবায় কৃষিকে সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে।

কৃষিক্ষেত্রে চরম ব্যর্থতার ফলে উদ্বিগ্ন নেতৃবর্গ ঐক্যজালিক শক্তির বলে রাতারাতি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী। কিন্তু যৌথ সমবায় কৃষির মধ্যে কোন অলৌকিক শক্তি নিহিত নাই বলিয়া ইহা হইতে কোন আশ্চর্যজনক ফল লাভের আশা করা বৃথা। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, আমরা ভারতের গ্রাম্য কৃষিপ্রধান অল্পসংখ্যক দেশে সমবায়ের গুরুত্ব অস্বীকার করিতেছি। অল্পসংখ্যক দেশ যেখানে কৃষি উৎপাদন, কারিগরী জ্ঞান এবং মূলধন স্বল্প, সেইরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা অপেক্ষা সমবায়ের মাধ্যমেই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি অধিকতর কার্যকরী হইবে। কিন্তু সমবায়ের পথে যে সমস্ত বাধা রহিয়াছে তাহাদের বিলোপ করা আশু প্রয়োজন।

সমবায় চাষ প্রবর্তন করিলে কৃষিতে যন্ত্রশক্তি ব্যবহার করা সম্ভবপর হইবে। কৃষি যন্ত্রিকরণ করার ফলে বেকার জনসংখ্যার সৃষ্টি হইবে। তাহাদিগকে কৃষি হইতে সরাইয়া নূতন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া না দিতে পারিলে কৃষি যন্ত্রিকরণে কোন লাভ হইবে না।

দ্রুত সমবায় কৃষির প্রসার সনাতন প্রকৃতির ভিত্তিমূলে নাড়া দিবে, পারিবারিক দায়িত্ব শিথিল করিবে, মূল্যবোধের পরিবর্তন করিবে। এই সকল সমস্তা সমাধান করিবার জন্ত সেবামূলক খাতে যে পরিমাণ ব্যয় করা প্রয়োজন বর্তমান অবস্থায় ভারতের তাহা করা সম্ভব নয়।

সমবায় কৃষির অর্থনৈতিক দিকটির প্রতিও যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সাধারণত ইহা মনে করা হয় যে, সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষির প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে। সমবায় কৃষি সমিতির সংখ্যা কম হওয়ায় এবং পরীক্ষামূলকভাবে মূলধন সমস্তা প্রবর্তিত হওয়ায় যথেষ্ট অর্থব্যয় করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু সুপারিশ-মত যদি প্রতি গ্রামে সমবায় কৃষি প্রবর্তন করা হয় তাহা হইলে যে প্রভূত মূলধনের

প্রয়োজন হইবে তাহা সংগ্রহ করা সহজসাধ্য হইবে না। উপরন্তু বিদেশ হইতে কৃষি-যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হইলে বৈদেশিক মূদ্রার প্রয়োজন দেখা দিবে, ফলে ইহা বৈদেশিক মূদ্রাসঙ্কট তীব্রতর করিবে।

অত্যাগ্র দেশে সমবায় চাষের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করিয়া সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে সমবায় চাষের সুবিধা অসুবিধার উল্লেখ করা যাইতে পারে। জমি একত্রিত করা হইলে খণ্ডিকরণ এবং অসম্বদ্ধতার কুফল দূর করা যাইবে, কৃষি যন্ত্রিকরণ করা সম্ভব হইবে, ফসল সংরক্ষণ সহজ হইবে এবং শ্রমের বিশেষিকরণ ঘটিবে। সমবায় চাষ প্রবর্তনের পথে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা রহিয়াছে। জমি কৃষকের একপ্রকার সম্পত্তি এবং সামাজিক মর্যাদার ভিত্তি বলিয়া সহজে সে উহা ছাড়িতে চাহিবে না। দ্বিতীয়ত, সংযুক্ত প্রয়াসের মধ্যে শৃঙ্খলা আনার সমস্যা রহিয়াছে। তৃতীয়ত, এই নূতন আদর্শ প্রচারের জ্ঞাত উপযুক্ত কর্মীদল গঠন করা প্রয়োজন। ইহা ছাড়া সাংগঠনিক শৃঙ্খলা এবং জটিল হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অসুবিধা সৃষ্টি করিতে পারে।

গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ইস্রাইলের সমবায় কৃষির অভিজ্ঞতা হইতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি। ইস্রাইলই একমাত্র গণতান্ত্রিক অল্পমত দেশ যেখানে সমবায় কৃষি ইস্রাইলের দৃষ্টান্ত পদ্ধতি কিছু পরিমাণ সাফল্য অর্জন করিয়াছে। ইস্রাইলে প্রথমে যে অনমনীয় সমবায় প্রবর্তন করা হইয়াছিল তাহা কিছুদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা হারায় এবং তজ্জগৎ অধিকতর উদার ও নমনীয় ধরনের সমবায় সমিতি গঠনের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, ইস্রাইলের সমবায় সমিতির সদস্যগণ সকলেই নগরবাসী এবং যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। এই কারণেই ইস্রাইলের সমবায় কৃষি সাফল্যলাভ করে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে এই সুবিধা নাই বলিয়া এদেশে উহা সফল হইতে অধিক সময় লাগিবে।

ইস্রাইলের কৃষকগণ সমবায় সমিতিতে কোন মূলধন সরবরাহ করে নাই। প্রাথমিক মূলধন বিভিন্ন তহবিল (Zionist funds) হইতে সরবরাহ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া ইস্রাইলের সকল সমবায় কর্মীকে দীর্ঘ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গ্রামীণ সমাজের সাংগঠনিক দুর্বলতা, সমজাতীয়তার অভাব, নেতৃত্ব গ্রহণে সমবায়ের অনিচ্ছা এবং ব্যর্থতা ভারতে সমবায় কৃষি প্রবর্তনের পথে প্রবল বাধার সৃষ্টি করিবে। সাংগঠনিক শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করিতে না পারিলে আমাদের গ্রামীণ পরিকল্পনার আকাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না।

ইস্রাইলের পর মেক্সিকোয় সমবায় চাষের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। মেক্সিকোর দৃষ্টান্ত মেক্সিকোয় সমবায় সমিতিগুলি পরিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান নয়। আবার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দ্বারাও প্রতিষ্ঠিত নয়। মেক্সিকোয় এইরূপ আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত সমবায় সমিতির সহিত ভারতীয় সমবায় কৃষির বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

ভারতের গ্রাম মেক্সিকোতে কৃষকদের শিক্ষা, উৎসাহ, কর্মপ্রচেষ্টা এবং আত্মবিশ্বাস

সীমাবদ্ধ। তথাপি, মেক্সিকোর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা একটি প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভ করি। মেক্সিকো প্রমাণ করিয়াছে যে, ব্যয়বহুল এবং সদাসর্বদা তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা না করিলে শুধুমাত্র সমবায় চাবের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে না। দ্বিতীয়ত, সমবায় খামারের দক্ষতা নির্ভর করে প্রধান কর্মীর বুদ্ধি এবং চারিত্রিক দৃঢ়তার উপর। সমবাসে কাজ করিবার মত শিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মীর যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে, ইহাই সমবায় সমিতিগুলির সাফল্যের ভারতম্যের জন্ত দায়ী। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ভারতের সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিয়া তোলার পথে প্রধান অসুবিধা হইল উপযুক্ত কর্মীর অভাব।

মেক্সিকোর দৃষ্টান্ত হইতে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি যে, সমবায় কৃষি ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা বিশেষ কঠিন। সাংগঠনিক ক্রটির জন্তই সেখানে কৃষিশ্রমিকের উৎপাদন হ্রাস পায়। সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ব্যবস্থা না করিয়া যদি যৌথ সমবায় কৃষির প্রবর্তন করা হয় তাহা হইলে ভারতেও উহা ঘটবে। সমবায় সমিতি মূলধন গঠনের জন্ত উদ্ভূত একত্রিকরণ এবং শিল্পশ্রমিকের প্রয়োজনীয় খাণ্ডশস্ত্রের যোগান অব্যাহত রাখিতে সহায়তা করিবে বলিয়া অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইহা বিশেষ উপযোগী বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু মেক্সিকোর দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত খামার হইতে উদ্ভূত সংগ্রহ করা অপেক্ষা সংগঠিত সমবায় সমিতি হইতে উহা সংগ্রহ করা সহজ হইলেও দুইটি কারণে মোট উদ্ভূতের পরিমাণ হ্রাস পাইতে পারে— (১) শ্রমের উৎপাদনশীলতা হ্রাস এবং (২) কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দরুন ভোগের পরিমাণ বৃদ্ধি। ইহা চিন্তা করিয়া মনে হয় নী যে, ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তন করিলে রাতারাতি খাণ্ডসমস্ত্রের সমাধান হইয়া যাইবে।

কৃষকদের মধ্যে সংগঠন-শৃঙ্খলা এবং উপযুক্ত নেতৃত্ব সৃষ্টি করিতে না পারিলে কৃষকদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে পারা যাইবে না, আর উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে খাণ্ড সমস্ত্রের কোন সমাধান হইবে না। কৃষকদের মধ্যে সমবায়ের উপযোগী সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং শিক্ষাগত পরিবেশ রচনা না করিতে পারিলে সমবায় চাষ প্রবর্তন করিয়া কোন দ্রুত সফল পাওয়া যাইবে না।

ভারতে সমবায় আন্দোলন (Co-operative Movement in India) :

১৯০৪ সালে সমবায় আইন পাশ হওয়ার সহিত ভারতে সমবায় আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আইনে সমবায় সমিতির কার্যকলাপ ঋণদানের মধ্যমী সীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্য পরবর্তীকালে এই আন্দোলন ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের সকল দিকে প্রসারিত হয়। ভারতে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় : প্রাথমিক পর্যায় (১৯০৪ সাল হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত), যুদ্ধকালীন পর্যায় এবং স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়।

প্রাথমিক পর্যায় : ১৯০৪ সালের সমবায় আইনের কয়েকটি ক্রটি ছিল। প্রথমত

এই আইনে অ-ঋণদান সমবায় সমিতি (non-credit co-operative societies) গঠনে বাধা ছিল। দ্বিতীয়ত, অর্থ সরবরাহ এবং কার্যপদ্ধতি তদারকের জ্ঞাত কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। তৃতীয়ত, পৌর সমিতি এবং গ্রামীণ সমিতিগুলির মধ্যে কোনরূপ সম্পর্ক ছিল না।

১৯১২ সালে সমবায় সমিতি আইন পাশ করিয়া ১৯০৪ সালের আইনের ক্রটিগুলি সংশোধন করা হয় এবং ঋণদান ব্যতীত অগ্রাগ্র উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি গঠিত হয়। ১৯১৫ সালে সমবায় সম্পর্কে ম্যাকলাগান কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ম্যাকলাগান কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯১৯ সালে সমবায় প্রাদেশিক বিষয়রূপে পরিগণিত হয়। ১৯২৫ সালে বোম্বাই সরকার সমবায় সমিতি আইন পাশ করিবার পর অগ্রাগ্র প্রাদেশিক সরকারও অনুরূপ আইন পাশ করেন। ১৯২৯-৩০ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় সমবায় আন্দোলনের গতি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এই সময় ফসলের দাম তীব্রভাবে হ্রাস পাওয়ায় কৃষকদের ঋণের চাপ বৃদ্ধি পায় বলিয়া তাহারা এই আন্দোলন সম্পর্কে নিস্পৃহ হইয়া পড়ে। কিন্তু ১৯৩৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নবগঠিত কৃষি ঋণদান বিভাগ বহু-মুখীন সমবায় সমিতির উপর জোর দেয়। এই সময় প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলিও সমবায় আন্দোলনকে সফল করিবার জ্ঞাত সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

যুদ্ধকালীন পর্যায় : যুদ্ধের সময় ফসলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সমবায় আন্দোলন প্রসারিত হইতে থাকে। কৃষকের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় সে সহজেই এই আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এই সময় অ-ঋণদান সমবায় সমিতিগুলি-(non-credit co-operative societies) বিশেষ প্রসার লাভ করে। ঋণদান সমবায় সমিতিগুলির তুলনায় অ-ঋণদান সমবায় সমিতিগুলির সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পায়। সর্বপ্রকার সমবায় সমিতির মধ্যে ক্রেতা সমবায় সমিতিই (consumers' co-operative societies) বিশেষ প্রসার লাভ করে। প্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের স্বল্পতা এবং সরকার কর্তৃক সমবায়ের মাধ্যমে দুপ্তাপ্য দ্রব্য বণ্টনের ব্যবস্থাই ক্রেতা সমবায় সমিতি সম্প্রসারণের কারণ। পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে সমবায় আন্দোলন মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশকে স্পর্শ করিয়াছিল কিন্তু ১৯৭৫-৮৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৬ শতাংশকে স্পর্শ করে। ১৯৪৫ সালে ভারত সরকার সমবায় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করেন। প্রাথমিক সমিতিগুলিকে বহুমুখীন সমিতিতে রূপান্তরিত করা এবং আগামী দশ বৎসরের মধ্যে ৫০ শতাংশ গ্রাম এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩০ শতাংশকে সমবায়ের অধীনে আনিবার জ্ঞাত এই কমিটি সুপারিশ করেন।

স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায় : ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার সমবায় আন্দোলন সম্প্রসারণের জ্ঞাত সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ভারতের পরিকল্পিত উন্নয়নের ভিত্তি হিসাবে সমবায়কে গ্রহণ করা হইয়াছে। গ্রামীণ উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনেই সমবায়ের কাজ সীমাবদ্ধ থাকিবে না, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে

সমবায় ক্ষুদ্রশিল্প এবং কুটিরশিল্প উন্নয়নেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ১৯৫০ সালে প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল ১০৫,০০০ এবং উহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪ লক্ষ, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া যথাক্রমে ২১৩,০০০ এবং ১ কোটি ৪৪ লক্ষ হয়। এই প্রাথমিক কৃষি সমিতিগুলির ঋণদানের পরিমাণ ২৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০০ কোটি টাকা হয়। প্রথম পরিকল্পনা শুরু হইবার সময় সকল ধরনের সমবায় সমিতির মোট সংখ্যা ছিল ১৮১,০০০, তৃতীয় পরিকল্পনার শুরুতে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩২,০০০ হয়। ১৯৫২ সালে নাগপুর অধিবেশনে সমবায়কে ভিত্তি করিয়া কংগ্রেস দলের নূতন কৃষিনীতি গৃহীত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৫২,০০০ প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে পূনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অগ্রগতি বিশেষ সন্তোষজনক নয়।

প্রাক-পরিকল্পনাযুগে সমবায় আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ (Reasons for the failure of Co-operative Movement in the Pre-Planning Period) : কৃষকদিগকে সন্তায় ঋণদানের উদ্দেশ্যে ভারতে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। মূনাফা লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত বাণিজ্য ব্যাংকগুলিকে সন্তায় কৃষিঋণ বণ্টনের উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া মনে করা হয় নাই। কৃষিঋণের বাজার হইতে মহাজনকে উচ্ছেদ করিবার জন্ত একটি বিকল্প প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। মূনাফা বৃদ্ধির পরিবর্তে প্রয়োজনীয় দান করাই সমবায় ঋণদান সমিতির লক্ষ্য বলিয়া ইহাকেই কৃষিঋণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত মাধ্যম বলিয়া মনে করা হইয়াছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ ৬০ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ঋণদানের ক্ষেত্রে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে। ১৯৬৪ সালে ২০৯৬২টি কৃষি সমবায় সমিতি ছিল এবং উহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ২ কোটি ৩৭ লক্ষ কিন্তু ঐ সময় ঋণদানের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ১৯৬১-৬২ সালের সমীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, গ্রামীণ ঋণের পরিমাণ ৩০০০ কোটি টাকা। সুতরাং ঋণদানের ক্ষেত্রে সমবায়ের ভূমিকা নগণ্য।

ভারতে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থতার প্রধান কারণ দুইটি : (১) স্বল্প এবং অনিয়মিত ব্যর্থতার কারণ আয়ের দরুন কৃষক সমবায় সমিতির সদস্য হিসাবে নিয়মিত টাকা দিতে পারে নাই এবং (২) পুরাতন ঋণের জন্ত কৃষকগণ মহাজনের কবল হইতে মুক্তি পায় নাই।

সমবায় আন্দোলনকে সফল করিতে হইলে ইহার পরিধি ব্যাপক করা প্রয়োজন। কৃষকের জীবনের সকল দিক স্পর্শ করা প্রয়োজন এবং এই উদ্দেশ্যে বহুমুখীন সমবায় সমিতি শ্রেষ্ঠ উপায়। ঋণদানের সহিত উৎপাদন এবং বিক্রয় ব্যবস্থার যোগসূত্র স্থাপন করিতে পারিলে তবেই গ্রামীণ জীবনের পুনর্গঠন সম্ভব হইবে। বহুমুখীন সমবায় সমিতিগুলি একই সঙ্গে ঋণ, বিক্রয় এবং উৎপাদন সমস্তা সমাধানের চেষ্টা করে বলিয়া

গ্রামীণ অর্থনীতির পুনর্গঠনের জন্ত ইহারা বিশেষ উপযোগী। সারা দেশে যে সমবায় সমিতি গঠিত হইতে চলিয়াছে উহারা আদর্শ বহুমুখী সমিতি হইবে এবং ঋণদান, ফসল বিক্রয় এবং উৎপাদন সমস্ত সমাধান করিবার চেষ্টা করিবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে সরকারী আনুকূল্য এই আন্দোলনকে সহায়তা করিবে।

সেবা সমবায় সমিতি (Service Co-operatives) : ব্যাপক অর্থে সকল সমবায় সমিতিই তাহার সদস্যদের সেবা দানের উদ্দেশ্যে গঠিত। তথাপি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায় এবং সেবা দানের উদ্দেশ্যে গঠিত সমবায়ের মধ্যে পার্থক্য করা যাইতে পারে। সমবায় কৃষি সমিতিতে যৌথভাবে চাষ করা হয় বলিয়া উহাকে উৎপাদন সমবায় (production co-operative) বলা হয়। অপরপক্ষে সেবা সমবায়গুলি কৃষকদিগকে ঋণদান, ফসল বিক্রয়, সার ও বীজ প্রভৃতি কাজে সহায়তা করিবে কিন্তু কৃষক ব্যক্তিগতভাবেই জমি চাষ করিবে।

দেশের অধিকাংশ সমবায় সমিতিগুলি শুধু ঋণদানের মধ্যেই তাহাদের কার্য সীমাবদ্ধ রাখিয়াছিল। অপর পক্ষে সেবা সমবায়গুলি গ্রামের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। ইহারা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত প্রয়োজনীয় ঋণ দিবে এবং অগ্রাগ্রহ কার্য করিবে। সেবা সমবায়গুলি কৃষি পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং প্রত্যেকেই কৃষি-উৎপাদনের জন্ত প্রয়োজনীয় ঋণ ও অগ্রবিধ সুবিধা পাইবে।

সেবা সমবায়গুলি কৃষকদিগকে ঋণ দিবে; সার, বীজ, লাঙ্গল, কীটনাশক ঔষধ সরবরাহ করিবে, সদস্যদের উদ্ভূত ফসল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিবে। ইহা ছাড়া এই সমবায়গুলি উন্নত বীজ সৃষ্টি এবং জৈব সার উৎপাদনের ব্যবস্থাও করিতে পারে। কিন্তু পরামর্শদান এবং সম্প্রসারণ সমবায়ের প্রাথমিক কাজ, ইহা শেষ হইলে তবেই ইহারা অগ্রবিধ কাজ করিবে।

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, নিকটবর্তী বিক্রয়সমিতি এবং পর্যবেক্ষণকারী ইউনিয়নের সহিত এই সকল সেবা সমবায়ের সংযোগ থাকিবে। ইহার শেষার মূলধন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। ফসল তোলার সময় সদস্যগণকে শেষার ক্রয় করিবার জন্ত উৎসাহিত করিতে হইবে। এই সেবা সমবায় সমিতির সর্বোচ্চ ক্ষমতা সদস্যগণের উপর হস্ত থাকিলেও নির্বাহী ক্ষমতা নির্বাচিত সদস্য লইয়া গঠিত কমিটির হস্তে থাকিবে। কমিটির প্রত্যেক সদস্য সমবায় সমিতির বিশেষ বিশেষ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে।

১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) সমবায় গঠনকে সমর্থন করে। ইহা সুপারিশ করে যে, সাধারণভাবে প্রত্যেক গ্রামের একটি করিয়া সমবায় থাকিবে। গ্রামটি আকারে ছোট হইলেও দুই বা ততোধিক গ্রাম মিলিত হইয়া যুক্তভাবে সমবায় গঠন করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ৩৮,৭৯৫টি সমবায় সমিতি স্থাপিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ৩০,৫০০টি নূতন সমবায় সমিতি গঠন করার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল।

ইহা ছাড়া ঐ সময় ৫৩,৭০০ প্রাথমিক সমিতিতে সমবায় সমিতিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ইহার ফলে আশা করা যায় যে, প্রত্যেক গ্রামেই সমবায় প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গ্রামীণ জনগণের ৭৩ শতাংশ ইহার আওতায় আসিবে।

প্রধানত ডাঃ অটো সিলারের ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া এই সমবায়ের কর্মসূচী প্রস্তুত করা হয়। ডাঃ অটো সিলার সমবায়ের ভিত্তিতে পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, সরবরাহ এবং বিক্রয়ব্যবস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কিন্তু ডাঃ সিলার ব্যক্তিভিত্তিক চাষের সমর্থক বলিয়া সমবায়গুলিকে যৌথ সমবায় সমিতিতে পরিণত করার কথা ভাবেন নাই। তথাপি সমবায় নিঃসন্দেহে একটি শুভ আদর্শ। ইহা দেশের গ্রামীণ জনগণের নিকট সম্ভাবনার উজ্জ্বল চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছে। এই আদর্শকে সফল করিতে হইলে গ্রামীণ জনগণের চেতনা, আকাঙ্ক্ষা এবং সংগঠনের সংযোগ প্রয়োজন।

সপ্তদশ অধ্যায়

কৃষি-শ্রমিক এবং কৃষি যন্ত্রিকরণ

(Agricultural Labour and Mechanization of Cultivation)

কৃষিশ্রমিক সম্পর্কে আলোচনা না করিলে কৃষিসমস্যাসংক্রান্ত আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্বাধীনতার পূর্ব যুগে শিল্প-শ্রমিককে সংরক্ষণ করিবার জন্য কার্যসূচী প্রণয়ন করা হইলেও কৃষিশ্রমিকের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি আদৌ দৃষ্টি দেওয়া হয় নাই। কৃষির অনুরূপিত, অর্থনিয়োগ এবং জনসংখ্যার চাপ এই সকল কুফলগুলি ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের জীবনে যুগপৎ প্রতিকলিত হইয়াছে। ইহাদের মজুরী অবিশ্বাস্য রকমের স্বল্প, কাজের চাপ অত্যধিক এবং নিয়োগ প্রাপ্তি অনিশ্চিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির বিবরণ (Main Findings of the First and Second Agricultural Labour Enquiries) :

স্বাধীনতা লাভের পর সরকার কৃষি-শ্রমিকের সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন হইয়া উঠেন। পরিকল্পনার প্রথম দশ বৎসরে দুইটি কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হয়। প্রথম (১৯৫০-৫১) এবং দ্বিতীয় (১৯৫৬-৫৭) কৃষি-শ্রম অনুসন্ধানকারী কমিটি দুইটি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম এবং নিয়োগ দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানকারী কমিটির বিবরণীর একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হইল।

(ক) দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানকারী কমিটির হিসাবানুযায়ী ১৯৫০-৫১ সালে ১ কোটি ৭২ লক্ষ কৃষিপরিবার ছিল, ১৯৫৬-৫৭ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১ কোটি ৬৩ লক্ষ হয়। দুইটি বৎসরের পার্থক্যের কারণ সম্ভবত সংজ্ঞা নির্ধারণের পার্থক্য। ১ কোটি ৬৩ লক্ষ কৃষিপরিবারের ৫৭ শতাংশ সম্পূর্ণ ভূমিহীন। আবার ঐ ১ কোটি ৬৩ লক্ষ কৃষিপরিবারের ৮৩ শতাংশ স্থায়ী কৃষি-শ্রমিক পরিবার। আর বাকী ১৭ শতাংশ স্থায়ী কৃষিপরিবার। যে পরিবারের প্রধান আয়ের উৎস হইল কৃষি-মজুরি তাহাকেই দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানকারী কমিটি কৃষিপরিবার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

(খ) ১৯৫০-৫১ সাল হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে স্থায়ী শ্রমিকের অনুপাত ১০ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৬.৬ শতাংশ হয়। এই বৃদ্ধির কারণ এই যে, পূর্বে যে সকল অমিদার, জায়গীরদার এবং তালুকদার স্থায়ী কৃষি-মজুর দিয়া জমি চাষ করাইত তাহারা ব্যক্তিগত চাষের উদ্দেশ্যে জমি পুনঃগ্রহণ করে।

(গ) ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি শ্রমিকদিগের সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৩০ লক্ষ। ইহার

মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ পুরুষ, ১ কোটি ২০ লক্ষ স্ত্রীলোক এবং ৩০ লক্ষ বালক ছিল। ১২৫০-৫১ সালে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যা ছিল। ইহার মধ্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পুরুষ, ১ কোটি ৪০ লক্ষ স্ত্রীলোক এবং ২০ লক্ষ বালক ছিল। যাহারা ১২৫০-৫১ সালে ২০০ দিন মজুরী লইয়া কাজ করিয়াছিল আর যাহারা ১২৫৬-৫৭ সালে ১২৭ দিন মজুরী লইয়া কাজ করিয়াছিল তাহাদের অস্থায়ী কৃষি-শ্রমিক বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। ইহারা ১২৫০-৫১ সালে ৭৫ দিন এবং ১২৫৬-৫৭ সালে ৪০ দিন স্বয়ংনির্ভরশীল (self employed) রূপে কাজ করে। অস্থায়ী স্ত্রী-শ্রমিকেরা ১২৫০-৫১ সালে ১৩৪ দিন মজুরী লইয়া কাজ করে এবং ১২৫৬-৫৭ সালে ১৪১ দিন মজুরীর বিনিময়ে কাজ করে। বালকদের মজুরী সমেত কর্মসংস্থান ১৬৫ দিন (১২৫০-৫১ সাল) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২৫৬-৫৭ সালে ২০৪ দিন হয়। ১২৫৬-৫৭ সালে অস্থায়ী পুরুষ শ্রমিকগণ ১২৮ দিন বেকার ছিল, ১২৫০-৫১ সালের তুলনায় পরিসংখ্যান হইল মাত্র ২০ দিন। কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ, জমি খণ্ডিকরণ, পারিবারিক শ্রমিক নিয়োগ এবং জমিদারদিগের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের দরুন কৃষিতে মজুরের কাজ পাওয়া বিশেষ কঠিন হয়।

(ঘ) বয়স্ক কৃষিশ্রমিকের গড় দৈনিক মজুরী ১০২ পয়সা হইতে হ্রাস পাইয়া ১২৫৬ সালে ৯৬ পয়সা হয়। ১২৫৬ সালে পাইকারী দামের ভিত্তিতে সামগ্রীর অঙ্কে (payments in kind) মজুরী দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ১২৫০ সালে উহা খুচরা দামের ভিত্তিতে দেওয়া হয়। খুচরা দাম সর্বদাই পাইকারী দাম অপেক্ষা অধিক। ১২৫০ এবং ১২৫৬ সালে যথাক্রমে মোট মজুরীর ৩১ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ সামগ্রীর অঙ্কে দেওয়া হয়। ১২৫০ এবং ১২৫৬ সালে মোট কৃষিমজুরীর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫০০ কোটি এবং ৫২০ কোটি টাকা। দুইটি কৃষি অনুসন্ধানকারী কমিটির তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, কৃষি-শ্রমিকের মজুরী সাধারণভাবে হ্রাস পাইয়াছে। মজুরী সম্পূর্ণভাবে সামগ্রীর অঙ্কে অথবা অংশত টাকার অঙ্কে এবং অংশত সামগ্রীর অঙ্কে দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মজুরী আয়ের উপর কৃষি-পরিবারের নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, পুরুষ এবং স্ত্রী শ্রমিকের মধ্যে মজুরীহারে তারতম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ভূমিকর্ষণ, শস্তারোপণ এবং ফসল কাটার জগ্ন মজুরীহার হ্রাস পাইয়াছে। ১২৫০-৫১ সালে কৃষিগত মজুরীহার অকৃষিগত মজুরীর হার অপেক্ষা অধিক ছিল কিন্তু ১২৫৬-৫৭ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। সাধারণভাবে ১২৫০-৫১ সালের তুলনায় ১২৫৬ সালে হয় মজুরা এবং কর্মসংস্থান উভয়ই হ্রাস পায় অথবা মজুরী হ্রাস পায়। দ্বিতীয় কৃষি-শ্রমিক অনুসন্ধানকারী কমিটির রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১২৫১ সালের তুলনায় ১২৫৭ সালে কৃষি-পরিবারের মোট আয় ১১ শতাংশ হ্রাস পায়।

(ঙ) ১২৫১ সালে কৃষি-শ্রমিক পরিবারের গড় বাৎসরিক আয় ছিল ৪৪৭ টাকা,

১৯৫৭ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৪৩৭ টাকা হয়। ১৯৫১ সালে কৃষি-শ্রমিকের মাথাপিছু আয় ছিল ১০৪ টাকা, ১৯৫৭ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ৯৯ টাকা ২৫ পয়সা হয়। ঐ সময় পরিবারের গড় আয়তন ৪.৩ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪.৪ হয়।

১৯৫৭ সালে জাতীয় মাথাপিছু আয় ছিল ২২ টাকা ৩০ পয়সা। ১৯৫৭ সালে গড় পারিবারিক আয় ছিল ৪৩৭ টাকা আর গড় ভোগব্যয় ছিল ৩১৭ টাকা। সুতরাং ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮০ টাকা। পূর্বের সঞ্চয় অথবা ঋণ গ্রহণ করিয়া এই ঘাটতি মিটানো হয়।

(চ) কৃষি-শ্রমিকেরা, বিশেষ করিয়া ভূমিহীন শ্রমিকেরা সাধারণত অল্পমত শ্রেণীর লোক। এই সকল অল্পমত শ্রেণীর লোকেরা সমাজের নিকট হইতে গ্রাম-বিচার পায় না এবং সহজেই শোষণের শিকারে পরিণত হয়। ইহাদের জীবন-যাত্রার মান অত্যন্ত নীচু, আয় অনিশ্চিত এবং উহা জীবনধারণের পক্ষে অপরিপুষ্ট। কৃষিমজুরের অবস্থার উন্নতির জন্ত ভূমিসংস্কার, কৃষিতে সর্বনিম্নমজুরী আইনের প্রবর্তন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বাসগৃহের ব্যবস্থা, পতিত জমি পুনরুদ্ধার করিয়া ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, ভূদান ও গ্রামদান, সমবায় চাষ, কুটিরশিল্পের উন্নতি প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসন (Rehabilitation of Agricultural Labour) : ১৯৫০ সালের কৃষিসংস্কার কমিটি (Agrarian Reforms Committee) বলিয়াছিলেন যে কৃষি-শ্রমিককে বাদ দিয়া কোন কৃষি উন্নয়ন কার্যসূচী প্রস্তুত করা হইলে গ্রামীণ অর্থনীতির একটি চুষ্ট ক্ষতকে উপেক্ষা করা হইবে। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারী এবং বেসরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে কৃষিমজুরদের অবস্থার উন্নয়নের জন্ত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

(ক) ১৯৪৮ সালের সর্বনিম্ন মজুরী আইন এবং কৃষিমজুর : প্রথম ও দ্বিতীয় কৃষিমজুর তদন্ত কমিটির বিবরণী হইতে রাজ্য সরকারসমূহ সেই রাজ্যের কৃষি-শ্রমিকের আয়, ব্যয়, কর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। উহার উপর ভিত্তি করিয়া সর্বনিম্ন মজুরী আইন নির্ধারণ করা সহজ হইবে। অন্ধ্র, আসাম, মাদ্রাজ, বিহার মধ্যপ্রদেশ, মহীশূর, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, কেরালা, পাঞ্জাব, উড়িষ্যা, রাজস্থান, আজমীর, কুর্গ, দিল্লী, কচ্ছ এবং ত্রিপুরার সর্বত্র এবং গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের নির্দিষ্ট এলাকায় কৃষি-শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরী আইন পাশ হইয়াছে।

(খ) **ভারতীয় সংবিধান এবং ভূমিদাস-প্রথার উচ্ছেদ :** ভারতীয় সংবিধানে যে কোন ধরনের ভূমিদাস প্রথাকে (serfdom) দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। অল্পমত শ্রেণীর উন্নয়ন, পতিত জমির পুনরুদ্ধার, সেচসম্প্রসারণ, জোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সংস্কার, কুটিরশিল্প স্থাপন, এবং পূর্ণসময়ে কাজের

ব্যবস্থার জ্ঞান সরকার কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যায় নূতন সংবিধান এবং উল্লিখিত কৃষি পুনর্গঠন ধীরে ধীরে ভূমিদাসত্ব প্রথার উচ্ছেদ করিয়া কৃষকের দুঃখজনক অবস্থার অবসান ঘটাইবে।

(গ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা এবং কৃষি-শ্রমিক : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষিশ্রমিকদিগের অবস্থার উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। কৃষি-শ্রমিকদের কষ্ট লাঘব করিবার জ্ঞান চার প্রকার কর্মসূচীর প্রস্তাব করা হয়। প্রথমত, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জ্ঞান ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, গ্রামীণ এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতি করিয়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিতে হইবে। তৃতীয়ত, ভূমি পুনর্বণ্টন এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষি-শ্রমিকের সামাজিক অবস্থা, দক্ষতা এবং কর্মপ্রচেষ্টা বৃদ্ধি করিতে হইবে। চতুর্থত, উন্নয়ন মূলক ব্যয়ের একাংশ কৃষি-শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জ্ঞান ব্যয় করা হইবে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ভূমিহীন কৃষকের পুনর্বাসনের জ্ঞান ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ২০,০০০ ভূমিহীন কৃষি-শ্রমিকের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অনুল্লত সম্প্রদায়ের উন্নতির জ্ঞান যথাক্রমে ৩২ কোটি এবং ২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নের জ্ঞান বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হইয়াছে। সরকারী খাতে কৃষি, সমাজউন্নয়ন এবং সেচ বাবদ মোট ব্যয় ১৭০০ কোটি টাকা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। কৃষিজ উৎপাদন ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। ২ কোটি একর জমি সেচ ব্যবস্থার সুবিধা পাইবে এবং ১ কোটি ১০ লক্ষ একর কৃষিজমি ভূমিসংরক্ষণের সুবিধা পাইবে। গ্রামীণ এবং কুটিরশিল্প খাতে ২২ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। গ্রামাঞ্চলে শিল্প-তালুক (industrial estates) এবং ক্ষুদ্রশিল্প প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই সকল পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে আশা করা যায়, তৃতীয় পরিকল্পনায় কৃষি-শ্রমিকের অবস্থার উন্নতি হইবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় রাজ্য-সরকারগুলি ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসনের জ্ঞান ৪ কোটি টাকা ব্যয় করিবে। ইহা ব্যতীত ঐ খাতে কেন্দ্রীয় সরকারও ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। কৃষি-শ্রমিক সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ৬০ লক্ষ একর জমিতে ৮০০,০০০ ভূমিহীন কৃষকের পুনর্বাসনের সুপারিশ করিয়াছেন।

(ঘ) ভূ-দান যজ্ঞ (Bhoodan Yagna) : মহাত্মা গান্ধীর শিষ্য সর্বোদয় নেতা আচার্য বিনোবা ভাবে ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে ভূ-দান আন্দোলন আরম্ভ করেন। এ পর্যন্ত এই আন্দোলনের ফলে ১২ লক্ষ একর জমি সংগৃহীত এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বন্টিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের মূল কথা হইল একমাত্র ঈশ্বরই জমির মালিক এবং জমি কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। ভূমিহীন কৃষকের ক্ষুধার যন্ত্রণাকে হৃদয়ে অনুভব করিয়া দাতা যদি নিঃস্বার্থভাবে জমিদানে উৎসাহ

প্রকাশ করেন তাহা হইলে 'সর্বোদয় সমাজ' প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ গ্রহণ করিবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, ভারতে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ৫ কোটি। প্রথমে এই আন্দোলনের লক্ষ্য খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিল না। প্রত্যেক ভূমিহীন কৃষকের জন্য এক একর হিসাবে মোট ৫ কোটি একর জমি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিনোবা ভাবে এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতে ৩০ কোটি একর জমি চাষ হয়, তাই ভূমির মালিকগণ অন্ততপক্ষে তাঁহাদের জমির এক-ষষ্ঠাংশ দান করিলে এই আন্দোলনের লক্ষ্য পূরণ হইবে। কিন্তু এই আন্দোলন যথেষ্ট উদ্দীপনার সঞ্চার করিলেও ইহার অগ্রগতি আশাহীনরূপে হয় নাই। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত ভূ-দান যজ্ঞ হইতে প্রাপ্ত মোট জমির পরিমাণ ছিল ৪২ লক্ষ একর। এই আন্দোলনের একটি বৈশিষ্ট্য যে, ইহা বেসরকারী আন্দোলন হইলেও পরোক্ষভাবে সরকার ইহার সমর্থন করিতেছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভূমিদান আন্দোলনের মাধ্যমে ভূমি সংগ্রহ করিয়া ভূমি-সমস্যার সমাধান করা গান্ধীজির সর্বোদয়ের আদর্শ। এই আন্দোলনের ফলে যে জমি পাওয়া যাইবে তাহা ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে পারিবারিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। ৫ কোটি একর জমি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে আচার্য্য ভাবে পদযাত্রা আরম্ভ করেন। ১৯৫৭ সাল হইতে ভূ-দান যজ্ঞ গ্রাম দানের রূপ গ্রহণ করে। গ্রাম দানের অর্থ সমগ্র গ্রাম 'সমাজকে' দান করিয়া দেওয়া। গ্রামদানের ফলে সমবায় পদ্ধতিতে গ্রাম পরিচালনা অধিকতর সহজসাধ্য হইবে। আচার্য্য ভাবের মতে ভূ-দানের প্রথম পর্যায়ে কোন ব্যক্তি ভূমিহীন থাকিবে না, আর শেষ পর্যায়ে ভূমির কোন ব্যক্তিগত মালিকই থাকিবে না।

এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিয়া বলা হয় যে, প্রত্যেক ভূমিহীন কৃষককে ভূমি সরবরাহ করিবার নীতি গ্রহণ করিলে জমির খণ্ডিকরণ এবং অসম্বন্ধতা বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদন হ্রাস পাইবে এবং বিক্রয়যোগ্য ফসলের পরিমাণ কমিবে। ইহা ব্যতীত ভূমিহীন দরদ্র কৃষককে কেবল জমি দিলেই চলিবে না, জমি চাষ করিবার মত অর্থ-সংস্থানও করিয়া দিতে হইবে।

ভূ-দান আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু পরিমাণ সাফল্য লাভ করিলেও ইহা ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার সকল ত্রুটি দূর করিয়া কাম্য সংস্কার সাধন করিতে পারে নাই। প্রথম দিকে এই আন্দোলন যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল তাহার কারণ ভূ-স্বামিগণ জমিদারী উচ্ছেদের আশঙ্কায় জমি দান করিয়াছিলেন। পদব্রজে ঘুরিয়া জমি সংগ্রহ করা সময়সাপেক্ষ বলিয়া ইহা অত্যন্ত ধীরগতিতে অগ্রসর হইতেছে। যাহা হউক, এই আন্দোলনের গুরুত্ব একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এককভাবে ইহা ভারতের ভূমি সমস্যার সমাধান করিতে না পারিলেও ইহা সরকারের নূতন কৃষি নীতিকে সহায়তা করিবে। ভূ-দান যজ্ঞকে যৌথ সমবায় চাষের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। ভূ-দান যজ্ঞের আদর্শ শুধুমাত্র ভারতেই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করিয়াছে। ভারতের মার্কসিষ্ট কম্যুনিষ্ট নেতা এ. কে. গোপালন পর্যন্ত মন্তব্য করিয়াছেন যে, যদিও ভূ-দান যজ্ঞ হইতে বিনোবাজী যতটা প্রত্যাশা করেন আমরা তাহা করি না, এবং মনে করি যে, আইন ব্যতীত এসমস্যার সমাধান অসম্ভব, তথাপি এ-আন্দোলনকে একটা শুভ আন্দোলন বলিয়াই মনে করি।

কৃষি যন্ত্রিকরণ (Mechanization of Cultivation) : একদিকে ক্রম-বর্ধমান জনসংখ্যা আর একদিকে সীমাবদ্ধ কৃষিত জমি—এই দুই কারণে ভারতীয় কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা আজ বিশেষ প্রয়োজন। সেচ সম্প্রসারণ এবং উন্নত বীজ ও সারের যতই ব্যবস্থা করা যাক না কেন, উহার সহিত কৃষি যন্ত্রপাতির উন্নতি না করিলে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যাইবে না। কৃষি যন্ত্রিকরণ বলিতে প্রধানত দুইটি বিষয় বুঝায় : প্রথমত, মাক্কাতা আমলের যন্ত্রপাতির পরিবর্তে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার। দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্ষে আণবিকশক্তি অথবা পশুশক্তির পরিবর্তে যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ। কৃষি যন্ত্রিকরণ বলিতে ইম্পাতের লান্ডল, ট্রাকটর, ইলেকট্রিক মোটর, কমবাইন ড্রিল (combine drill), হারভেস্টার থ্রেসার (harvester thresher) প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহার বুঝায়।

ভারতের গ্রায় কৃষি-প্রধান দেশে কৃষি যন্ত্রিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। ভারতে কৃষি প্রায় ৭০ জন লোকের উপজীবিকা হইলেও

কৃষি অত্যন্ত অনগ্রসর অবস্থায় রহিয়াছে। অত্যাগ্র দেশে দেখা গিয়াছে প্রয়োজনীয়তা

যে কৃষিকার্ষে আধুনিক এবং উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদনশীলতা প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতেও কৃষিযন্ত্রিকরণ করা হইলে শ্রমিকের দক্ষতা এবং জমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে, ফসলের দাম কমিবে, জমির অপব্যয় রোধ হইবে, কৃষকের দারিদ্র্য দূর হইবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং গ্রাম ও শহরের শ্রমিকদের মধ্যে আয়ের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

ভারতে কৃষিকার্ষে যন্ত্রিকরণ করার কতকগুলি অন্তরায় রহিয়াছে। প্রথমত, ভারতে জোতের আয়তন ক্ষুদ্র এবং অসম্বন্ধভাবে অবস্থিত। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিতে আধুনিক

ধরনের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ করা সম্ভবপর নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষিকার্ষে অস্ববিধা

যন্ত্রের ব্যবহার করা হইলে নূতন করিয়া বেকার সমস্যা দেখা দিবে। কৃষি যন্ত্রিকরণের ফলে যে বেকার সমস্যা দেখা দিবে তাহাদের বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিপর্যয় দেখা দিবে। কৃষি যন্ত্রিকরণের সঙ্গে সঙ্গে যদি কৃষিত জমির পরিমাণ বৃদ্ধি না পায় এবং অ-কৃষিগত ক্ষেত্রে কোন বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা না করা যায় তাহা হইলে যন্ত্রিকরণ নূতন সমস্যার সৃষ্টি করিবে। তৃতীয়ত, মূলধনের স্বল্পতা কৃষি যন্ত্রিকরণের পথে বাধার সৃষ্টি করিবে। অধিকাংশ ভারতীয় কৃষকের কোনরূপ সঞ্চয় নাই বলিয়া তাহাদের পক্ষে দামী যন্ত্রপাতি ক্রয় করা সম্ভবপর হইবে না। চতুর্থত, কৃষিকার্ষে যে সকল আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে সেগুলি

আমাদের দেশে তৈয়ারী হয় না, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয়। কৃষি যন্ত্রপাতির আমদানি বৃদ্ধি করিলে বৈদেশিক মুদ্রার উপর নূতন চাপ স্থাপিত হইবে। পঞ্চমত, ভারতীয় কৃষক অশিক্ষিত এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের তাহাদের কোনই জ্ঞান নাই বলিয়া সহসা কৃষি যন্ত্রিকরণ করা সম্ভবপর হইবে না। ইহা ব্যতীত যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সহিত যন্ত্রপাতি মেরামতির প্রশ্নও জড়িত রহিয়াছে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যন্ত্রপাতি মেরামতির বন্দোবস্ত করা কঠিন।

যন্ত্রিকরণের যে সকল অসুবিধা রহিয়াছে তাহা দূর করা কঠিন হইলেও অসম্ভব নয়। জ্বোতের আয়তন ক্ষুদ্র বলিয়া যন্ত্রপাতি ব্যবহারের যে অসুবিধা তাহা সমবায় চাষ প্রবর্তন করিয়া দূর করা যায়। সমবায় আন্দোলনের প্রসারে সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সমবায় সমিতির মাধ্যমে মূলধন সমস্কারও সমাধান হইবে। ভারতীয় কৃষকদিগকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শিখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা অনস্বীকার্য যে, যান্ত্রিক শিক্ষা দিতে যথেষ্ট সময় লাগিবে কিন্তু ভবিষ্যতে কৃষক একদিন এই সকল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারিবে। কৃষি যন্ত্রিকরণের ফলে বহু সংখ্যক কৃষক কর্মচ্যুত হইবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে ভারতে ব্যাপকভাবে কৃষি যন্ত্রিকরণ করা হইলে ৬০ শতাংশ কৃষি-নির্ভর ব্যক্তি কর্মচ্যুত হইয়া পড়িবে। বর্তমানে দ্রুতহারে শিল্প সম্প্রসারণ হইতেছে না বলিয়া কর্মচ্যুত ব্যক্তিগণের জন্ম অবিলম্বে শিল্পক্ষেত্রে বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যাইবে না। এইজন্য অবিলম্বে কৃষি যন্ত্রিকরণ না করিয়া দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসূচী হিসাবে ইহাকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং অবিলম্বে পূর্ণ যন্ত্রিকরণ না করিয়া ছোট ছোট হালকা যন্ত্রপাতি, উন্নত সেচব্যবস্থা, কর্ষণযোগ্য পতিত জমির পুনরুদ্ধার এবং উন্নত বীজ ও সার ব্যবহার করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জাপানী পদ্ধতিতে ধানচাষ প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিশেষ সাফল্য লাভ করায় তৃতীয় পরিকল্পনায় উহাকে প্রসারিত করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় উন্নত জ্বোতের বীজ ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করায় ভারতীয় কৃষিপদ্ধতিতে নিম্নলিখিত পরিবর্তন-গুলি সাধিত হইবে : (১) অধিক মাত্রায় রাসায়নিক সার ব্যবহার, (২) সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ, (৩) উন্নত বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি, (৪) সমাজউন্নয়ন পরি-সরকারী নীতি কল্পনার মাধ্যমে কৃষিসংক্রান্ত উন্নত জ্ঞানের প্রয়োগ এবং (৫) সরকারী সহায়তায় হালকা ধরনের ট্রাক্টর ও অগ্নাত ছোট ছোট যন্ত্রপাতি সরবরাহের ব্যবস্থা। বড় বড় ট্রাক্টর এবং অগ্নাত ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া অবিলম্বে কৃষি-বিপ্লব ঘটাইলে যে নূতন জটিলতার সৃষ্টি হইবে সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন বলিয়াই পরিকল্পনা কমিশন উহার পক্ষপাতি ন'ন। এইজন্য পরিকল্পনা কমিশন ছোট ছোট যন্ত্রপাতির ব্যবহার, সেচ সম্প্রসারণ, উন্নত সার ও বীজের প্রয়োগ, নিবিড় চাষ (intensive cultivation) প্রবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষি-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করিতে আগ্রহী।

যদি ভারতীয় কৃষি-সংগঠনে মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন করা যায় এবং এরূপ দ্রুতহারে শিল্প সম্প্রসারণ করা যায় যাহাতে কর্মচ্যুত কৃষকগণের বিকল্প কর্মসংস্থান হইতে পারে তাহা হইলেই ভূমিহীন, অর্থবেকার কৃষি-শ্রমিক এবং কৃষি যন্ত্রিকরণের সমস্তার সমাধান হইবে।

প্রশ্নপত্র ও উত্তরসংকেত

(Questions and Answer Hints)

1. What do you understand by the term "overpopulation"? Is India overpopulated? Give reasons for your answer.
(C.U. B.A. '50, B. Com '55) [পৃষ্ঠা ১২২-৩৩]
2. "A rapidly growing population is the most fundamental obstacle to economic progress in India." Discuss.
(C.U. B. Com '50) [পৃষ্ঠা ১২৫-২৭]
3. Write a short note on the population problems of India.
(C.U. B. Com '65, B.A. '64) [পৃষ্ঠা ১২২-৩৩]
4. Enumerate the chief factors which affect the size of India's population.
(C.U. B.A. '60) [পৃষ্ঠা ১২৩-২৫]
5. Discuss the relation between the growth of population and economic development in India. (C.U. B. Com. '66) [পৃষ্ঠা ১২৫-২৭]
6. Show the interconnection between population, food supply and economic growth in India in present times. [পৃষ্ঠা ১২৩-২৭]
7. Examine some of the salient features of the Indian population as revealed by the last census. [পৃষ্ঠা ১২৭-২২]
8. Discuss the main features of a population policy for India.
[পৃষ্ঠা ১৩৩-৩৫]
9. Examine the importance of increasing the production of foodgrains in a developing country like India.
(C.U. B. Com '58) [পৃষ্ঠা ১৪২-৪৩]
10. What are the causes of food shortage in India? Discuss the measures adopted by the Government to remedy the shortage.
(C.U. B.A. '58) [পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৫]

crisis in India. (B.U. 1950) [পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৫]

12. Argue for and against State Trading in foodgrains. (C.U. B.Com. 65, B.A. '66) [পৃষ্ঠা ১৫১-৫৩]

13. Write a note on the Food Corporation of India. [পৃষ্ঠা ১৪৯-৫১]

14. What are the defects in the present system of marketing agricultural produce in India? How can they be removed? [পৃষ্ঠা ১৫৫-৫৯]

15. Give your own evaluation of the scheme of "integrated structure of rural credit" recommended by the All India Rural Credit Survey. (C.U. B.Com '59) [পৃষ্ঠা ১৬৩-৬৬]

16. Discuss fully the main problems in the field of agricultural credit in India. (B.U. 1962) [পৃষ্ঠা ১৫৯-৬১]

17. Examine the agencies for the supply of rural credit in India. How would you reorganize the system? (C.U. B.A '57) [পৃষ্ঠা ১৫৯-৬৬]

18. What are your suggestions for the reorganization of rural credit in India? (C.U. B. Com '56) [পৃষ্ঠা ১৫৯-৬৬]

19. Discuss the different aspects of the question of fixing ceilings on agricultural holdings in India. (C.U. B.Com. '59, '61, '63) [পৃষ্ঠা ১৭৬-৭৮]

20. Discuss the effects of the abolition of the Zamindari System upon the rural economy of India. (C.U. B.A. '59) [পৃষ্ঠা ১৭১-৭৩]

21. Examine the principal types of land tenure in India and discuss the economic bearings of each. (C.U. B.Com. '54) [পৃষ্ঠা ১৭০-৭৩]

22. What are the main defects of land reforms and policy at present? Do you think that the Nagpur Resolution on land reforms will basically remove these defects? [পৃষ্ঠা ১৭৮-৮০]

23. What are the main features of the New Agrarian Policy based on the Nagpur Resolution of the Congress in 1957? Do you think that it will succeed and bring about thorough reorganization of Indian agriculture? [পৃষ্ঠা ১৭৮-৮০]

24. Examine the case for Co-operative Farming in India. What

11. Explain carefully the factors underlying the present food methods would you suggest for the development of Co-operative farming in this country ? (C.U. B.A. '59) [পৃষ্ঠা ১৮১-৮৬]

25. Discuss the possibilities and limitations of co-operative farming in India. (B. U. B. A. '64) [পৃষ্ঠা ১৮১-৮৬]

26. Trace briefly the history of the Co-operative movement in India. What factors have been responsible for the slow progress of the movement in the country ? (C.U. B.A. '56) [পৃষ্ঠা ১৮৬-৮৯]

27. Discuss the merits and demerits of Joint Co-operative Farming in India. Will it be possible for the Government to extend Joint Co-operative Farming throughout the country within a short period of time ? [পৃষ্ঠা ১৮৪-৮৬]

28. Discuss the possibilities and limitations of mechanized farming in India. (C.U. B.A. '56) [পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৮]

29. Would you like to have mechanized agriculture in India ? Explain clearly its possibilities and drawbacks in a country like India. (C.U. B.A. '51) [পৃষ্ঠা ১৯৬-৯৮]

30. What are the main handicaps from which agricultural labour at present suffers in India. Give suggestion for the removal of these difficulties and for the rehabilitation of agricultural labour in India. [পৃষ্ঠা ১৯৩-৯৬]

পঞ্চম খণ্ড

অষ্টাদশ অধ্যায়

শিল্প পরিচালনা : ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা

(Industrial Management with special reference
to the Managing Agency System)

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে অতি দ্রুত শিল্পায়ণের জন্ত সরকার বিশেষ তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। শিল্প উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প পরিচালনার গুরুত্বও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতে শিল্প পরিচালনার অত্যন্ত পদ্ধতি হইল ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা। ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার নিয়ন্ত্রণ এবং সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল নূতন কোম্পানী আইন পাশ করা হয়।

ভারতের মিশ্র অর্থনীতিতে শিল্পক্ষেত্র দুইটি অংশে বিভক্ত—বেসরকারী উद्यোগের ক্ষেত্র (Private Sector) এবং সরকারী উद्यোগের ক্ষেত্র (Public Sector)। এই দুই ক্ষেত্রে শিল্প পরিচালনার প্রকৃতি ভিন্ন বলিয়া পৃথকভাবে উহাদের আলোচনা করা হইল। বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার তিনটি পদ্ধতি রহিয়াছে—ব্যক্তিগত পরিচালনা, অংশীদারী পরিচালনা এবং যৌথ মূলধনী পরিচালনা। বৃহদায়তন শিল্পগুলি যৌথ মূলধনের ভিত্তিতে গঠিত হইলেও ইহা পরিচালক সভা কর্তৃক পরিচালিত হয় না—পরিচালনার ভার থাকে ম্যানেজিং এজেন্টদের হাতে। “ম্যানেজিং এজেন্ট

হইল কোন ব্যক্তি, অথবা ফার্ম অথবা কোম্পানী যাহা চুক্তির
সংজ্ঞা বলে কোম্পানী পরিচালনার ক্ষমতা লাভ করিয়া থাকে।”

(“A managing agent is a person, firm or company in charge of the whole of the management of a company but deriving his or its authority by virtue of an agreement with the Company.”) বর্তমানে কোম্পানী আইনের সংশোধনের ফলে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার প্রাধান্য হ্রাস পাইয়াছে এবং বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সেক্রেটারী ও কোষাধ্যক্ষ (Secretaries and Treasurers) কর্তৃক পরিচালনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভারতে শিল্প-প্রসারের অনুকূল পরিবেশ (যেমন, পঞ্চাশ কাঁচামাল, সুলভ শ্রমিক এবং বিস্তৃত বাজার) থাকায় ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ এদেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়। ইংলণ্ডে গঠিত এই সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনার ভার লইবার উপযুক্ত একশ্রেণীর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখা দেয়। ভারতে বসবাসকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের দ্বারা গঠিত এজেন্সি হাউসগুলি (Agency House) এই পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। ইহারা ব্রিটিশ শিল্পসংস্থার আস্থাভাজন এবং এদেশের বৈষয়িক অবস্থার সহিত পরিচিত ছিলেন। ‘এজেন্সি হাউস’ শব্দটি হইতেই ‘ম্যানেজিং এজেন্সি’ শব্দটির উদ্ভব হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ প্রথমে শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দৈনন্দিন ভার গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে মূলধন সরবরাহের দায়িত্বও ইহাদের উপর হস্ত হয়। সংগঠিত মূলধন বাজার, প্রোমোটিং হাউস এবং ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্টের অভাব ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বিকাশে সহায়তা করিয়াছে। ঠিক কোন সময় হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার কার্যকাল শুরু হইয়াছিল তাহা নিতুলভাবে জানা যায় না, তবে শ্রীমতী ভেরা এ্যান্স্টে অনুমান করেন যে, ১৮৩৩ সালে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধিকার রদ হইবার পর হইতেই ইহাদের কাজ শুরু হয়।

শুরুতে ম্যানেজিং এজেন্সিগুলি অংশীদারী কারবার অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অংশীদারী অথবা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীগুলিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত করিবার প্রবণতা দেখা যায়। বর্তমানের খ্যাতনামা ম্যানেজিং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিড়লা ব্রাদার্স, ডালমিয়া জৈন প্রভৃতি কোম্পানীগুলি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর ভিত্তিতে এবং ম্যাকনেল বেরী, মার্টিন বার্ন, শ’ওয়ালেস, ম্যাকলিয়ড, বার্ড প্রভৃতি কোম্পানীগুলি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর ভিত্তিতে গঠিত।

ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যাবলী (Functions of Managing Agents) : ম্যানেজিং এজেন্টগণ প্রধানত তিন ধরনের কাজ করিয়া থাকে, (১) ইহারা শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে (promoters), (২) ইহারা তিন ধরনের কাজ শিল্প পরিচালনা করিয়াছে (managers), এবং (৩) ইহারা শিল্পে মূলধন যোগান দিয়াছে (financiers)।

কোন নূতন শিল্প স্থাপন করা সম্ভব কিনা এবং তাহার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা চালাইয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্প-স্থাপনে অগ্রণী হইয়াছে। ইহাদের চেষ্টা এবং উদ্যোগে পাটশিল্প, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, বাগিচাশিল্প, কয়লাশিল্প প্রভৃতি গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের শিল্প-গঠনে ম্যানেজিং এজেন্টদের ভূমিকার গুরুত্ব স্বীকার করিয়া ভারতীয় ফিসক্যাল কমিশন বলিয়াছে, শিল্পায়ণের প্রথম যুগে যখন মূলধন এবং উদ্যোগ কোনটাই পর্যাপ্ত ছিল না সেই সময় ম্যানেজিং এজেন্টগণই মূলধন এবং উদ্যোগ উভয়ই যোগান দিয়াছে এবং ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলি ম্যানেজিং এজেন্টদের উৎসাহ এবং সযত্ন রক্ষণাবেক্ষণের ফলেই বর্তমান অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইতে পারিয়াছে। ভারতে শিল্প-সম্ভাবনা উপলব্ধি করিয়া প্রাথমিক বুঁকি লইয়া ইহারাই শিল্পস্থাপনে অগ্রণী হইয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্পে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রকার মূলধনই সরবরাহ করিত। শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেষার এবং ডিবেঞ্চার কিনিয়া ইহারা দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহ করিত। ম্যানেজিং এজেন্টদের ভূমিকা শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যাঙ্ক হইতে স্বল্পকালীন ঋণ পাইতে সহায়তা করিয়াছে। দুইজন জামিন না থাকিলে ব্যাঙ্ক ঋণ দেয় না; ম্যানেজিং এজেন্টগণ দ্বিতীয় জামিন হইত। কিছুদিন আগে পর্যন্ত ইহারা সরাসরি শিল্পের ঋণ অংশ মূলধন যোগান দিত।

তৃতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্টগণ শিল্পের দৈনন্দিন পরিচালনার ভারও গ্রহণ করে। এক ম্যানেজিং এজেন্টের অধীনে একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান থাকায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ব্যয় কম হয়।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার কুফল (Abuses of the System) : এই ব্যবস্থার দোষত্রুটিও অনেক। বাস্তবিকপক্ষে ইহাকে বিভিন্ন দোষের আকর বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। সমালোচকদের মতে শিল্প গঠনের প্রারম্ভিক পর্ষায় এই ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকিলেও আজ আর নাই। এই ব্যবস্থার ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা হইল।

প্রথমত, পরিচালনা এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ একই সঙ্গে ম্যানেজিং এজেন্টদের হাতে গুস্ত থাকায় অর্থনৈতিক ক্ষমতার উৎকট কেন্দ্রীভবন ঘটে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মূলধন একত্র রাখার ফলে এক প্রতিষ্ঠানের মূলধন অপর প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হইত। দক্ষ প্রতিষ্ঠানের মূলধন দুর্বল প্রতিষ্ঠানগুলির জন্ত ব্যয় করার ফলে দক্ষ প্রতিষ্ঠানও দুর্বল হইয়া পড়ে। তৃতীয়ত, ভারতীয় শিল্পের অনগ্রসরতার জন্ত এই প্রথা

আংশিকভাবে দায়ী। চতুর্থত, কোম্পানীর আর্থিক সঙ্গতির কুফলসমূহ

প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া ম্যানেজিং এজেন্টগণ কমিশন বাবদ ও অন্যান্য উপায়ে নানাভাবে অর্থ আদায় করিত। ম্যানেজিং এজেন্টগণ দুইভাবে টাকা পাইয়া থাকে—কোম্পানীর নীট মুনাফার উপর নির্দিষ্ট হারে কমিশন পায় এবং অফিস পরিচালনার জন্ত পারিশ্রমিক পায়। কর অল্পসঙ্কান কমিশনের হিসাবমত ১৯৫১ সালে ম্যানেজিং এজেন্টগণ কোম্পানীর মুনাফার অর্ধাংশ আত্মসাৎ করিয়াছিল।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন প্রবর্তনের পূর্বে এই প্রথার সংস্কার (Reform of the System Prior to 1956 Company Law) : ১৯৩৬ সালে ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইনের সংস্কার করিয়া ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার উপর নিয়ন্ত্রিত নিয়ন্ত্রণসমূহ আরোপ করা হয়—(১) কোন ম্যানেজিং এজেন্ট ২০ বৎসরের বেশি কোন প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে পারিবে না। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টকে পুনর্নিয়োগ করা চলিবে; (২) ম্যানেজিং এজেন্টগণ কোম্পানীর মোট ডিরেক্টরদের এক-তৃতীয়াংশের অধিক মনোনীত করিতে পারিবে না; (৩) এক প্রতিষ্ঠানের মূলধন অত্র প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা চলিবে না; (৪) কোম্পানীর

ডিরেক্টরগণ অনুমোদন করিলে তবেই ম্যানেজিং এজেন্টগণ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক অথবা কমিশন পাইবে।

ইংরেজ সরকার ইংরেজ ম্যানেজিং এজেন্টদের স্বার্থ রক্ষার জন্ত সচেতন ছিলেন বলিয়া এই সকল সংশোধনগুলি বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পর ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা উচ্ছেদের স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু হয়। কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্টগণ মনে করে যে, এই প্রথার উচ্ছেদ ঘটিলে দেশে বেসরকারী উদ্যোগে মূলধন গঠন ব্যাহত হইবে।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫০ সালে “ভাবা” কমিটি নিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে এই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ১৯৫১ সালে এক সংশোধনী আইন পাশ করা হয়।

“ভাবা” কমিটি এই আইনানুসারে ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রথম নিয়োগ এবং পরবর্তী কার্যকাল সম্প্রসারণ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনাধীনে আনা হয়। পরে “ভাবা” কমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইন পাশ করা হয়। এই আইন ১৯৫৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রবর্তিত হয়।

১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইনের দ্বারা ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার সংস্কার (Reform of the System in the New Indian Companies Act, 1956) : ১৯৫৬ সালের আইনে যে সকল নূতন ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে তাহার ফলে ম্যানেজিং এজেন্টদের অসং আচরণ ও স্বজন পোষণ বন্ধ করিবে, এবং কোম্পানীর দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুপরিচালনায় সহায়তা করিবে। এই আইনের বলে ১৯৬০ সালের পর ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার অবসান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা সরকারের উপর গৃহীত হয়। নূতন কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন ঘটিয়াছে তাহা নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

[এক] নিয়োগ নিষিদ্ধকরণ : ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্টের পর সরকার নির্দেশিত বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর শিল্প এবং ব্যবসায় ম্যানেজিং এজেন্সি আদৌ থাকিবে না। অবশ্য এই প্রথার অবসান করিবার পূর্বে এই সমস্যা সম্পর্কে সরকারকে উপদেশ দিবার জন্ত একটি কমিটি গঠিত হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি নূতন প্রশাসনিক বিভাগ খোলা হইয়াছে। কোম্পানী আইন প্রশাসনিক বিভাগ নামে পরিচিত এই বিভাগটি কোম্পানী আইনের বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা করিবে। ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বর্তমান নিয়ন্ত্রণ এবং ভবিষ্যৎ উচ্ছেদ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবার উদ্দেশ্যে একটি উপদেষ্টা কমিশন (Advisory Commission) গঠন করা হইয়াছে।

[দুই] নিয়োগ : ম্যানেজিং এজেন্টদের নিয়োগ বা পুনর্নিয়োগ প্রথমে কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণের সাধারণ সভায় পাশ করিয়া লইতে হইবে এবং ইহার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে অনুমোদন লইতে হইবে। ম্যানেজিং এজেন্টদের প্রথম দফায়

১৫ বৎসরের অধিক কালের জন্ত নিয়োগ করা চলিবে না, এবং ১০ বৎসরের অধিক সময়ের জন্ত পুনর্নিয়োগ করা চলিবে না।

[তিন] নিয়োগের সর্তাবলী : ১৯৬০ সালের ১৫ই আগষ্টের পর কোন ম্যানেজিং এজেন্ট ১০টির অধিক প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে পরিচালনা করিতে পারিবে না।

[চার] ম্যানেজিং এজেন্টের বরখাস্ত : দেউলিয়া বা বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে ম্যানেজিং এজেন্টের পরিচালনার অবসান ঘটবে। প্রতারণা, বিশ্বাস ভঙ্গ, গুরুতর অবহেলা অথবা অযোগ্য পরিচালনার অভিযোগে কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণ তাহার ম্যানেজিং এজেন্টকে অপসারিত করিতে পারিবে।

[পাঁচ] ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিক : একই প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজিং এজেন্ট এবং সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ (Secretaries and Treasurers) একই সঙ্গে থাকিতে পারিবে না। ম্যানেজিং এজেন্টগণ পারিশ্রমিক হিসাবে নীচ মূনাফার ১০ শতাংশ, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ৭½ শতাংশ এবং ম্যানেজার ৫ শতাংশ পর্যন্ত পাইতে পারে। মূনাফার ১০ শতাংশের অধিক অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণ অনুমোদন করিলে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কোনরূপ আপত্তি না করিলে তবেই ম্যানেজিং এজেন্টগণ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক লইতে পারিবে।

[ছয়] ম্যানেজিং এজেন্টদের অসৎ আচরণ অবসানের উদ্দেশ্যে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ : ম্যানেজিং এজেন্ট পরিচালক মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাধীন থাকিয়া কাজ করিবে। ম্যানেজিং এজেন্টগণ ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের বিধানাবলী মানিয়া চলিবে। অধীনস্থ এক কোম্পানীর অর্থ অথবা কোম্পানীতে লগ্নী করা চলিবে না। ম্যানেজিং এজেন্টগণ অধীনস্থ কোম্পানীর নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। কোন ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এজেন্ট থাকিতে পারিবে না। অধীনস্থ কোম্পানীর অনুমতি ব্যতিরেকে ম্যানেজিং এজেন্ট সমজাতীয় কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করিতে পারিবে না। পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যসংখ্যা ৫ হইলে ১ জন এবং উহার বেশি হইলে ২ জন সদস্য ম্যানেজিং এজেন্টগণ নিয়োগ করিতে পারিবে। উত্তরাধিকারী সূত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি লাভ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতি লইতে হইবে।

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের পর্যালোচনা (Appraisal of the 1956 Act) : নূতন কোম্পানী আইনে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার যে সংস্কারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। অযোগ্য পরিচালনার অবসান এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধে নিঃসন্দেহে ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইন এক দৃঢ় পদক্ষেপ। ১৯৫৬ সালের আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোম্পানী আইন প্রশাসন বিভাগের উপর ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে দেশের

বেসরকারী উদ্যোগ দেশের সামাজিক অগ্রগতির এক শক্তিশালী বাহনে পরিণত হইবে। অবশ্য ১৯৫৬ সালের আইনের কয়েকটি ক্রটি লক্ষণীয় : প্রথমত, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে। আশঙ্কা করা অমূলক নয় যে, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বিলোপ ঘটিলে ম্যানেজিং এজেন্টগণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের নাম গ্রহণ করিয়া পূর্বের গ্রায় কাজ করিয়া চলিবে। দ্বিতীয়ত, মূলধন গঠন ব্যাহত হইতে পারে। মুনাফার ১০ শতাংশ ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিকের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিত হওয়ার দরুন ছোট ছোট ম্যানেজিং এজেন্টদের পক্ষে ব্যবসায় সম্প্রসারণ অথবা নূতন ব্যবসায় গঠন করা কঠিন হইবে। অপরপক্ষে সরকারী অল্পগ্রহপুষ্টি বড় বড় ম্যানেজিং এজেন্টগণের অতিরিক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণে কোন বাধাই থাকিবে না। ইহার ফলে একচেটিয়া মালিকানা এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধি পাইবে। তৃতীয়ত, ম্যানেজিং এজেন্টগণ আত্মপক্ষ সমর্থন এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে লর্ড কেন্সের যুক্তি উপস্থাপিত করে। লর্ড কেন্স প্রায় ৪২ বৎসর পূর্বে বালনে তাঁহার বিখ্যাত End of Laissez Faire বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, বেসরকারী উদ্যোগ যাহা করিতেছে তাহার উন্নতি সাধনের জগ্ন কিছু না করিয়া বেসরকারী উদ্যোগ যাহা করে নাই তাহা করাই সরকারের কর্তব্য। কেন্সের যুক্তিকে ম্যানেজিং এজেন্টগণ সরকারী বিধিনিষেধ উচ্ছেদের স্বপক্ষে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে। কিন্তু ইহারা ভুলিয়া যায় যে, কেন্স জার্মানী এবং রুটেনের গ্রায় উন্নত অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যাহা বলিয়াছিলেন অল্পন্নত দেশ সম্পর্কে তাহা প্রযোজ্য নয়। বিশেষ করিয়া ঐ সকল দেশে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার কোন অস্তিত্ব নাই এবং বেসরকারী শিল্পপতির। ভারতীয় ম্যানেজিং এজেন্টদের গ্রায় অসতুপায় অবলম্বন করেন না।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্যাটেল কমিটির (১৯৬৫) রিপোর্ট (Patel Committee Report on the Future of the Managing Agency System) : ১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইন পাশ হওয়ার পর হইতে নানা দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। কোম্পানী আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৫৭ সালে শ্রী এ. ভি. বিশ্বনাথ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। শাস্ত্রীকমিটির সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৬০ সালে কোম্পানী সংশোধন আইন পাশ করা হয়।

১৯৬০ সালের আইনে তিন ধরনের সংশোধনের ব্যবস্থা আছে : (ক) ১৯৫৬ সালের আইনের ব্যবহারিক অসুবিধা দূরীকরণের জগ্ন সংশোধন, (খ) ১৯৫৬ সালের আইনের ভাষাগত ক্রটি এবং অস্পষ্টতা দূরীকরণের জগ্ন সংশোধন, এবং (গ) ১৯৫৬ সালের আইনের উদ্দেশ্য সফল করিবার জগ্ন কাম্য সংশোধন। ১৯৬০ সালের সংশোধনী আইনের বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

প্রথমত, ১৯৫৬ সালের আইনে ম্যানেজিং এজেন্টগণ কর্তৃক অধীনস্থ কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু অনেক ম্যানেজিং এজেন্ট পদত্যাগ করিয়া ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হইয়া নিজেদের স্বার্থে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ পরিচালনা করেন। ইহা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালের সংশোধনী আইনে বিশেষ শিল্প বা দ্রব্য ব্যতীত সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারী অনুমোদন ভিন্ন ক্রয়-বিক্রয়ের জ্ঞাত কোন এজেন্ট নিয়োগ করা চলিবে না বলিয়া স্থির করা হয়। দ্বিতীয়ত, এক কোম্পানীর অর্থ অন্য কোম্পানীতে লগ্নী করা নিষিদ্ধ করা হয়। ইহা ব্যতীত ম্যানেজিং এজেন্টগণ যাহাতে কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ার ক্রয় না করিতে পারে (cornering) তাহারও ব্যবস্থা করা হয়। এই আইনে শেয়ার হস্তান্তরের সময় ভোটদান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের জ্ঞাত সরকারের হাতে ক্ষমতা গ্ৰস্ত করা হইয়াছে। তৃতীয়ত, এই আইনে ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিকের সঠিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ম্যানেজিং এজেন্সি ফার্মের কোন অংশীদার অথবা ডাইরেক্টর কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করিলে তাহা ম্যানেজিং এজেন্টের পারিশ্রমিক বলিয়া গণ্য হইবে। কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক এবং পরে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে তবেই ম্যানেজিং এজেন্ট এবং কোম্পানীর মধ্যে কোন চুক্তি বৈধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। চতুর্থত, এই আইনে ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগের সর্বসমূহ নির্দিষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। যদি কোন ব্যক্তির পাবলিক ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানীতে ১০ শতাংশ শেয়ার থাকে অথবা প্রাইভেট ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানে ৫ শতাংশ শেয়ার থাকে তাহা হইলে তাহাকে ম্যানেজিং এজেন্ট হিসাবে গণ্য করা হইবে। ম্যানেজিং এজেন্সি কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ লক্ষ্য রাখিবেন যেন তাঁহারা একই সঙ্গে ১০টির অধিক কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেন্ট না হন। ভবিষ্যতে ম্যানেজিং এজেন্টের অফিস স্থানান্তর করিতে হইলে উহাকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং অধীনস্থ কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণের অনুমোদন লইতে হইবে।

মহানবীশ কমিটি এবং হাজারী কমিটির রিপোর্টে কিছু কিছু শিল্পক্ষেত্রে এই প্রথার অবসান এবং অগ্রগত ক্ষেত্রে উহাদের নিয়ন্ত্রণ করিয়া চালু রাখার সুস্পষ্ট সংকেত রহিয়াছে।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা ত্রুটিপূর্ণ হইলেও কোন বিকল্প ব্যবস্থা না করিয়া সহসা ইহার উচ্ছেদ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। ইহাকে সংস্কার করিয়া বাঁচাইয়া রাখিলে ইহা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক হইবে। সকল দিক চিন্তা করিয়া সরকারও এই ব্যবস্থার আশু উচ্ছেদের সমর্থক বলিয়া মনে হয় না। ১৯৬০ সালে কোম্পানী (সংশোধন) আইন প্রবর্তনের সময় সরকার ঘোষণা করেন যে, যদিও ধীরে ধীরে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার উচ্ছেদ সরকারের কাম্য তথাপি শীঘ্রই এ বিষয়ে কিছু করা হইবে না।

১৯৬০ সালের সংশোধনী আইন পাশ হইবার পূর্বে ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে

সরকার কোম্পানী আইন উপদেষ্টা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মূনাফার আন্তর্জাতিক হারে (sliding scale) ম্যানেজিং এজেন্ট এবং সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের পারিশ্রমিক স্থির করেন। ম্যানেজিং এজেন্টদের ক্ষেত্রে এই পারিশ্রমিক প্রথম ১০ লক্ষ টাকা নীট মূনাফার উপর ১০ শতাংশ হইতে শুরু করিয়া ১ কোটির অধিক মূনাফার উপর ৪ শতাংশ হারে এবং সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের ক্ষেত্রে প্রথম ১০ লক্ষ নীট মূনাফার উপর ৭½ শতাংশ হইতে শুরু করিয়া ১ কোটির অধিক মূনাফার উপর ৩ শতাংশ হারে ধার্য করা হয়।

ইহা ব্যতীত সরকার স্থির করেন যে, ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের কার্যকাল ১০ বৎসরের অধিক হইবে না এবং পুনর্নিয়োগের ক্ষেত্রে কার্যকাল হইবে ৫ বৎসর। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনে ব্যবস্থা করা হয় যে, ১৫ বৎসরের অধিক কালের জন্ত প্রথম নিয়োগ এবং ১০ বৎসরের অধিক কালের জন্ত পুনর্নিয়োগ করা চলিবে না। ফলিত অর্থনৈতিক গবেষণার জাতীয় পরিষদ (National Council of Applied Economic Research) তাহার সাম্প্রতিক প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় উল্লেখ করিয়াছে যে, ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যকাল হ্রাস পাওয়ায় তাহারা কোন দীর্ঘকালীন সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করিবে না এবং উহাদের স্বল্পকালীন কার্যকাল শিল্পক্ষেত্রে বৈদেশিক সহযোগিতা ব্যাহত করিবে। অবশ্য ইহা স্মৃতির কথা যে, পরে কোম্পানী আইন পরিচালনা বিভাগ ১৯৫৯ সালের আইনের নির্ধারিত ১০ বৎসর এবং ৫ বৎসর কার্যকাল ব্যাখ্যা করিয়া বলে যে, উহা অনমনীয় নয় এবং যে সকল শিল্পে বিনিয়োগ এবং উৎপাদনের মধ্যে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান থাকে সেখানে ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যকাল ১৫ বৎসর পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা যাইবে।

ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সরকারী নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৬৫ সালে ডাঃ আই. জি. প্যাটেলের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি দীর্ঘকালীন সময়ে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করিবার জন্ত সুপারিশ করে। কিন্তু বর্তমানের সঙ্কটজনক অর্থনৈতিক অবস্থায় প্যাটেল কমিটি সরকারকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত ঐ নীতি অনুসরণ করিবার জন্ত কমিটি নির্দেশ দেয়। কমিটি প্রধানত চিনি, বস্ত্র এবং সিমেণ্ট শিল্প হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা উচ্ছেদ করিবার নির্দেশ দেয়। কিন্তু পাট ও কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে কমিটি এই প্রথার অবসানের পক্ষপাতি নয়। এমন কি চিনি, বস্ত্র এবং সিমেণ্টের ক্ষেত্রেও ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা লোপ করিয়া নূতন পরিচালন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্ত প্রয়োজনীয় সময় দিতে হইবে।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার ঘোষণা করেন যে, আগামী ৩ বৎসরের মধ্যে সিমেণ্ট, বস্ত্র, পাট, কাগজ এবং চিনি শিল্পে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা লোপ করা হইবে।

প্যাটেল কমিটি ৩টি শিল্প হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি ব্যবস্থা বিলোপ করার সুপারিশ করেন কিন্তু সরকার ৫টি হইতে উহা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং আগামী তিন বৎসরের মধ্যে বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প, চিনিশিল্প, সিমেন্টশিল্প এবং কাগজশিল্প হইতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার অবসান ঘটবে।

প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্যাটেল কমিটি পাট এবং কাগজ শিল্পের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বহাল রাখার সুপারিশ করেন। কমিটি উপলব্ধি করেন যে, পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্টদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কাগজশিল্প এখনো পর্যন্ত অন্তরত পর্যায়ের রহিয়াছে বলিয়া কমিটি এই ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা বলবৎ রাখিতে চাহিয়াছিলেন। যাহা হউক, সরকার এই দুইটি শিল্পক্ষেত্রে প্যাটেল কমিটির সুপারিশ গ্রহণ না করিয়া অগুরুত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মনোপলি অনুসন্ধান কমিশনের রিপোর্ট (Report of the Monopolies Enquiry Commission) : ভারতীয় অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৬৪ সালের মে মাসে বিচারপতি কে. সি. দাশগুপ্তকে সভাপতি করিয়া একটি কমিশন গঠন করে। কমিশন ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ইহার রিপোর্ট দাখিল করে। একচেটিয়া এবং সঙ্কোচনমূলক আচরণসমূহ (monopolistic and restrictive practices) বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কমিশন একটি স্থায়ী বিধিবদ্ধ সংস্থা (statutory body) গঠনের সুপারিশ করে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটয়াছে এবং কৃষি ছাড়া যে সকল একচেটিয়ামূলক এবং সঙ্কোচনমূলক ব্যবস্থা অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচলিত রহিয়াছে তাহা কমিশনকে অনুসন্ধান করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। জনস্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কমিশনকে আইনগত এবং অত্যাগত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্দেশ দিতে বলা হয়। আশা করা গিয়াছিল যে, অর্ধ-পরিকল্পিত মিশ্র অর্থনীতির মূল সমস্যা সমাধানে কমিশনের পরিণত জ্ঞান এবং বিবেচনা সহায়ক হইবে। কিন্তু কার্যত এই উচ্চ আশা পূরণ হয় নাই। কমিশন শুধুমাত্র একচেটিয়ামূলক কারবার নিয়ন্ত্রণের জগুই সুপারিশ করিয়াছেন কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষমতার যে কেন্দ্রীভবন ঘটয়াছে তাহা রোধ করিবার জগু কিছুই করেন নাই। ইহা বিশ্বয়জনক বলিয়া মনে হয় যে, কমিশন তাঁহার রিপোর্টে ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কারণ অথবা পরিমাণ সম্পর্কে কোন বিশ্লেষণ না করিয়া উহাকে স্বীকার করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। কমিশনের মতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক হইয়াছে। কমিশনের এই অভিমত আমাদের নিকট আশ্চর্যজনক বলিয়াই মনে হইয়াছে। কমিশন অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের মূলে আঘাত করেন নাই, কি করিয়া ইহাকে গ্রায্য বণ্টনের অন্তর্কুল করা যায় তাহাই চিন্তা করিয়াছেন।

প্রধানত একচেটিয়ামূলক এবং সঙ্কোচনমূলক ব্যবস্থাগুলির কুফল দূর করিবার স্থায়ী সংস্থা গঠন উদ্দেশ্যে কমিশন একটি স্থায়ী বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠন এবং উহার কার্য ও ক্ষমতার খসড়া প্রস্তুত করেন। সরকার অথবা জনসাধারণের নিকট হইতে কোন অভিযোগ আসিলে প্রস্তাবিত সংস্থাটি ঐ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবে। বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে ঐ সংস্থাটি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে অত্যাচার আচরণ বন্ধ করিবার জ্ঞপ্তি নির্দেশ দিবে। এই ধরনের নির্দেশ অবশ্য পালনীয় (mandatory) এবং চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অবশ্য সুপ্রিম কোর্টে ইহার বিরুদ্ধে আপীল করা চলিবে।

প্রস্তাবিত সংস্থাটি যে কোন একচেটিয়া কারিবার পরীক্ষা করিয়া উহার উন্নয়নের জ্ঞপ্তি উপযুক্ত নির্দেশ দিবে। কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের সহিত অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তিকরণ অনুমোদন করিবার ক্ষমতা এই সংস্থাটির থাকিবে। কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর সমজাতীয় অথবা কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হইবার পূর্বে এই সংস্থাটির অনুমতি লইতে হইবে। এই সংস্থাটি বড় বড় কোম্পানীর নিকট হইতে বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব চাহিতে পারে। কমিশন মনে করেন এই সকল ক্ষমতার ফলে প্রস্তাবিত সংস্থাটি সকল বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে পারিবে এবং দ্রব্যভিত্তিক (product-wise) অথবা দেশভিত্তিক (country-wise) কেন্দ্রীভবন প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত কার্যসূচী গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার ঘোষণা করেন যে, একচেটিয়া এবং সঙ্কোচনমূলক আচরণ কমিশন (Monopolies and Restrictive Trade Practices Commission) নামে একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা হইবে। সঙ্কোচনমূলক আচরণ সমূহ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা এই কমিশনের থাকিবে। অর্থনৈতিক ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীভবন রোধ করিবার উদ্দেশ্যে এই নূতন সংস্থাটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ, ব্যবসায়ের বিকেন্দ্রীকরণ, সংযুক্তিকরণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সরকারকে পরামর্শ দিবে। অবশ্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা সরকারের হাতেই থাকিবে।

আমাদের মনে হয় না যে, নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতাসম্পন্ন একটি স্থায়ী সংস্থা গঠিত হইলেই অবস্থার উন্নতি হইবে। ভারতে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। উহা সমাধানের জ্ঞপ্তি সুচিন্তিত অর্থনৈতিক নীতি এবং দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামোর প্রয়োজন।

কমিশন প্রসঙ্গত ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার উচ্ছেদ সম্পর্কে আলোচনা করিলেও উহার উচ্ছেদ অথবা নিয়ন্ত্রণের জ্ঞপ্তি কোন সুপারিশ করেন নাই। কমিশনের মতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনের কারণ এবং মনে রাখা প্রয়োজন যে, কমিশনের মতে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির সহায়ক। কমিশন মনে করেন যে, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার উচ্ছেদ হইলে অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবনে

কোনরূপ পরিবর্তন দেখা দিবে না, কারণ ইহার স্থানে অল্প কোন পরিচালন-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিবে। সুতরাং শিল্পক্ষেত্রে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের কথা ভাবিলেই চলিবে না, দেশের শিল্পোন্নতির উপরও উহার প্রভাব লক্ষ্য করিতে হইবে। কিন্তু ইহা কমিশনের অনুসন্ধান বহির্ভূত বিষয় বলিয়া কমিশন সমস্তার এই দিক সম্পর্কে নীরব থাকিয়া গিয়াছেন।

আমাদের মিশ্র অর্থনীতির ভিত্তি হইল “অংশীদারী ধনতন্ত্র” (partnership capitalism)। কেন্দ্রীভবন রোধ এবং বেসরকারী উদ্যোগ নিয়ন্ত্রণ করিয়া সরকার ইহাকে “গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে” পরিণত করিতে চান। যদি সরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারী উদ্যোগ দক্ষতা এবং সততা সহকারে কাজ করে তবেই ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের আদর্শ সফল হইবে।

সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা (Management of Public Enterprises) : ভারতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা পদ্ধতি প্রধানত তিন ধরনের

—বিভাগীয় সংগঠন (Departmental Organisation), বিধিবদ্ধ তিন ধরনের পরি- বা সরকারী কর্পোরেশন (Statutory or Public Corporations) চালনা এবং সরকারী যৌথ মূলধনী কোম্পানী (Government Joint Stock Company)।

কোন সরকারী বিভাগ বা দপ্তর কর্তৃক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতে পারে, এই ক্ষেত্রে সাধারণত সরকার এবং ব্যবসায়টিকে পৃথক করিয়া দেখা হয় না। ডাক ও তার বিভাগ, রেল পরিবহণ, অল ইণ্ডিয়া রেডিও প্রভৃতি বিভাগীয় সংগঠনের উদাহরণ। দ্বিতীয়ত, সরকারী ব্যবসায় কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হইতে পারে। এই কর্পোরেশনগুলি পার্লামেন্টের বিশেষ আইন দ্বারা গঠিত হয় এবং পৃথক আইনগত স্বত্বা হিসাবে ইহাদের স্বাভাব্য থাকিলেও পরিচালনার জ্ঞান ইহারা সরকারের নিকট দায়ী থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, স্টেট ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, ভারতীয় বিমানপথ কর্পোরেশন, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন প্রভৃতি সরকারী কর্পোরেশনের উদাহরণ। তৃতীয়ত, সরকারী মালিকানা ও পরিচালনায় যৌথ মূলধনী কারবার গঠিত হইতে পারে। এই সকল কারবার ভারতীয় কোম্পানী আইনানুসারে গঠিত হয় এবং মোট শেয়ারের অন্ততঃ ৫১ ভাগ সরকার কিনিয়া থাকে। হিন্দুস্থান স্টিল, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন, সিন্ধি সার কারখানা প্রভৃতি সরকারী যৌথ মূলধনী কোম্পানীর উদাহরণ।

সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন সরকারের লক্ষ্য বলিয়া সরকার অর্থনৈতিক কাজকর্মে অধিক পরিমাণে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। পরিবহণ, বাণিজ্য এবং শিল্প ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বুলেটিন হইতে দেখা যায় যে, ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে সরকারী কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ৩৬ এবং মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৬.৩ কোটি টাকা।

কিন্তু ১৯৬৫ সালে সরকারী কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৮৩ এবং মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ হয় ১১১৪.২১ কোটি টাকা। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্র কিরূপ দ্রুত গতিতে সম্প্রসারিত হইতেছে তাহা এই পরিসংখ্যান হইতে উপলব্ধি করা যায়। শিল্পক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের গুরুত্ব যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই উহার দক্ষ পরিচালনা সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতেছে। সরকারী উদ্যোগের প্রধান লক্ষ্যই হইতেছে দক্ষ উৎপাদন অর্থাৎ সর্বনিম্ন খরচে অধিক দ্রব্য উৎপাদন করা। যদি সংগঠন এবং পরিচালনা দক্ষ হয় তবেই উহার লক্ষ্য পূরণ হইতে পারে।

সাম্প্রতিক কালে জীবনবীমা কর্পোরেশনের পরিচালনা সংক্রান্ত বিতর্কের ফলে সরকারী কর্পোরেশনের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটি পুরোভাগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন তাহার রিপোর্টে বলে যে, সকল প্রকার সরকারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের কাজের জ্ঞান পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিবে। বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান, সরকারী কর্পোরেশন অথবা সরকারী কোম্পানী যে ভাবেই সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হোক না কেন, উহার অবাধ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী হইতে পারে না এবং কাজের জ্ঞান পার্লামেন্ট তথা জনগণের নিকট দায়ী থাকিবে। পার্লামেন্ট কর্তৃক বিশেষজ্ঞদিগকে লইয়া একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করিয়া উহার মাধ্যমে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষতা বিচারের জ্ঞান অভিটের ব্যবস্থাও করা যাইতে পারে।

সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাতন্ত্র্যের দাবী সম্পর্কে আলোচনা করিয়া ডাঃ পল এ্যাপ্‌লবি বলিয়াছেন, যথার্থ স্বাতন্ত্র্য দেওয়া গণতান্ত্রিক দেশে সম্ভবপর নয়। কারণ গণতান্ত্রিক দেশে যে কোন ব্যাপারে যে কোন সময়ে সরকার হস্তক্ষেপ করিতে পারে। অবশ্য শিল্পায়নের প্রাথমিক যুগে সীমাবদ্ধ আকারে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া উচিত, কারণ এই সময়ে ক্ষমতার অপব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে কিন্তু পরিশেষে যদি অবস্থার উন্নতি ঘটে তাহা হইলে এই প্রশ্নটি পুনর্বিবেচনা করিতে হইবে।

সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের অভিমত (Observations by Experts on Management and Organization of Public Enterprises) :

(ক) গোরওয়ালার সুপারিশ (১৯৫১) : ১৯৫১ সালে পরিকল্পনা কমিশন শ্রী এ. ডি. গোরওয়ালার নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির দক্ষ পরিচালনার জ্ঞান নিম্নোক্ত সুপারিশগুলি করে :

(১) সরকারী শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রে স্বয়ং শাসিত কর্তৃত্বই (autonomous authority) আদর্শ ব্যবস্থা বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিভাগীয় সংগঠন হিসাবে ইহা পরিচালিত হইতে পারে। স্বয়ংশাসিত সংস্থায় সরকারী মালিকানা, সরকারী দায়িত্বশীলতা এবং সাধারণ স্বার্থে দক্ষ পরিচালনার সংমিশ্রণ থাকিবে।

(২) বাজেট অনুমোদনের সময় স্বয়ংশাসিত সংস্থাটির কাজের সকল দিক লইয়া আলোচনা করার সুযোগ পার্লামেন্টের থাকা প্রয়োজন। বাৎসরিক রিপোর্ট এবং হিসাব আলোচনার জন্ত পার্লামেন্টে দাখিল করা প্রয়োজন। অবশ্য দৈনন্দিন পরিচালনার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের কোন হাত থাকিবে না।

(৩) ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বয়ংশাসিত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অগ্রাগ্রহ সদস্যদের নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু পরিচালনার স্বাভাবিক বজায় রাখিতে হইলে মন্ত্রীর অগ্রাগ্রহ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য জাতীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন ব্যাপারে সাধারণ নির্দেশ দিবার ক্ষমতা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর থাকিবে। নূতন মূলধন লগ্নী করিবার সময় মন্ত্রীর অনুমোদন থাকা প্রয়োজন।

(৪) উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত সরকারী সংস্থাগুলি পাবলিক কর্পোরেশনের মাধ্যমে পরিচালিত হইবে। যখন সরকারী সংগঠনটি প্রধানত উৎপাদন এবং বিক্রয়ের কাজে নিযুক্ত থাকিবে, তখন উহাকে সরকারী যৌথ মূলধনী কোম্পানী হিসাবেই গঠন করা প্রয়োজন।

(৫) কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে কোন মন্ত্রী অথবা পার্লামেন্টের সদস্য থাকিতে পারিবে না। পরিচালকমণ্ডলীকে একরূপভাবে গঠন করা প্রয়োজন যাহাতে জনস্বার্থে উহাকে পরিচালনা করা যায়।

(৬) দুই ধরনের নির্দেশমূলক বোর্ড (Board of Direction) হইতে পারে—
(ক) নীতি নির্দেশ বোর্ড (Policy Board) এবং (খ) কার্যগত বোর্ড (Functional Board)। নীতি নির্দেশ বোর্ডগুলি পাবলিক কর্পোরেশন এবং সরকারী যৌথ মূলধনী কোম্পানীর ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী হইবে।

(খ) অধ্যাপক গ্যালব্রেথের মতামত : ১৯৫৬ সালে খ্যাতনামা মার্কিন অর্থনীতিবিদ গ্যালব্রেথ সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের সমস্যা লইয়া আলোচনার জন্ত ভারতে আসিয়াছিলেন। অধ্যাপক গ্যালব্রেথ স্বয়ংশাসিত সরকারী সংস্থার পরিপূর্ণ স্বাভাবিক সমর্থন করিয়া পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে রায় দেন।

সরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কৃষ্ণ মেনন কমিটির সুপারিশ (Krishna Menon Committee's Recommendations on the Management of Public Enterprises) : পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সরকারী কর্পোরেশন এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে কিভাবে দৈনন্দিন কার্যে পার্লামেন্টের হস্তক্ষেপ বন্ধ করা যায় এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া ১৯৫২ সালে কৃষ্ণ মেনন কমিটি কতকগুলি সুদূরপ্রসারী নির্দেশ দিয়াছেন। শ্রী মোরারজী দেশাই-এর নেতৃত্বে গঠিত একটি সাবকমিটি কৃষ্ণ মেনন কমিটির সুপারিশসমূহ অতি সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়া ঘোষণা করেন যে, মেনন কমিটির সুপারিশগুলি মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে

কমিটি বলেন যে, স্থায়ী পার্লামেন্টারী কমিটি (Standing Parliamentary Committee) নামে একটি কমিটি গঠন করিতে হইবে। ইহা ত্রাট অনুসন্ধানকারী অথবা সর্বোচ্চ পরিচালন সংস্থা হইবে না। এই ক্ষেত্রে মেনন কমিটির সুপারিশের সহিত সরকারী উদ্যোগ সম্পর্কে জাতিপুঞ্জের সেমিনারের মতামত তুলনা করা যাইতে পারে। এই সেমিনারে যোগদানকারী সকল সদস্যই স্বীকার করেন যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যের উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া নীতিগত ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণ মেনন কমিটি সুপারিশ করেন যে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মণ্ডলীর চেয়ারম্যানের উপর চূড়ান্ত দায়িত্ব হস্ত থাকিবে; চেয়ারম্যান যদি মনে করেন যে, কোম্পানীর স্বার্থে ইহা করা প্রয়োজন তাহা হইলে বোর্ডের পূর্বসম্মতি ব্যতীতই বোর্ডের সিদ্ধান্ত নাকচ করিবার অথবা নিজ বিবেচনা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে। ইহার ফলে পরিচালক বোর্ডের স্বাভাবিক পরিপূর্ণরূপে নষ্ট হইয়া চেয়ারম্যানের হাতের নিছক যন্ত্রে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকিবে।

তৃতীয়ত, বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে কমিটি বাস্তবানুগ দৃষ্টি গ্রহণ করিয়াছে। কমিটি বলেন, কখন মন্ত্রী নির্দেশ জারি করিবে অথবা কখন করিবে না এ সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা সম্ভব নয় আবার বাঞ্ছনীয়ও নয়। অবশ্য যদি কোন নির্দেশ জারি করা হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী উহার পরিপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন। সকল সময়ই মন্ত্রী পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। কমিটি অবশ্য বলেন, ইহার অর্থ এই নয় যে মন্ত্রীর শিল্প প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন পরিচালনা অথবা আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে। মেনন কমিটির সুপারিশের এই অংশটি বাস্তব ক্ষেত্রে সরকারী প্রতিষ্ঠানের উপর সীমাবদ্ধ স্বাভাবিক সমর্থন করে। গোরওয়ালা সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন সীমাবদ্ধ স্বাভাবিক সমর্থন করিয়াছেন কিন্তু মেনন কমিটি মন্ত্রীদের হস্তক্ষেপ এবং পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ উভয়ের উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

প্রশ্নপত্র ও উত্তর-সংকেত

1. Estimate the advantages and disadvantages of the Managing Agency System and indicate how legislation has helped to remove some of the defects of the system.

(C. U. B. Com. 1963, B. U. B. A. 1963). [পৃষ্ঠা ২০২-২০৫]

2. Give your own evaluation of the part played by the Managing Agency System in India's economic development.

(C. U. B. Com. 1959, B. A. 1960). [পৃষ্ঠা ২০১-২০৩]

3. Discuss the future of the Managing Agency System in India in the light of the Patel Committee's Report of 1966. [পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯]

4. Give an account of the extent and causes of concentration of economic power in India as found by the Monopolies Inquiry Commission (1965). What measures are to be taken to check the growth of monopoly in India ? [পৃষ্ঠা ২০৯-২১১]

5. Write a brief note on the different forms of the management of State Enterprises in India. Which of these forms do you consider most suitable for the country ? (C. U. B. Com. '64) [পৃষ্ঠা ২১১-২১৪]

6. How far is it necessary to do away with the system of Managing Agency in this country ? Give full reasons.

(C. U. B. Com. 1955) [পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯]

7. "Although in the initial stages the Managing Agency System played an important role in the development of industries in India, it has several drawbacks." Discuss. (C. U. B. A. 1953) [পৃষ্ঠা ২০১-২০৩]

8. "The Managing Agency System has outlived its usefulness." Discuss the statement. (C. U. B. Com. 51) [পৃষ্ঠা ২০১-২০৩]

9. What type of management is most suitable for public enterprises ? What recommendations were made by Mr. A. D. Gorwala in 1951 for efficient management of Public Enterprises ? [পৃষ্ঠা ২১১-২১৪]

উনবিংশ অধ্যায়

সরকার, শিল্প এবং বৈদেশিক মূলধন

[State, Industries and Foreign Capital]

বেসরকারী উद्यোগের হাতে দেশের শিল্পোন্নতির সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলে দ্রুত এবং সুসম (balanced) শিল্পায়ণ হইতে পারে না। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব এবং প্রাথমিক মূল্যের স্বল্পতার দরুন মূল শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হইতে পারে। অল্পমত দেশে শিল্পোন্নয়নের দায়িত্ব সরকারকেই বহন করিতে হইবে। আধুনিক কালে কোন দেশেই রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা ব্যতিরেকে দ্রুত এবং সুসম শিল্পোন্নয়ন হয় নাই। জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারই শিল্পোद्यোগের ক্ষেত্রে অগ্রণী হইয়া আসিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বৃটিশ যুগে বিদেশী সরকার ভারতের শিল্পোন্নয়নের জন্য কোন সুপরিকল্পিত নীতি লইয়া অগ্রসর হন নাই। ভারতের শিল্পোন্নতি বৃটিশ স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলিয়া তাহারা উহাতে আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সরকার এক ব্যাপক এবং সুনির্দিষ্ট শিল্পনীতি গ্রহণ করিয়া দেশের শিল্পোন্নতিতে বিশেষ উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছে।

স্বাধীনতা-পূর্বযুগে ভারতের শিল্পনীতি (Industrial Policy in Pre-Independent India) : দেশের সম্পদ এবং শিল্পসম্ভাবনা সম্পর্কে জরিপ করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৬ সালে ভারতীয় শিল্প কমিশন নিযুক্ত হইলেও সরকারের কোন নির্দিষ্ট এবং সুসম্বদ্ধ শিল্পনীতি ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সরকার প্রথম শিল্প সম্প্রসারণ, গবেষণা এবং ট্রেনিং-এর গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। ১৯৪০ সালে বৈজ্ঞানিক এবং শিল্পসংক্রান্ত গবেষণার বোর্ড স্থাপিত হয়। ভারতে বৃটিশ শাসনের শেষ যুগে কেন্দ্রে পরিকল্পনা এবং পুনর্গঠন বিভাগ স্থাপিত হয়। এই সময়ে কোনরূপ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা না থাকায় দ্রুত শিল্পায়ণ সম্ভবপর হয় নাই।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতি (Industrial Policy of 1948) : স্বাধীনতা লাভের এক বৎসরের মধ্যেই ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল তারিখে জাতীয় সরকার সর্বপ্রথম এক ব্যাপক এবং সুসম্বদ্ধ শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। এই শিল্পনীতিতে সরকারী এবং বেসরকারী শিল্প উদ্যোগের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। দেশের সকল প্রকার সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং গ্রাম্য বণ্টনের উপর প্রতিষ্ঠিত এক সমাজব্যবস্থা গঠন করা এই শিল্পনীতির উদ্দেশ্য বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করা হইল :

(ক) এই শিল্পনীতির ভিত্তি হইল মিশ্র অর্থনীতি (Mixed Economy) অর্থাৎ ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের স্থান থাকিবে।

(খ) শিল্পগুলিকে প্রধানত চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় : (১) রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ একচেটিয়া এলাকাত্ত্বিত শিল্প : (Exclusive State Monopolies) অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, আণবিক শক্তি উৎপাদন এবং রেল পরিবহণ এই তিনটি শিল্পকে রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ একচেটিয়া এলাকায় রাখা হইয়াছে। (২) রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ক্ষেত্র (State Controlled Sphere) : লৌহ ও ইস্পাত, কয়লা, বিমানপোত নির্মাণ, জাহাজ নির্মাণ প্রভৃতি মূল শিল্পগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রে বেসরকারী মালিকানায় পরিচালিত পুরানো শিল্পগুলিকে ১০ বৎসরের জন্ত থাকিতে দেওয়া হইবে এবং তাহার পর জাতীয়করণের প্রশ্ন উঠিবে। এই ক্ষেত্রে নতুন শিল্প গঠনের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের উপর হস্ত থাকিবে। (৩) সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন বেসরকারী শিল্পসমূহ (Industries subject to State Control and Regulation) চিনি, বস্ত্র, সিমেন্ট, কাগজ, মেশিনটুল্‌স্, লবণ প্রভৃতি কুড়িটি শিল্পকে এই ক্ষেত্রে রাখা হইয়াছে। এইগুলি বেসরকারী উদ্যোগাধীনে পরিচালিত হইলেও ইহাদের চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণের ভার সরকারের উপর হস্ত থাকিবে। এই ক্ষেত্রের শিল্পগুলির জাতীয়করণের কোন আশঙ্কা নাই। (৪) শিল্পক্ষেত্রের বাকী অংশ (The residual industries) : এই ক্ষেত্রের শিল্পগুলি সাধারণত বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হইলেও প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার এই ক্ষেত্রেও অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

(গ) কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, জাতীয় অর্থনীতিতে ইহাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকিবে। বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবে এবং যতদূর সম্ভব সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্পগুলিকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

(ঘ) শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি সৌহার্দপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে। এই কারণে শ্রমিক যাহাতে মুনাফার অংশ পায় এবং শিল্প পরিচালনায় অধিকতর পরিমাণে অংশগ্রহণ করিতে পারে সে সম্পর্কে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। শ্রমিকদের বাসস্থানের উন্নতির জন্ত সরকার প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবেন। আবার মালিকও যাহাতে গ্রাহ্য মুনাফা লাভ করে তাহাও দেখিতে হইবে।

(ঙ) রাষ্ট্রীয় উদ্যোগাধীন শিল্পগুলি প্রধানত কর্পোরেশনের মাধ্যমেই পরিচালিত হইবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হয়। মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের অবস্থান নির্বাচন করিবার ভার রাষ্ট্রের উপর হস্ত থাকিবে।

(চ) যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত থাকিবে সাধারণভাবে তাহাদের মালিকানার অধিকাংশ ভারতীয়গণের হাতে রাখিতে হইবে। ভারতীয়েরা

যাহাতে বিশেষজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিতে এবং উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

সমালোচনা (Criticism of 1948 Policy) : ১৯৪৮ সালে যখন প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় তখন দেশের সম্মুখে কোন সুসম্বন্ধ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। সরকারের অপরিণত অর্থনৈতিক চিন্তাধারা মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ক্ষেত্রে জাতীয়করণের প্রাথমিক তুলিয়া ধরে। দশ বৎসরের পর জাতীয়করণের আশঙ্কা বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি করে, বেসরকারী ক্ষেত্রে মূলধন গঠন ব্যাহত করে, এবং মূলশিল্পের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ রোধ করে, বাধ্য হইয়া দুই বৎসরের মধ্যেই সরকারকে ঘোষণা করিতে হয় যে, আগামী ১০ বৎসর পরেও মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে জাতীয়করণ করা সম্ভব হইবে না। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির প্রধান ত্রুটি হইল যে, শিল্পনীতি এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মধ্যে কোন সমন্বয় ছিল না। যখন এই শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় তখন পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শিল্পোন্নয়নে সরকারী ভূমিকা কি হইবে এ সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ফলে ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে সাধারণভাবে শিল্পসম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র—দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প সম্প্রসারণের কোন সুস্পষ্ট, বলিষ্ঠ এবং বাস্তবনীতি উহাতে ছিল না।

যাহা হউক, এই শিল্পনীতিই ভারতে মিশ্র অর্থনীতির বনিয়াদ দৃঢ়তর করে। এই মিশ্র অর্থনীতির উপর ভিত্তি করিয়াই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনা এবং ১৯৫১ সালের শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন (First Plan and the Industries Development and Regulation Act, 1951) : প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি এবং সেচ ব্যবস্থার উপর সর্বাধিক অগ্রাধিকার দেওয়া হইলেও শিল্পকে সম্পূর্ণরূপে অবহেলা করা হয় নাই। প্রথম পরিকল্পনায় শিল্প এবং খনি খাতে ১৭২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হয় ১০০ কোটি টাকা। প্রথম পরিকল্পনাকালে সরকারের শিল্পনীতির সহিত পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিল্পক্ষেত্রের লক্ষ্যমাত্রার সমন্বয় সাধন করা হয়।

বেসরকারী শিল্পগুলির উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণের জন্ত ১৯৫১ সালে শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন পাশ করা হয়। ১৯৫২ সালের ৮ই মে তারিখ হইতে এই আইন কার্যকরী হয়। প্রথমে এই আইন ৩৭টি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। পরে ১৯৫৩ সালে এই আইন সংশোধন করিয়া ৪৫টি শিল্পের উপর উহার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রসারিত করা হয়। বর্তমানে ১৬২টি শিল্প এই আইনের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই আইনের প্রধান প্রধান ধারাগুলি বর্ণনা করা হইল।

প্রথমত, বেসরকারী শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত সরকারের হাতে প্রভূত ক্ষমতা

দেওয়া হয়। তালিকাভুক্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে উৎপাদন আশায়রূপ না হইলে অথবা অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি করিলে অথবা দ্রব্যের মানের অবনতি ঘটিলে সরকার উহার সম্পর্কে তদন্ত করিতে পারিবেন। কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ সন্তোষজনক না হইলে সরকার স্বহস্তে উহার কার্যভার গ্রহণ করিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত, সকল বর্তমান শিল্পগুলিকে সরকারের নিকট রেজিস্ট্রি করিতে হইবে এবং নূতন শিল্প স্থাপন করিতে হইলে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে। লাইসেন্স দিবার সময় সরকার শিল্পটির অবস্থান, তাহার সর্বনিম্ন আয়তন প্রভৃতি বিষয়ে সর্ত্ত আরোপ করিতে পারিবেন।

তৃতীয়ত, তালিকাভুক্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্ত একটি করিয়া উন্নয়ন পরিষদ (Development Council) এবং সামগ্রিকভাবে সকল শিল্পের জন্ত একটি কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ (Central Advisory Council for Industries) গঠন করা হইবে। নূতন শিল্পকে লাইসেন্স দিবার জন্ত একটি লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটি (Licensing Committee) গঠন করা হইবে।

শিল্প (উন্নয়ন এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুযায়ী শ্রমিক, মালিক ও ভোগকারিগণের ২৭ জন প্রতিনিধি লইয়া কেন্দ্রীয় শিল্প উপদেষ্টা পরিষদ এবং সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের জন্ত একটি করিয়া উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত লাইসেন্স দানের জন্ত লাইসেন্স প্রদানকারী কমিটিও গঠিত হইয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিভাবে ত্বরান্বিত করা যায় এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ অনেকবার আলোচনায় বসিয়াছে। আমাদের মনে হয় উপদেষ্টা পরিষদের পরিবর্তে যদি শিল্প নিয়ন্ত্রণ বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হইত তাহা হইলে বেসরকারী উদ্যোগে শিল্প সম্প্রসারণ দ্রুততর হইত।

লাইসেন্সদানের ক্ষেত্রে শুরু হইতেই স্বজন পোষণ এবং পক্ষপাতিত্ব দেখা গিয়াছে। লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে যাহাতে কোন দুর্নীতি প্রশ্রয় না পায় তাহা অনুসন্ধান করিবার জন্ত বিশেষ কমিটি বা কর্মচারী নিয়োগ করা প্রয়োজন।

উন্নয়ন পরিষদগুলির কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবেই অগ্রসর হইতেছে। গ্রাম উৎপাদন পরিষদগুলি (Village Production Councils) যেমন কৃষি পরিকল্পনার ভিত্তি সেইরূপ এই পরিষদগুলি শিল্প পরিচালনার প্রধান ভিত্তি হিসাবে কাজ করিবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি (Second Plan and the Industrial Policy of 1956) : ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল তারিখে প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু মূল শিল্পনীতির সংশোধন ঘোষণা করেন। বিগত আট বৎসরের মধ্যে দেশে নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, যেমন, সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের আদর্শ গ্রহণ করা হইয়াছে, পরিকল্পনা কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে, ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তিত হইয়াছে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দ্রুত শিল্পায়ণের উপর অগ্রাধিকার দান করা

হইয়াছে। এই সকল পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে নূতন করিয়া শিল্পনীতি নির্ধারণের প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির প্রধান প্রধান দিকগুলি ব্যাখ্যা করা হইল :

(ক) এই শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। অস্ত্রশস্ত্র, আণবিক শক্তি, লৌহ ও ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, কয়লা, খনিজ তৈল, বিমানপোত নির্মাণ, রেল ও বিমান পরিবহণ, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বটন প্রভৃতি ১৭টি শিল্প এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মোটামুটিভাবে বলা যায় ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে যে শিল্পগুলিকে প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল, নূতন শিল্প নীতিতে তাহাদের প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ভবিষ্যতে রাষ্ট্র বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিল্প সম্প্রসারণের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণ করিবে বলিয়া মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্পগুলিকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করা হয়। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতির দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে এই নূতন নীতিতে কোন জাতীয়করণের আশঙ্কা ছিল না। বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি এবং নূতন সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি একই সঙ্গে কাজ করিয়া যাইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে ১২টি শিল্প রাখা হইয়াছে উহাদের ক্ষেত্রে সরকারী ও বেসরকারী মালিকানা চলিলেও ক্রমশ রাষ্ট্রের মালিকানা প্রসারিত হইবে এবং নূতন শিল্প গঠনে রাষ্ট্রই উদ্যোগী হইবে। অ্যালুমিনিয়াম, মেশিনটুল্‌স্, এক্টিবায়োটিক, সার, কৃত্রিম রবার, রাস্তা এবং সমুদ্র পরিবহণ প্রভৃতি শিল্পগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। এই ক্ষেত্রে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠায় সরকার অগ্রণী হইলেও বেসরকারী উদ্যোগ যাহাতে সম্প্রসারিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য থাকিবে। ইহাই হইল মিশ্র অর্থনীতির ক্ষেত্র—সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকিয়া কাজ করিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলি জাতীয় উন্নয়নের জন্ত অপরিহার্য। যদি বেসরকারী উদ্যোগ উহা স্থাপনে উৎসাহ প্রকাশ না করে তাহা হইলে উহা স্থাপনের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিয়া উচিত কাজই করিয়াছেন।

বাকী শিল্পগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। এই শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন বেসরকারী উদ্যোগ এবং প্রচেষ্টার উপর হস্ত থাকিবে। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে যে শিল্পগুলিকে চতুর্থ শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল তাহাদের এই নূতন নীতিতে তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সাধারণভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সরকারী সাহায্য এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। দেশের সুসম এবং দ্রুত শিল্পায়ণের জন্ত প্রয়োজন হইলে এই ক্ষেত্রেও সরকার নূতন শিল্প গঠন করিতে পারিবেন। সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত শিল্পের

ক্ষেত্রে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকিবে। সরকার বেসরকারী উদ্যোগের অল্পকালে উপযুক্ত ফিস্কে্যাল (fiscal) নীতি গ্রহণ করিবেন এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্ত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিবেন। বেসরকারী উদ্যোগও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কর্মসূচীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিবে এবং শিল্প (উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ) আইনের ধারাগুলি মানিয়া চলিবে।

(খ) শিল্পগুলিকে তিনটি পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইলেও এই শ্রেণীবিভাগ অনমনীয় নয়। উন্নয়নের প্রয়োজনে এক শ্রেণীভুক্ত শিল্প অথবা শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নূতন শিল্পনীতি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনশীলতার নীতিকেই গ্রহণ করিয়াছে।

(গ) ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়নে ক্ষুদ্র এবং কুটির-শিল্পের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমত, এই শিল্পগুলি অতি দ্রুত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে। দ্বিতীয়ত, ইহাদের প্রসার ঘটিলে গ্রামাঞ্চলে যে অব্যবহৃত মূলধন রহিয়াছে তাহা ব্যবহারের সুযোগ আসিবে। তৃতীয়ত, এই শিল্পগুলি ধনবৈষম্য হ্রাস এবং জাতীয় আয়ের ল্যাম্বা বণ্টনে সহায়তা করিবে। সরকার কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ভূমিকারই শুধু প্রশংসা করে নাই, উহার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিবার জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র শিল্পকে বৃহৎ শিল্পের পরিপূরক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার জন্ত কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একই সঙ্গে ভারীশিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন করিয়া যুগপৎ অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ভোগ্য সামগ্রীর যোগান বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়।

(ঘ) ভারতে শিল্পোন্নয়নে যে আঞ্চলিক বৈষম্য রহিয়াছে তাহা হ্রাস করিবার জন্ত রাষ্ট্র অল্পমত অঞ্চলগুলিতে বিদ্যুৎ, পরিবহণ এবং জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবে। যে সকল অঞ্চলে ব্যাপক বেকার সমস্যা রহিয়াছে সেখানে নূতন শিল্প স্থাপন করিতে হইবে।

(ঙ) শিল্পায়ণের প্রারম্ভিক পর্দায় সাংগঠনিক অসুবিধা, দক্ষ কর্মী এবং উপযুক্ত পরিচালকের অভাব দেখা দিতে পারে। উপযুক্ত পরিচালক সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধির জন্ত ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়েও সরকার যাহাতে যথোচিত দৃষ্টি দেন ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সে সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির মূল্যায়ণ (Appraisal of 1956 Industrial Policy) : ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বচনা হইয়াছে তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে ইহার যথার্থ মূল্যায়ণ সম্ভব। অল্পমত দেশে সরকার যদি স্বয়ং স্বল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শিল্পক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া আসে তবেই দেশের অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হইতে পারে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার

জ্ঞাত নূতন বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পায়। যদি গণতান্ত্রিক কাঠামোয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে ইহা করিতে হয় তবে মিশ্র অর্থনীতিই আদর্শ ব্যবস্থা হইবে। সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটিলে বেসরকারী উদ্যোগ উৎসাহিত হইবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, সরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে লৌহ ও ইস্পাত অথবা ভারী বৈদ্যুতিক শিল্প গড়িয়া উঠিলে বেসরকারী উদ্যোগে বহু সহযোগী শিল্প (ancillary industries) গড়িয়া উঠিবে। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি মিশ্র অর্থনীতি অথবা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সরকারী উদ্যোগ এবং বেসরকারী উদ্যোগ পাশাপাশি থাকিয়া একপভাবে কাজ করিবে যাহাতে পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হয়। ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে সরকারের শিল্পনীতি এবং পরিকল্পনা-অন্তর্ভুক্ত শিল্পসূচীর মধ্যে পরিপূর্ণ সমন্বয় সাধন করা হইয়াছে।

একদিকে পূর্ণ নিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজগঠন এবং অপরদিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক গ্রায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লইয়া ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি রচিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের পরিমার্জিত শিল্পনীতি বেসরকারী উদ্যোগকে সমৃদ্ধ করিতে পারে নাই। বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলির জাতীয়করণের কোন সম্ভাবনা নাই, বরং উহাদের উন্নয়ন এবং সম্প্রসারণের জ্ঞাত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তথাপি বেসরকারী উদ্যোগ আশঙ্কাবোধ করিতেছে, ফলে বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে মূলধন গঠন ব্যাহত হইতেছে। যে কোন ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের অবাধ প্রবেশাধিকার থাকিলেও পরিকল্পিত উন্নয়নে বেসরকারী উদ্যোগের ভূমিকা স্বীকার করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহারই ফলশ্রুতি এই পরিমার্জিত শিল্পনীতি।

নূতন অবস্থা, নূতন পরিবেশ এবং নূতন নীতির সহিত ভারতীয় শিল্পপতিগণের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলা উচিত। নিয়ন্ত্রিত ধনতন্ত্রে কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলবৎ থাকার দরুন সরকারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে বেসরকারী উদ্যোগকে যে ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা মানিয়া লইয়া সরকারের সহিত তাহার সহযোগিতা করা প্রয়োজন। অপরপক্ষে সরকারও বেসরকারী উদ্যোগকে সাহায্য এবং উৎসাহিত করিলে তবেই বর্তমান শিল্পনীতি সফল হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে শিল্পনীতি (Industrial Policy during Third Plan Period) : চীনা আক্রমণ এবং পাকিস্তানী যুদ্ধের ফলে যে সঙ্কটজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহার জ্ঞাত তৃতীয় পরিকল্পনাকালে যুগপৎ প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নের প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে। মূলধনী যন্ত্রপাতি নির্মাণের ক্ষমতা অসামরিক উৎপাদনের তুলনায় প্রতিরক্ষামুখী উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর প্রয়োজনীয়। মূলধনী

দ্রব্য উৎপাদনশিল্প গড়িয়া তুলিতে পারিলে বিদ্যুৎ, পরিবহণ, এবং খনিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশ স্বয়ংনির্ভরশীল হইতে পারিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতি অনুসারে শিল্পসম্প্রসারণের গতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বারা তৃতীয় পরিকল্পনায়ও সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগকে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, নাইট্রোজেন সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, চতুর্থ পরিকল্পনায় বেসরকারী উদ্যোগ এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া সরকারী উদ্যোগের পরিপূরক এবং সহায়ক হইবে। ভবিষ্যতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগের ক্ষেত্রে সেই সকল প্রকল্পগুলির উপর জোর দেওয়া হইবে যাহা রপ্তানি বৃদ্ধি অথবা আমদানি হ্রাসে সহায়তা করিবে।

সরকারের প্রথম নীতি (Government's First Policy) : অল্পমত দেশে প্রাথমিক অবস্থায় উপযুক্ত সংরক্ষণ অথবা শুদ্ধনীতি গ্রহণ করিয়া শিল্পের বিকাশ সাধন করা যায়।

ফিসকাল নীতির উদ্দেশ্য হইবে আমদানি শুদ্ধ ধার্য করিয়া সমজাতীয় দেশীয় দ্রব্যের তুলনায় বৈদেশিক দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি করা অথবা দেশীয় শিল্পকে সাহায্যদান করিয়া তাহার প্রতিযোগী ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

পুরাতন বিশ্লেষণাত্মক সংরক্ষণ নীতি (Old Policy of Discriminating Protection) : ব্রিটিশ শাসনকালে প্রথম ফিসকাল কমিশন (১৯২১-২৩) নিযুক্ত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় শিল্পোন্নয়নের জন্ম উপযুক্ত নীতি নির্ধারণ করা। এই কমিশন শুধুমাত্র যোগ্য শিল্পগুলির ক্ষেত্রেই সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছিল। নিম্নলিখিত তিনটি সর্ত পূরণ করিলে তবেই শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়া যাইবে : (ক) শিল্পটির স্বাভাবিক সুবিধা থাকা চাই, যেমন, পর্যাপ্ত কাঁচামালের যোগান, স্থূলত বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত শ্রমিক সরবরাহ এবং বিস্তৃত আভ্যন্তরীণ বাজার, (খ) শিল্পটি এরূপ হওয়া চাই যে, দেশের প্রয়োজনে উহার দ্রুত উন্নয়ন কাম্য কিন্তু সংরক্ষণ ব্যতীত উহা সম্ভব নয় এবং (গ) শিল্পটি এরূপ হওয়া চাই যাহা পরিশেষে সংরক্ষণ ব্যতিরেকে বিদেশী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে পারিবে। নবগঠিত কোন শিল্পই এই তিনটি কঠোর সর্ত পূরণ করিতে পারে নাই।

এইরূপ তিনটি কঠোর সর্ত আরোপ না করিয়া, সাময়িক ট্যারিফ বোর্ড (Ad-hoc Tariff Boards) স্থাপন করিয়া বিশেষ বিশেষ শিল্পকে সংরক্ষণ দিবার ক্ষমতা উহার উপর গুপ্ত করা উচিত ছিল। প্রথম ফিসকাল কমিশন বিশেষ শিল্পের জন্ম কোন বিশেষ নীতি গ্রহণ না করিয়া সাধারণভাবে প্রযোজ্য নীতি গ্রহণ করায় কোন শিল্পই লাভবান হয় নাই। দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করিয়া এই নীতি গ্রহণ করা হয় নাই। মাত্র কতকগুলি নির্বাচিত শিল্পকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে

রক্ষা করার সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ হইতে এই নীতি রচিত হইয়াছিল। লৌহ ও ইস্পাত, তুলা, চিনি, কাগজ এবং দিয়াশলাই প্রভৃতি কয়েকটি শিল্প সংরক্ষণের সুবিধা পায়। কিন্তু বহু যোগ্য মূলশিল্প সংরক্ষণের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। এই বিভেদমূলক ফিসক্যাল নীতির দরুন জাতীয় শিল্পের সুখম উন্নয়ন ব্যাহত হয়। ইহা প্রধানত কতকগুলি ভোগ্য পণ্যশিল্পকেই সুবিধা দেয় কিন্তু মূলধনী শিল্পের উন্নয়ন পরিপূর্ণভাবে উপেক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় ফিসক্যাল কমিশনের সুপারিশ এবং নূতন ফিসক্যাল নীতি, ১৯৪৯ (The New Fiscal Policy, 1949) : স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার উপলব্ধি করিলেন যে, পরিকল্পিত পদ্ধতিতে শিল্পোন্নয়ন আরম্ভ করিবার পূর্বে নূতন করিয়া ফিসক্যাল নীতি রচনা করা প্রয়োজন, কারণ পূর্বতন বিভেদমূলক সংরক্ষণ নীতি দ্রুত এবং সুখম শিল্পোন্নয়নের উপযোগী ছিল না। ১৯৪৯ সালে শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর সভাপতিত্বে নূতন ফিসক্যাল কমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৫০ সালে এই কমিটি রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিশন দেশের সুখম শিল্পোন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভারতীয় ফিসক্যাল নীতি পুনর্গঠন করে। নূতন ফিসক্যাল নীতির বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা হইল :

(ক) এই কমিশন সংরক্ষণের ব্যাপক ধারণা গ্রহণ করিয়াছে। পূর্বকার প্রতিরক্ষা-মূলক সংরক্ষণের (defensive protection) পরিবর্তে ইহা উন্নয়নমূলক সংরক্ষণের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কৃষ্ণমাচারী কমিশন দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল এবং ভারী শিল্পের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া এরূপ এক ফিসক্যাল নীতি নির্ধারণ করে যাহা পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়। নূতন ফিসক্যাল কমিশন সংরক্ষণ সম্পর্কে যে ধারণা গ্রহণ করিয়াছে তাহা প্রথম ফিসক্যাল নীতির ত্রুটি দূর করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য আনিবে।

(খ) প্রথম কমিশনের সংরক্ষণের তিনটি সর্বের সমালোচনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, জাতীয় স্বার্থই সংরক্ষণ দানের একমাত্র মানদণ্ড হইবে। নিম্নলিখিত সাধারণ নীতি-সমূহ শুদ্ধ কমিশন (Tariff Commission) অনুসরণ করিবে বলিয়া নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(১) যদি কোন শিল্পে স্থলভ শ্রমিক এবং আভ্যন্তরীণ বিস্তৃত বাজার পাইবার সুবিধা থাকে তাহা হইলে দেশে পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব থাকিলেও সেই শিল্পকে সংরক্ষণ দিতে হইবে।

(২) সংরক্ষণ দিবার সময় আভ্যন্তরীণ বাজার ব্যতীত সম্ভাব্য বৈদেশিক চাহিদার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

(৩) সংরক্ষিত শিল্প আভ্যন্তরীণ সামগ্রিক চাহিদা না-ও মিটাইতে পারে।

(৪) যেখানে অধিক মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন এরূপ নূতন শিল্পের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দিতে হইবে।

(৫) যে সকল শিল্প সংরক্ষিত শিল্পের দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাদেরও সংরক্ষণ দেওয়া যাইবে।

(৬) সংরক্ষিত শিল্পের উপর কোনরূপ উৎপাদন শুল্ক (excise duty) বসানো চলিবে না।

(৭) প্রয়োজন হইলে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে কুবিজ দ্রব্যকেও সংরক্ষণ দেওয়া যাইবে। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে সংরক্ষণ একসঙ্গে পাঁচ বৎসরের বেশি সময়ের জন্ত দেওয়া যাইবে না।

এই সাধারণ নীতিসমূহ বৃটিশ যুগের বিভেদমূলক সংরক্ষণের ক্রটিগুলি সংশোধনের চেষ্টা করিয়াছে। জাতীয় স্বার্থ এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি শিল্পের সংরক্ষণ পাইবার দাবী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত ক্ষমতা ট্যারিফ বোর্ডের থাকিবে। ট্যারিফ বোর্ড একটি স্থায়ী সংস্থা হিসাবে কাজ করিবে।

(গ) কৃষ্ণমাচারী কমিশন যখন নিযুক্ত হইয়াছিল তখন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা শুরু না হইলেও এই কমিশনের সুপারিশগুলি পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হইয়াছিল। পরিকল্পিত বিভাগের শিল্পগুলিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল :

(১) প্রতিরক্ষা শিল্পসমূহকে প্রথম শ্রেণীতে রাখা হইয়াছিল, নবলব্ধ স্বাধীনতা রক্ষার জন্ত অপরিহার্য বলিয়া, ব্যয় যাহাই হোক না কেন, সরকার এই শিল্পগুলিকে সংরক্ষণ দিবে।

(২) মূল এবং ভারী-শিল্পগুলিকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে রাখা হয় ; ইহাদের সংরক্ষণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ট্যারিফ কমিশনের উপর হস্ত করা হয়। ইহাদের সংরক্ষণ দানের ব্যাপারে ট্যারিফ কমিশনকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। সংরক্ষণ-দানের ব্যাপারে কোনরূপ কঠোর নীতি অনুসরণ করিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) অপরাপর শিল্পগুলিকে তৃতীয় শ্রেণীতে রাখা হইয়াছে। অর্থনৈতিক সুবিধা, সম্ভাব্য সংরক্ষণ ব্যয় এবং প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া ট্যারিফ কমিশন সংরক্ষণ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

শিল্পের এই তিনটি বিভাগ ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে শিল্প-পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় যে, সংরক্ষণ সত্ত্বেও বেসরকারী উদ্যোগে অবস্থিত মূল এবং ভারী-শিল্পগুলির আশাহরূপ উন্নয়ন হইতেছে না। এইজন্ত ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে কতকগুলি মূল শিল্পকে প্রতিরক্ষামূলক শিল্পশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে সরকারী পরিচালনাধীনে আনা হয়। অপর দুইটি শ্রেণীতে যে শিল্পগুলিকে রাখা হইয়াছে, জাতীয় স্বার্থের খাতিরে প্রয়োজন হইলে তাহাদের সংরক্ষণ দেওয়া হইবে এবং আরোপিত বিধিনিষেধ মানিয়া চলিলে সরকার উহাদের সকল সম্ভাব্য সাহায্য দিবে।

(ঘ) গুজরাজস্ব হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা একটি উন্নয়ন ফাণ্ড (Development Fund) গঠনের সুপারিশ কমিশন করিয়াছে। এই ফাণ্ড হইতে যোগ্য শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করা হইবে। আমাদের মনে হয়, সাধারণভাবে একটি ফাণ্ড গঠনের পরিবর্তে যদি প্রত্যেক শিল্পের জন্য একটি করিয়া পৃথক ফাণ্ড গঠন করা হয় এবং সেই অর্থ ব্যয়ের ভার সংশ্লিষ্ট শিল্পের উন্নয়ন পরিষদের উপর দেওয়া হয় তবে এই পরিকল্পনা অধিকতর কার্যকরী হইবে।

(ঙ) নূতন ফিসক্যাল কমিশন একটি স্থায়ী ট্যারিফ কমিশন গঠনের সুপারিশ করিয়াছে। প্রথম ফিসক্যাল কমিশনের বিভেদমূলক নীতি কার্যকর করিবার জন্ত অস্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড ছিল। কোন বিশেষ শিল্পের সংরক্ষণের দাবী লইয়া বিবেচনা করিবার উদ্দেশ্যে অস্থায়ী বোর্ড গঠিত হইত এবং রায় দিবার পর বোর্ডকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইত। ফলে সংরক্ষিত শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছুই দেখা হইত না। এই ক্রটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণমাচারী কমিশন একটি স্থায়ী ট্যারিফ বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেয়। এই বোর্ড শুধুমাত্র সংরক্ষণের প্রশ্ন লইয়াই বিবেচনা করিবে না, সংরক্ষিত শিল্পসমূহের কার্যপদ্ধতি লক্ষ্য করিবে এবং গুরু হারে হ্রাস-বৃদ্ধির সুপারিশ করিবে।

স্থায়ী কর্মীবৃন্দ লইয়া ট্যারিফ কমিশন গঠিত হইবে। ইহাদের মধ্যে অর্থনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞের দলও থাকিবেন। ট্যারিফ কমিশনের সংরক্ষণ সংক্রান্ত সুপারিশ যাহাতে দ্রুত কার্যকর হয় সে সম্পর্কে সরকারকে তৎপর থাকিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সাধারণত দুই মাসের মধ্যেই সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। কমিশন দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছে, কারণ অতীতে অযথা বিলম্ব নবগঠিত শিল্পগুলির উন্নয়নে বিশেষ বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সরকার কৃষ্ণমাচারী কমিশনের প্রায় সকল সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন ফিসক্যাল নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৫২ সালে একটি স্থায়ী ট্যারিফ কমিশন গঠন করিয়াছিলেন। কমিশনের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল এবং ইহার বিগত পনেরো বৎসরের কার্যাবলীর পর্যালোচনা হইতে দেখা যায় যে, সাফল্যের সহিত ইহা তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছে। ট্যারিফ কমিশনের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়।

যুদ্ধোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ১৯৫২ সালের পর হইতে সংরক্ষণ পাইয়াছে এরূপ কতকগুলি শিল্প সংরক্ষণের আওতায় উন্নতি লাভ করিয়াছে। ৫ হইতে ১০ বৎসর পর সংরক্ষণ তুলিয়া লওয়া হয়। যে সকল শিল্প এখনো সংরক্ষণের সুবিধা পাইতেছে তাহার মধ্যে রহিয়াছে এ্যালুমিনিয়াম, বস্ত্রবয়ন, যন্ত্রপাতি, রং, সিল্ক প্রভৃতি।

পূর্বকার অস্থায়ী ট্যারিফ বোর্ডের তুলনায় বর্তমান ট্যারিফ কমিশনের কাজ বিশেষ উৎসাহজনক। বিগত পনেরো বৎসরে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা হইয়াছে

আশা করা যায় তাহার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় ট্যারিফ কমিশন দেশের ফিসক্যাল নীতিকে একপভাবে পরিচালনা করিবে যাহাতে ইহা দেশের দ্রুত এবং সুখম শিল্পায়নের সহায়ক হয়।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধনের ভূমিকা (Role of Foreign Capital during Development Planning in India) : বৃটিশ শাসনকালে বৈদেশিক মূলধন খনি, বাগিচাশিল্প, রেলপথ, জাহাজ চলাচল প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য বৈদেশিক মূলধন কখনো দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজে বিনিয়োগিত হয় নাই, ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারসাম্য বজায় থাকে নাই। স্বাধীনতা লাভের পর উপলব্ধি করা গেল যে, দেশের দ্রুত উন্নয়নের জন্ত প্রয়োজনীয় মূলধন দেশে নাই। সুতরাং দেশের অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়কগণ মনে করিলেন যে, যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন পাওয়া যায় তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ত্যাগস্বীকার করিয়া প্রয়োজনীয় উন্নয়ন সাধন করা যাইবে। কিন্তু বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী মনোভাব হইল যে, কোনরূপ রাজনৈতিক চাপ না থাকিলে তবেই উহা গ্রহণ করা হইবে এবং উহা একপভাবে ব্যবহার করা যাইবে যাহাতে উহা দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের পরিপন্থী না হয়। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রাথমিক পর্যায়ে সঠিক বৈদেশিক বিনিয়োগ হইলে অল্পমত দেশ যথেষ্ট লাভবান হইবে, কারণ ইহা দেশীয় উদ্যোগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া দক্ষতার মান উন্নত করিবে। মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞের আকারে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গেলে উহা অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গতিবেগের সঞ্চার করিবে। ভারতে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের স্বল্পতার দরুন বৈদেশিক মূলধনকে দেশীয় মূলধনের পরিপূরক হিসাবে ব্যবহার গেলে দেশের উন্নয়ন দ্রুততর হইবে। ভারত সরকারের বৈদেশিক মূলধন সংক্রান্ত নীতি দুই পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারার ফলশ্রুতি। একদিকে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের দরুন বৈদেশিক মূলধনের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে আর অপরদিকে দেশের নবলব্ধ স্বাধীনতা যাহাতে বিপর্যস্ত না হয় তাহার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। বৈদেশিক মূলধনের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করার সঙ্গে এই আশঙ্কাও রহিয়াছে যে, দেশ হইতে বৈদেশিক মূলধন অন্তর্হিত হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং বৈদেশিক মূলধনের ক্ষেত্রে সরকারের একরূপ এক নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যাহা মূলধন প্রদানকারী অথবা মূলধন গ্রহণকারী কোন দেশের স্বার্থেরই পরিপন্থী না হয়।

ভারতে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃতি (Pattern of Foreign Investment in India) : ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দীর্ঘমেয়াদী বৈদেশিক বিনিয়োগ পূর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়াছে। হাওয়ার্ডের হিসাবানুযায়ী ১৯১০ সালে মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের শতকরা ৩৫ ভাগ বেসরকারী খাতে বিনিয়োগিত হইয়াছিল; ১৯৫৫ সালে ঐ অনুপাত বৃদ্ধি পাইয়া ৭২ শতাংশ হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের

হিসাব অনুযায়ী ১৯৪৮ সালে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ২৫৫০৮ কোটি টাকা, ১৯৬২ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৭৩৫৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অর্থাৎ চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে বিনিয়োগ ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। মোট ৭৩৫৫ কোটি টাকা বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৫৬৭৬ কোটি টাকা এবং বাকী ১৬৮ কোটি টাকা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ। যে মূলধনের সহিত বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ জড়িত থাকে তাহাকে প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বলে আর বিদেশের বাজারে ভারতীয় বণ্ড বিক্রয় করিয়া যে মূলধন সংগ্রহ করা হয় তাহাকে পোর্টফোলিও মূলধন বলে। ১৯৪৮ সাল হইতে ১৯৫৩ সালের মধ্যে ১৩২ কোটি টাকা বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার মধ্যে ১১২ কোটি টাকা ছিল প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ। এই ১১২ কোটি টাকার মধ্যে ৭০ কোটি টাকা বিদেশী প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলিতে এবং বাকী ৪২ কোটি টাকা ভারতে রেজিস্ট্রিকৃত কোম্পানীগুলিতে বিনিয়োগ করা হয়।

১৯৫৭ সালে বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৬৮ কোটি টাকা ; ১৯৫৬ সালে উহার পরিমাণ ছিল ২৪৭ কোটি টাকা। বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ দুইট কারণে হ্রাস পায় : (ক) ১৯৫৬ সালে জীবনবীমা এবং স্বর্ণখনি জাতীয়করণের দরুন বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্ষতিপূরণ দান এবং (খ) মুনাফা হ্রাস। ১৯৬০ সালে বেসরকারী খাতে নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ ৭৮৪ কোটিতে আসিয়া রেকর্ড স্থাপন করে। ১৯৫৯ সালের তুলনায় ইহা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়।

১৯৬২ সালে বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহ কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইয়া ৩৮২ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৬৩-৬৪ সালে উহা সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ৬৭২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। বৈদেশিক বিনিয়োগের এই উর্ধ্বগতি বজায় থাকে এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭৭ কোটি টাকায়।

দেশগত শ্রেণীবিভাগ করিলে দেখা যায় যে, ১৯৬০ সালে যুক্তরাজ্যই সর্বাপেক্ষা অধিক মূলধন সরবরাহ করিয়াছে। মোট ৭৮৪ কোটি টাকা বৈদেশিক মূলধনের মধ্যে যুক্তরাজ্য ৪৪৫ কোটি টাকা অর্থাৎ অর্ধেকের বেশি সরবরাহ করিয়াছে। ইহার প্রায় সমস্তটাই বেসরকারী মূলধন, সরকারী খাতে মূলধনের পরিমাণ দুই কোটি টাকারও কম ছিল। ১৯৬০ সালে যুক্তরাজ্য হইতে যে বেসরকারী মূলধন পাওয়া যায় তাহার তিন-চতুর্থাংশ বা ৩০ কোটি টাকা পেট্রোলিয়ম শিল্পে বিনিয়োজিত হয়। দ্রব্য প্রস্তুতকারক শিল্পে ১০৫ কোটি টাকা বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োজিত হয়। দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৬০ সালে ইহা ভারতে ২৮৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে।

১৯৬২ সালেও যুক্তরাজ্য ভারতে মূলধন যোগানদার হিসাবে প্রথম স্থান অধিকার করে। ৩৮ কোটি টাকা মোট বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে অর্ধেক পাওয়া যায় যুক্তরাজ্য হইতে। ১৯৫৫ সালের শেষে ভারতে ব্রিটিশ মূলধনের পরিমাণ ছিল ৩৬৬ কোটি টাকা,

১৯৬১ সালের শেষে উহা ৪৪৬ কোটি টাকায় পৌঁছায় এবং ১৯৬২ সালে উহা ৪৮২.৮ কোটি টাকা হয়। ১৯৬২ সালে প্রধানত দ্রব্য প্রস্তুতকারক শিল্পেই ব্রিটিশ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। পরিমাণের দিক হইতে মার্কিন বিনিয়োগ ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৬২ সালের শেষে উহা ১০৮.২ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ভারতে সর্বাধিক মূলধন সরবরাহ করে। ১৯৬৩-৬৪ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে যথাক্রমে ৬৮ কোটি এবং ৭৮ কোটি টাকা নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ যথাক্রমে ৬১ শতাংশ এবং ৫১ শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে আসে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মূলধন প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায়, ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে উহার বেসরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া ১৫৫ কোটি টাকা হয় এবং ১৯৬৫ সালের মার্চে আরও বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৩ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। যুক্তরাজ্য হইতে ১৯৬৩-৬৪ সালে ভারতে নীট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ১৪ কোটি টাকা, ১৯৬৪-৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৬ কোটি টাকা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূলধন প্রধানত, সরকারী স্বত্রে প্রাপ্ত কিন্তু যুক্তরাজ্য হইতে প্রাপ্ত মূলধন প্রধানত, বেসরকারী উৎস হইতে আসিয়াছে।

বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কে সরকারী নীতি (Government's Policy towards Foreign Capital) : ১৯৪৮ সালের শিল্পনীতিতে বৈদেশিক মূলধনের উপর কিছু পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ইহা ছাড়া জাতীয়করণের আশঙ্কাও বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহকে ব্যাহত করে।

বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর আশঙ্কা দূর করিয়া ভারতে বৈদেশিক মূলধন প্রবাহ বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। এই বিবৃতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীকে তিন ধরনের আশ্বাস দান করা হয় : প্রথমত, ভারত সরকারের শিল্পনীতিতে দেশীয় প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হয় নাই। দ্বিতীয়ত, বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা বিবেচনা করিয়া মুনাফা পাঠাইবার এবং মূলধন প্রেরণের যুক্তিসঙ্গত সুবিধা দেওয়া হইবে। তৃতীয়ত, বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্তমানে জাতীয়করণ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। আর যদি জাতীয়করণ করা হয় তাহা হইলে গ্রায্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই বিবৃতির ফলে পুনরায় ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। অবশ্য আমাদের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে মূলধন প্রবাহ ব্যাহত হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাকল্যের পর সরকারী, বেসরকারী এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা হইতে ভারত বৈদেশিক মূলধন পাইয়াছে। পরিকল্পনার প্রথম যুগে ভারত সরকার বৈদেশিক উৎস হইতে যতখানি সম্ভব “প্রাথমিক মূলধন” (equity capital) সংগ্রহের

চেষ্টা করে। এই মূলধনের সহিত কোন রাজনৈতিক চাপ যুক্ত ছিল না এবং উহা ভারতীয় মূলধনের সহিত একত্রে বিনিয়োগিত হইয়া শিল্পোন্নতিকে ত্বরান্বিত করে। ভন্টাস, সেন-র্যালো, বিড়লা-নফিল্ড, টাটা-আই. সি. আই. প্রভৃতি উদ্যোগে বৈদেশিক মূলধন ভারতীয় মূলধনের পরিপূরক হইয়াছে।

বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট এবং বৈদেশিক মূলধন (Foreign Exchange Shortage and Attitude towards Foreign Capital) : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট বৈদেশিক মূলধনের প্রতি সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন ঘটায়। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা জুলাই প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, অতীতে আমরা বৈদেশিক মূলধনকে স্বাগত জানাইয়াছি, ভবিষ্যতেও জানাইব। ইহার পর সরকার পক্ষ হইতে পুনঃপুনঃ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, ভারতের অবস্থা বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর স্বার্থের অনুরূপ এবং অর্থনীতি সম্প্রসারণশীল বলিয়া এখানে বিনিয়োগ হইতে মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বিশেষ উজ্জ্বল। ১৯৬৫ সালের এপ্রিলের পর হইতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীকে তাহার শুধুমাত্র ভারতে উপার্জিত আয়ের উপর কর দিতে হয়। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর দেয় করের পরিমাণ কোন ক্ষেত্রেই ৭০ শতাংশের অধিক হইবে না। পরিশেষে, ১৯৬৫ সালের এপ্রিলের পর হইতে যদি কোন বৈদেশিক শিল্পপতি ভারতে কারখানা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করে তাহা হইলে স্বয়ং “অভিপ্রায় পত্র” (letter of intent) পাইবে। পূর্বে বৈদেশিক শিল্পপতি ভারতীয় উদ্যোক্তার সহিত সহযোগিতা করিতে পারিত এবং শুধু ভারতীয় উদ্যোক্তাই অভিপ্রায় পত্র পাইতে পারিত।

বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের সময় যদি বৈদেশিক বিনিয়োগ রপ্তানি শিল্পে অথবা আমদানি শিল্পে বিনিয়োগিত হয় তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হয়। বর্তমানে অধিকাংশ বৈদেশিক বিনিয়োগ আমদানি কমাইবার কাজে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা অবশ্যই সুবিধাজনক। কিন্তু সরকারের নিকট বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগ নির্বাচনের প্রাথমিক মানদণ্ড হইবে বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগের ফলে দেশের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ। তৃতীয় পরিকল্পনার রচয়িতাগণ অনুমান করেন যে, পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে বেসরকারী বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৩০০ কোটি টাকার মত হইবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ইহারই অর্ধেক হইয়াছিল।

বেসরকারী মূলধন ব্যতীত বৈদেশিক সাহায্য সরকারী অনুদান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হইতে ঋণ হিসাবেও পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালের আগষ্ট পর্যন্ত মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ছিল ১৪৮৪ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৫৭.৭ শতাংশ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে এবং ৩১.৫ কোটি টাকা বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণবান্ধ পাওয়া যায় ; ইহার এক-তৃতীয়াংশ বেসরকারী উদ্যোগকে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের আগষ্টের শেষে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১০.০২ মিলিয়ন ডলার।

তৃতীয় পরিকল্পনার ১৯৬৩ সালের মার্চের শেষে মোট অনুমিত বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৬৫ কোটি টাকায়। তৃতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ৫৭৪ কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার খসড়া রচনার সময় ৩২০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের আশা করা হইয়াছিল। কিন্তু পাক-ভারত সংঘর্ষের দরুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সেই কারণে তৃতীয় পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। ১৯৬৬-৬৭ সালের সঙ্কটকালীন বার্ষিক পরিকল্পনায় ৩৫১ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ ধরা হইয়াছে।

যেভাবে নূতন শিল্পনীতি, নূতন ফিসক্যাল নীতি এবং বৈদেশিক মূলধন বিনিয়োগ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাতে দেশী ও বিদেশী প্রত্যেক বেসরকারী বিনিয়োগকারীর উচিত এই সকল সুযোগের সদ্যবহার করিয়া গণতান্ত্রিক পরিবেশে “অংশীদারী ধনতন্ত্রের” বনিয়াদকে দৃঢ়তর করা।

প্রশ্নপত্র ও উত্তরসংকেত

1. Elucidate the main features of the Industrial Policy of the Government of India as enunciated from time to time.

(C.U. B. Com. '59) [পৃষ্ঠা ২১৬-২১]

2. Examine the main features of the Government of India's Industrial Policy since independence. Indicate in this connection the respective roles which have been assigned to the public and private sector.

(C.U. B.A. '66) [পৃষ্ঠা ২১৬-২১]

3. Write a short note on the Industrial Policy of the Government of India.

(C.U. B.Com. '57) [পৃষ্ঠা ২১৬-২১]

4. Discuss the principles of protectionist policy adopted in India after 1949-50.

(C.U. B. A. '57) [পৃষ্ঠা ২২৩-২৭]

5. Critically discuss the main provisions of the Industries (Development and Regulation) Act of 1951.

(C.U. B.Com. '56) [পৃষ্ঠা ২১৮-১৯]

6. Explain the scheme of protection as formulated by the Indian Fiscal Commission of 1949-50. (C.U. B.A. '55) [পৃষ্ঠা ২২৩-২৭]

7. "The Indian Fiscal Commission of 1949-50 approached their task from a new angle of vision and laid down new principles of protection." Elucidate the statement.

(C.U. B.A. '53) [পৃষ্ঠা ২২৩-২৭]

8. Explain the new scheme of protection of Indian industries as formulated by the Fiscal Commission of 1949-50.

(C.U. B.Com. '51; B.A. '51) [পৃষ্ঠা ২২৩-২৭]

9. Give a critical estimate of the Government of India's policy regarding foreign capital in India.

(C.U. B.A. Hons. '58) [পৃষ্ঠা ২২২-৩১]

10. Discuss fully the economic effects of the employment of foreign capital in India.

(C.U. B.Com. '54) [পৃষ্ঠা ২২৭-২৯]

বিংশ অধ্যায়

শিল্প-মূলধন

(Industrial Finance)

দ্রুত শিল্পায়নের জন্ত প্রয়োজন মূলধনের পর্যাপ্ত যোগান। ভারতীয় যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্কগুলি শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী মূলধন যোগান দেয় নাই। শিল্পে দীর্ঘকালীন মূলধন যোগান দেয় বিনিয়োগ ট্রাস্ট (Investment Trust) এবং ইস্যু হাউস (Issue House) কিন্তু ভারতে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান বিরল। স্বাধীনতা লাভের পর সরকার শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে কতকগুলি বিশেষ ঋণদান সংস্থা গঠন করেন। শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন ব্যতীত ভারতে আরও কতকগুলি বিনিয়োগ কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। এই সকল ঋণদান সংস্থাগুলিকে একত্রে “উন্নয়ন ব্যাঙ্ক” (development banks) বলা হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation) গঠন করেন। ত্রিশ বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি এই ধরনের একটি সংস্থা গঠনের সুপারিশ করিয়াছিলেন। শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন এবং সাম্প্রতিককালে প্রতিষ্ঠিত অগ্রাগত উন্নয়ন ব্যাঙ্ক দেশের শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করিতেছে এবং আভ্যন্তরীণ মূলধন একত্রীকরণ করিয়া পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নকে সহায়তা করিতেছে।

ভারতের শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন (Industrial Finance Corporation of India) : গঠন (Organization) : পার্লামেন্টের এক আইনানুসারে ১৯৪৮ সালের ১লা জুলাই ভারতীয় শিল্প অর্থ কর্পোরেশন গঠিত হয়। শিল্প অর্থ কর্পোরেশন একটি অংশীদারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠিত হয়—সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং কতকগুলি বিশেষ প্রতিষ্ঠানই ইহার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনের শেয়ারের জামিন থাকেন।

কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ১০ কোটি টাকা। ইহা ২০,০০০ শেয়ারে বিভক্ত এবং প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ৫০০ টাকা। ইহার মধ্যে ৭.৫ কোটি টাকার ১৫,০০০ শেয়ার কেন্দ্রীয় সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, তপশীল ভুক্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী এবং অগ্রাগত প্রতিষ্ঠানগত বিনিয়োগকারী ক্রয় করিয়াছে। আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত কর্পোরেশন তাহার আদায়ীকৃত মূলধনের পাঁচগুণ পর্যন্ত বণ্ড বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে পারিবে। ইহা জনসাধারণের নিকট হইতে পাঁচবৎসর পরে পরিশোধযোগ্য আমানত

লইতে পারিবে। কর্পোরেশনের বণ্ডের মূল্য ফেরত এবং সুদ প্রদান সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার জামিন থাকেন। কর্পোরেশনের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জনসাধারণের নিকট ৪½% হার সুদে ৬ কোটি টাকার বারো বৎসর মেয়াদী বণ্ড বিক্রয় করা হয়। ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আরো ২ কোটি টাকার বণ্ড বিক্রয় করা হয়। ইহার উপর সুদের হার ছিল ৫½% ; ১৯৬৬ সালের মার্চের শেষে মোট ৩০.৫ কোটি টাকার বণ্ড বিক্রয় করা হয়।

কর্পোরেশন ১২ জন ডিরেক্টর কর্তৃক পরিচালিত হয়। ইহার মধ্যে তিনজন কেন্দ্রীয় সরকার ও দুইজন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা মনোনীত হন, ছয় জন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতির দ্বারা নির্বাচিত হন এবং একজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কার্যকরী সমিতির সভাপতি—এই সমিতিতে আরো চারজন ডাইরেক্টর আছেন। সম্প্রতি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পুরাসময়ের জন্তে নিযুক্ত হইয়াছেন। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডাঃ সরোজকুমার বসু বলিয়াছিলেন যে, কর্পোরেশনের একটি অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগ থাকা প্রয়োজন। কর্পোরেশন এই মত গ্রহণ করিয়াছে এবং অর্থনৈতিক গবেষণা বিভাগ খুলিবার একটি প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছে।

কার্যাবলী (Functions) : কর্পোরেশন নিম্নলিখিত তিন ধরনের কাজগুলি করিবে :

(১) শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বাজার হইতে যে ঋণ সংগ্রহ করে তাহা ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হইলে কর্পোরেশন সেই ঋণ সম্পর্কে গ্যারাণ্টি দিবে।

(২) কর্পোরেশন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে ঋণ ও দান দিবে অথবা উহার ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে। এই ঋণ ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান শেষার বা ডিবেঞ্চার যদি বাজারে ছাড়িতে চায় তাহা হইলে কর্পোরেশন উহা আগুয়ারাইট (Underwrite) করিতে পারিবে। অবশ্য ইহার দরুন যে শেষার ও ডিবেঞ্চার পাওয়া যাইবে তাহা ৭ বৎসরের মধ্যে বিক্রয় করিতে হইবে।

কর্পোরেশন পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকেই শুধু দীর্ঘকালীন ঋণদান করিতে পারে। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী, অংশীদারী কারবার এবং রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, শিল্পপ্রতিষ্ঠান এই কর্পোরেশনের এলাকার বাইরে। যে সকল বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে কর্পোরেশন তাহাদের আর্থিক প্রয়োজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিবে। ১৯৪৮ সালের আইনানুসারে কর্পোরেশন কোন শিল্পকে প্রাথমিক মূলধন (equity capital) সরবরাহ করিবে না। কর্পোরেশনের এই নীতি ডাঃ সরোজকুমার বসু তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়াছেন।

১৯৪৮ সালের আইন অনুযায়ী কর্পোরেশন সরাসরি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেষার

অথবা ডিবেঞ্চার কিনিতে পারিত না। অবশ্য ইহা কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার আগুররাইট করিতে পারে এবং সরকারের অনুমতি ব্যতীত সাত বৎসর এবং সরকারের অনুমতি লইয়া সাত বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত উহা রাখিতে পারিবে। কর্পোরেশন মূলধনের একাংশ সরবরাহ করিবে এই নিশ্চয়তা থাকিলে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষে খোলা বাজার হইতে অধিক মূলধন সংগ্রহ করা সহজ হইবে, ফলে কর্পোরেশনের নিকট হইতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের ঋণগ্রহণের প্রয়োজন হ্রাস পাইবে। ১৯৬০ সালে শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন (সংশোধন) আইনানুসারে সরাসরি কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের শেয়ার কিনিবার ক্ষমতা কর্পোরেশন পাইয়াছে।

ইহার পূর্বে ১৯৫৩ এবং ১৯৫৫ সালে শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন আইনের সংশোধন করা হয়। ১৯৫৩ সালের সংশোধন অনুযায়ী কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে দেয় সর্বোচ্চ ঋণের পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া এক কোটি টাকা করা হয়। এই সংশোধনী আইনে জাহাজ কোম্পানীগুলিকে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালে কর্পোরেশন বিশ্বব্যাপ্ত হইতে যে ঋণ গ্রহণ করে এই সংশোধনী আইনের বলে সরকার ইহার গ্যারান্টি দেন। এই আইনের বলেই কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৩ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা লাভ করে, অবশ্য এই ঋণ ১৮ মাসের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। সরকার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যাহাতে তাহাদের শেয়ারের লভ্যাংশ না লইয়া একটি বিশেষ সংরক্ষিত তহবিলে, ৫০ লক্ষ টাকা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঐ টাকা জমা রাখে, এই আইনে তাহারও নির্দেশ আছে। এই সকল কাম্য পরিবর্তনের ফলে কর্পোরেশন প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৩-৫৪ সালে কর্পোরেশন ৫.২৭ কোটি টাকা ঋণদান করে; ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৪-৫৫ সালে ৭.৩৪ কোটি টাকা এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ২৮.২ কোটি টাকা হয়। ১৯৫৩ সালে সংশোধন আইন পাশ হওয়ার তেরো বৎসরের মধ্যে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ পাঁচগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬০ সালের সংশোধনী আইনের বলে কর্পোরেশন ১৯৬২-৬৩ সালে সর্বপ্রথম সরাসরি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ষ্টক ও শেয়ার ক্রয় করে।

বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে কর্পোরেশন দেশের শিল্পোন্নতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ১৯৬৬ সালে কর্পোরেশন ২৬টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে মোট ৪৩.৫২ কোটি টাকা ঋণ দান করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে কর্পোরেশন টাকা দিয়া সাহায্য দান করিত, ধীরে ধীরে স্থগিত পাওনা এবং বৈদেশিক ঋণসম্পর্কে গ্যারান্টি দানও ইহার কাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে; ইহা ব্যতীত ইকুইটি শেয়ার ও ডিবেঞ্চার আগুররাইট করিয়া ও সরাসরিভাবে উহা ক্রয় করিয়া ইহা শিল্প-স্থাপনে সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কর্পোরেশন ধীরে ধীরে উন্নয়ন ব্যাঙ্কের ভূমিকাও গ্রহণ করিতেছে। ইহার স্থাপনার সময় হইতে ১৯৬৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখ পর্যন্ত কর্পোরেশন মোট ২৫৩.৩ কোটি টাকা আর্থিক

সাহায্য অনুমোদন করে এবং ইহার মধ্যে ১৭৫৭ কোটি টাকা অর্থাৎ ৬২.৪ শতাংশ বণ্টন করা হয়।

কার্যাবলীর পর্যালোচনা (Review of its Working) : কর্পোরেশনের প্রাথমিক পর্যায়ে লাল শ্রীরাম ইহার আংশিক সময়ের জন্ম সভাপতি ছিলেন। কর্পোরেশনের কাজ সম্ভাব্যজনক না হওয়ায়, পুরা সময়ের জন্ম একজন সভাপতি নিয়োগ করা প্রয়োজন হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যতীত কর্পোরেশনের আরও কতকগুলি ক্রটি ছিল। কোন অর্থনৈতিক তথ্যসংগ্রহ এবং গবেষণা বিভাগ না থাকায় ঋণের আবেদনগুলি সতর্কতার সহিত বিবেচিত হয় নাই। তৃতীয়ত, এই অভিযোগও আনা হয় যে, ঋণদানের ব্যাপারে যোগ্যতার পরিবর্তে স্বজনপোষণের নীতি অনুসরণ করা হয়।

এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্ম সরকার শ্রীমতী সুরেতা কৃপালনীর হুচেতা কৃপালনী
কমিট
নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। ঐ কমিটি ১২৫৩ সালের

৭ই মে তারিখে ইহার রিপোর্ট দাখিল করে। ইহার প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

- (১) পুরা সময়ের জন্ম একজন বেতনভোগী চেয়ারম্যান রাখিতে হইবে।
- (২) কর্পোরেশনের বোর্ডে একজন অর্থনীতিবিদ, একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট এবং একজন পরিচালন বিশেষজ্ঞ রাখিতে হইবে।
- (৩) কর্পোরেশনের প্রত্যেক শাখা-অফিসে আঞ্চলিক উপদেষ্টা সমিতি থাকিবে।
- (৪) কর্পোরেশনের কোন ডিরেক্টর যে প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ডিবেঞ্চার বা শেয়ার-হোল্ডার, সেই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঋণ পাইতে হইলে ভোটদানযোগ্য ডিরেক্টরদের অন্তত দুই তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে উহা অনুমোদিত হইতে হইবে।
- (৫) ঋণ অনুমোদন এবং ঋণ বণ্টনের ব্যাপারে দীর্ঘস্থত্রতার অবসান ঘটাইতে হইবে।
- (৬) আগামী তিন বৎসরের জন্ম ৫০ হাজার টাকার অধিক সকল ঋণ কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদ্বয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।
- (৭) কর্পোরেশন তাহার কাজের বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করিবে এবং উহার বোর্ডের অধিবেশন কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসিবে।
- (৮) ঋণদানের সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির উপার্জন ক্ষমতা এবং যাহাতে অন্তত ৫০ শতাংশ মার্জিন হিসাবে ব্যবহৃত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সরকার এই তদন্ত কমিটির প্রায় সকল সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন। ১২৫৫ সালের ৬ই আগষ্ট পুরা সময়ের জন্ম একজন বেতনভোগী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বোর্ডের অধিবেশন আহ্বানের জন্ম এবং বিস্তারিত বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশের জন্ম সরকার নির্দেশ দেন। ঋণদানের সময় যাহাতে অন্তত ৫০ শতাংশ মার্জিন রাখা হয় সে বিষয়ে সরকার নির্দেশ দেন এবং ৫০

লক্ষ টাকার অধিক ঋণের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হইবে। অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ সরকারকে শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন পুনর্গঠন এবং ইহার কার্যাবলীর মানোন্নয়নে সহায়তা করিয়াছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের সমস্যা এবং রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন (Financial Problems of Small Industries and the Role of State Financial Corporations) : অতীতে আমাদের দেশে ক্ষুদ্রশিল্পের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল—বর্তমানেও ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। এই শিল্পের উন্নয়নের প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব। সংগঠিত টাকার বাজার হইতে ক্ষুদ্রশিল্প দীর্ঘকালীন ঋণ সংগ্রহ করিতে পারে না। বাধ্য হইয়া ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকদের আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব, মহাজন এবং স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ইহার অতি সামান্য মূলধনই সরবরাহ করিয়াছে।

উপযুক্ত জামিনের অভাবে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানসমূহ বাণিজ্যব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে না। ব্যাঙ্ক এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী মূলধনের অতি সামান্য অংশই সরবরাহ করিয়া থাকে।

রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন (State Finance Corporations) : ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পগুলির আর্থিক সমস্যা দূর করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫১ সালে রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন আইন পাশ করেন। বর্তমানে ১৫টি রাজ্যে ১৫টি রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন কাজ করিতেছে। নাগাল্যান্ড ব্যতীত সকল রাজ্যেই একটি করিয়া রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন রহিয়াছে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন গঠনেই সহায়তা করে নাই, ইহা সকল রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশনের একজন প্রধান শেয়ারহোল্ডারও বটে। রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন পরিদর্শন করিবার ক্ষমতাও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রহিয়াছে। এই সংস্থাগুলির বার্ষিক অধিবেশন আস্থানের দায়িত্বও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিয়াছে। রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশনের সহিত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও সমবায় ব্যাঙ্ক সমেত অগ্রাগ্র ব্যাঙ্কের সমন্বয় সাধন করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ।

পনেরোটি রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ প্রায় ৩৩ কোটি টাকা; ইহার মধ্যে আদায়ীকৃত মূলধন ১৫৮২ কোটি টাকা। অধিকাংশ কর্পোরেশন তাহাদের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বণ্ড বিক্রয় করিয়াছে। ১৯৫৩-৫৪ সাল হইতে ১৯৬৫-৬৬ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশনগুলি মোট ১২৩ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ১৫টি কর্পোরেশন মোট ২৩.৩ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে।

ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পকে দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণ দানের উদ্দেশ্যে রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে। শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন শুধুমাত্র বৃহদায়তন

শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকেই অর্থ সাহায্য করিয়া থাকে। রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন শিল্প-অর্থ কর্পোরেশনের ক্ষুদ্র সংস্করণ হইলেও উহাদের মধ্যে তিনটি পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন শুধুমাত্র পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীকেই ঋণ সরবরাহ করে কিন্তু রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী, অংশীদার কারবার এবং একমালিকী কারবারকেও ঋণ দিয়া থাকে। দ্বিতীয়ত, শিল্প-অর্থ কর্পোরেশনের শেয়ার কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানই (institutions) কিনিতে পারে কিন্তু রাজ্য অর্থ-সরবরাহ কর্পোরেশনের শেয়ার জনগণ ২৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্রয় করিতে পারে। তৃতীয়ত, শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন ২৫ বৎসর কালের জ্ঞাত ঋণদান করিতে পারে কিন্তু রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন ২০ বৎসরের জ্ঞাত ঋণদান করিতে পারে।

১৯৫১ সালের আইনানুসারে রাজ্য কর্পোরেশনের সর্বাধিক অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ হইবে ৫ কোটি টাকা। রাজ্য কর্পোরেশন তাহার আদায়ীকৃত মূলধন এবং সংরক্ষিত তহবিলের পাঁচগুণ পর্যন্ত বণ্ড ও ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিতে পারিবে। দুঃখের বিষয় রাজ্য কর্পোরেশনের কোন অর্থনৈতিক ও গবেষণা বিভাগ নাই।

সাহায্যদানের পরিধি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে রাজ্য অর্থ-সরবরাহ কর্পোরেশন আইনের সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনী আইনের বলে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ঋণ গ্রহণ করিলে কর্পোরেশন উহার গ্যারান্টি প্রদান করিতে পারিবে। এই আইনের বলে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী এবং সমবায় সমিতিতে দেয় ঋণের সর্বোচ্চ পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ টাকা করা হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা প্রসারিত করিয়া হোটেল, পরিবহণ শিল্প এবং শিল্প-তালুককে উহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রাজ্য কর্পোরেশনের কার্যাবলীর পর্যালোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, উহা ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইতে কতদূর সফল হইয়াছে। ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পের তিন ধরনের মূলধন প্রয়োজন হয়—প্রাথমিক মূলধন বা ইকুইটি মূলধন, সম্প্রসারণ এবং পুনর্গঠনের জ্ঞাত ঋণ-মূলধন এবং দৈনন্দিন কার্য পরিচালনার জ্ঞাত কার্যকরী মূলধন। অধিকাংশ রাজ্য কর্পোরেশনগুলি প্রধানত ঋণ-মূলধন সরবরাহ করিয়াছে—ইহাদের কার্যকরী মূলধন অথবা প্রাথমিক মূলধন সরবরাহের পরিমাণ নগণ্য।

কর্পোরেশনগুলির শুধুমাত্র ঋণ-মূলধন প্রদান সমর্থন করা যায় না। ঋণ-মূলধনের প্রয়োজন আছে ইহা সত্য, কিন্তু কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজন আরো অধিক। অধিকাংশ ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের টিকিয়া থাকাই সর্বাপেক্ষা বৃহত্তর সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে এবং কার্যকরী মূলধনের অভাবে তাহাদের পতন অনিবার্য। ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল অথবা শিল্পজাত দ্রব্য ব্যাঙ্ক জামিন হিসাবে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক বলিয়া এই সকল শিল্পসংস্থাগুলি ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তাহাদের কার্যকরী মূলধনের অতি সামান্য অংশই পাইয়া থাকে। সুতরাং রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন যদি ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে

সাহায্য করিতে আগ্রহী থাকে তাহা হইলে উহার তাহাদের আর্থিক সাহায্যদান নীতির পরিবর্তন করিবে এবং কার্যকরী মূলধন যোগান দিবে।

রাজ্য কর্পোরেশনগুলি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অধিক সাহায্যদান করিয়াছে। ইহার কারণ ক্ষুদ্র সংস্থাগুলিকে ঋণদানে ঝুঁকি বেশি। ইহাদের হিসাবপত্র রাখার পদ্ধতি আধুনিক নয়; ইহা ব্যতীত ঋণের পরিবর্তে কোন জামিন রাখিবার মতো স্থায়ী সম্পত্তিও ইহাদের নাই। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে যে ভূমিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা রক্ষা করিতে হইলে উহাদের অধিক সাহায্য প্রয়োজন। সুতরাং রাজ্য কর্পোরেশনগুলির নীতির পরিবর্তন প্রয়োজন। অধিকতর ঝুঁকি গ্রহণ করিয়া দ্রব্যের জামিনে ছোট শিল্পসংস্থাগুলিকে ঋণদান করিতে হইবে। আর ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিরও হিসাবপত্র রাখা এবং পরিকল্পনা রচনার আধুনিক পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, নবগঠিত ভারতীয় শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের (Industrial Development Bank of India) কার্যাবলীর সহিত রাজ্য কর্পোরেশনগুলির প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকিবে।

দেখা গিয়াছে যে, রাজ্য কর্পোরেশনগুলির সুদের হার বেশ উচ্চ। ইহার কারণ শেয়ারহোল্ডারদের ৩½% ডিভিডেণ্ড দেওয়ার দরুন সুদের হার ৮% বা ৯% হইতে বাধ্য। ইহা ছাড়া ঋণগ্রহীতাকে রেজিস্ট্রেশন খরচ, স্ট্যাম্প ডিউটি ইত্যাদি বাবদ আরও ৩% ব্যয় করিতে হয়। সুতরাং ঋণের মূল্য শতকরা ১১% হইতে ১২% হয়। এই কারণে এই সকল প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প উৎস হইতে ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করে। এই অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া পাঞ্জাব সরকার রেজিস্ট্রেশন ও স্ট্যাম্প খরচ মুকুব করিয়াছেন—অত্যাগত রাজ্যেরও ইহা করা উচিত।

বিভিন্ন ঋণদান সংস্থার কাজের মধ্যে যাহাতে সমন্বয় সাধিত এবং কাজের সঠিক বণ্টন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। ১৯৫৪ সালের আগষ্ট মাসে রাজ্য কর্পোরেশনগুলির প্রতিনিধিদের যে অধিবেশন হয় তাহাতে স্থির হয় যে, ১০ লক্ষ টাকার আর্থিক ঋণ শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন এবং ১০ লক্ষ টাকার অনধিক ঋণ রাজ্য কর্পোরেশনগুলি দিবে। ১০ হাজার হইতে ৭৫ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ রাজ্য কর্পোরেশন দিবে এবং তদপেক্ষা কম হইলে উহা রাজ্যসরকার দিবে। ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণদানের ব্যাপারে যে পাইলট পরিকল্পনা (Pilot scheme) প্রবর্তন করা হয় তাহা সাফল্য লাভ করায় ১৯৫২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র শিল্পসমূহকে ঋণদান করিতেছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ও অত্যাগত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ক্ষুদ্রশিল্পে অধিকতর ঋণদানে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের অতিরিক্ত ঋণগ্রহণের সুবিধাদান করিয়াছে।

অত্যাগত অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন এবং উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Other Finance Corporations and Development Banks) : উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা

চলিতে থাকিলে দেখা গেল যে, রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন এবং কেন্দ্রে শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন বেসরকারী শিল্পের আর্থিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সেইজন্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন স্থাপন করেন এবং শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন নামে একটি বেসরকারী সংস্থা স্থাপনে সহায়তা করেন। ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঋণদানের উদ্দেশ্যে সরকার জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন নামে একটি আধা-সরকারী কর্পোরেশন স্থাপন করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরকে চেয়ারম্যান করিয়া ১৯৫৮ সালের জুন মাসে বেসরকারী লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন গঠিত হয়। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পুনঃ অর্থ-সরবরাহ কর্পোরেশন নবগঠিত শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়। সাম্প্রতিককালে সরকার দুইটি ঋণদান সংস্থা গঠন করিয়াছেন—ইউনিট ট্রাস্ট এবং শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক। ইউনিট ট্রাস্ট ছোট ছোট বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ একত্র করিয়া বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিতেছে। ৫০ কোটি টাকা লইয়া গঠিত ভারতের শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক শিল্পে মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবে। শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক সরাসরি অথবা ব্যাঙ্ক ও অগ্রাগ্রহ অর্থসরবরাহ সংস্থার সহিত সম্মিলিতভাবে অর্থসাহায্য করিবে। শিল্প ঋণ পুনঃ সরবরাহ করা শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের অগ্রতম প্রধান কাজ বলিয়া পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশনকে ইহার সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ক) জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (National Industrial Development Corporation) : ইহা সরকার প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশন এবং ভারত সরকার সম্পূর্ণরূপে ইহার মূলধন যোগান দিবে। শিল্পে অর্থসরবরাহ এবং পরিকল্পিত শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে এই কর্পোরেশন গঠিত হয়। যে সকল ক্ষেত্রে নূতন শিল্প স্থাপন করা প্রয়োজন কিন্তু বেসরকারী উত্তোগ এবং মূলধন অগ্রসর হইয়া আসিতেছে না, সেই সকল ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের দায়িত্বও এই সংস্থার। বেসরকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা এবং মুনাফা অর্জনের অবস্থা না আসা পর্যন্ত তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করাও ইহার কাজ। এই কর্পোরেশনের কাজ অনেকটা ল্যাটিন আমেরিকার “ফোমেণ্টো কর্পোরেশনের” অনুরূপ।

এককোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন লইয়া জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠিত হয়। ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ১০ লক্ষ টাকা, ইহার সবটাই ভারত সরকার সরবরাহ করিয়াছে। সাধারণত, এই কর্পোরেশন শিল্পে অর্থ সরবরাহ করিবে না, সেই কারণে ১০ লক্ষ টাকা আদায়ীকৃত মূলধন পর্যাপ্ত বলিয়া সরকার মনে করিয়াছিলেন।

জাতীয় শিল্পউন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রধান কাজগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায় : প্রথমত, ইহা নূতন শিল্প স্থাপন অথবা নূতন দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পনা করিয়া উহাকে কাজে পরিণত করিবে; দ্বিতীয়ত, ইহা শিল্পে কারিগরী জ্ঞানসংক্রান্ত পরামর্শ দান

করিরে ; এবং তৃতীয়ত, তুলা, পাট মেশিনটুলস প্রভৃতি বিশেষ শিল্পের পুনর্গঠন এবং আধুনিকীকরণের জন্ত অর্থ সরবরাহ করিবে। পাট, এবং তুলা শিল্পের পুনর্গঠন ও আধুনিকীকরণ এবং মেশিনটুলস শিল্পের সম্প্রসারণ এই কর্পোরেশনের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। পাট, তুলা এবং মেশিনটুলস শিল্পের পুনর্গঠন, আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণের জন্ত কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত ঋণের পরিমাণ ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ২৮.২ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ২৮.৪ কোটি টাকা হয়।

আশা করা যায় যে, পরিকল্পনাকালে জাতীয় শিল্পউন্নয়ন কর্পোরেশন দেশের স্বয়ম শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করিবে। কর্পোরেশন শুধুমাত্র ভারী শিল্পকেই সাহায্য দান করিবে না, ভোগ্যপণ্য শিল্পকেও সাহায্য দান করিবে। ভারী শিল্পের সহিত পাশাপাশি হালকা ভোগ্যপণ্য শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিলে তবেই শিল্পের স্বয়ম উন্নয়ন ঘটবে। সুতরাং অনুন্নত অঞ্চলে বেকারত্ব এবং অর্ধবেকারত্বের অবসান ঘটাইবার জন্ত ভোগ্য পণ্যশিল্পের সম্প্রসারণের প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(খ) শিল্প ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন (Industrial Credit and Investment Corporation of India) : বিশ্বব্যাঙ্ক এবং মার্কিন সরকারের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন গঠিত হয়। কর্পোরেশনের অনুমোদিত হিসাবে শিল্পঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশন গঠিত হয়। কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা। কর্পোরেশনের আদায়ীকৃত মূলধন ৫ কোটি টাকা— ইহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগকারীর নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত, মার্কিন সরকার বিনামূল্যে ৭৬ কোটি টাকা এই কর্পোরেশনে জমা রাখিয়াছেন। ১৯৫৫ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক ১৫ বৎসরের জন্ত ৪.৬% হার সুদে কর্পোরেশনকে ৫ কোটি টাকা ঋণ দেয়। সুতরাং ১৯৫৫ সালেই কর্পোরেশন ১৭.৬ কোটি টাকা মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করে। মোট আদায়ীকৃত মূলধন এবং সরকারী আমানতের তিনগুণ পর্যন্ত কর্পোরেশন ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

সক্রিয় মূলধন দ্বারা বাজারের অভাব পূরণ করাই কর্পোরেশনের মূল উদ্দেশ্য। বিগত বারো বৎসরে ইহা শিল্পে দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহ করিয়াছে, নূতন উদ্যোগ গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিয়াছে এবং মূলধন বাজারকে শক্তিশালী করিয়াছে। আগাররাইট করাই ইহার প্রধান কাজ। নূতন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ইহা প্রারম্ভিক মূলধনও যোগান দিয়া থাকে।

ক্রমবর্ধমান কাজের চাপ মিটাইবার জন্ত কর্পোরেশনের সম্পদের পরিমাণ, বিশেষ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সালে বিশ্বব্যাঙ্ক কর্পোরেশনকে ৫ কোটি ডলার ঋণদান করে। পি. এল. ৪৮০ তহবিল হইতে ভারত সরকারও ১৯৬৫ সালে কর্পোরেশনকে ৫ কোটি টাকা ঋণ দান করে। ১৯৬৫ সালে

পশ্চিম জার্মানী ৪৫ মিলিয়ন ডি. এম. ঋণ দান করে। ১৯৬৫ সালের শেষে কর্পোরেশনের মোট আর্থিক সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ১১৫.৭ কোটি টাকা—ইহার মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৭৩.৮ কোটি টাকা।

কর্পোরেশনের অষ্টম বার্ষিক রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, ১৯৬২ সালে বিনিয়োগ সংক্রান্ত কাজে ইহার সক্রিয় ভাব ছিল। বৈদেশিক মুদ্রার তীব্র সংকটকালে কর্পোরেশন শিল্পে বৈদেশিক মুদ্রা সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৫ সাল হইতে ১৯৬৫ সালের শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন ১২৪ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য দিয়াছে, এবং ২৮.৩২ কোটি টাকার আগুররাইটের কাজ করিয়াছে। বিগত ১০ বৎসরে কর্পোরেশন ৩০০টি কোম্পানীকে সাহায্য দান করিয়াছে—ইহার মধ্যে ১৭২টি নূতন প্রতিষ্ঠান। ইহা বিশেষ আশার কথা যে, কর্পোরেশন কর্তৃক আর্থিক সাহায্য দানের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় শিল্প সম্প্রসারণে অর্থ সরবরাহ করা বিশেষ প্রয়োজন। পরিকল্পনা শুধু জাতীয় পর্যায়েই প্রয়োজনীয় নয়, প্রকল্প রচনার স্তরেও প্রয়োজন। শিল্প-ঋণ ও বিনিয়োগ কর্পোরেশনের দ্বারা উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্কের ভূমিকা পরিকল্পিত প্রকল্প রচনায় সাহায্য করিবে।

১৯৫৬ সালে নূতন কোম্পানী আইন বলবৎ হওয়ার পর শিল্প প্রতিষ্ঠায় ম্যানেজিং এজেন্টদের কার্যকলাপ হ্রাস পাইয়াছে। ইহার ফলে কর্পোরেশনের কার্যপরিধি বৃদ্ধির সুযোগ ঘটিবে। এই কর্পোরেশন শুধুমাত্র ঋণদান সংস্থা হিসাবেই কাজ করে না; ইতিমধ্যেই ইহা যথেষ্ট পরিমাণ শেয়ার আগুররাইট করিয়াছে এবং বহু কোম্পানীর শেয়ার-মূলধনে অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে। কর্পোরেশনের কার্যাবলী শুধুমাত্র বিনিয়োগের সাধারণ অবস্থার সহিতই জড়িত নয়—ইহা সরকারী নীতির দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত।

(গ) জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation) : ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের সুবিধা, যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে সহায়তা করা এবং ক্ষুদ্র শিল্পের সাধারণ উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই কর্পোরেশন গঠিত হয়। যে সকল শিল্পে অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা মূলধন আছে এই কর্পোরেশন সেই সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেই শুধুমাত্র সাহায্য দিবে। ১০ লক্ষ টাকার অনুমোদিত মূলধন লইয়া প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে এই কর্পোরেশনটি স্থাপিত হয়। ভারত সরকার ইহার সমস্ত মূলধনই যোগান দিয়াছেন। প্রয়োজন হইলে ভারত সরকার ইহাকে চলতি মূলধন দিয়া সাহায্য করিবেন।

সুখম শিল্পের কাঠামো গড়িয়া তোলায় জ্ঞান পরিপূরক শিল্প (ancillary industries) গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। এই কর্পোরেশন ক্ষুদ্রশিল্পসেবা সংস্থাগুলির (Small Scale Industries Service Institutes) সহযোগিতায় কাজ করিবে।

প্রথমত, ইহা বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের চারিপাশে কিডার প্রতিষ্ঠান গঠনে সহায়তা করিবে ; দ্বিতীয়ত, বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে সে বিষয়ে উৎসাহ দান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া চলমান বিক্রয়-গাড়ি ও পাইকারী ডিপোর সাহায্যে কর্পোরেশন ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতেছে। বিদেশে প্রদর্শনী প্রভৃতির মাধ্যমে ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করাও এই কর্পোরেশনের কাজ। কর্পোরেশন ক্ষুদ্রশিল্পকে সরকারের নিকট হইতে কর্ট্রাক্ট পাইতে সাহায্য করিতেছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ক্ষুদ্র শিল্পসমূহ ১৭ কোটি টাকার কর্ট্রাক্ট পাইয়াছিল।

কারিগরীজ্ঞান এবং আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির দুইটি প্রধান অন্তরায় বলিয়া ১৯৬৬ সালে কর্পোরেশন ক্ষুদ্রশিল্পের উত্তোক্তাদিগকে সুবিধাজনক সর্তে এবং ঠিকা-সওদার ভিত্তিতে (Hire-Purchase) যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত কর্পোরেশন ২৫ কোটি টাকা মূল্যের ১৬,০০০ মেশিন ক্ষুদ্র শিল্পগুলিকে ঠিকা-সওদার ভিত্তিতে যোগান দেয়। ক্ষুদ্রশিল্পজাতদ্রব্য যাহাতে উন্নত-মানের হয় সেই উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন ক্ষুদ্রশিল্পসংস্থা পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়াছে।

ঠিকা-সওদা ব্যবস্থার সহিত ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর করিবার এবং বিক্রয় ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং নয়া দিল্লীতে চারিটি সাহায্যকারী কর্পোরেশন স্থাপন করা হয়। যন্ত্রপাতি ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করা ব্যতীত এই শাখাগুলি ক্ষুদ্র শিল্পকে প্রয়োজনীয় লৌহ, ইস্পাত এবং কাঁচামাল সরবরাহ করিবে।

দেশের সর্বত্র যে অসংখ্য ক্ষুদ্রশিল্প ছড়াইয়া রহিয়াছে তাহাদের সাহায্য করা এই চারিটি সাহায্যকারী কর্পোরেশনের পক্ষেও সম্ভব নয়। এই কারণে মাদ্রাজ, নাগাভূমি এবং জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সকল রাজ্য সরকারই জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে।

(ঘ) পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন (Refinance Corporation) : ভারত ও মার্কিন সরকারের মধ্যে এক চুক্তির ফলে ১৯৫৮ সালের জুন মাসে পুনঃ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। ১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনানুযায়ী ইহা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীরূপে স্থাপিত হয়। ইহা ছয় বৎসরকাল একটি পৃথক সংস্থা হিসাবে কাজ করে। নবগঠিত শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনঃ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের সমস্ত কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে। পুনঃ অর্থ-সরবরাহ কর্পোরেশন যে সকল সুবিধাদান করিত শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক তাহা দিবে। ইহা ব্যতীত কোন শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ৫০ লক্ষের পরিবর্তে ১০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া চলিবে। উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যাঙ্ক মাঝারি আকারের শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ঋণদান করিলে সেই ব্যাঙ্ক কর্পোরেশন হইতে সম পরিমাণ অর্থ সাহায্য

পাইবে। কর্পোরেশনের উদ্দেশ্য হইল শিল্পে মধ্যমেয়াদী ঋণদানের ব্যাপারে বাণিজ্য-
ব্যাঙ্ক ও অগ্রাগ্র প্রতীষ্ঠানকে উৎসাহ দান করা। ১৯৬৩ সালে কর্পোরেশন ২৭টি
অর্থ সরবরাহ প্রতীষ্ঠানকে ঋণদান অনুমোদন করে। বাণিজ্যব্যাঙ্ক এবং রাজ্য অর্থ
সরবরাহ কর্পোরেশন ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা—উহা এক লক্ষ টাকা মূল্যের
২৫০০ শেয়ারে বিভক্ত। ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ১২.৫ কোটি টাকা। রিজার্ভ
ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা কর্পোরেশন এবং ১৫টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ইহার শেয়ার ক্রয় করিয়াছে।
গঠনকালে কর্পোরেশনের মোট আর্থিক সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৮.৫ কোটি টাকা (১২.৫
কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন + পি. এল. ৪৮০ ফাণ্ড হইতে প্রাপ্ত ২৬ কোটি টাকা)
সাধারণত কোন ক্ষেত্রেই শিল্প-প্রতীষ্ঠানকে ৫০ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ দান করা হয় না।
তিন বৎসরের কম এবং সাত বৎসরের অধিক সময়ের জ্ঞাত ঋণদান করা চলিবে না।
যে সকল শিল্প-প্রতীষ্ঠানের আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভ পাঁচ লক্ষ টাকার কম অথবা
২.৫ কোটি টাকার অনধিক তাহারাই কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ পাইবার যোগ্য।

সুখের বিষয় যে কর্পোরেশন বিভিন্ন ধরনের শিল্পসংক্রান্ত কাজে ঋণদান করিয়াছে
এবং নূতন শিল্পস্থাপনে পুনঃ অর্থ সরবরাহের সুবিধা দান করিয়াছে। ১৯৬৪ সালের
আগষ্ট মাসে ইহা শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়।

(৬) ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া (Unit Trust of India) : ক্ষুদ্র
বিনিয়োগকারীর সম্পদ একত্র করিয়া বিভিন্ন ধরনের ঋণপত্রে বিনিয়োগ করার জ্ঞাত
ইউনিট ট্রাস্টের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিনিয়োগ হইতে যে আয় হয় তরচ মিটাইয়া
বাকী অংশ ইউনিট হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। ইউনিট ট্রাস্টের মোট
বিনিয়োগ সমমূল্যের ইউনিটে বিভক্ত করা হয়। ইউনিট ক্রেতা ঋণপত্রের মালিকানা
লাভ করে এবং উহার লভ্যাংশ পাইবে। ইউনিট ট্রাস্ট সর্বদাই বিনিয়োগকারীর নিকট
হইতে ইউনিট কিনিতে প্রস্তুত থাকে বলিয়া এই ব্যবস্থায় অর্থের তরলতা (liquidity)
রক্ষিত হয়। বাজার প্রচলিত দামে ট্রাস্ট ইউনিট কেনাবেচা করিয়া থাকে।

১৯৬৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী পাঁচ কোটি টাকা প্রারম্ভিক মূলধন লইয়া ভারতের
ইউনিট ট্রাস্ট গঠিত হয়। এই মূলধন এইরূপভাবে সংগৃহীত হইয়াছে—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-
২.৫ কোটি টাকা, জীবন বীমা কর্পোরেশন ৭৫ লক্ষ টাকা, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ৭৫ লক্ষ টাকা,
তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং অগ্রাগ্র অর্থসরবরাহ সংস্থা ১ কোটি টাকা দিয়াছে।

প্রতিটি ইউনিটের মুদ্রিত মূল্য (face value) ১০ টাকায় পার্শ্বকরা হইয়াছে এবং
সর্বোচ্চ মুদ্রিত মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইবে না। ইউনিটগুলির উপর বিভিন্ন সময়ে
লভ্যাংশের পরিমাণ অনুযায়ী উহাদের যে দাম স্থির হইবে সেই দামে উহারা বাজারে
বিক্রীত হইবে। ক্রেতা যে কোন পরিমাণ ইউনিট ক্রয় করিতে পারিবে; এ সম্পর্কে
কোনরূপ বাধা নাই।

ট্রাস্টের ব্যবসায় পরিচালনা এবং নির্দেশনার দায়িত্ব একটি ট্রাস্টী বোর্ডের উপর হস্ত করা হইয়াছে। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন; ইহা ছাড়া আরও আটজন ট্রাস্টী থাকিবেন—ইহাদের দুইজন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিযুক্ত করিবে, জীবনবীমা কর্পোরেশন একজন ট্রাস্টী নিযুক্ত করিবে, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক একজন ট্রাস্টী নিযুক্ত করিবে এবং তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং অগ্রাচ্ছ প্রতিষ্ঠান দুইজন ট্রাস্টী নির্বাচন করিবে।

ট্রাস্ট রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও অগ্রাচ্ছ ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণগ্রহণ করিতে পারিবে। ইউনিট ট্রাস্ট আয়কর, সুপার ট্যাক্স এবং আয়ের উপর অগ্রাচ্ছ কর হইতে অব্যাহতি পাইবে। ইউনিট ট্রাস্ট প্রবর্তিত হওয়ার ফলে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী শেয়ারের আকারে সম্পত্তি অর্জন করার সুযোগ পাইবে। আর ইহার ভিত্তি এরূপ যে, যতই সময় যাইবে ততই উহার মূল্যবৃদ্ধি ঘটিবে। বড় বড় শহরের বাহিরে ইউনিট জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে পোষ্টাফিসের মাধ্যমে ইউনিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বাণিজ্যব্যাঙ্কের ৪০০০ শাখা অফিস এবং ১৪০০০ পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে বর্তমানে ইউনিট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ট্রাস্ট ১৯৬৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী স্থাপিত হয় এবং ঐ বৎসরের ১লা জুলাই তারিখ হইতে জনসাধারণের নিকট ইউনিট বিক্রয় শুরু করে। ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত প্রাথমিক বিক্রয় পর্যায়ে প্রতিটি ইউনিট ১০ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইয়াছিল। ইহার পর হইতে দৈনিক নির্ধারিত মূল্যে ইউনিট বিক্রয় করা হয়। ১৯৬৪ সালের ১৬ই নভেম্বর তারিখে ট্রাস্ট ঘোষণা করে কি মূল্যে ইহার নিকট ইউনিট পুনর্বিক্রয় করা চলিবে।

১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত ইউনিট কিনিবার জন্ম ১৪৪৭৪৮ আবেদন-পত্র পাওয়া যায়; ইহার মধ্যে ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ১৪৪৬০৬—উহারা ২১২৮ কোটি টাকার ইউনিট ক্রয় করে। যে পরিমাণ মোট ইউনিট বিক্রীত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ১২৮৭ কোটি টাকা ব্যক্তি এবং ১৪১ কোটি টাকা প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রয় করে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ইউনিট ট্রাস্টের মোট আয় ছিল ১৫৩ কোটি টাকা, ১৯৬৫-৬৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৩ কোটি টাকা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে মোট বিক্রীত অর্থের ৫২ শতাংশ পুনরায় ট্রাস্ট কিনিয়াছিল।

ট্রাস্ট প্রথমে তাহার সম্পদের অধিকাংশ সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিয়াছিল, পরে ধীরে ধীরে অগ্র ধরনের ঋণপত্রেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে থাকে। ইহার দ্বিতীয় বার্ষিক কার্যকালে দেখা গেল যে ট্রাস্ট ২৫০টি শিল্পসংস্থার ঋণপত্রে তাহার অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে। ট্রাস্ট এখনো পর্যন্ত নির্দিষ্ট আয় প্রদানকারী ঋণপত্র এবং পরিবর্তনশীল আয় প্রদানকারী ঋণপত্রে তাহার সম্পদ বণ্টনে ভারসাম্য বজায় রাখিয়াছে। ট্রাস্টের বিনিয়োগ নীতি দুইটি উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত—(১) সর্বাধিক আয় লাভ করা এবং (২) মূলধনের নিরাপত্তা।

ট্রাস্ট শুধুমাত্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কারীদের সম্পদই একত্র করিবে না, ইহা বিনিয়োগকারীর মনে সাহস সঞ্চার করিয়া মূলধন ভিত্তিকে দৃঢ়তর করিবে। ট্রাস্টের কার্যাবলীর ফলে দেশে মূলধন বাজার সুসংহত হইবে এবং পরিকল্পিত উন্নয়নে ক্রমাগত সম্পদ সরবরাহ করিয়া ট্রাস্ট একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

(চ) ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক (Industrial Development Bank of India) : ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই তারিখে ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। ইহা শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী ও মধ্যমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করিবে। এই ব্যাঙ্কের অনুমোদিত মূলধন ৫০ কোটি টাকা, পরে প্রয়োজন মত উহা বৃদ্ধি করিয়া ১০০ কোটি টাকা করা যাইবে। এই ব্যাঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মালিকানাধীন। শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১৯৬৪ সালের ১লা জুলাই ১০ কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করে। ব্যাঙ্কের পরিচালনার ভার একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর হস্ত থাকিবে।

ব্যাঙ্কের আর্থিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে সুদবিহীন ঋণ গ্রহণ করা যাইবে। এই ঋণ ১৫টি বার্ষিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, বণ্টন বিক্রয় করা যাইবে; তৃতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারা যাইবে এবং চতুর্থত, অন্যান্য এক বৎসর মেয়াদী আমানত গ্রহণ করা যাইবে। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে একটি বিশেষ উন্নয়ন সাহায্য ভাণ্ডার (Development Assistance Fund) গঠন করা হইবে। যে সকল শিল্পে মুনাফার হার অত্যন্ত কম বা অধিক বিনিয়োগ প্রয়োজন হয় কিন্তু ইহা ব্যাঙ্ক বা অন্য কোন স্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে না সেই সকল শিল্প ঐ ভাণ্ডার হইতে অর্থ সাহায্য পাইবে।

এই ব্যাঙ্ক শিল্পে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয়ভাবেই অর্থ সরবরাহ করিবে। শিল্প-অর্থ কর্পোরেশন বা রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন বা অন্য কোন সংস্থা শিল্প-প্রতিষ্ঠানকে ২৫ বৎসর মেয়াদী ঋণদান (term loan) করিলে উহারা শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক হইতে সমপরিমাণ অর্থসাহায্য পাইবে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক তিন হইতে দশ বৎসর মেয়াদী 'টার্মলোন' দিলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক উহাদেরও পুনঃ অর্থসরবরাহ করিবে। ইহা শিল্প-অর্থকর্পোরেশন, রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন প্রভৃতি সংস্থার শেয়ার ও বণ্টন কিনিতে পারিবে এবং ছপ্তি ও প্রমিসারী নোট গ্রহণ, বাট্টা এবং পুনর্বাট্টা করিতে পারিবে।

ব্যাঙ্কের দ্বিতীয় ধরনের কাজ হইল ইহা স্বয়ং শিল্পে অর্থসরবরাহ করিতে পারিবে এবং উহাদের শেয়ার ক্রয় অথবা আগুয়ারাইট করিতে পারিবে। ইহা শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থগিত পাওনা অথবা তাহারা ব্যাঙ্ক হইতে যে ঋণ সংগ্রহ করিবে সে সম্পর্কে গ্যারান্টি দিবে। পরিশেষে, ইহা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক এবং অগ্রাগ্র ঋণ

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কোন শিল্প-সংস্থার শেষার ও ডিবেঞ্চার আগাররাইট করিলে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক তাহার গ্যারাণ্টি দিবে।

এই ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অধীনস্থ সংস্থা হিসাবে কাজ করিবে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের বোর্ড গঠিত হইবে। এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ব্যাঙ্কিং-সংক্রান্ত কাজের চাপ বিশেষ প্রবল; সুতরাং এই নবগঠিত সংস্থাটির প্রাথমিক পর্যায়ে যে পরিমাণ যত্ন এবং সময় প্রয়োজন, তাহা কি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দিতে পারিবে?

১৯৬৪ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক শিল্প পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশনের সমগ্র কার্যভার গ্রহণ করিয়াছে। ব্যাঙ্ক পুনঃ অর্থসরবরাহের সর্বাধিক পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০০ লক্ষ টাকা করিয়াছে। মধ্যমেয়াদী রপ্তানি ঋণের জন্ম পুনঃ অর্থ সরবরাহের সর্বোচ্চমাত্রা সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৬৫-৬৬ সালে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রত্যক্ষভাবে ৫৭.৬ কোটি টাকা ঋণদান করে। এই সাহায্য ২৮টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধানত নূতন প্রকল্পের কাজে ব্যবহৃত হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ঋণ ও আগুররাইট কাজের জন্ম ১৩.১ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়। ব্যাঙ্কের কার্যকালের প্রারম্ভ হইতে ১৯৬৬ সালের জুনের শেষে পুনঃ অর্থসরবরাহের জন্ম ইহা ১০.২২ কোটি টাকা ঋণদান করে। ব্যাঙ্ক স্থির করিয়াছে যে, প্রতিরক্ষা ও রপ্তানি শিল্প, এবং প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতি অগ্রাধিকার দিবে।

যে সকল প্রতিষ্ঠান শিল্পে সর্ব ঋণ (term loan) দান করে তাহাদের শীর্ষপ্রতিষ্ঠান হিসাবে উহাদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করাও এই ব্যাঙ্কের অগ্রতম কাজ। প্রসঙ্গত ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে পুনঃ অর্থসরবরাহের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ঋণদানকারী ব্যাঙ্কই প্রদত্ত ঋণের ঝুঁকি বহন করিবে।

১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাস হইতে শিল্প ঋণ এবং গ্যারাণ্টির ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণের পরিকল্পনা নামে একটি নূতন পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হইল বিশেষ শিল্প-সংস্থার প্রতি ব্যাঙ্ক সাহায্য দানের পরিমাণ হ্রাস করা এবং দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাহায্যের পরিধি সম্প্রসারণ করা।

কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক সরবরাহ করিবে। অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত পুনঃ সরবরাহ করিতে পারে। সাধারণত রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে ২৫ লক্ষ বা ততোধিক টাকার ঋণ এবং ব্যাঙ্ক ও অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ৫০ লক্ষ বা ততোধিক টাকার ঋণের ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। পরিশেষে, ব্যাঙ্ক বা অগ্রাধিকার কোন প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ এবং স্থগিত পাওনার ব্যাপারে শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্ক গ্যারাণ্টি দিতে পারিবে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে কতকগুলি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ফলে শিল্পে মূলধন

সরবরাহের ক্ষেত্রে যে শূণ্যস্থান ছিল তাহা ধীরে ধীরে পূরণ হইয়া যাইতেছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সুসম্বন্ধ কার্যধারা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা শিল্পে মূলধন সরবরাহ ব্যবস্থা দৃঢ়তর করিবে এবং শিল্প-সম্প্রসারণের সহায়ক হইবে।

প্রশ্নপত্র ও উত্তরসংকেত

1. Describe the organization and functions of the Industrial Finance Corporation of India and comment upon its working. (C.U. B.A. '55, '59, B.Com. '52, '56, 62, B.Com. '63, '65, '66 ; B.U. '64) [পৃষ্ঠা ২৩৩-৩৭]
2. Give a critical review of the working of the Industrial Finance Corporation of India during last ten years. (C.U. B.A. '59) [পৃষ্ঠা ২৩৬-৩৭]
3. Give an account of the functions and importance of the new institutions that have been established in India for providing long-term finance to large scale industrial concerns. (C.U. B.Com. '58) [পৃষ্ঠা ২৩৩-৩৬, ২৪০-৪২]
4. Give an account of the special agencies that have been set up in India after World War II for providing long-term finance to private industry. (C.U. B.A. '58, '59, B.Com. '58, '59, '61, '65) [পৃষ্ঠা ২৩৩, ৩৬, ২৪০-৪২]
5. Critically examine the functions and achievements of the Industrial Finance Corporation of India. (C.U. B.A. '57) [পৃষ্ঠা ২৩৩-৩৭]
6. Discuss the importance and functions of the State Finance Corporations set up in different states of India. (C.U. B.Com. '64) [পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৯]
7. Discuss the finance problems of the small and medium sized industries in India. Give in this connection an account of the part played by the State Finance Corporations in the financing of such industries. (C.U. B.A. '66) [পৃষ্ঠা ২৩৭-৩৯]
8. What are the different sources from which capital can be

raised by a large scale industry in the private sector in India ?
Estimate the adequacy of these sources. (C.U. B.Com. '65)

[পৃষ্ঠা ২৪০-৪২, ৪৩-৪৮]

9. Give a critical estimate of the activities of the principal agencies of the supply of finance to large scale industries in India.
(B.U. '62, '65 ; C.U. B.A. '64) [পৃষ্ঠা ২৩৯-৪২]

10. Give a critical account of the progress of Development Banking in India in the post-independence years. (C.U. B.A. '66)
[পৃষ্ঠা ২৩৯-৪৮]



একবিংশ অধ্যায়

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা

(Role of Small Scale and Cottage Industries)

বেকার সমস্যা বর্তমান শতাব্দীর এক চরম অভিশাপ। ভারতে বেকার এবং আধা-বেকারের সমস্যা ক্রমবর্ধমান গতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। সুতরাং আমাদের এরূপ শিল্প আবিষ্কার করিতে হইবে যাহা বেকার ও আধা-বেকারদের নিয়োগের ব্যবস্থা করিবে এবং স্বল্প মূলধন দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, শুধুমাত্র বৃহদায়তন শিল্প সকল বেকার ও আধা-বেকারের নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিবে না। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ ইহাও উপলব্ধি করেন যে, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুন বেকার সমস্যা ক্রমশই ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহদায়তন শিল্প উন্নয়নের চেষ্টা করে।

ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ভূমিকা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে হইলে ১৯৫৫ সালের গ্রাম এবং ক্ষুদ্রশিল্প কমিটির (বা কার্ভে কমিটির) সুপারিশসমূহ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ॥

কার্ভে কমিটির সুপারিশ (Recommendations of the Karve Committee) : কমিটি লক্ষ্য করিয়াছে যে, শিল্পক্ষেত্রে নানাবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দরুন শ্রমিকেরা ক্রমশই বেকার হইয়া পড়িতেছে। সুতরাং গ্রাম্য ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলির ক্ষেত্রে শ্রমিককে উচ্ছেদ করিয়া যাহাতে যন্ত্রপাতি বসানো না হয় কমিটি তাহার সুপারিশ করে। প্রথমত, সরকারকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, এই শিল্পগুলির সংস্কারকালে বেকারসমস্যা যেন বৃদ্ধি না পায় ; দ্বিতীয়ত, এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে যেখানে কর্মসংস্থানের ক্রমবর্ধমান সুযোগ থাকিবে। এই সকল শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিকেন্দ্রিকরণের নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য দুইটি সকল হইলে একদিকে যেমন বর্তমান কর্ম সংস্থানের সুযোগ অব্যাহত থাকিবে অগ্ৰদিকে তেমন নূতন কর্ম সংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি পাইবে।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা ব্যতীত কমিটির অপর প্রধান উদ্দেশ্য হইল উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উৎপাদন এরূপভাবে বৃদ্ধি করিতে হইবে যাহাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস না পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত উৎপাদন কৌশল উন্নত করা প্রয়োজন। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার না করিলে তবেই উৎপাদন-কৌশল উন্নত করা চলিবে।

উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কমিটি একমত কিন্তু, উন্নত উৎপাদন কৌশল

প্রবর্তন করিয়া কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট করিতে কমিটি রাজী নয়। কমিটি স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, অনুরূপ উৎপাদন কৌশলের ক্ষেত্রে নিয়োগ বৃদ্ধির কোন প্রস্তাব নাই। কিন্তু যখন নতুন মূলধন বিনিয়োগ হইবে তখন উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হইবে।

কমিটির মতে যেহেতু গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পে প্রচুর বেকার রহিয়াছে, যে শিল্প সম্পর্কে ইহাদের জ্ঞান আছে, নিজেদের যন্ত্রপাতি আছে, সেই সকল শিল্পে নিয়োগ বৃদ্ধি করাই সুবিধাজনক। ইহার ফলে মূলধন, বিনিয়োগ এবং দক্ষ শ্রমিকের অসুবিধা দূর হইবে। মূল ও ভারী শিল্পায়নের সাথে সাথে গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের সাহায্যে ভোগ্য পণ্যের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইবার ব্যবস্থা করাই দ্বিতীয় পরিকল্পনার মূল শিল্পনীতি।

কমিটির মূল নীতি সফল করিতে হইলে ভোগ্য পণ্য শিল্পসমূহের উৎপাদনের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারণ করিয়া দিতে হইবে। ইহার ফলে ভোগ্য বস্তুর জ্ঞাত জনসাধারণের বাড়তি চাহিদা ক্ষুদ্র শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি প্রবাহিত হইবে। অবশ্য ইহার জ্ঞাত সংগঠন, বিক্রয় ব্যবস্থা এবং অর্থসরবরাহ ক্ষেত্রে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু রিপোর্টে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নতির জ্ঞাত কমিটি যে সকল ধনাত্মক সুপারিশ করিয়াছে তাহা কার্যকরী করা বিশেষ সময় সাপেক্ষ। সুতরাং ঋণাত্মক সুপারিশসমূহ অবিলম্বে কার্যকরী করা সম্ভবপর হইবে না। বৃহদায়তন উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ প্রভৃতি ঋণাত্মক সুপারিশসমূহ কার্যকরী করা হইলে অদক্ষ উৎপাদন-কৌশল অব্যাহত থাকিবে এবং উন্নত উৎপাদন-কৌশল গ্রহণ করা কঠিন হইবে।

কমিটির ধনাত্মক সুপারিশসমূহকে ছয়ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে বিকেন্দ্রিকরণ করিয়া সমবায়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা ; (খ) সাধারণ ক্রয়বিক্রয় সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া উৎপাদনের জ্ঞাত কাঁচামাল এবং যন্ত্রপাতির যোগান ও উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাথমিক পর্যায়ে সমবায় সমিতি সরকারী গ্যারান্টি লইয়া কাজ করিবে ; (গ) সমবায় উন্নয়ন এবং গুদামঘর কর্পোরেশন গঠনের জ্ঞাত আইন পাশ করা হইলে উহার মাধ্যমে গ্রাম এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্যসমূহ বিক্রয়ের ব্যবস্থাও করিতে হইবে ; (ঘ) রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশনের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ও গ্রামশিল্পে দীর্ঘকালীন ঋণ গ্রহণ করা হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি কর্পোরেশনে একটি করিয়া গ্রামশিল্প বিভাগ খুলিতে হইবে ; (ঙ) কৃষি ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যেকোন সামগ্রিক দায়িত্ব লইয়া কাজ করিতেছে সেইরূপ ক্ষুদ্র ও সমবায় শিল্পের ক্ষেত্রেও ঋণ সরবরাহের সামগ্রিক দায়িত্ব উহাকে লইতে হইবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কও গ্রাম ও ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে ক্রমশই অধিকতর আগ্রহ লইবে ; (চ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জ্ঞাত কেন্দ্রে ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি পৃথক মন্ত্রিসভা গঠন করা প্রয়োজন।

কমিটির ঋণাত্মক সুপারিশসমূহকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় : (ক) বৃহদায়তন

বস্ত্রশিল্প এবং ধানকলের উৎপাদন বৃদ্ধি রোধ করা এবং হস্তচালিত তাঁত ও টেকি হইতে চাল উৎপাদনের ক্ষেত্র সংরক্ষণ করা প্রয়োজন ; (খ) ভেষজ তৈল এবং চর্মশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি রোধ করিতে হইবে ; বর্তমানেই তৈলশিল্পের ৫০ শতাংশ অব্যবহৃত বলিয়া তৈল উৎপাদনের জগৎ কোন নূতন মিল স্থাপন করা চলিবে না ; চর্মশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি রোধ করিলেই চলিবে—অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতার উপর কোনরূপ সীমানির্ধারণ করার প্রয়োজন নাই। (গ) কমিটি বস্ত্রশিল্প, টেকি-ছাঁটা চাল, ভেষজ তৈল এবং চর্মশিল্পের ক্ষেত্রে সেস (Cess) এবং বিভেদমূলক গুস্ত্র ধার্ষের (differential excise duties) সুপারিশ করে। ইহার ফলে ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্যের দাম অপেক্ষাকৃত কম হইবে।

কার্তে কমিটির সুপারিশসমূহের পর্যালোচনা (Appraisal of Karve Committee's Recommendations) : কার্তে কমিটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হইল যে, গ্রাম ও কুটিরশিল্পে নিযুক্ত অধিকাংশ জনগণের উৎপাদন ক্ষমতা, আয় এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন জাতীয় সমৃদ্ধির পথে এক দৃঢ় পদক্ষেপ। এ বিষয়ে আমরাও কমিটির সহিত একমত। কিন্তু কমিটি নির্দেশিত পথে গ্রাম ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ হইলে শ্রমের গতিশীলতা হ্রাস পাইবে এবং ভবিষ্যতে উন্নত শিল্প-কৌশল ব্যবহার করা অসুবিধাজনক করিয়া তুলিবে।

ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতিটি পর্যায়ের উপযোগী যান্ত্রিক উন্নয়নের একটি নির্দিষ্ট মান আছে। পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাচীন ধরনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সাহায্যেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা চলিতে পারিবে। কিন্তু উহার যদি উৎপাদন কৌশল উন্নত করিতে না পারে তাহা হইলে এই শিল্পগুলি ভবিষ্যতে টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। দেশের উন্নয়ন ব্যবস্থাকে সফল করিতে হইলে ক্ষুদ্রশিল্পকে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ ও উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্য লইতে হইবে। আমাদের মনে হয়, কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পকে সংরক্ষণ করায় ভবিষ্যতে গ্রামীণ কারিগরেরা উন্নততর যন্ত্র ব্যবহার করিতে চাহিবে না। এই বিপদের সম্ভাবনা দূর করিতে হইলে কার্তে কমিটির সকল ধনাত্মক সুপারিশগুলি কার্যকরী করা প্রয়োজন।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা চিন্তা করিয়া এই সকল শিল্পকে অস্থায়ী সংরক্ষণ দান করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যে এই সকল শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির জগৎ সরকারের পক্ষে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রতিযোগিতামূলক সমাজ ব্যবস্থায় অদক্ষ শিল্পকে অধিকদিন বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হয় না।

ক্ষুদ্রশিল্পের সমস্যা (Problems of Small Industries) : আমাদের দেশের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহার মধ্যে উৎপাদন

বায়ের আধিক্যই প্রধান। সাময়িক সংরক্ষণ নীতি এই শিল্পের বর্তমান অসুবিধা দূর করিতে পারিলেও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস করিতে না পারিলে ইহার দীর্ঘস্থায়ী সমস্তার সমাধান হইবে না। জাপান ও সুইজারল্যান্ডের ক্ষুদ্রশিল্প হইতে আমরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি।

ভারী এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে সাধারণ উৎপাদন এবং সহযোগিতার কর্মসূচী (common production cum collaboration programme) হইল ক্ষুদ্রশিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ। জাপানে বৃহৎশিল্পের বিভাগীয় কাজ ক্ষুদ্রশিল্পের উপর গ্রস্ত করায় উৎপাদনব্যয় বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। জাহাজ নির্মাণ শিল্প তাহাদের মোট কাজের ৭০ শতাংশ, মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প তাহাদের কাজের ৩২ শতাংশ এবং বস্ত্রবয়ন যন্ত্রশিল্প তাহাদের কাজের ৩৪ শতাংশের জ্ঞান নির্ভর করে ক্ষুদ্রশিল্পের উপর। জাপানের দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায় যে, “সাধারণ উৎপাদন কর্মসূচী” গ্রহণ করিয়া উৎপাদনব্যয় হ্রাস করা যায়। ভারত সরকারও বর্তমানে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশনের মাধ্যমে সাধারণ উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে।

উৎপাদনবায়ের আধিক্য ব্যতীত কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের আরও কতকগুলি সমস্যা রহিয়াছে। অসম্বন্ধ সংগঠন, কারিগরী জ্ঞানের অভাব, ক্রটিপূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থা, মান নির্ধারণের অভাব, অর্থাভাব, কাঁচামাল এবং বিদ্যুতের ঘাটতি—এই শিল্পের উন্নয়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে। আশা করা যায় যে, নবগঠিত ক্ষুদ্রশিল্প সেবা সংস্থা, সর্বভারতীয় পর্যায়ে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন, ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন এবং রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন প্রভৃতি নবগঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রতিবন্ধক-সমূহ দূর করিতে পারিবে।

আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদলের নির্দেশিত প্রতিকার (Remedies Suggested by the International Planning Team, 1954) : ১৯৫৪

সালে আন্তর্জাতিক পরিকল্পনাদল ভারতের ক্ষুদ্রশিল্পসমূহ পরীক্ষা করিয়া উহাদের সমস্যা সমাধানের জ্ঞান নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ নির্দেশ করে :

(ক) পরিকল্পনা দল চারিটি বহুমুখীন কারিগরী প্রতিষ্ঠান (Multipurpose Institutes of Technology) গঠনের সুপারিশ করে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি দেশের সর্বত্র একরূপভাবে কারিগরী প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থাপন করিবে যাহাতে সমগ্র দেশের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। ইহা ব্যতীত এই দল ডিজাইন ও ক্যাসান শিক্ষা দিবার জ্ঞান জাতীয় ডিজাইন বিদ্যালয় (National School of Design) স্থাপনেরও সুপারিশ করে। ভোগ্য পণ্য সেবা কর্পোরেশন এবং রপ্তানি উন্নয়ন অফিস স্থাপন করিয়া দেশে ও বিদেশে উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

(খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পকে ঋণ ও অর্থসরবরাহ সম্পর্কে পরিকল্পনা দল সুপারিশ করেন যে, বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন এই সকল

শিল্পকে অধিক পরিমাণে ঋণদান করিবে। ভূসম্পত্তির জামিনে ঋণদানের ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিলে ক্ষুদ্রশিল্পের বিশেষ উপকার হইবে।

(গ) কাঁচামাল ক্রয় এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় সমবায় সমিতির মাধ্যমে করিতে হইবে।

(ঘ) কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্বয়ংশাসিত বিক্রয় সেবা কর্পোরেশন (Autonomous Marketing Service Corporation) গঠন করিয়া বিভিন্ন সমীক্ষার সাহায্যে ভোগকারীর চাহিদার পরিমাপ করিবে এবং উৎপাদককে তদনুযায়ী দ্রব্য উৎপাদনের ফরমাস দিবে।

আন্তর্জাতিক দলের সুপারিশসমূহ ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়ন এবং সংগঠনের ক্ষেত্রে নূতন সম্ভাবনার দিক উন্মুক্ত করিবে। সরকার চারটি বহুমুখী আঞ্চলিক কারিগরী বিদ্যালয়, একটি জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন এবং একটি বিক্রয় সেবা সংগঠন স্থাপন করিয়াছেন। কুটিরশিল্পের পুনর্গঠন এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা এই সংস্থাকুলির বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী নীতি (Government Policy towards Cottage and Small Scale Industries) : স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ক্ষুদ্র এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সরকারী নীতির আকাজক্ষিত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৯৪৮ এবং ১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় কুটির এবং ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্ত ৪২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ঐ খাতে ১৭৫ কোটি এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় ২৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অবশ্য তৃতীয় পরিকল্পনাকালে প্রকৃত ব্যয় হয় ২২০ কোটি টাকা। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়নের জন্ত ৩৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার ব্যবস্থা করা হইবে।

(ক) প্রথম পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রশিল্পের অগ্রগতি : প্রথম পরিকল্পনাকালে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্ত দুই ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় :

(১) ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়নের জন্ত প্রথম পরিকল্পনাকালে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়, এবং (২) খাদি ও বিভিন্ন গ্রামীণ শিল্পের জন্ত সর্বভারতীয় বোর্ড গঠন করা হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে চারটি আঞ্চলিক ক্ষুদ্রশিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান ও তাহার শাখা স্থাপন করিয়া কারিগরীশিক্ষা, পরামর্শ এবং সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্ত প্রথম পরিকল্পনাকালে জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন গঠন করা হয়।

(খ) দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অম্লসহ মূলনীতি : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার কার্তে কমিটির সুপারিশসমূহ কার্যকরী করিতে মনস্ত্ব করেন। কর্মসংস্থানের পরিমাণ যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেই উদ্দেশ্যে সরকার পুরাতন ধরনের কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নয়ন করিতে মনোযোগ দেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সকল রাজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প সেবা সংস্থা

স্থাপন করা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৪২টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সময় ৭০০ ক্ষুদ্রশিল্প সমন্বিত ৬০টি শিল্প তালুক গঠিত হয়।

১৯৫৬ সালের শিল্পনীতিতে গ্রাম ও ক্ষুদ্র শিল্পকে স্বয়ংনির্ভরশীল করিবার এবং বৃহদায়তন শিল্পের উন্নয়নের সহিত ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের সমন্বয় সাধন করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। আশা করা যায় গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্প্রসারিত এবং উহার মূল্য হ্রাস পাইলে ক্ষুদ্রশিল্প স্বয়ংনির্ভরশীল হইতে পারিবে।

পরিকল্পনা কমিশনের মতে সারাদেশে সমবায় সমিতি স্থাপন করিয়া কাঁচামালের যোগান এবং উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। আশা করা যায় সেবা-সমবায়গুলি ইহা করিতে সমর্থ হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ক্ষুদ্র গ্রামশিল্পের জন্ম ১৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই সময়ে ১২০টি শিল্পতালুক স্থাপনের অনুমোদন পাওয়া যায় কিন্তু কার্যত মাত্র ৬০টি স্থাপিত হয় এবং বাকী ৬০টি তৃতীয় পরিকল্পনাকালে স্থাপিত হয়। এই সময় সকল রাজ্যে ক্ষুদ্রশিল্প সেবা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় এবং ৪২টি সম্প্রসারণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই সময় জাতীয় ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশন ঠিকা-সওয়ার ভিত্তিতে (hire purchase scheme) ২ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে।

(গ) তৃতীয় পরিকল্পনায় অনুমত নীতি কর্মসংস্থানবৃদ্ধি এবং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃহদায়তন শিল্পের সহিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পেরও উন্নতি করা হয়। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্ম তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ২৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। অবশ্য প্রকৃত ব্যয় অনেক কম হইয়াছিল—২২০ কোটি টাকা। এই সময় নূতন ৩০০ শিল্পতালুক স্থাপিত হইবার কথা ছিল কিন্তু কার্যত ২৩৪টি শিল্পতালুক স্থাপিত হয়। আশা করা যায় চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ২৫০টি শিল্পতালুক স্থাপিত হইবে।

ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প ভারতীয় অর্থনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দেশের বেকার ও অর্ধবেকার সমস্যা সমাধানে ক্ষুদ্রশিল্পের বিশেষ ক্ষমতা রহিয়াছে বলিয়া অর্থনীতিতে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় ইহার বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে। গতিশীল পৃথিবীতে ইহাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহাদের পুনর্গঠন এবং পুনর্বিভাস অপরিহার্য।

প্রশ্নপত্র ও উত্তরসংকেত

1. On what lines and by what methods would you like to develop our cottage and small scale industries, so that they may play a useful part in India's economic development ?

(C. U. B. A. '59) [পৃষ্ঠা ২৫০-৫২, ২৫৩-৫৪]

2. Indicate the role of small industries in the Indian Economy. Comment on the measures adopted by the Government in India to develop them. (C. U. B. Com. '64, '65) [পৃষ্ঠা ২৫৪-৫৫]

3. Indicate the steps that have been taken to develop small scale industries in India during the plan period.

(C. U. B. Com. '63) [পৃষ্ঠা ২৫৪-৫৫]

4. Discuss the role that cottage industries in India are expected to play in the maintenance of production and employment. What attempts are being made by the Government of India to improve the position of these industries ?

(C. U. B. A. '54) [পৃষ্ঠা ২৫০-৫৫]

5. Explain the difficulties faced by the small scale industries in India and comment on the measures adopted by the Government to deal with them.

(B. U. B. A. '62) [পৃষ্ঠা ২৫২-৫৫]

কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প ও তাহাদের সমস্যা (Problems of some Large Scale Industries)

ভারতের কয়েকটি বৃহদায়তন শিল্প ও তাহাদের সমস্যার আলোচনা করা হইল :
বস্ত্রশিল্প (Cotton Mill Industry) :

(ক) বিবর্তন : ১৮১৮ সালে কলিকাতার নিকটবর্তী লুগলী জেলার অন্তর্গত ঘুসারী অঞ্চলে প্রথম বস্ত্রশিল্প স্থাপিত হইলো ও ১৮৫৪ সালে বোম্বাই-এ বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠার পর এই শিল্পের প্রকৃত অগ্রগতি শুরু হয়। ১৯২৬ সালে এই শিল্পকে প্রথম সংরক্ষণ দেওয়া হয় এবং ১৯৪৭ সালে উহা তুলিয়া লওয়া হয়। দীর্ঘ ২১ বৎসর সংরক্ষণের আওতায় থাকিয়া শিল্পটির বিশেষ অগ্রগতি হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক বন্ধ হওয়ায় এই শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। ১৯৪৪ সালে ৪৮৫০ মিলিয়ন গজ বস্ত্র উৎপাদন করিয়া বস্ত্রশিল্প রেকর্ড স্থাপন করে। দেশবিভাগ হওয়ায় কাঁচা তুলার সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় এই শিল্প বিশেষ সমস্যার সম্মুখীন হয়। পরে অবশু দেশে তুলার উৎপাদন এবং আমদানি বৃদ্ধি করিয়া অবস্থার উন্নতি করা হয়। ফলে ১৯৫৩ সালের জুলাই মাসে বস্ত্রের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া সম্ভব হয়। সাম্প্রতিককালে ভারত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে বস্ত্র রপ্তানি করিতেছে। এই উদ্দেশ্যে একটি রপ্তানি উন্নয়নসংস্থা গঠন করা হইয়াছে।

(খ) শিল্পগত অবস্থানের পরিবর্তন : ১৯২০ সাল পর্যন্ত বস্ত্রশিল্প বোম্বাই অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল। বর্তমানে বস্ত্রশিল্প দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বোম্বাই প্রধানত মিহি বস্ত্র তৈয়ারী করে। উত্তর ভারত, মাদ্রাজ এবং মহীশূরে প্রধানত মোটা কাপড় তৈয়ারী হয়।

(গ) সমস্যাবলী : এই শিল্প প্রধানত চারিটি মূল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথমত, কাঁচামালের সমস্যা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫৬-৬১) ৬.৫ মিলিয়ন গাঁট কাঁচা তুলা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে প্রকৃত উৎপাদন হয় ৪.৭ মিলিয়ন গাঁট এবং শেষ বৎসরে হয় ৫.৪ মিলিয়ন গাঁট। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কাঁচা তুলার উৎপাদনলক্ষ্য ৭ মিলিয়ন গাঁটে ধার্য করা হয়। কিন্তু পরিকল্পনার চতুর্থ ও পঞ্চম বৎসরে প্রকৃত উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৫.৪ মিলিয়ন গাঁট এবং ৪.৭ মিলিয়ন গাঁট। পরিকল্পনা রচয়িতাগণ আশা করেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৮.৬ মিলিয়ন গাঁট হইবে। মিহি বস্ত্রের চাহিদা ক্রমশই বাড়িতেছে। মিহি বস্ত্রের উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলার আমদানি বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে, দেশের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থার ক্রমশই অবনতি ঘটতেছে।

দ্বিতীয়ত, এই শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা অত্যন্ত কম। উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাইলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহার দরুন হয় মুনাফা হ্রাস পাইবে নতুবা মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিয়া শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করা বিশেষ প্রয়োজন। ইহার জ্ঞাত শিল্পে আধুনিকীকরণ করা প্রয়োজন, ইহাতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যয়সঙ্কোচ ঘটবে। তৃতীয়ত, রপ্তানি বৃদ্ধির সমস্তা রহিয়াছে। হস্তচালিত তাঁতশিল্পের দ্বারা দেশের চাহিদার এক বিরাট অংশ সংরক্ষিত রাখিয়া তৃতীয় পরিকল্পনাকালে বৎসরে ৮৫০ মিলিয়ন গজ বস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে। ১৯৬৬ সালে মিলবস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪২৫ মিলিয়ন গজ। প্রসঙ্গত ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৬ সালের মুদ্রা-মান হ্রাসের সহিত বস্ত্রশিল্পের জ্ঞাত রপ্তানি উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যত বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু শীঘ্রই উপলব্ধি করা যায় যে, টাকার মূল্য হ্রাস সত্ত্বেও বস্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নাই। কাঁচা তুলা, বস্ত্রবয়ন যন্ত্রপাতি, রং এবং রাসায়নিক দ্রব্য বাহির হইতে আমদানি করা হয় বলিয়া মুদ্রামান হ্রাসের ফলে বস্ত্রশিল্পে উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি পাইলে বস্ত্র রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পাইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হয়। সাম্প্রতিককালে হল্যান্ড, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, স্পেন এবং জাপান বস্ত্র রপ্তানি শুরু করায় বৈদেশিক বাজারে ভারত তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতেছে। আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যের মান উন্নত এবং দাম হ্রাস করিতে না পারিলে ঐ সকল দেশের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারত টিকিতে পারিবে না। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে আধুনিকীকরণ করিয়া ইহার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। পাকিস্তানও বস্ত্রশিল্প গড়িয়া তুলিতে মনোযোগী হইয়াছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি, পর্যাপ্ত কাঁচামাল এবং সুলভ শ্রমিকের সুবিধা থাকায় আশা করা যায় যে, পাকিস্তানও অদূর ভবিষ্যতে তাহার আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাপড় রপ্তানি করিতে পারিবে। চতুর্থত, পুরাতন যন্ত্রপাতির আশু পরিবর্তন প্রয়োজন। ১৯৫০ সালে বোম্বাই মিল মালিক সংঘের এক হিসাব হইতে জানা যায় যে, বোম্বাই অঞ্চলে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির ৯০ শতাংশ ২৫ বৎসরের পুরাতন। বস্ত্রশিল্পের ওয়ার্কিং দলের (Working Party for the Cotton Textile Industry) মতে এই শিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ যন্ত্রপাতিই মাস্কাতা আমলের এবং উহাদের সম্বন্ধ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এই ধরনের যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিলে উৎপাদনব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদিত দ্রব্যের মানের অবনতি ঘটবে এবং শ্রমিকদের উপর অধিক চাপ পড়িবে। ওয়ার্কিং দলের মতে আগামী ১০ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। জাতীয় উন্নয়ন কর্পোরেশনের মতে বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে ১৮০ কোটি টাকা লাগিবে। ১৯৬৬ সালের মার্চের মধ্যে বিদেশ হইতে বস্ত্রবয়ন যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে ৬০ কোটি টাকা লাগিবে। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৬ সালের মার্চ পর্যন্ত বস্ত্রশিল্পের পুনর্গঠন এবং আধুনিকীকরণের জ্ঞাত ১২.৭ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে, কিন্তু কার্যত ১০.৪ কোটি টাকা বন্টিত হয়।

(ঘ) যোশী কমিটির সুপারিশ (১৯৫৮) : ১৯৫৮ সালের মে মাসে সরকার শ্রী ডি. এস. যোশীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়া এই শিল্পের বর্তমান অসুবিধা দূর করিবার জন্ত সুপারিশ করিতে নির্দেশ দেন। এই কমিটি বস্ত্রশিল্পের উপর গুরু হ্রাস করিবার সুপারিশ করে। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে এই সুপারিশ কার্যকরী করা হয়। আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশ ছিল যে, ইহার ফলে বেকারত্বের সৃষ্টি হইলে বেকার শ্রমিকদের বিকল্প নিয়োগ দিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে যোশী কমিটি কোন নূতন সিদ্ধান্ত লইতে পারে নাই। কোন কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতির পরিবর্তে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইতে হইলে বস্ত্রশিল্প এবং সমগ্র দেশের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া তাহা করিতে হইবে। পরিশেষে, যাহারা কেবলমাত্র রপ্তানির জন্তই উৎপাদন করিবে কমিটি প্রায় ৩০০০ স্বয়ংক্রিয় তাঁতের ব্যবহার তাহাদের জন্তই সুপারিশ করিয়াছে। ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সরকার ঘোষণা করেন, স্বয়ংক্রিয় তাঁত ও অগ্নাশ্রু প্রয়োজনীয় যে-সকল যন্ত্রপাতি এদেশে প্রাপ্ত হইয়া না, উহাদের বিদেশ হইতে আমদানি করিতে সরকার অনুমতি দিবেন। নূতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদিত সমস্ত দ্রব্য রপ্তানি করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত অগ্নাশ্রু মিলগুলিকে তাহাদের রপ্তানির ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে হইবে। রপ্তানি ব্যাপারে এরূপ কঠোর সর্ত আরোপ করা উচিত হয় নাই।

(ঙ) সরকারী নীতি : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হয় যে, ১৯৬০-৬১ সালে কাপড় উৎপাদন এবং সূতা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৮৫০০ মিলিয়ন গজ এবং ১২০০ মিলিয়ন পাউণ্ডে ধার্য করা হইয়াছে।

১৯৫৫-৫৬ সালে মাথাপিছু ১৬ গজ কাপড় পাওয়া যাইত, ১৯৬০-৬১ সালে উহা বৃদ্ধি করিয়া ১৮.৪ গজ লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়। এই বর্ধিত আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইতে হইলে ৭৫০০ মিলিয়ন গজ বস্ত্র লাগিবে। ইহার সহিত রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ১০০০ মিলিয়ন গজ যোগ করিলে মোট ৮৫০০ মিলিয়ন গজ উৎপাদন করা প্রয়োজন হইবে। কাঁচা তুলার ঘাটতি, অধিক উৎপাদন ব্যয়, উচ্চ কর হার, প্রাচীন যন্ত্রপাতি প্রভৃতি অসুবিধার জন্ত ১৯৬০-৬১ সালে আভ্যন্তরীণ ভোগ এবং রপ্তানির জন্ত যথাক্রমে ৬৭৫০ মিলিয়ন গজ এবং ৫৭৫ মিলিয়ন গজ কাপড় পাওয়া যায়।

১৯৬৫-৬৬ সালে জনগণকে মাথাপিছু ১৭.৫ গজ কাপড় সরবরাহ করিতে ৮৪৫০ মিলিয়ন গজ কাপড় লাগিবে বলিয়া তৃতীয় পরিকল্পনায় হিসাব করা হয়। কিন্তু কাঁচা তুলার ঘাটতি, এবং মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাব, উচ্চ করভার প্রভৃতি কারণে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। সাধারণত আয়ের অধিক অংশ খাজ ক্রয়ে ব্যয়িত হওয়ায় বস্ত্রের জন্ত পর্যাপ্ত ব্যয় করা সম্ভব হয় না। এই কারণে কাপড়ের ব্যবহার বৃদ্ধি পায় নাই। মুদ্রামান হ্রাস করিয়াও বস্ত্রের রপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় নাই। এইজন্ত বর্তমানে এই শিল্পে অব্যবহৃত উৎপাদন-ক্ষমতার সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের উপর বিশেষ চাপ পড়ে। নিয়ন্ত্রণ প্রণ

এবং কাপড়ের উপর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন শুদ্ধ এই শিল্পের ক্ষতি করে। সরকার অনেক বিলম্বে বুঝিতে পারেন যে, উৎপাদন শুদ্ধ হ্রাস করা প্রয়োজন কিন্তু তখন শিল্পে সঙ্কট শুরু হইয়া গিয়াছে। ১৯৫৭ সালে মাঝারি কাপড়ের উপর উৎপাদন শুদ্ধ হ্রাস করা হয়। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে পুনরায় উৎপাদন শুদ্ধ হ্রাস করা হয়—এই সময় সকল ধরনের বস্ত্রই ইহার সুবিধা লাভ করে। ১৯৫৮ সালের জুলাইমাসে ঘোশী কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পুনরায় উৎপাদন শুদ্ধ হ্রাস করা হয়। কিন্তু ১৯৬২-৬৩, ১৯৬৩-৬৪, ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে বাজেটে কাপড় এবং সূতার উপর উৎপাদন-শুদ্ধ বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬৪ সালের অক্টোবর মাসে কাপড়ের উপর আংশিক নিয়ন্ত্রণ ধার্য করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণের কার্যসূচী ত্রিবিধ—উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ, গুণ নিয়ন্ত্রণ এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ। ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে নিয়ন্ত্রিত কাপড়ের দাম ৪.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয় এবং অত্যধিক করভার—বর্তমানে বস্ত্রশিল্প এই অসুবিধা সত্ত্বেও সম্প্রসারণশীল এবং ইহার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়।

পাটশিল্প (Jute Industry) : (ক) বিবর্তন : কলিকাতা ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই পাটশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। কাঁচা পাটের সহজপ্রাপ্তি, ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্টদের নিকট হইতে পর্যাপ্ত অর্থ সরবরাহ এবং কলিকাতা বন্দরের সাল্লাদ্য প্রভৃতি সুবিধার দরুন কোনরূপ সংরক্ষণ ব্যতিরেকেই এই শিল্পটি দ্রুত উন্নতিলাভ করে। বিশ্ববাপী মন্দার সময় এই শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পুনরায় ইহার অগ্রগতি হয়। দেশবিভাগ এই শিল্পের উপর চরম আঘাত হানিয়াছে। দেশ বিভাগের ফলে পাট উৎপাদক অঞ্চলগুলি পড়িয়াছে পাকিস্তানে আর পাটকলগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাটকল স্থাপিত হওয়ার পর পাকিস্তান হইতে পাটের সরবরাহ হ্রাস পাইয়াছে। আভ্যন্তরীণ পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা, পাটের পরিবর্তে মেষ্য ব্যবহার এবং পাকিস্তানের সহিত বাণিজ্য চুক্তির ফলে প্রথম পরিকল্পনার শেষে অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়।

প্রথম পরিকল্পনাকালে উৎপাদন-শুদ্ধের উপর সর্বক দৃষ্টি রাখা হয় এবং কয়েকবার উহা হ্রাস করা হয়। ১৯৫৫ সালের আগষ্ট মাসে পাকিস্তান মুদ্রামান হ্রাস করে। মুদ্রামান হ্রাসের সুবিধা যাহাতে পাকিস্তান পাইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারত সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন শুদ্ধ রহিত করিয়াছেন।

(খ) পাটশিল্প বর্তমানে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়াছে :

প্রথমত, কাঁচামালের সমস্যা : পাট উৎপাদক অঞ্চলের ৮০ শতাংশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে বলিয়া পাটশিল্পে কাঁচামালের বিশেষ অভাব দেখা দিয়াছে। আশা করা হইয়াছিল যে, পাট উৎপাদক অঞ্চলের সম্প্রসারণের দরুন আভ্যন্তরীণ উৎপাদন ৩৩ মিলিয়ন গাঁট (১৯৫০-৫১) হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫-৫৬ সালে ৫০১ মিলিয়ন

গাঁট হইবে। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে মাত্র ৪.২ মিলিয়ন গাঁট পাট উৎপাদিত হয় এবং উহা অত্যন্ত নিম্নমানের। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৫ মিলিয়ন গাঁটে ধার্য করা হয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারত প্রথম কাঁচা পাট উৎপাদনের স্বয়ংনির্ভরশীলতা অর্জন করে। কিন্তু বহু এবং প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন ১৯৫৯-৬০ সালে পাট উৎপাদন সন্তোষজনক হয় নাই—মাত্র ৪.২ মিলিয়ন গাঁট উৎপাদিত হইয়াছিল। ১৯৬০ সালে এই শিল্প বিশেষ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়। ফটকা-বাজী এবং কৃত্রিম দুস্ত্রাপ্যতার সৃষ্টি করিয়া এই সঙ্কটকে ত্বরান্বিত করা হয়। পরে অবশু অবস্থার উন্নতি হয়। ১৯৬২-৬৩ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে কাঁচা পাটের উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৫.৫ মিলিয়ন গাঁট এবং ৬ মিলিয়ন গাঁটে ধার্য করা হয়। ১৯৬২ সাল হইতে ১৯৬৫ সাল, এই পর পর তিন বৎসর ভাল ফসল হওয়ায় কাঁচামালের ঘাটতি সাময়িকভাবে দূর হয়। কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ার দরুন পুনরায় ১৯৬২-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে কাঁচাপাটের উৎপাদন হ্রাস পায়। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪.৫ মিলিয়ন গাঁট এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ৫ মিলিয়ন গাঁট পাট উৎপাদিত হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার বৎসরে ৭.৫ মিলিয়ন গাঁট পাট ও মেস্তা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় এবং ইহার মধ্যে কাঁচা পাটের উৎপাদন ৬.২ মিলিয়ন গাঁটে ধার্য করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে পাট উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৯ মিলিয়ন গাঁটে ধার্য করা হয়।

দ্বিতীয়ত, আধুনিকীকরণের সমস্যা : পাটশিল্পে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অধিকাংশই মাল্ধাতা আমলের এবং অত্যধিক ব্যবহারের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত। যুদ্ধোত্তরকালে ইউরোপীয় দেশগুলিতে পাটশিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং পুনর্গঠন হইয়াছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল, ফিলিপাইন, জাপান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশসমূহ আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে এই শিল্প গড়িয়া তুলিতেছে। আমাদের এই শিল্পকে আধুনিকীকরণ করিয়া, ইহার প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে অগ্ৰাণু দেশ, বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের সহিত আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সহজ হইবে না। বড় বড় পাটকলগুলি নিজেরাই আধুনিক যন্ত্রপাতি ক্রয় করিয়া শিল্পের পুনর্গঠন করিয়াছে। ১৯৫৫ সালে জাতীয় শিল্পায়োজন কর্পোরেশন ঘোষণা করে যে, শিল্পের আধুনিকীকরণের জন্ত প্রয়োজন হইলে ইহা ঋণদান করিবে। ১৯৬৬ সালের মার্চ পর্যন্ত এন. আই. ডি. সি. পাটশিল্পের আধুনিকীকরণের জন্ত ৭.৫ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৫.৮ কোটি টাকা ঋণ বন্টিত হয়।

মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিবর্ত দ্রব্য ব্যবহার এই শিল্পের তৃতীয় সমস্যা। দেশ বিভাগের পর পাটের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় পাটজাত দ্রব্যের দাম বিশেষ বৃদ্ধি পায়। দাম বৃদ্ধির সুযোগ লইয়া পাটের বহু পরিবর্ত দ্রব্যের ব্যবহার শুরু হইয়া যায়। বিদেশে ‘শিশল’ এবং ‘কেনাক’ পাটের পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ইহা ছাড়া কাগজ এবং কাপড়ের ব্যাগও বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। একসঙ্গে অধিক

পরিমাণ দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি (bulk handling) পাটজাতদ্রব্যের চাহিদা হ্রাস করিয়াছে। পাটজাত দ্রব্যের মূল্য যাহাতে অব্যাহতিভাবে বৃদ্ধি পাইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে ১৯৬০ সালের শুরুতে কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে পাট এবং পাটজাত দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (লাইসেন্স) নির্দেশ জারি করা হয়।

(গ) ১৯৫৪ সালের পাটশিল্প অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ : শ্রী কে. আর. পি. আরেদ্বারের সভাপতিত্বে একটি পাটশিল্প অনুসন্ধান কমিশন গঠন করা হয় ; ১৯৫৪ সালের মে মাসে এই কমিশন তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি এইরূপ :

(১) পাটশিল্পের জুতা একটি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা প্রয়োজন ;

(২) পুরাতন মিলগুলিতে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান থাকায় নূতন মিল স্থাপন বন্ধ রাখিতে হইবে ;

(৩) পাটশিল্পকে আধুনিকীকরণ এবং পুনর্গঠন করিতে হইবে ;

(৪) পাট উৎপাদনে চরম স্বয়ংসম্পূর্ণতার পরিবর্তে আপেক্ষিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করিতে হইবে। যে শ্রেণীর পাট দেশে উৎপন্ন হয় না তাহা পাকিস্তান হইতে আমদানি করিতে হইবে।

(৫) কাঁচা পাটের সর্বনিম্ন দাম নির্ধারিত করিয়া দিতে হইবে এবং আঞ্চলিক বণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে।

(৬) এই শিল্পটিকে কর অব্যাহতি দিতে হইবে।

এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে সরকার নূতন মিল স্থাপন বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন। পাটের গুণগত মানোন্নয়ন এবং নিবিড় চাষের মাধ্যমে কাঁচা পাট উৎপাদন বৃদ্ধির প্রতি সরকার অধিকতর দৃষ্টি দেন।

কমিশন সুপারিশ করেন যে, সরকার একজন পাট কমিশনার (Jute Commissioner) নিযুক্ত করিবেন। কমিশনার সংশ্লিষ্ট সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া কাঁচা পাটের ত্রাণ্য মূল্য নির্ধারণ করিবেন। কমিশনের মতে পাটের দাম নিয়ন্ত্রণ ভবিষ্যতে সুবিধাজনক হইবে না। এই কমিশন একটি পাট পর্ষৎ (Jute Board) গঠনের সুপারিশ করেন কিন্তু ইহার আশু প্রয়োজনীয়তা না থাকায় সরকার প্রস্তাট লইয়া পরে বিবেচনা করিবার আশ্বাস দেন।

(ঘ) বর্তমান অবস্থা : পাট শিল্পের বিগত ২০ বৎসরের ইতিহাস কঠোর জীবন-সংগ্রামের ইতিহাস। অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থার মধ্য দিয়া এই শিল্প বিশেষ কৃতিত্বের সহিত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। ১৯৫৬ সালের জাছুয়ারী মাসে যেসকল তাঁত বন্ধ ছিল তাহাদের ২২ শতাংশ পুনরায় চালু করা হয়। ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে আরও ৫ শতাংশ বন্ধ তাঁত পুনরায় চালু করা হয়। ইহার ফলে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি না পাওয়ায় অবিক্রীত পণ্যের পরিমাণ জমিতে থাকে।

১৯৫৬ সালে সরকারী নির্দেশে অতিরিক্ত উৎপাদন, পণ্যজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস, কাঁচা পাটের মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে অবিক্রীত পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার ফলে পাটকলগুলিকে বিশেষ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। ১৯৫৭ সালেও এই শিল্পে সমৃদ্ধির সূচনা দেখা যায় না। অবশ্য এই সময় রপ্তানির কিছু উন্নতি ঘটিয়াছিল। ১৯৫৮ সালে কাঁচা পাট উৎপাদনে স্বয়ংনির্ভরশীলতা আসায় এই শিল্পের উন্নতি দেখা দেয়। অ-দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ করিয়া অধিকতর দক্ষ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন শুরু করা হয়।

১৯৫৮-৫৯ সালে পাট উৎপাদন ভাল হওয়ায় কাঁচা পাটের মূল্য বৃদ্ধি পায় নাই। এই সময় আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং আমেরিকায় অর্থনৈতিক কাজকারবারের উন্নতি দেখা দেওয়ায় বৈদেশিক চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৯ সালে এই শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। কিন্তু ১৯৬০ সালে কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার সমন্বয়ে পাটশিল্পে পুনরায় অবনতি শুরু হয়। পাটের বাজারে ফটকা কারবার শুরু হওয়ায় কাঁচা পাটের দাম অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। ১৯৬১-৬২ এবং ১৯৬৩-৬৪ সালে কাঁচা পাটের উৎপাদন ভাল হওয়ায় এই শিল্পের অবস্থার উন্নতি হয়। বহির্বিপ্লবে পাকিস্তানের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জ্ঞাত দেশে দীর্ঘ আঁশযুক্ত পাট উৎপাদন এবং নূতন নূতন পাটজাত দ্রব্য উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় সরকার শ্রী এন. সি. শ্রীবাস্তবের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করিয়া বিদেশে ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কি ভাবে বৃদ্ধি করিতে পারা যায় সে সম্পর্কে উপায় উদ্ভাবন করিতে বলেন। ১৯৬৩ সালের আগস্ট মাসে কমিটি তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। কমিটি সুপারিশ করে যে, রাজ্য কৃষিবিভাগ-সমূহের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জ্ঞাত একটি পাট উন্নয়ন পর্ষৎ (Jute Development Board) গঠন করিতে হইবে।

১৯৬৫-৬৬ সালে পাটের উৎপাদন কম হওয়ায় এই শিল্পের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়। ১৯৬৬ সালের ২৩শে মে হইতে সকল পাটশিল্পই এক সপ্তাহ বন্ধ থাকে। ১৯৬৬-৬৭ সালেও এই শিল্পে সর্বাঙ্গিক সঙ্কট দেখা দেয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মুদ্রামান হ্রাসের পর পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানি হ্রাস পায়। এই শিল্পের সঙ্কট মোচনের জ্ঞাত নূতন এবং বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, পাটশিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যাহাতে সে পাকিস্তানের সহিত সাফল্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে। দ্বিতীয়ত, কাঁচা পাটের আভ্যন্তরীণ যোগান কম হইলে, পাকিস্তানের পরিবর্তে অন্যান্য বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলি হইতে উহা আমদানি করিতে হইবে। দেশের সর্ববৃহৎ বৈদেশিক মুদ্রা আহরণকারী শিল্প বলিয়া ইহার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জ্ঞাত সঠিক এবং বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

কয়লাখনি শিল্প (Coal Mining Industry) :

(ক) উৎপাদন সমস্যা : ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৫৫ সাল এই পঁচিশ বৎসরে কয়লা

শিল্পের অগ্রগতি সন্তোষজনক হইয়াছিল। ১৯৩০ সালে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৪ মিলিয়ন টন, ১৯৫৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়াইয়া। ১৯৬৩, '৬৪ এবং '৬৫ সালে উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৬৭ মিলিয়ন টন, ৬৪ মিলিয়ন টন এবং ৬২.৫ মিলিয়ন টন হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কয়লা উৎপাদনের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৬০ মিলিয়ন টন ধার্য করা হয়। ইহার মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগ হইতে ৪৫ মিলিয়ন টন এবং সরকারী উদ্যোগ হইতে ১৫ মিলিয়ন টন পাওয়া যাইবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই—উৎপাদন মাত্র ৫৫ মিলিয়ন টন হইয়াছিল। কয়লা উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইলেও ভারতীয় কয়লাখনি কমিটি, ১৯৪৬ (Indian Coal Field's Committee) এবং কয়লাশিল্পে ওয়ার্কিং দলের (Working Party on the Coal Industry, 1951) রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, কয়লা শিল্পের দক্ষতার মান অত্যন্ত নীচু। এই দুইটি কমিটি কয়লাখনি শিল্পে আশু যন্ত্রিকরণের সুপারিশ করেন।

ওয়ার্কিংদল কয়লাখনি শিল্পের উন্নতির জন্ত নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করিয়াছিল :

(১) যন্ত্রিকরণ : কয়লাখনি শিল্পে যন্ত্রিকরণ করা আশু প্রয়োজন, কারণ উহা করা না হইলে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যাইবে না। ছোট ছোট খনিগুলিতে যন্ত্রিকরণ করা সম্ভব নয় বলিয়া উহাদের সংযুক্তিকরণ করিতে হইবে। কয়লাখনির জন্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন করিতে হইবে ; (২) ধাতু নিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণ : ভারতে কোক কয়লার পরিমাণ অল্প বলিয়া ইহার অপচয় রোধ করিতে হইবে। লৌহ ও ইম্পাত শিল্পের প্রসারের জন্ত কয়লার প্রয়োজন বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়লাখনি স্টোইং আইনের এরূপ সংশোধন করা প্রয়োজন যাহাতে উহা ভাল কোক ও ধাতু নিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণের সহায়ক হয় ; (৩) আঞ্চলিক উৎপাদন : শিল্পে আধুনিকীকরণ, উন্নততর বন্টন ব্যবস্থা এবং কোলিয়ারী সংশ্লিষ্ট উন্নতির জন্ত আঞ্চলিক ভিত্তিতে উৎপাদন করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে কয়লা উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি পাইলেও বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির উপর বিধিনিষেধ ধার্য করা এবং উহার দাম বৃদ্ধির ফলে কয়লাশিল্পে অতি ধীর গতিতে যন্ত্রিকরণ করা হইয়াছে। ইহা স্মরণের কথা যে, বৈদেশিক সহযোগিতায় দুর্গাপুরে একটি কয়লাখনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা গড়িয়া উঠিতেছে। মূল্যবান কোক কয়লা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে কয়লাখনি (সংরক্ষণ এবং নিরাপত্তা) আইন পাশ করিয়া কোক কয়লার সর্বোচ্চ উৎপাদন মাত্রা ধার্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে নিম্ন স্তরের কয়লা ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

(খ) কয়লার গ্রায্য মূল্য এবং কয়লামূল্য সংশোধন কমিটির সুপারিশ : কয়লার মূল্য অত্যন্ত অল্প রাখার সরকারী নীতির ফলে এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। অর্থের অভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির গতি ব্যাহত হইতেছে এবং ঘাটতির সৃষ্টি করিতেছে।

এই সমস্যার সমাধানকল্পে কয়লার এরূপ মূল্য নির্ধারণ করা উচিত যাহার ফলে সম্প্রসারণের ব্যয়ভার বহন করা এবং রিজার্ভ-ফাণ্ড গঠন করা সম্ভব হইবে। ১৯৫৭ সালের মে মাসে সরকার মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব কয়লা মূল্য সংশোধন কমিটির (Coal Prices Revision Committee) উপর ছাড়িয়া দেন। কমিটি প্রথম চার স্তরের কয়লা ক্ষেত্রে টন প্রতি ৫০ পয়সা মূল্য বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। ইহার ফলে টন প্রতি ১.৭৫ পয়সা মুনাফা থাকিবে, ইহাই গ্রাহ্য মুনাফা হইবে, দুইটি সর্বনিম্ন স্তরের কয়লা সম্পর্কে কমিটি এই মত পোষণ করে যে, বর্তমান মূল্যকে “নির্দিষ্ট মূল্য না বলিয়া সর্বোচ্চ মূল্য” বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে। সরকার কমিটির এই সকল সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

স্টোইং বা খনন কালে সাজাইবার পদ্ধতিতে অনুপ্রেরণা দিবার উদ্দেশ্যে কমিটি সুপারিশ করেন যে, স্টোইং বাবদ যে ব্যয় হইবে তাহা কয়লা পর্ষৎ (Coal Board) সাহায্যদান হিসাবে দিবে। এই উদ্দেশ্যে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্ত কমিটি টন প্রতি ২৫ পয়সা উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধির নির্দেশ দেয়। এই নির্দেশ অনুযায়ী সরকার ১৯৫৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে প্রতি টন কয়লায় ২৫ পয়সা উৎপাদন শুল্ক ধার্য করেন। যে সকল কলিয়ারী বিশেষ অনুবিধার মধ্যে রহিয়াছে তাহাদের সাহায্য দিবার নীতিও সরকার গ্রহণ করেন। শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ফলে ১৯৬০ সালে দুইবার কয়লার মূল্য বৃদ্ধি করিতে হয়। প্রথমবার টন প্রতি ৮১ পয়সা এবং দ্বিতীয়বার ৬ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে সকল স্তরের কয়লার মূল্য টন প্রতি ২৫ পয়সা বৃদ্ধি করা হয়। পরিশেষে, এক সমীক্ষা দলের (Study Group) সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার উচ্চস্তরের কয়লার মূল্য বৃদ্ধি করেন।

(গ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনা এবং কয়লা শিল্প : পরিকল্পনাকালে চারটি নূতন ইম্পাত কারখানা স্থাপন, বর্তমান কারখানাগুলির সম্প্রসারণ, রেলপথের সম্প্রসারণ এবং অসংখ্য তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই সকল কাজের জন্ত দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অতিরিক্ত ২২ মিলিয়ন টন কয়লার প্রয়োজন হইবে বলিয়া হিসাব করা হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ক্ষেত্রেই সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব লইয়া কাজ করিতে হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ অনুমিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা ৫ মিলিয়ন টন হ্রাস পায়। এখনও পর্যন্ত কয়লাখনি শিল্পের মোট উৎপাদনের ৮৮ শতাংশ বেসরকারী খনিগুলি হইতে পাওয়া যায় আর মাত্র ১২ শতাংশ সরকারী খনিগুলি সরবরাহ করে।

পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে বাৎসরিক ২৭ মিলিয়ন টন কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে, অবশ্য পরে ইহা হ্রাস করিয়া ৭৬ মিলিয়ন টন

করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ হয় ৭০ মিলিয়ন টন। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে কয়লা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১০৬ মিলিয়ন টনে ধার্য করা হয় কিন্তু উৎপাদনের বর্তমান গতিধারা লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, ঐ সময় কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ ৯০ মিলিয়ন টনের বেশি দাঁড়াইবে না।

বস্ত্র, পাট এবং কয়লাখনি শিল্পের আধুনিকীকরণ (Rationalization in Cotton, Jute and Coal Mining Industries) : ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর হইতে শিল্পে আধুনিকীকরণের একটি আদর্শ প্রকল্প রচনা করা হয়। ইহাতে মালিক ও শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আধুনিকীকরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে। শিল্পে আধুনিকীকরণ করা হইলে যে সকল শ্রমিক কর্মচ্যুত হইবে তাহাদের বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবেই আধুনিকীকরণ করিতে সরকারী অনুমোদন পাওয়া যাইবে।

আধুনিকীকরণ বলিতে শিল্পের পুনর্গঠন বুঝায়। বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পূর্বব্যবহার, আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, শ্রম এবং কাঁচামালের অপচয় রোধ করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস প্রভৃতি সকল বিষয়ই আধুনিকীকরণের অন্তর্গত। সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিকীকরণ হইলে শিল্পের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠন (“Rationalization means putting reason into industry.”)। আধুনিকীকরণের দরুন শিল্পের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে, উৎপাদনব্যয় হ্রাস এবং চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। শিল্পে আধুনিকীকরণ মূল্য হ্রাস করিয়া বাজার বৃদ্ধিতে সহায়তা করে বলিয়া আমাদের বস্ত্র, পাট এবং কয়লা শিল্পে আধুনিকীকরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

আধুনিকীকরণের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বড় অভিযোগ যে, ইহা বেকার সমস্তার সৃষ্টি করে। এই কারণে শ্রমিকেরা শিল্পে আধুনিকীকরণের বিরোধিতা করে। কিন্তু আধুনিকীকরণের ফলে যে বেকার সমস্তার সৃষ্টি হয় তাহা সাময়িক। আধুনিকীকরণের দরুন পণ্যের দাম হ্রাস এবং চাহিদা বৃদ্ধির ফলে অত্যধিক উৎপাদনের প্রয়োজন দেখা দিলে শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিবে এবং নিয়োগের অধিক সুযোগ আসিবে। সুতরাং সাময়িক বেকারত্বের ফলে শিল্পের সুদূরপ্রসারী উন্নয়ন বন্ধ রাখা যুক্তিসঙ্গত নয়। শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি করিতে না পারিলে উহাকে বাঁচাইয়া রাখা যাইবে না। শিল্পের উন্নতি করিতে হইলে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করিতেই হইবে আর আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই ইহা সম্ভব।

(ক) বস্ত্রশিল্পের আধুনিকীকরণ : বিশেষজ্ঞদিগের মতে বস্ত্রবয়ন যন্ত্রপাতির কার্যকরী আয়ুষ্কাল ৩০ হইতে ৩৫ বৎসর। অধিকাংশ ভারতীয় বস্ত্রশিল্পে যে সকল যন্ত্রপাতি ১৯২৭ সালে চালু করা হয় অতাবধি নেশুলিই বহাল রহিয়াছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সকল যন্ত্রপাতি ক্ষয়প্রাপ্ত এবং ব্যবহারের অযোগ্য। এই সকল পুরাতন যন্ত্রপাতি সরাইয়া আধুনিক যন্ত্রপাতি প্রবর্তন করা প্রয়োজন। ১৯৫৮ সালে ঘোষী

কমিটি ভারতীয় বস্ত্রশিল্প সমস্যার পর্যালোচনা করিয়া মন্তব্য করেন যে, অধিকাংশ বস্ত্র-শিল্পের যন্ত্রপাতি ৪০ বৎসরের পুরানো এবং উহাদের উপযোগিতা বিনষ্ট হইয়াছে। বস্ত্রশিল্পে আশু আধুনিকীকরণ করা না হইলে আমাদের রপ্তানি বাজার হারাইতে হইবে। শিল্পের বনিয়াদ দৃঢ় এবং রপ্তানি বাজার সংরক্ষণ করিতে হইলে বস্ত্রশিল্পের আধুনিকীকরণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

(খ) পাটশিল্পের আধুনিকীকরণ : পাকিস্তান, ব্রিজিল, ফিলিপাইন প্রভৃতি দেশ আধুনিক ধরনের পাটশিল্প স্থাপন করিয়াছে বলিয়া ইহারা কম দামে পাটজাত দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে। পাটশিল্পকে আধুনিকীকরণ না করিতে পারিলে ঐ সকল দেশের সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিতে পারিব না। পাট অনুসন্ধান কমিশন পাটশিল্পে দ্রুত আধুনিকীকরণের সুপারিশ করিয়াছেন। বর্তমানে সরকারও ইহা উপলব্ধি করিতেছেন যে, পাটশিল্পের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে আধুনিকীকরণের উপর। ইহা আশার কথা যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাটশিল্পে আধুনিকীকরণের কিছু কাজ শুরু হয়। এই সময় কতকগুলি অদক্ষ প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। দুইটি তাঁত ও একজন শ্রমিক— এই নীতি ১৬,০০০ তাঁতের ক্ষেত্রে চালু করা হয়। জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের সহায়তায় পাটশিল্পে আধুনিকীকরণ সম্ভাব্যজনক গতিতে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত জাতীয় শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন পাটশিল্পে আধুনিকীকরণের জন্য ৭.৫ কোটি টাকা ঋণদান করে। পাটশিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি যাহাতে দেশেই উৎপাদন করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করা যায় সেই উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপনের চেষ্টাও চলিতেছে।

(গ) কয়লাখনি শিল্প : ১৯৫১ সালে ওয়ার্কিং দল কয়লা শিল্পের সমস্যা পর্যালোচনা করিয়া দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বৃহৎ কোলিয়ারীগুলিতে আধুনিকীকরণের সুপারিশ করেন। বর্তমানে কয়লার মূল্য সংশোধনের জন্য যে দাবী উঠিয়াছে তাহার জন্যও আধুনিকীকরণের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। কয়লাশিল্পে আধুনিকীকরণ করা হইলে উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পাইবে, উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে এবং শিল্পের দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। কয়লাশিল্পে আধুনিকীকরণ করা হইলে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কয়লা উৎপাদনের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে তাহা পূরণ হইবে।

চিনি শিল্প (Sugar Industry) : (ক) বিবর্তন : ১৯৩২ সালে এই শিল্পকে সংরক্ষণ দান করা হয়। দীর্ঘ আঠারো বৎসর সংরক্ষণের সুবিধা পাইবার পর ১৯৫০ সালে সংরক্ষণ তুলিয়া লওয়া হয়। সংরক্ষণের আওতায় এই শিল্পের এরূপ উন্নতি হয় যে, ১৯৩৬ সালে ভারত চিনি উৎপাদনে স্বয়ংনির্ভরশীল হইয়া উঠে। কিন্তু ১৯৩৭ সাল হইতে '৪২ সাল পর্যন্ত অতিরিক্ত উৎপাদনের দরুন এই শিল্পে সংকট শুরু হয়। ১৯৪২ সালে জাপান যুদ্ধে যোগদান করায় মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে ভারতীয় চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু পরিবহনের অনুবিধার জন্য দেশে চিনি ছপ্পাপ্য হইয়া দাঁড়ায়।

সরকার বাধ্য হইয়া চিনি নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করেন। ১২৫২ সালের নভেম্বর মাসে চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়। চিনির উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার পর সহসা চিনির চাহিদা এবং প্রকৃত ভোগপ্রবণতাও বৃদ্ধি পায়। এই ক্রমবর্ধমান চাহিদা মিটাইবার জন্ত সরকার চিনি আমদানি করিতে বাধ্য হন। ১২৫৫ সালে আখের উৎপাদন ভালো হওয়ায় সরকার চিনি আমদানি বন্ধ করিয়া দেন। ১২৫৭ সালে আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়া ভারত ৩৮,০০০ টন চিনি রপ্তানি করে। কিন্তু ১২৫৮ এবং ৫৯ সালে চিনি উৎপাদন হ্রাস পায়। ১২৬০-৬১ সালে ৩০৩ মিলিয়ন টন চিনি উৎপাদিত হয়।

(খ) চিনি শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ : বিহার, যুক্তপ্রদেশ এবং অন্যান্য উত্তরাঞ্চলে চিনি শিল্পের একদেশতা ঘটিয়াছিল। ১২৩৬ সালে আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার সরবরাহ করে। বিহার ও যুক্তপ্রদেশ আখ উৎপাদক অঞ্চল বলিয়া এবং মূলধনের সহজলভ্যতা থাকার দরুন ঐ সকল অঞ্চলে চিনিশিল্পের একদেশতা ঘটে।

বর্তমানে দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করিয়া বোম্বাই, মাদ্রাজ, মহীশূর এবং অন্ধ্র চিনিশিল্প গড়িয়া উঠিবার প্রবণতা দেখা যাইতেছে। দক্ষিণের চিনি কারখানাগুলি উত্তর ভারতের কারখানার তুলনায় অধিকতর দক্ষ বলিয়া উহাদের উৎপাদন ব্যয় কম। দক্ষিণের কারখানাগুলির নিজেদের আখ উৎপাদনক্ষেত্র আছে, এবং ইহার ফলে আখ পেষণ করা সহজ হয়। অধিকন্তু অনুকূল আবহাওয়ার দরুন উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে আখ হইতে প্রাপ্ত চিনির পরিমাণ ১ হইতে ২ শতাংশ বেশি হয়। দক্ষিণ ভারতীয় চিনি-কলগুলি উপজাত দ্রব্য ব্যবহার করে, ইহাদের যন্ত্রপাতি আধুনিক ধরনের এবং বিহার ও যুক্তপ্রদেশের তুলনায় অধিকতর সুসংগঠিত।

(গ) চিনিশিল্পের সমস্যা : চিনিশিল্পের সমস্যাগুলিকে মোটামুটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমত, আখ যোগানের সমস্যা : বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের চিনিকলগুলি কাছাকাছি অবস্থিত থাকার ফলে উহাদের মধ্যে আখ লইয়া তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেয়। চিনিকলের মালিকদের এই প্রতিযোগিতার ফলে আখের মূল্য বৃদ্ধি পায়। ১২৫৬ সালে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৬৬.৮২ মিলিয়ন টনে পৌঁছায়। কিন্তু ১২৫৭ সালে উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৬৫ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়ায়।

পাঞ্জাবে বত্মা, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহারে খরা এবং দাক্ষিণাত্যে কীটের আক্রমণে ১২৬২-৬৩ এবং ১২৬৩-৬৪ সালে আখের উৎপাদন বিশেষ হ্রাস পায়। ১২৬৩ সাল হইতে চিনির দাম দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দামের এই উর্ধ্বগতি রোধ করিবার জন্ত ১২৬৩ সালের এপ্রিল মাসে পুনরায় চিনি নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয়।

দ্বিতীয়ত, আখের মূল্য এবং চিনিসংক্রান্ত নূতন নীতি : চিনি উৎপাদনে ষাটটি

পূরণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৩-৬৪ সালে সরকার ৩ মিলিয়ন টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে। বিভিন্ন আর্থ ব্যবহারকারীদের মধ্যে সমানভাবে আর্থ বন্টন করিবার নীতি সরকার গ্রহণ করেন। আর্থ উৎপাদকদিগকে কর্মপ্রেরণা (incentive) দিবার উদ্দেশ্যে সরকার মণপ্রতি ১৮ পয়সা মূল্য বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সরকারের চিনিসংক্রান্ত নূতন নীতি সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে যে, গুড় এবং খানেশরী (দেশীয় প্রথায় প্রস্তুত চিনি) বাদ দিয়া শুধুমাত্র চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ ধার্য করিলে সরকারী নীতি সফল হইবে না— ইহার জ্ঞাত প্রয়োজন একটি সুসঙ্গত নীতি গ্রহণ করা।

তৃতীয়ত, উৎপাদন তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছায় এবং তাহার পর হ্রাস পায় : ১৯৬৩-৬৪ সালে চিনি উৎপাদন নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ৩ মিলিয়ন টনে পৌঁছাইতে পারে নাই ; উৎপাদন হইয়াছিল মাত্র ২৫৬ মিলিয়ন টন। ১৯৬৪-৬৫ সালে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া ৩২৬ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়ায়। পরবর্তী বৎসরে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাইয়া ৩৫২ মিলিয়ন টনে পৌঁছায়। উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় ভারত ১৯৬৪-৬৫ সালে ২৮০,০০০ টন এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে ৪৩০,০০০ টন চিনি রপ্তানি করে। ১৯৬৬-৬৭ সালে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশে প্রচণ্ড খরার ফলে আখের উৎপাদন হ্রাস পায় এবং ইহার দরুন চিনি উৎপাদন হ্রাস পাইয়া ৩ মিলিয়ন টন অপেক্ষাও কম হয়। এই অবস্থায় রপ্তানি হ্রাস এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য ছিল।

চতুর্থত, আধুনিকীকরণ এবং কারিগরী দক্ষতা : চিনিশিল্প উন্নয়ন কাউন্সিল সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, চিনিকলগুলিকে আধুনিকীকরণ করিবার জ্ঞাত ৬০ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে। উচ্চ করহার এবং সংরক্ষিত তহবিলের অভাবে অধিকাংশ চিনিকল আধুনিকীকরণ করিতে পারিবে না। পাটশিল্প এবং বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও জাতীয়শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের অর্থ সাহায্য করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, সেন কমিশনের রিপোর্ট এবং চিনিনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশ্ন : ১৯৬৫ সালের অক্টোবর মাসে চিনি অনুসন্ধান কমিশন তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে বাৎসরিক ৭৫০,০০০ টন এবং পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে বাৎসরিক ১০ লক্ষ টন চিনি রপ্তানি করিবার নির্দেশ দেয়। ১৯৬৬-৬৭ সাল হইতে চিনির উপর নিয়ন্ত্রণ অপসারণ, আর ইহার জ্ঞাত মজুতকরণ এবং পূর্বনির্ধারিত সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মূল্য, খাত্ত কর্পোরেশনের (Food Corporation of India) মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ বন্টন এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের মাধ্যমে রপ্তানি—এইগুলি হইল সেন কমিশনের প্রধান সুপারিশ।

১৯৬৬-৬৭ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় চিনি বিনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সরকার বিভিন্ন অঞ্চলে চিনির মূল্য সংশোধন করেন। ইহার ফলে চিনির মূল্য বৃদ্ধি পায়।

চিনিশিল্প এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ : প্রথম পরিকল্পনায় চিনি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য ১.৫ মিলিয়ন টনে ধার্য করা হয়। ১৯৫২ সালে চিনি নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার পর সহসা চিনির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১.৫ মিলিয়ন টন হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১.৮ মিলিয়ন টনে ধার্য করেন। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে প্রকৃত উৎপাদন হয় ১.৮৬ মিলিয়ন টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২.২৫ মিলিয়ন টনে ধার্য করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে ৩.০৩ মিলিয়ন টন চিনি উৎপাদিত হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনায় চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪.৫ মিলিয়ন টনে ধার্য করা হয়।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry) : (ক) বিবর্তন : ভারতে লৌহ ও ইস্পাতশিল্পের প্রকৃত বনিয়াদের পত্তন হয় ১৯০৭ সালে বিহারের অন্তর্গত সাক্‌চিতে টাটা কোম্পানীর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের পর। ইহার পর ১৯০৮ সালে হিরাপুরে ‘ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কোম্পানী’ এবং ১৯২৩ সালে ভদ্রাবতীতে ‘মহীশূর লৌহ ও ইস্পাত কারখানা’ স্থাপিত হয়। তীব্র বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা পাইবার উদ্দেশ্যে ১৯২২ সালে এই শিল্পটি সংরক্ষণের জন্ত আবেদন করে। ১৯২৪ সালে ইহাকে সংরক্ষণ দান করা হয় এবং ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকে। সংরক্ষণের আওতায় থাকিয়া শিল্পটি দ্রুত উন্নতি করিতে থাকে। ১৯৫৭ সালে ১৩.৪৬ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদিত হয়। ১৯৫৮ সালে টাটার কারখানায় শ্রমবিরোধের দরুন উৎপাদন সামান্য হ্রাস পাইয়া ১২.২৫ লক্ষ টনে আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৭ সালে ১৭.৩ লক্ষ টন লৌহ ও ইস্পাত আমদানি করা হয়, ১৯৫৮ সালে আমদানির পরিমাণ ছিল ১১.৬ লক্ষ টন। ১৯৫৯ এবং ৬০ সালে ইস্পাত উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়ায় লৌহ ও ইস্পাতের আমদানি পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায়। ১৯৬২ সালে ঝরকেলা, ভিলাই এবং হুগাঁপুরে সরকারী উদ্যোগে তিনটি ইস্পাত কারখানা স্থাপিত হওয়ায় মোট ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়া ৪.৫ মিলিয়ন টনে আসিয়া দাঁড়ায়। প্রথম পরিকল্পনার শুরুতে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র এক মিলিয়ন টন।

(খ) লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সমস্যা : এই শিল্প নিম্নলিখিত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইয়াছে :

প্রথমত, ইস্পাতের মূল্য এবং বিনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতি : দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় ইস্পাতশিল্প সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ছিল। সরকার মূল্য নির্ধারণ করিয়া দিত এবং উহাকে কার্যকরী করার জন্ত বণ্টন ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছিল।

আমদানিকৃত ইস্পাত অপেক্ষা ভারতীয় ইস্পাতের মূল্য কম। উভয় প্রকার ইস্পাতের মূল্যের মধ্যে সমতা রক্ষার উদ্দেশ্যে সরকার “সমতামূলক মূল্য নীতি” (Retention Price Policy) অনুসরণ করেন। ক্রেতাদের ক্রয়মূল্য এবং

বিক্রেতাদের বিক্রয়মূল্যের (বিক্রেতাদের মূল্যকে Retention Price বলে) মধ্যে যে মূল্য পার্থক্য উহা হইতে লব্ধ অর্থ দ্বারা একটি সমতা বিধানকারী তহবিল (Equalisation Funds) গঠন করা হইয়াছে। এই তহবিল হইতে ইম্পাতশিল্পকে অর্থ সাহায্য করা হইবে।

১৯৬৪ সালের মার্চ মাস হইতে সরকার কয়েক ধরনের ইম্পাত ব্যতীত অগ্ৰাহ্য সকল প্রকার ইম্পাতের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লইবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহাও সিদ্ধান্ত করা হয় যে, নতুন লেনদেনের ক্ষেত্রে ইম্পাত সমতা বিধানকারী তহবিল কার্যকরী হইবে না। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিক্রয়মূল্য এবং সমতা মূল্যের মধ্যে আর কোনরূপ পার্থক্য থাকিবে না।

লৌহ ও ইম্পাত কট্টোলারকে সভাপতি করিয়া সরকার একটি সংযুক্ত কারখানা কমিটি (Joint Plant Committee) গঠন করেন। এই কমিটির প্রধান কাজ হইল বিভিন্ন ধরনের ইম্পাত উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

১৯৬৭ সালের ১লা মে হইতে সকল প্রকার ইম্পাতের মূল্য এবং বণ্টনের উপর হইতে নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে স্থাপিত সংযুক্ত কারখানা কমিটির উপর ভারতে উৎপাদিত ইম্পাতের মূল্য এবং বণ্টনের ভার গ্রস্ত করা হয়। রাজ-কমিটির সুপারিশ অনুসারে ইম্পাত বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৯৬২ সালের মার্চ মাসে ডঃ কে. এন. রাজকে সভাপতি করিয়া সমগ্র লৌহ ও ইম্পাত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরীক্ষা করিবার জ্ঞাত একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ইম্পাত চাহিদার যোগানের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ এবং অগ্ৰাহ্য ধরনের ইম্পাতের ক্ষেত্রে “নিয়ন্ত্রিত” বিনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করিবার নির্দেশ দেয়। রাজ কমিটির প্রধান সুপারিশ ছিল “সংযুক্ত কারখানা কমিটি” (Joint Plant Committee) গঠন করিয়া ফরমশ অনুযায়ী বিভিন্ন কারখানায় ইম্পাত উৎপাদন করা। সরকার রাজ-কমিটির এই সুপারিশ গ্রহণ করেন।

এই কমিটির আর একটি সুপারিশ ছিল যে, ভবিষ্যতে ইম্পাতের মূল্য শুদ্ধ কমিশনের পরিবর্তে সংযুক্ত কারখানা কমিটি স্থির করিবে। এই নীতি গ্রহণ করিলে চাহিদার প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উৎপাদন সহজ হইবে। অধিক উৎপাদন শুদ্ধ পাওয়া যাইবে বলিয়া কমিটি ইম্পাতের উৎপাদন মূল্য উচ্চ রাখিবার নির্দেশ দেন।

অগ্রাধিকারপূর্ণ ইম্পাত চাহিদার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের সমর্থন করিলেও কমিটি অগ্রাধিকার বহির্ভূত চাহিদার ক্ষেত্রে আংশিক বিনিয়ন্ত্রণ নীতির সুপারিশ করেন। কমিটির মতে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সকল প্রয়োজনের ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। কয়লা, ইম্পাত, তৈল, ভারী-যন্ত্রপাতি, কৃষি, জাহাজ-নির্মাণ, পরিবহণ প্রভৃতি মূল শিল্পের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অগ্রাধিকার দিতে হইবে। অগ্ৰাহ্য সকল প্রকার চাহিদা অগ্রাধিকার বহির্ভূত চাহিদা বলিয়া বিবেচিত হইবে।

কমিটি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, অগ্রাধিকার বহির্ভূত ইম্পাতের ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ করা হইবে না। প্রথমত, উৎপাদকগণ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে প্রথম বিক্রয় করিবার পর ইহা করা হইবে। দ্বিতীয়ত, কাঁচা লোহা যোগানের জ্ঞান না ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। কমিটি অগ্রাধিকার বহির্ভূত ইম্পাতের ক্ষেত্রে “বাজার যে মূল্য বহন করিতে পারে তাহা স্থির করার” (price should be what the market can bear) নীতি গ্রহণ করিয়াছে। পরবর্তীকালে সরকার এই নীতি সিমেন্টের ক্ষেত্রেও গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয়ত, ধাতু নিষ্কাশক কয়লা এবং ইম্পাত উৎপাদন সংক্রান্ত সমস্যা : দেশে ১০ হইতে ১১ মিলিয়ন টন ধাতু নিষ্কাশক কয়লা উৎপাদন হয় আর ইহার মধ্যে প্রায় পাঁচ মিলিয়ন টন লোহ ও ইম্পাত শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বাকী ৫৬ মিলিয়ন ধাতু নিষ্কাশক কয়লার অপচয় হইতেছে। লোহ ও ইম্পাত শিল্পের যেভাবে দ্রুত সম্প্রসারণ হইতেছে তাহার জ্ঞান ধাতু নিষ্কাশক কয়লা সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। দুর্গাপুর ইম্পাত কারখানায় উচ্চস্তরের ধাতু নিষ্কাশক কয়লা সরবরাহের উদ্দেশ্যে ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কোকচুলী কারখানা স্থাপন করেন।

(গ) লোহ ও ইম্পাতশিল্প এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা : দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনাকালে অনুমান করা হইয়াছিল যে, সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত লোহ ও ইম্পাত কারখানাগুলি হইতে ২ মিলিয়ন টন ইম্পাত পাওয়া যাইবে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করিতে হইলে দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রুরকেলা, দুর্গাপুর এবং ভিলাই-এ সরকারী উদ্যোগে তিনটি কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ইহাদের প্রত্যেকেরই এক মিলিয়ন টন লোহপিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা থাকিবে। রুরকেলা এবং ভিলাই-এ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ইম্পাত উৎপাদন শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে দুর্গাপুরের ইম্পাত কারখানার নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সোভিয়েট সহযোগিতায় বোকারোতে চতুর্থ ইম্পাত কারখানা স্থাপিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বোকারো ইম্পাত কারখানা হইতে ১০৭ মিলিয়ন টন ইম্পাত উৎপাদনের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ধার্য থাকিলেও পরে ইহা ৫৫ মিলিয়ন টন ইম্পাত উৎপাদন করিতে পারিবে। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ১০০২ মিলিয়ন টন ইম্পাতপিণ্ড (steel ingots) এবং ১০৫ মিলিয়ন টন কাঁচা লোহা (pig-iron) উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা কার্যকরী হয়। ইহার মধ্যে সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত ইম্পাত কারখানাগুলি হইতে ৫০২ মিলিয়ন টন এবং বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত কারখানাগুলি হইতে ৩০২ মিলিয়ন টন ইম্পাত পাওয়া যাইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে টাটা লোহ ও ইম্পাত কারখানা এবং ভারতীয় লোহ ও ইম্পাত কারখানার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩০ মিলিয়ন টন। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ৬৮ মিলিয়ন টন নির্মিত ইম্পাত (finished steel) উৎপাদন

করা। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে প্রকৃত উৎপাদন হয় ৪.৬ মিলিয়ন টন মাত্র। আশা করা যায় যে, চতুর্থ পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে অনুমিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে নির্মিত ইস্পাতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা ১০ মিলিয়ন টনের মত হইবে কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হইবে মাত্র ৮.৮ মিলিয়ন টন মাত্র। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে ইস্পাতপিণ্ড উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয় ১০ মিলিয়ন টনে কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন হইয়াছিল মাত্র ৭ মিলিয়ন টন। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ১৪.৮ মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে। এই লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে হইলেও শিল্পায়ণের গতিবেগ ত্বরান্বিত করিতে হইলে ইহা পূরণ করিতে হইবে। এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইলেও ভারত পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক পিছাইয়া থাকিবে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মাথাপিছু ইস্পাত ব্যবহারের পরিমাণ হইল ১২৩৭ পাউণ্ড, যুক্তরাজ্যে উহা ৬২৮ পাউণ্ড, অপর পক্ষে ভারতে উহা মাত্র ১৮ পাউণ্ড। বিশ্বব্যাপক এবং আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ারদিগের সহায়তায় টাটা লৌহ ও ইস্পাত কারখানা এবং ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত কারখানা চতুর্থ পরিকল্পনাকালে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া অনুমান করা যাইতেছে।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উন্নয়নের জন্ত ব্যাপক এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে যে, অদূর ভবিষ্যতে বর্তমান ইস্পাত কারখানাগুলি এবং যেগুলি নূতন স্থাপিত হইবে তাহারা আমাদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটাইতে পারিবে। করকেলা, ভিলাই এবং দুর্গাপুরে নবনির্মিত ইস্পাত কারখানাগুলির কাজ সম্পূর্ণ হইলে ইহারা প্রত্যেকে বৎসরে ৪০ কোটি টাকা মূল্যের ইস্পাত এবং কাঁচা লোহা উৎপাদন করিতে পারিবে।

চা-শিল্প (Tea Industry) : ভারতের অর্থনীতিতে চা, পাটের মত একটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প। সেইজন্ত ইহাকে স্বর্ণ আহরণকারী পত্র (golden leaf) বলা হয়। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে চা উৎপাদনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চা উৎপাদন এবং রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৭০০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং ৫০০ মিলিয়ন পাউণ্ড ধার্য করা হয়। ১৯৬০-৬১ সালে প্রকৃতপক্ষে ৭০৮ মিলিয়ন পাউণ্ড চা উৎপাদিত হয় এবং ৪৭৫ মিলিয়ন পাউণ্ড চা রপ্তানি করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৯০০ মিলিয়ন পাউণ্ডে ধার্য করা এবং রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ৭৫০ মিলিয়ন পাউণ্ডে ধার্য করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে অর্থাৎ তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে চাষের প্রকৃত উৎপাদন হয় মাত্র ৮৩০ মিলিয়ন পাউণ্ড এবং রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৫১০ মিলিয়ন পাউণ্ড।

প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও ১৯৬৬-৬৭ সালে ৩৭৬ মিলিয়ন কিলো চা উৎপাদিত হইয়া এক রেকর্ড স্থাপিত হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে চা উৎপাদন এবং রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৪২০ মিলিয়ন কিলো এবং ২৪০ মিলিয়ন কিলোয় ধার্য করা হয়।

(ক) এই শিল্পটি বর্তমানে কয়েকটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। উৎপাদন ব্যয়ের আধিক্য এই শিল্পের প্রধান সমস্যা। মূল্যস্তর বৃদ্ধি এবং বাগিচা-শিল্পে শ্রম-কল্যাণকর কর্মসূচী প্রবর্তনের দরুন শ্রমিকদিগের মজুরি ক্রমশ বাড়িতেছে। শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির মূল্যও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। চা-চাষের জন্ত রাসায়নিক সারের প্রয়োজন কিন্তু বর্তমানে সারের মূল্য বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে চাষের বিক্রয় মূল্য বৃদ্ধির জন্ত যখন চাপ পড়িতেছে এমন সময় ভারতীয় মুদ্রামান হ্রাস করা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার মূল্য ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়। মুদ্রামান হ্রাসের পর রপ্তানি কর ক্রেডিট পরিকল্পনা (export tax credit scheme) তুলিয়া লওয়া হয় এবং প্রতি কিলো রপ্তানিকৃত চাষের উপর ২ টাকা করিয়া রপ্তানি শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে মূল্যের ভিত্তিতে (ad valorem) রপ্তানি শুল্কের সংশোধন করায় রপ্তানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে মোরারজী দেশাই ঘোষণা করেন যে, চা এবং কফির উপর রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হইবে। চাষের উপর অধিক উৎপাদন শুল্ক ধার্য করা হইলেও রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করার দরুন মূল্য সমান থাকিয়া গিয়াছে। কিন্তু উৎপাদনশুল্ক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন দেশে চাষের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই শিল্পের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চা-অর্থ সরবরাহ কমিটি (Tea Finance Committee) বা চারি কমিটির (Chari Committee) সুপারিশসমূহ কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, আয়কর গণনার সময় উন্নয়নী ব্যয় হিসাবে নূতন এবং পুরাতন অঞ্চলে যথাক্রমে ৫০ শতাংশ এবং ৪০ শতাংশ বাদ দিতে হইবে। চা-শিল্পে মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের উদ্দেশ্যে এই কমিটি একটি চা-অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশন (Tea Finance Corporation) গঠনের সুপারিশও করেন। ভারত সরকার, চা-উৎপাদক রাজ্যসমূহ, অগ্রাগ্রহণ অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনসমূহ এবং চা-কোম্পানীগুলি এই কর্পোরেশনের মূলধন যোগান দিবে।

সম্প্রতি বাগিচা-শিল্প অনুসন্ধান কমিশন (Plantation Enquiry Commission) ব্যবস্থাপনা ব্যয় হ্রাস করিবার জন্ত এবং ‘আসাম বহন কর’ (Assam Carriage Tax) ও ‘পশ্চিমবঙ্গ অনুপ্রবেশ কর’ (W. Bengal Entry Tax) উচ্ছেদ করিবার জন্ত সুপারিশ করিয়াছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, চতুর্থ ফিনান্স কমিশন এই দুইটি করের পুনর্গঠনের সুপারিশ করেন।

চাষের মূল্য নির্ধারণের জন্ত লণ্ডনের নিলাম বাজারের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা এই শিল্পের দ্বিতীয় সমস্যা। ইহা সন্তোষের কথা যে, বর্তমানে লণ্ডন, কলিকাতা এবং কোচিনের নিলাম বাজারের গড় মূল্যের উপর নির্ভর করিয়া ভারতীয় চা-এর মূল্য নির্ধারণের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করা হইতেছে। চা নিলাম কমিটির সুপারিশ

অনুসারে ভারত সরকার লণ্ডনের নিলাম বাজারে ভারতীয় চা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। এই ব্যবস্থার ফলে কলিকাতা এবং কোচিনের চায়ের নিলাম বাজারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৬৬ সালের মুদ্রামান হ্রাসের পর চা রপ্তানি সম্প্রসারণের সম্ভাবনা এই শিল্পের তৃতীয় সমস্যা। মুদ্রামান হ্রাসের সহিত সকল প্রকার চায়ের উপর কিলো প্রতি ২ টাকা রপ্তানি শুল্ক ধার্য করা হয়। কম মূল্যের চায়ের উপর এই শুল্ক বিশেষ ভার স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। টাকার মূল্য হ্রাসের দরুন মাঝারি ধরনের চা মোটেই লাভবান হয় নাই, বরং ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে রপ্তানির পরিমাণ কম হইয়াছিল। অবশ্য টাকার মূল্য হ্রাসের দরুন উৎকৃষ্ট ধরনের চায়ের রপ্তানি ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৬৬ সালে বৃদ্ধি পায়। মূল্যের ভিত্তিতে রপ্তানি শুল্ক ধার্য করা এবং কিলো প্রতি ২৪ পয়সা রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করার দরুন চায়ের রপ্তানি সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

(খ) বাগিচা-শিল্প অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ : ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে ভারত সরকার বাগিচা-শিল্প অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশসমূহ বাতিল করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহাতে ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বিলোপ এবং রিজার্ভ ফাণ্ড হইতে ডিভিডেণ্ড দেওয়ার জ্ঞাত টাকা তোলা বন্ধ করার সুপারিশ ছিল। বাগিচা অনুসন্ধান কমিশন মঞ্জুরি হারে তারতম্য হ্রাস করা এবং উচ্চ পদে ভারতীয় নিয়োগের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। সরকার মনে করেন যে, উপযুক্ত করনীতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। ছোট বাগিচাগুলির অসুবিধা এবং চায়ের খুচরা প্যাকেটের মূল্য সম্পর্কে মাঝে মাঝে অনুসন্ধান করার যে সুপারিশ কমিশন করিয়াছিল সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

(গ) চা-শিল্পের বর্তমান গতি-প্রকৃতি : স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার শ্রম-কল্যাণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছেন এবং বাগিচা-শিল্পের শ্রমিকদিগের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। চা-শিল্প শ্রমিকদিগের শ্রম-কল্যাণের জ্ঞাত বাগিচা-শিল্প অনুসন্ধান কমিশন যে সকল সুপারিশ করিয়াছেন সরকার তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ক্যানাডা, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশে চায়ের চাহিদা বৃদ্ধির জ্ঞাত চা পর্ষদ (Tea Council) বিশেষ তৎপর হইয়াছে।

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে চা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪২০ মিলিয়ন কিলোয় ধার্য করা হয়। আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে চায়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারকার্য চালানো প্রয়োজন। F.A.O. সম্প্রতি বলিয়াছে যে, ১৯৭০ সালে বিশ্বে ১০০ মিলিয়ন কিলো চা উদ্ভূত হইবে। ভারতীয় চায়ের গুণগত মানোন্নয়ন, উন্নত পরিকল্পনা, ব্যাপক এবং দক্ষ প্রচারকার্য, এবং রপ্তানি শুল্ক হ্রাস প্রভৃতি কার্যসূচী গ্রহণ করিতে পারিলেই চা-এর বাজার সম্প্রসারিত হইতে পারিবে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, শ্রমিক সংঘ এবং যৌথ দরাদরি

(Industrial Relations, Trade Unions and Collective Bargaining)

ভারত পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে সফল করিতে হইলে অধিকতর উৎপাদন, কর্মসংস্থান এবং বিনিয়োগের প্রয়োজন। ভারতের গ্রায় উন্নতিকামী দেশে শিল্প এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি, জাতীয় আয় বর্ধনে সমতা, অর্থনৈতিক ক্ষমতার পুনর্বস্তুন এবং কাজের সর্তাদির উন্নতি বিধান করিতে হইবে। মজুরি বৃদ্ধির দাবী যাহাতে শিল্পবিরোধের সৃষ্টি না করে সে সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে হইবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকুল একটি সুপরিকল্পিত শ্রমনীতি গ্রহণ করা হইলে শিল্পশান্তি অব্যাহত থাকিবে।

কয়েকটি প্রধান শিল্প ব্যতীত অগ্রগত শিল্পে শ্রমিকসংঘ নাই বলিলেই চলে। অধিকাংশ শ্রমিক সংঘগুলি মজুরি বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হয়, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বা অগ্র ধরনের শ্রম-কল্যাণকর কাজ ইহারা আদৌ করে না।

শিল্পবিরোধসংক্রান্ত আইন (Industrial Disputes Acts) :

(ক) ১৯২৯ সালের শিল্পবিরোধ আইন : ১৯২৯ সালে শিল্পবিরোধ মীমাংসার জ্ঞাত শিল্পবিরোধ আইন (Trade Disputes Act) পাশ হয়। শিল্পবিরোধ মীমাংসার জ্ঞাত এই আইনে অস্থায়ী অনুসন্ধান কমিটি (Court of Enquiry) এবং আপস পর্ষৎ (Boards of Conciliation) গঠনের ব্যবস্থা ছিল। এই আইনের প্রধান ত্রুটি এই যে এই সকল সংস্থানগুলি অস্থায়ী হওয়ার ফলে শিল্প ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ঘটনার সহিত যোগাযোগ রাখিতে পারিত না। বিরোধের প্রারম্ভেই যাহাতে পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উহা নিষ্পত্তি করা যায় সেইরূপ কোন সংস্থা ছিল না। ১৯৩৮ সালে এই আইনের সংশোধন করিয়া আপস কর্মচারী (Conciliation Officer) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।

(খ) ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইন : ১৯৪৭ সালে শিল্প-বিরোধ আইন পাশ হওয়ায় ১৯২৯ সালের শিল্পবিরোধ আইন বাতিল হইয়া যায়। এই আইনে শ্রমিক ও মালিকের প্রতিনিধি লইয়া কার্য কমিটি (Works Committee) গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ১০০ বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কার্য কমিটি থাকিবে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক, দৈনন্দিন কাজ এবং শিল্প সংক্রান্ত সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে নানাবিধ সমস্যা লইয়া ইহারা আলোচনা করিবে। ইহা ব্যতীত এক বা একাধিক ব্যক্তি লইয়া শিল্প আদালত (Industrial Tribunal) গঠন করা

হইবে। বিবাদমান দুই পক্ষ রাজী থাকিলে এবং সরকার সম্মতিদান করিলে শিল্প আদালতে বিবাদ উপস্থাপিত করা যাইবে।

১৯৪৭ সালের শিল্পবিরোধ আইনে শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তিতে আপসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। দুই বিরোধী পক্ষ যাহাতে নিজেরাই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য-সরকার আপস কর্মচারী (Conciliation Officer) নিযুক্ত করিতে পারিবেন। আপস কর্মচারী ১৪ দিনের মধ্যে সরকারকে বিবাদ সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করিবে। আপস কর্মচারীর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে সরকার বিরোধটি আপন পক্ষ অথবা শিল্প-আদালতে পাঠাইবার নির্দেশ দিবেন। আপস পক্ষ বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে সমর্থ হইলে সেই চুক্তি ছয় মাস বা অধিককাল বলবৎ থাকিবে।

আপস পক্ষ কোন বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে সরকার বিবাদটিকে কোন অনুসন্ধান কমিটির নিকট উল্লেখ করিতে পারিবেন। পরিশেষে সালিশীর জ্ঞা বিরোধটি শিল্প-আদালতে উপস্থাপিত করা যাইবে। ১৯৫০ সালের Industrial Disputes (Appellate Tribunal) Act অনুসারে আদালতের রায় বাহির হইবার ৩০ দিন পরে উহা উভয় পক্ষের উপর প্রযোজ্য হইবে।

১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে, জনস্বার্থমূলক প্রতিষ্ঠানের (public utility service) সকল বিরোধই সরকার আপোসের জ্ঞা নির্দেশ দিতে পারিবেন। জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানে নোটিশ না দিয়া অথবা বিরোধটি আদালতের বিচারধীন থাকার সময় ধর্মঘট অথবা লক আউট করা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। বাগিচা-শিল্প এবং কারখানায় শ্রমিকদের ছাঁটাই হইলে অথবা সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ থাকিলে (lay-off) উহাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫৩, ১৯৫৪ এবং ১৯৫৫ সালে শিল্প-বিরোধ আইনের সংশোধন করা হয়। ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ব্যবস্থা আছে : (১) কার্য কমিটি, (২) আপস এবং সালিশী, (৩) ধর্মঘট এবং লকআউট, (৪) ছাঁটাই এবং সাময়িক কর্মচ্যুতির ক্ষতিপূরণ।

১৯৫০ সালের শ্রমিক সম্পর্ক বিল (Labour Relations Bill of 1950) : শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অধিকতর উন্নত করিবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫০ সালে পার্লামেন্টে একটি বিল উপস্থাপিত করেন। ১৯৪৭ সালের আইনে যে সকল ছিদ্র ছিল তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা এই বিলে করা হয়। শিল্পবিরোধ মীমাংসার জ্ঞা দশটি সংস্থা গঠনের ব্যবস্থা এই বিলে ছিল। এই দশটি সংস্থা হইল রেজিষ্টারিং অফিসার, কার্যকমিটি, আপস কর্মচারী, আপস পক্ষ, স্থায়ী আপস পক্ষ, অনুসন্ধান কমিশন, শ্রম-আইন (labour code), শ্রম-আদালত এবং আপীল আদালত। এই বিলে যৌথ দরাদরির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং জাতীয় প্রয়োজনে সরকার যে কোন সংস্থার কার্যভার

গ্রহণ করিতে পারিবেন। এই বিলটির পরিধি ব্যাপকতর ছিল এবং ১০ জনের অধিক সংখ্যক কর্মচারী লইয়া গঠিত সংস্থানুলিকেও ইহার আওতায় আনা হয়।

বিলটির মধ্যে অনেক প্রশংসাযোগ্য ব্যবস্থা থাকিলেও ইহা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব প্রয়োজনকে উপেক্ষা করিয়াছে। দশটি সংস্থা থাকার ফলে কোন বিরোধের মীমাংসা বিশেষ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইবে। ইহা ব্যতীত এই বিলে সরকারকে প্রভূত ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল। সরকারের পক্ষে এই অবাধ ক্ষমতা অপব্যবহারের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। নানাদিক হইতে তীব্র বিরোধিতার ফলে এই বিল পাশ হয় নাই। ১৯৫২ সালে শ্রী ভি. ভি. গিরি কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তিনি শিল্পে শান্তি স্থাপনের জন্ত বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তি অপেক্ষা পারম্পরিক আলোচনার উপর অধিক জোর দেন। ১৯৫৪ সালে শ্রীগিরি পদত্যাগ করিলে শ্রীখান্দুভাই দেশাই শ্রম-মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তাঁহার সময় শ্রমিক সম্পর্ক আইনের কোন অগ্রগতি হয় নাই। কোন নূতন শ্রমিক সম্পর্ক আইন প্রণয়ন না করিয়া ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করিয়া উহাকে কার্যকরী করার কথা সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

শিল্পবিরোধের কারণ (Causes of Industrial Disputes) : শিল্প-বিরোধের কারণগুলিকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—(ক) অর্থনৈতিক কারণ (খ) রাজনৈতিক কারণ এবং (গ) সামাজিক কারণ।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ : (১) অল্প মজুরি : ভারতে শ্রমিকগণ অতি অল্প মজুরি পাইয়া থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে কিন্তু জীবনযাত্রায় ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় শ্রমিকদের মজুরির হার বাড়িতেছে না। এই কারণে স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতেছে এবং চরমে উঠিলে ধর্মঘট দেখা দেয়।

(২) সুদীর্ঘ কার্যকাল : কাজের সময় হ্রাস করিবার জন্ত শ্রমিকগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আন্দোলন করিয়া আসিতেছে। ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনে সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে কিন্তু শ্রমিকগণ উহা আরও হ্রাস করিতে চায়। ইহা ছাড়া, কারখানা আইনের আওতায় পড়ে না এরূপ বহু কারখানায় সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার অনেক বেশি সময় কাজ হয়। কাজের সময় হ্রাস করিবার জন্ত আন্দোলন শিল্পবিরোধ সৃষ্টি করে।

(৩) কাজে নিরাপত্তার অভাব : অনেক কারখানায় ইচ্ছামত শ্রমিকদিগকে ছাঁটাই করিবার জন্ত মালিক শ্রমিকদের দীর্ঘদিন ধরিয়া অস্থায়ী করিয়া রাখে। মালিকেরা অত্যাচারভাবে শ্রমিক ছাঁটাই করিলে শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দেয়, ফলে শিল্পশান্তি ব্যাহত হয়।

(৪) বোনাস : বর্তমানে শ্রমিকেরা শিল্পের মুনাফার একাংশ বোনাস হিসাবে দাবী করে। মালিকেরা অনেক সময় বোনাস দিতে অস্বীকার করে অথবা কম হারে বোনাস

দেয়। এই বোনাসের দাবীকে কেন্দ্র করিয়া বহু শিল্পবিরোধ ঘটিয়াছে। ১৯৬৫ সালে বোনাস আইন পাশ হইয়াছে। আশা করা যায় ইহার ফলে বোনাসকে কেন্দ্র করিয়া বিরোধ হ্রাস পাইবে।

(৫) র্যাশানলাইজেশন : শিল্পের প্রতিযোগী ক্ষমতা বাড়াইবার উদ্দেশ্যে মালিকেরা র্যাশানলাইজেশন করে। র্যাশানলাইজেশনের ফলে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয় বলিয়া শ্রমিকেরা তীব্রভাবে উহাকে বাধা দান করে। বর্তমানে অটোমেশন শিল্পবিরোধ সৃষ্টির একটি প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাজনৈতিক কারণ : (১) পরিচালনায় অংশগ্রহণ দাবী : বর্তমানে শ্রমিকগণ শিল্পপরিচালনায় অংশগ্রহণ দাবী করিতেছে কিন্তু মালিকপক্ষ রাজী না হইলে শিল্প-বিরোধ অনিবার্যরূপে দেখা দিবে।

(২) শ্রমিকসংঘের ক্রমবর্ধমান শক্তি : বর্তমানে শ্রমিকগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা প্রসারের ফলে শ্রমিকসংঘগুলি শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। বর্তমানে শ্রমিকদিগের ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন শিল্পবিরোধ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সামাজিক কারণ : (১) কারখানার অসন্তোষজনক পরিবেশ : শ্রমিকদিগের কারখানায় কাজের পরিবেশ আদৌ সন্তোষজনক নয়। কারখানা আইন পাশ হওয়া সত্ত্বেও মালিকপক্ষের অব্যবস্থা অথবা শৈথিল্যের দরুন নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য অথবা কল্যাণ-মূলক ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই পর্যাপ্ত নয়। ইহার ফলে কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটে এবং শ্রমিকদের স্বাস্থ্যহানি হয়। অবস্থার উন্নতির জন্য শ্রমিকগণ আন্দোলন করিলে শিল্প-বিরোধ দেখা দেয়।

(২) হতাশা ও পুঞ্জীভূত অসন্তোষ : আয়ের স্বল্পতা, দারিদ্র্যের তীব্রতা, বেকারত্ব, নিরাপত্তার অভাব, পুত্রকন্টার শিক্ষাদীক্ষা এবং চিকিৎসার অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে শ্রমিকদের মনে একটানা হতাশা নৈরাশ্য, অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ দেখা যায়। সময় সময় ইহা শিল্পবিরোধের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা (Industrial Relation Trends) : ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনে বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালের শিল্পবিরোধ (আপীল আদালত) আইনে আপীল আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শ্রী গিরি প্রদত্ত ফরমুলায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। গিরি স্বেচ্ছামূলক আপস এবং স্বেচ্ছামূলক সালিশীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে বিরোধের মীমাংসা বাধ্যতামূলক সালিশী অপেক্ষা শ্রেয় বলিয়া মনে করেন।

১৯৫৬ সালে শিল্পবিরোধ আইনের সংশোধন করিয়া শ্রম আদালত, শিল্প আদালত এবং জাতীয় আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাতীয় স্বার্থজড়িত অথবা

একাধিক রাজ্যে অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরোধ মীমাংসা করিবে জাতীয় আদালত। জাতীয় আদালতে বিচারাধীন কোন বিষয় লইয়া অন্য কোন আদালতে যাওয়া চলিবে না। এই আইনানুসারে শ্রমিকের কাজের সর্ত পরিবর্তন না করিয়া, বিরোধসংক্রান্ত বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে স্ট্যান্ডিং অর্ডার (Standing Orders) অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা মালিককে দেওয়া হইয়াছে।

আপীল আদালতের অবসানের আগে ১৯৫৬ সালে গঠিত নূতন শিল্প-আদালতের দায়িত্ব বাড়িয়াছে। বর্তমানে শ্রম-বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, বাধ্যতামূলক নিষ্পত্তির উপর জোর না দিয়া পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে ঘনিষ্ঠতর শ্রমিক মালিক সম্পর্ক গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে স্বেচ্ছামূলক সালিশীর উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইবে। কিন্তু এরূপ অনেক শিল্প আছে যেখানে অনুমোদিত শ্রমিক-সংঘ নাই; এরূপক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক নীতি প্রয়োগ করা কঠিন।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারত অত্যধিক চীন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটে। জাতীয় সংকটের গভীরতা উপলব্ধি করিয়া ১৯৬২ সালের ৩রা নভেম্বর কেন্দ্রীয় মালিক এবং শ্রমিকসংস্থার এক যুক্ত বৈঠকে স্থির হয় যে, উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত শ্রমিক ও মালিক সর্বপ্রকারে পরস্পরের সহযোগিতা করিবে, দেশের প্রতিরোধ প্রচেষ্টাকে জোরদার করিবে এবং পূর্ণ দেশপ্রেমের শপথ গ্রহণ করে। শিল্পে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বনের কথা ঘোষণা করা হয়:

(ক) কোন অবস্থাতেই উৎপাদন বন্ধ করা অথবা ধীর গতিতে কাজ করা (go-slow) চলিবে না।

(খ) নিজেদের স্বার্থসংক্রান্ত ব্যাপারে শ্রমিক-মালিক বিরোধ বন্ধ রাখিতে হইবে এবং জাতীয় স্বার্থ ও প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে উভয়কেই সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে।

(গ) যতদূর সম্ভব স্বেচ্ছামূলক সালিশীর মাধ্যমে বিরোধের নিষ্পত্তি করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক সালিশীর প্রয়োজন হইলে যাহাতে অতি দ্রুত বিরোধের নিষ্পত্তি হয় তাহা করিতে হইবে।

(ঘ) ১৯৪৭ সালের শিল্প-বিরোধ আইনে উল্লিখিত শিল্পসমূহকে জনস্বার্থ জড়িত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে পেট্রোলিয়ম, রাসায়নিক প্রভৃতি অন্যান্য শিল্পগুলিকেও জনস্বার্থ জড়িত প্রতিষ্ঠান বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

(ঙ) হাটাই, কর্মচ্যুতি, বলিকরণ (victimization) সংক্রান্ত অভিযোগ পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে নিষ্পত্তি না হইলে সালিশীর মাধ্যমে উহাদের মীমাংসা করিতে হইবে। উভয় পক্ষ রাজী থাকিলে আপস কর্মচারীরা উহা মীমাংসা করিতে পারিবেন। যতদূর সম্ভব হাটাই এবং কর্মচ্যুতি (lay-off) পরিহার করিতে হইবে।

(চ) কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহে শ্রমদপ্তর এরূপভাবে পরিচালিত হইবে যাহাতে

অতি দ্রুত শিল্পবিরোধের নিষ্পত্তি করা যায় এবং সৌহার্দপূর্ণ শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক অব্যাহত থাকে।

চীন আক্রমণের সময় জাতীয়তাবোধের যে জাগরণ ঘটে ১৯৬৩ সালের শেষ দিকে উহা ধীরে ধীরে স্তিমিত হইয়া আসে। দ্বিতীয়ত, এই সময় মূল্যস্ফুর্ত ক্রমাগত বাড়িতে থাকায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ শুরু হয়। পরিশেষে, শ্রমিক-সংঘগুলির আভ্যন্তরীণ বিরোধ শিল্পশান্তি ব্যাহত করে। এই সকল কারণে ১৯৬৪-৬৫ সালে ৭ মিলিয়ন শ্রমিক-দিন (man-days) নষ্ট হয়; ১৯৬২-৬৩ সালে উহার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩.১ মিলিয়ন শ্রমিক-দিন।

শ্রমিক-সংঘ (Trade Unionism) : ভারতে শ্রমিক-সংঘের ইতিহাসে ৪২ বৎসর অতিবাহিত হইলেও ইহার অগ্রগতি সন্তোষজনক হয় নাই। শ্রমিক-সংঘগুলির নেতারা সাধারণত রাজনৈতিক ব্যক্তি অথবা সমাজসেবী। শিল্প-শ্রমিকদের সমস্তা বুঝিবার মত বাস্তব অভিজ্ঞতা ইহাদের নাই এবং শ্রমিকদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ইহাদের সহানুভূতির অভাব রহিয়াছে। শ্রমিক-সংঘের ভিত্তি দৃঢ় করিতে হইলে শ্রমিকদের মধ্য হইতেই শ্রমিক-সংঘের নেতা নির্বাচিত করিতে হইবে।

ভারতে শ্রমিক-আন্দোলনের অসুবিধা (Difficulties of Trade Unionism in India) : ভারতে শ্রমিক-আন্দোলন নানা কারণে আজও পাশ্চাত্য দেশের ত্রায় প্রসারলাভ করে নাই। ভারতে মোট শ্রমিকসংখ্যার মাত্র ৩ শতাংশ শ্রমিক-সংঘের সদস্য, অপরপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে মোট শ্রমিকসংখ্যার ৯০ শতাংশ শ্রমিক-সংঘের সদস্য। নিম্নলিখিত কারণগুলি ভারতে শ্রমিক-সংঘ গঠনে অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছে :

প্রথমত, শ্রমিকদের মধ্যে অশিক্ষা, দারিদ্র্য এবং গণতান্ত্রিক চেতনার অভাব শ্রমিক-সংঘ গঠনের প্রধান অন্তরায়। দীর্ঘদিন ধরিয়া শোষিত হইবার ফলে দারিদ্র্য ভারতীয় শ্রমিকদের মনে এক দাসমূলভ এবং অদৃষ্টবাদী মনোভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। সংঘবদ্ধ হইয়া কাজ করার সুবিধা ইহারা বুঝিতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, ভাষাগত, জাতিগত এবং আচারগত পার্থক্য শ্রমিকদের আঞ্চলিক পার্থক্য সংঘবদ্ধতার পথে বিশেষ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

তৃতীয়ত, শ্রমিক-সংঘ গঠনের পূর্বসর্ত হইল স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক। কিন্তু ভারতে এখনো স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া ওঠে নাই। শ্রমিকেরা গ্রাম হইতে শিল্পাঞ্চলে আসিয়া কাজ করে এবং কিছুকাল পরে আবার দেশে ফিরিয়া যায়। ব্রাহ্ম্যমান চরিত্র শ্রমিকদের এই ব্রাহ্ম্যমান চরিত্রের জন্ত তাহারা কোন কারখানায় দীর্ঘদিন ধরিয়া কাজ করে না। সাম্প্রতিককালে অবশ্য ধীরে ধীরে শিল্পাঞ্চলে স্থায়ী শিল্প-শ্রমিক গড়িয়া উঠিতেছে।

চতুর্থত, শ্রমিকদের অসীম দারিদ্র্য শ্রমিক-সংঘ গঠনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতেছে।

শ্রমিক-সংঘের সদস্য হইতে হইলে নিয়মিতভাবে যে সামান্য টাঁদা দেওয়া প্রয়োজন দারিদ্র্যের জগৎ অধিকাংশ শ্রমিকই তাহা দিতে পারে না। শ্রমিক-সংঘসংক্রান্ত কাজ করিবার জায় সময় অথবা মনোভাব কোনটাই তাহাদের নাই। এই সমস্যা সমাধান করিতে হইলে শ্রমিকদের মধ্যে শ্রমিক-সংঘ সংক্রান্ত শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে। শ্রম-দপ্তর সাম্প্রতিককালে শ্রমিক-শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচী চালু করিয়াছে।

পঞ্চমত, শ্রমিক-সংঘগুলির সংগঠনের মধ্যেও যথেষ্ট দুর্বলতা রহিয়াছে। ভারতের শ্রমিক-সংঘগুলি কল্যাণমূলক কাজ অপেক্ষা সামাজিক কাজ করিতেই বিশেষ তৎপর।

ইহা ব্যতীত শ্রমিক নেতার পরিবর্তে বহিরাগত নেতারা ই শ্রমিক-সংঘ পরিচালনা করিয়া থাকেন। একই শিল্পে একাধিক শ্রমিক-সংঘ থাকায় শ্রমিক আন্দোলন দুর্বল হইয়া পড়ে। “একটি শিল্পে একটি শ্রমিক-সংঘ” (One Union in one Industry) এই নীতি গ্রহণ করা উচিত।

পরিশেষে, ভারতীয় শ্রমিক-সংঘের প্রতি মালিকশ্রেণীর বিরোধিতাও শ্রমিক আন্দোলনের গতি ব্যাহত করিয়াছে। মালিকেরা শ্রমিক-সংঘগুলিকে শত্রুশিবির বলিয়া মালিকের মনে করে এবং শ্রমিক-সংঘ কর্মীদের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাব পোষণ বিরোধিতা করে। শ্রমিকদের শক্তি ক্ষুণ্ণ করিবার জগৎ বহু মালিক পরোক্ষভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রমিক-সংঘ গঠনে উৎসাহ দান করিয়া থাকে।

ভারতে শ্রমিক আন্দোলনকে ঠিক পথে পরিচালিত করিতে হইলে শ্রমিকদের নিজ অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হইতে হইবে। শ্রমিক-সংঘগুলিকেও রাজনীতি হইতে মুক্ত হইতে হইবে এবং উহাদের এরূপভাবে পুনর্গঠিত করিতে হইবে যাহাতে তাহারা শ্রমিকদের উন্নতির জগৎ অধিক পরিমাণে কল্যাণমূলক কাজ করিতে পারে। পরিকল্পনা কমিশন প্রস্তাব করিয়াছে যে, কতকগুলি সর্ব পূরণ করিলে তবেই শ্রমিক-সংঘ আইনগত অনুমোদন লাভ করিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছোট ছোট শ্রমিক-সংঘগুলির একত্রিকরণ এবং শ্রমিকদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে তবেই শ্রমিক আন্দোলন সাফল্য লাভ করিবে।

শ্রমিক-সংঘ আইন (Trade Union Legislations) : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জীবনযাত্রার ব্যয়বৃদ্ধি, ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবে শ্রমিকরাজ প্রতিষ্ঠা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন স্থাপন (ILO) প্রভৃতি কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতে শ্রম আন্দোলন দানা বাঁধিয়া ওঠে। যদিও শ্রমিক আন্দোলন ভারতে সন্তোষজনকভাবে সম্প্রসারিত হয় নাই তথাপি বিগত ৪০ বৎসরে সংখ্যাগত, শিল্পগত এবং রাজ্যগত ভাবে এই আন্দোলনের প্রভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(ক) ১৯২৬ সালের শ্রমিক সংঘ আইন : ১৯২৬ সালে ভারতে প্রথম শ্রমিক-সংঘ আইন পাশ হয় এবং ১৯২৭ সাল হইতে উহা বলবৎ করা হয়। এই আইনে শ্রমিক-সংঘ রেজিস্ট্রি করা ঐচ্ছিক ছিল। রেজিস্ট্রিভুক্ত শ্রমিক-সংঘকে তাহাদের সদস্য

সংখ্যা, আর্থিক অবস্থা প্রভৃতি জানাইয়া বাৎসরিক বিবরণী দাখিল করিতে হইত। এই সকল সংঘকে যে সকল অধিকার দেওয়া হয় তাহার বলে প্রকৃত শ্রমিক-সংঘসংক্রান্ত কাজকর্মের জ্ঞান ইহাদের দেওয়ানী এবং কোজদারী মামলায় অভিযুক্তকরণ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯২৬ সালের শ্রমিক-সংঘ আইন এক উল্লেখযোগ্য এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই আইনে শ্রমিক-সংঘকে স্বীকৃতি দান এবং উহাকে আইনগত ভিত্তির উপর স্থাপন করা হইলেও ইহা শ্রমিকসংঘ আন্দোলন সম্প্রসারণে অল্পপ্রেরণা যোগায় নাই। এই আইনের প্রধান ত্রুটি যে, ইহা অ-রেজিস্ট্রিভুক্ত শ্রমিক-সংঘগুলির অধিকার রক্ষার কোন দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই এবং উহাদের রেজিস্ট্রিভুক্ত করিবার জ্ঞান কোন ব্যবস্থা করে নাই।

(খ) ১৯৪৭ এবং ১৯৬০ সালের শ্রমিকসংঘ সংশোধনী আইন : ১৯৪৭ সালে শ্রমিক-সংঘ আইনের সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনী আইনে প্রতিনিধিমূলক শ্রমিকসংঘের প্রতি মালিকের অনুমোদন দান বাধ্যতামূলক করা হয়। কোন মালিক শ্রমিক-সংঘকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলে উহা বিচারের জ্ঞান শ্রম আদালতে যাওয়া যাইবে। এই সংশোধনী আইনে কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজকে অনুমোদিত শ্রমিকসংঘের অসদাচরণ এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট কাজকে মালিক পক্ষের অসদাচরণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

শ্রমিক-সংঘ সংশোধনী আইনকে কার্যকরী করার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। রাজ্য-সরকারই শ্রমিক-সংঘের রেজিস্ট্রার নিয়োগ করেন। রেজিস্ট্রার শ্রমিক-সংঘের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন না। ইহাই এই আইনের একটি মারাত্মক ত্রুটি। অবশ্য পরে ১৯৫৯ সালের শ্রম-অধিবেশনে স্থির হয় যে, রেজিস্ট্রারদের হিসাবপত্র পরীক্ষার ক্ষমতা দান করা হইবে।

১৯৬০ সালে শ্রমিক-সংঘ আইনের পুনরায় সংশোধন করা হয়। ইহাতে শ্রমিক-সংঘের প্রত্যেক সদস্যের সর্বনিম্ন মাসিক চাঁদার হার ২৫ পয়সায় ধার্য করা হয়। এই আইনানুসারে রেজিস্ট্রার শ্রমিকসংঘের হিসাব-পত্র, রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ইত্যাদি তলব করিতে বা পরীক্ষা করিতে পারিবে।

(গ) ১৯৫০ সালের শ্রমিক সংঘ বিল : ১৯৫০ সালে একটি শ্রমিক-সংঘ বিল উপস্থাপিত করা হয়। এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক-সংঘের অবস্থার উন্নতিকরণ এবং ঠিক পথে ইহাকে পরিচালিত করা। এই বিলে শ্রমিক-সংঘের রেজিস্ট্রিকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়, কিন্তু রাষ্ট্রকৃত্যকদের (civil servants) সাধারণ শ্রমিক-সংঘের বাহিরে রাখা হয়। গৃহ-ভৃত্যদেরও শ্রমিক-সংঘ আইনের আওতায় আনা হয়। পরিশেষে, শ্রমিক-সংঘের ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে বহিরাগত ব্যক্তিদের শ্রমিক-সংঘের সদস্য হইতে অনুমতিদানের ব্যবস্থা এই বিলে ছিল।

এই বিলটি পার্লামেন্টে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হইলে সরকার উহাকে অনির্দিষ্ট

কালের জ্ঞান মূলত্ববী রাখেন। বর্তমানে এই বিল সম্পর্কে আর কোন কথা শোনা যায় না।

ভারতীয় শ্রমিক-সংঘের উন্নয়নের উপায় (Indian Trade Unions— Suggestions for Improvements) : ১৯২০ সালে সর্বভারতীয় শ্রমিক-সংঘ (All India Trade Union Congress) গঠিত হয়। বর্তমানে চারিটি কেন্দ্রীয় শ্রমিক-সংঘ সংগঠন রহিয়াছে—সর্বভারতীয় শ্রমিক-সংঘ কংগ্রেস (All India Trade Union Congress), ভারতীয় জাতীয় শ্রমিক-সংঘ কংগ্রেস (Indian National Trade Union Congress), হিন্দু মজদুর সভা (Hind Mazdoor Sabha) এবং ইউনাইটেড শ্রমিক-সংঘ কংগ্রেস (United Trade Union Congress)। সর্বভারতীয়

শ্রমিক-সংঘ কংগ্রেস সর্বপেক্ষা পুরাতন সংগঠন এবং বর্তমানে ইহা চারিটি কেন্দ্রীয় সংগঠন কমিউনিষ্ট পার্টি কর্তৃক পরিচালিত। ১৯৪৭ সালে গুলজারীলাল

নন্দের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় শ্রমিক-সংঘ কংগ্রেস গঠিত হয়। ইহা কংগ্রেস কর্তৃক পরিচালিত এবং সরকার কর্তৃক সর্বাধিক প্রতিনিধিমূলক বলিয়া স্বীকৃত। ইহা সরকারের পরিকল্পিত কর্মসূচীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছে। ১৯৪৮ সালে প্রজা সোসালিস্ট পার্টি হিন্দু মজদুর সভা গঠন করেন। ১৯৪৯ সালে ইউনাইটেড শ্রমিক-সংঘ কংগ্রেস গঠিত হয়। দাবী করা হয় যে, ইহা কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়।

চারিটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকিলেও ভারতে শ্রমিক আন্দোলন আজও দুর্বল। ইহার প্রধান কারণ হইল এদেশে শ্রমিক সংঘগুলি দলগত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া পরিচালিত হয়—শ্রমকল্যাণ ইহাদের নিকট গোণ বিষয়। আমাদের দেশের শ্রমিক-সংঘগুলির সংগঠন এবং দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। শ্রমিক-সংঘসংক্রান্ত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে শ্রমিক-সংঘগুলি সরকারী সহায়তায় ট্রেড ইউনিয়ন কলেজ স্থাপন করিবে। ধর্মঘটকে শ্রমিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে যাহাতে ব্যবহার করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। শ্রমিক সংঘগুলি কিভাবে মজুরি বৃদ্ধি করা যায় শুধুমাত্র এই চিন্তায় তাহাদের সময় এবং শক্তি অতিবাহিত করে কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির পদ্ধতিসমূহ লইয়া মোটেই মাথা ঘামায় না। ভোগের দিক ছাড়িয়া উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিবার সময় আসিয়াছে।

যৌথ দরাদরি (Collective Bargaining) : যৌথ দরাদরি শ্রমিক আন্দোলনের ফলশ্রুতি। যৌথ দরাদরি ব্যবস্থা চালু থাকিলে শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধি এবং মালিকদের মধ্যে মজুরি ও কাজের অগ্রাগ্রহ সর্ত লইয়া সরাসরি আলোচনা চলিতে পারিবে। দুই পক্ষের মধ্যে সরাসরি কথাবার্তা চালাইয়া যৌথ সম্মতি লাভ করা যায়। ১৯৬০ সালের আই. এল. ও. রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, উন্নত দেশগুলিতে যৌথ দরাদরি ব্যবস্থা বিশেষ সফল প্রসব করিয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যৌথ দরাদরি ব্যবস্থা সর্বাধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতের গ্রায় অন্তর্গত দেশে বাধ্যতামূলক সালিশীর পরিবর্তে

যৌথ দরাদরি পদ্ধতি শিল্প-শান্তি স্থাপন করিতে অধিকতর কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়।

যৌথ দরাদরির সাফল্যের সর্ত (Conditions Necessary for the Success of Collective Bargaining) : যৌথ দরাদরির সাফল্যের প্রথম সর্ত

হইল বলিষ্ঠ শ্রমিক-সংঘ। শ্রমিক-সংঘ দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলে যৌথ দরাদরি সহজ এবং ফলপ্রসূ হয়। শ্রমিক-সংঘ বলিষ্ঠ হইলে শ্রমিকগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাহাদের দাবী জানাইতে পারিবে। যৌথ দরাদরি পদ্ধতিকে সফল করিতে হইলে “একটি শিল্পে একটি ইউনিয়ন”, এই নীতি গ্রহণ করা উচিত।

দ্বিতীয়ত, যৌথ দরাদরির সাফল্যের জন্ত রাষ্ট্র, মালিক, শ্রমিক এবং জনসাধারণের সহযোগিতা প্রয়োজন। এই পদ্ধতির প্রতি জনসাধারণের নৈতিক সমর্থন থাকিবে, সরকার প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়া যৌথ আলোচনাকালে মালিকের ইচ্ছামত ছাঁটাই রোধ করিবেন, এবং শ্রমিক ও মালিক পরস্পরের সমস্তা বুঝিবার চেষ্টা করিয়া উভয়ের গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিবে।

তৃতীয়ত, বিভিন্ন দেশে এবং বিভিন্ন রাজ্যে যৌথ দরাদরি ব্যবস্থা কি ভাবে কাজ করিতেছে সে সম্পর্কে শ্রমিক-সংঘগুলি প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে। এইজন্ত শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনে শিক্ষিত নেতৃত্বের প্রয়োজন।

শ্রীগিরি শ্রম-মন্ত্রী নিযুক্ত হইবার পর হইতে যৌথ দরাদরির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বাধ্যতামূলক সালিশীর পরিবর্তে স্বেচ্ছামূলক আপসের মাধ্যমে বিরোধের মীমাংসা করাকে “গিরির দৃষ্টিভঙ্গী” (Giri Approach) বা “গিরি ফরমুলা” বলা হয়। শিল্পে শান্তি স্থাপনের জন্ত গিরি পারস্পরিক গিরি ফরমুলা গোলটেবিল আলোচনা এবং স্বেচ্ছামূলক আপসের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরবর্তী শ্রমমন্ত্রী শ্রী খান্দুভাই দেশাইও মূলত গিরির দৃষ্টিভঙ্গী সমর্থন করেন। কিন্তু পরবর্তী কালে শ্রী গুলজারীলাল নন্দ শ্রমমন্ত্রী হইলে সরকারের শ্রমনীতিতে পরিবর্তন দেখা যায়। শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করিবার জন্ত নন্দ যৌথ পর্ষৎ (Joint Council), শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ প্রভৃতি পরিকল্পনার সমর্থন করেন। তিনি আশা করেন, ইহার ফলে যৌথ দরাদরি ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় হইবে। শ্রমিকদের যৌথ দরাদরির ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে তবেই ভারতীয় শিল্পে গণতান্ত্রিকতার প্রসার ঘটবে।

শ্রমিক মালিক সম্পর্ককে উন্নত করার জন্ত মহাত্মা গান্ধী পারস্পরিক আলোচনা এবং স্বেচ্ছামূলক সালিশীর নীতি অনুসরণের নির্দেশ দেন। ১৯২০ সালে গান্ধী নীতি

আমেদাবাদে গৃহীত হইলেও ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম যৌথ দরাদরির চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি সম্পাদিত হয় আমেদাবাদ গান্ধী নীতি মিল মালিক সংঘ এবং আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্প শ্রমিক সংঘের মধ্যে। অবশ্য ইহার চার বৎসর পূর্বে ১৯৪৮ সালে বাটা কোম্পানীতে শ্রমিক-মালিকদের যৌথ দরাদরির চুক্তি গৃহীত হয়। ১৯৫৫ সালে আমেদাবাদে আমেদাবাদ মিলমালিক সংঘ এবং আমেদাবাদ বস্ত্রশিল্প শ্রমিক-সংঘের মধ্যে আরও দুইটি যৌথচুক্তি সম্পাদিত হয়। একটি চুক্তিতে পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা আছে। পারস্পরিক আলোচনা ব্যর্থ হইলে তবেই সালিশী করা হইবে। দ্বিতীয় চুক্তিতে শ্রমিকদের বোনাস সংক্রান্ত নীতির উল্লেখ আছে। এই ধরনের একটি বোনাস চুক্তি বোম্বাই মিল মালিক সংঘ এবং রাষ্ট্রীয় মিল মজদুর সংঘের মধ্যে সাক্ষরিত হয়। ১৯৫৬ সালে টাটা লোহ ও ইস্পাত কোম্পানীর মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে যৌথ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইহা ব্যতীত বর্তমানে ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানী, আসাম অয়েল কোম্পানী, মহীশূর পেপার মিলস, ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম কোম্পানী এবং আরো অগাণ্ড কোম্পানীতে যৌথচুক্তি সাক্ষরিত হইয়াছে।

শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ (Workers' Participation in Management) : সাম্প্রতিক কালে শ্রমিক মালিকদের মধ্যে যে সকল চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার ফলে শ্রমিক মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অনুকূল বাতাবরণের সৃষ্টি হইয়াছে। বর্তমানে শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে। শ্রমিকেরা যাহাতে শিল্প-পরিচালনায় অধিকতর অংশগ্রহণ করিতে পারে সরকার সেইভাবে তাহার শ্রমনীতি পরিচালনা করিতেছেন। শিল্পে শ্রমিক অংশগ্রহণ করিলে শিল্পের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে। একটি সমীক্ষাদলের বিবরণী, উপর ভিত্তি করিয়া শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের একটি পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী যে সকল শিল্পে অন্ততঃ ৫০০ জন শ্রমিক নিযুক্ত আছে সেই সকল প্রতিষ্ঠানে যৌথ পরিচালনা পর্ষৎ (Joint Management Council) গঠন করা হইবে। এই পর্ষৎ শ্রমিকদের কাজের অবস্থা এবং বাসস্থানের উন্নতি করিবে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে এবং মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সংযোগরক্ষা করিবে।

১৯৫৭ সালে ভারতীয় শ্রম অধিবেশনে স্থির হয় যে, ৫০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষামূলক ভাবে যৌথ পরিচালনা পর্ষৎ চালু করা হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মাত্র ৩০টি শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এই পরিকল্পনা চালু করা হয়। ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে ১২২টি যৌথ পরিচালনা পর্ষৎ কার্যকরী ছিল—ইহাদের মধ্যে ৮১টি ছিল বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান আর ৪০টি ছিল সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। চতুর্থ পরিকল্পনা-কালে যৌথ পরিচালনা পর্ষৎকে অধিক সংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এরূপভাবে

সম্প্রসারিত করা হইবে যাহাতে ইহা ভারতীয় শিল্প-ব্যবস্থার অত্যন্তম বৈশিষ্ট্য পরিণত হইতে পারে।

যৌথ পরিচালনা পর্ষৎ হইতে কিছু সুফল পাওয়া যাইলেও ইহার অগ্রগতি পরিপূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই। কোন কোন বিষয় যৌথ পর্ষতে আলোচিত হইবে এ সম্পর্কে মতবিরোধ, আন্তঃইউনিয়ন বিরোধ এবং শ্রমিক ও মালিকের উপযুক্ত ট্রেনিং-এর অভাব প্রভৃতি কারণে যৌথ পরিচালনা পর্ষতের সন্তোষজনক অগ্রগতি হয় নাই। যৌথ পরিচালনা পর্ষতের আদর্শ সফল করিতে হইলে শ্রমিক-সংঘ আন্দোলনকে জোরদার করা প্রয়োজন। সম্প্রতি শিল্পে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের শ্রম ও নিয়োগ দপ্তরে একটি বিশেষ সংস্থা খোলা হইয়াছে। ১৯৬১ সালে শ্রমিক-মালিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক কমিটি (Tripartite Committee on Labour Management Co-operation) গঠন করা হইয়াছে। ১৯৬২ সালে যৌথ পরিচালনা পর্ষৎগুলির কাজকর্ম পর্যালোচনা করিবার উদ্দেশ্যে একজন অফিসার নিয়োগ করা হইয়াছে। অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে, শ্রমিক-সংঘগুলি দৃঢ় এবং শক্তিশালী না হইলে শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য সফল হইবে না।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

শিল্প-শ্রমিকের দক্ষতা, মজুরি নির্ধারণ এবং লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা

(Industrial Efficiency, Wage Fixation and Profit Sharing)

নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমিক যে পরিমাণ কাজ করে তাহা হইতে তাহার কর্ম দক্ষতা বুঝিতে পারা যায়। জীবনযাত্রার উন্নত মান, পুষ্টিকর খাদ্য, বাসস্থানের সুব্যবস্থা, সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষার সুযোগ এবং সরকারের নানাধরনের শ্রম-কল্যাণকর ব্যবস্থার উপর শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভর করে। এই সকল সর্বের অভাবে ভারতীয় শ্রমিক পাশ্চাত্য দেশের শ্রমিকের হ্রাস দক্ষ নয়। কিন্তু অনুকূল পরিবেশ পাইলে ভারতীয় শ্রমিকও অগ্ণাত দেশের হ্রাস দক্ষ হইয়া উঠিতে পারিবে। ১৯৪৬ সালের শ্রমিক শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি অনুসন্ধান কমিটির (Labour Investigation Committee) মতে অগ্ণাত দেশের তুলনায় ভারতীয় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা কম নয় এবং ভারতীয় শ্রমিকের অদক্ষতার যে অভিযোগ করা হয় তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হইতে প্রেরিত গ্রেডী মিশনও (Grady Mission) অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছে। বর্তমানে বোম্বাই বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদন ল্যাংকাশায়ার শ্রমিকদের মাথাপিছু উৎপাদনের ৮৫ শতাংশ-এর সমান।

কারখানা আইন এবং শ্রমিকের দক্ষতা (Factory Legislations and Labour Efficiency) : ব্রিটিশ শাসনকালে ১৮৮১, ১৮৯১, ১৯১১, ১৯২২ এবং ১৯৩৪ সালে কারখানা আইন পাশ হয়। এই সকল আইনে কারখানায় বালক-শ্রমিক নিযুক্ত করা নিষিদ্ধ এবং কারখানায় কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

রয়েল কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৩৪ সালে ভারতীয় কারখানা আইন পাশ করা হয়। এই আইনে স্থায়ী কারখানায় দৈনিক ১০ ঘণ্টা এবং সাময়িক কারখানায় (seasonal factory) দৈনিক ১১ ঘণ্টা কাজের সময় নির্দিষ্ট করা হয়। ১৯৪৬ সালে ঐ আইনের সংশোধন করিয়া শ্রমিকদের বিশ্রামাগার, স্ত্রী-শ্রমিক ও বালকদের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত প্রভৃতি কিছু কিছু কল্যাণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

শ্রমিক অনুসন্ধান কমিটি ভারতীয় কারখানা আইনের কয়েকটি ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন। বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি কারখানা আইনের বিধানসমূহ মানিয়া চলিলেও ক্ষুদ্র এবং সাময়িক কারখানাগুলি মোটেই উহা পালন করে নাই। কারখানা ইনস্পেক্টরের সংখ্যা অল্প থাকার জন্তই এই গলদ দেখা দিয়াছিল।

১৯৩৪ সালের কারখানা আইনের ক্রটিসমূহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালে এক ব্যাপক কারখানা আইন পাশ করা হয়। আন্তর্জাতিক শ্রম-দপ্তরের সাধারণ নিয়মাবলীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জ্ঞাত এবং কয়েকটি বাস্তব অসুবিধা দূর করিবার জ্ঞাত ১৯৫৪ সালে কারখানা আইনের সংশোধন করা হয়। ১৯৪৮ সালের কারখানা আইনের প্রধান প্রধান বিধানসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

(ক) যে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠান শক্তি (power) ব্যবহার করে তাহাদের শ্রমিক সংখ্যা যদি ১০ জন বা ততোধিক এবং যাহারা শক্তি ব্যবহার করে না তাহাদের শ্রমিক সংখ্যা যদি ২০ জন বা ততোধিক হয় তাহা হইলে এই আইন প্রযোজ্য হইবে। এই আইনে স্থায়ী এবং সাময়িক কারখানার মধ্যে পার্থক্য তুলিয়া দেওয়া হয়। জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত এই আইন ভারতের সর্বত্র প্রযোজ্য হইবে।

(খ) এই আইনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং কল্যাণের ব্যাপক বন্দোবস্ত করা হয়। কারখানায় ২৫০ জন বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করিলে ক্যানটিন রাখা, ৫০ বা ততোধিক স্ত্রী-শ্রমিক কাজ করিলে ক্রেস (crèche) রাখা, ১৫০ বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করিলে বিশ্রামাগার রাখা এবং ৫০০ জন বা ততোধিক ব্যক্তি কাজ করিলে ওয়েলফেয়ার অফিসার রাখার ব্যবস্থা এই আইনে করা হয়।

(গ) ১৪ বৎসরের কম বালকদের কারখানায় নিযুক্ত করা চলিবে না এবং কিশোর শ্রমিকদের বয়সের উপরী সীমা ১৭ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১৮ বৎসর করা হয়।

(ঘ) পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকের দৈনিক ৯ ঘণ্টা এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা কাজের সময় ধার্য করা হইয়াছে। ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক শ্রমিকগণ দৈনিক ৪½ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করিতে পারিবে। শিশু এবং স্ত্রীলোকেরা রাত্রি ৭টা হইতে সকাল ৬টা পর্যন্ত কারখানায় কাজ করিতে পারিবে না। কোন শ্রমিক অতিরিক্ত কাজ করিলে তাহাকে সাধারণ মজুরি হারের দ্বিগুণ মজুরি দিতে হইবে।

(ঙ) এক বৎসর কাজ করিবার পর একজন পূর্ণবয়স্ক শ্রমিক প্রতি ২০ দিনে ১ দিন এবং ১৮ বৎসরের কম বয়স্ক শ্রমিক প্রতি ১৫ দিনে ১ দিন ছুটি পাইবে।

(চ) এই আইনকে বলবৎ করার জ্ঞাত প্রশাসনিক কোন পরিবর্তনের কথা বলা হয় নাই। শুধুমাত্র কারখানা ইনস্পেক্টরদের সংখ্যা বৃদ্ধির কথাই বলা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার সম্প্রতি কারখানার প্রধান পরামর্শদাতার (Chief Advisor, Factories) অফিস খুলিয়াছেন। ইহা রাজ্যসরকারকে কারখানা পরিদর্শনের ব্যাপারে পরামর্শ দান করিবেন।

১৯৪৮ সালের কারখানা আইন ভারতীয় কারখানা আইনের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। এই আইনে শ্রম-কল্যাণের যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে উহা শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করিবে। আমাদের মনে হয় এই আইনের বিধানাবলীকে বলবৎ করার জ্ঞাত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্ব

গ্রহণ করা প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালের আইন পূর্ববর্তী কারখানা আইন অপেক্ষা ব্যাপক হইলেও ইহা অভ্র, বিড়ি তৈয়ারী, কার্পেট বুনন প্রভৃতি শোষণকারী শিল্পের (sweated industries) ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। শোষণকারী শিল্পে শ্রমিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতি করার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পৃথক আইন পাশ করা প্রয়োজন।

নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র এবং শ্রম-দক্ষতা (Employment Exchange and Industrial Efficiency) : শ্রমিকদের দারিদ্র্য এবং দুরবস্থার সুযোগ লইয়া দালালেরা তাহাদের শোষণ করে। দালাল বা সর্দারের মাধ্যমে নিয়োগের যে গলদ তাহা দূর করিবার জন্ত সারা দেশে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করা প্রয়োজন। কল্যাণকামী রাষ্ট্রে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করার দায়িত্ব সরকারের। নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি কর্মপ্রার্থীদের নিকট হইতে আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং শ্রমিক নিয়োগ করিতে ইচ্ছুক মালিকদের উপযুক্ত শ্রমিকের সন্ধান দেয়। পাশ্চাত্য দেশে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলির শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে এক বিশিষ্ট ভূমিকা রহিয়াছে। ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলির গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

জাপানের নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। জাপানে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি কেবলমাত্র নিয়োগের ব্যবস্থা করিবার দায়িত্বই গ্রহণ করে নাই, নিয়োগ প্রার্থীদের উপযুক্ত শিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং নিয়োগ অধ্বেষণে অগ্রতর গমনাগমনের জন্ত অর্থ সাহায্যের দায়িত্বও লইয়াছে। জাপানে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি এইভাবে শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিয়া দেশের শিল্পায়ণকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

শিব রাও কমিটির রিপোর্ট (Shiva Rao Committee's Report) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে নিয়োগ বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলি স্থাপন করা হয়। সামরিক বাহিনীতে নিযুক্ত ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৪৫ সালে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৭০। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ইহাদের স্থায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয় এবং ইহাদের কার্যপরিধি ব্যাপক করা হয়। ১৯৫৬ সালে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৩৬। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১২০টি নূতন নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের মোট সংখ্যা দাঁড়াইবে ২৫৬। ১৯৬৫ সালে উহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ৩৭৬। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ১০০টি নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে প্রতি জেলায় অন্তত একটি করিয়া নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র থাকিবে।

১৯৫২ সালে সরকার নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলিকে পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্যে শ্রীবি.

শিব রাও-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে এই কমিটি তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি বর্ণনা করা হইল :

(ক) নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলিকে পুনর্গঠন করিয়া জাতীয় নিয়োগ সংস্থা (National Employment Service) রূপে অভিহিত করিতে কমিটির
সুপারিশসমূহ হইবে এবং ইহা স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে। সরকারী
এবং আধা-সরকারী চাকুরীগুলি বিনিময় কেন্দ্রের মাধ্যমে পূরণ
করিতে হইবে।

(খ) রাজ্য সরকারের হাতে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের দৈনন্দিন পরিচালনা ভার
গৃহস্থ থাকিবে। কিন্তু সাধারণ নীতি নির্ধারণ এবং বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত নিয়োগ
বিনিময়গুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং উহাদের তদারক করার ভার থাকিবে
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

(গ) যে সকল কর্মপ্রার্থী অথবা নিয়োগকর্তা নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রের সাহায্য
চাহিবে তাহাদের নিকট হইতে কোনরূপ ফী আদায় করা চলিবে না।

(ঘ) নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলিতে বৃত্তিমূলক এবং কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা
করিতে হইবে।

শিব রাও কমিটির সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৬ সালে রাজ্য সরকারের হাতে নিয়োগ
বিনিময় কেন্দ্রগুলির প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। বর্তমানে কেন্দ্রীয়
সরকারের কাজ সাধারণ নীতি নির্ধারণ এবং সাংগঠনিক ব্যয়ের ৬০ শতাংশ বহন করার
মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ১৯৬০ সালে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্র কর্মখালির বাধ্যতামূলক
নোটিশদান [Employment Exchange (Compulsory Notification of
Vacancies) Act] আইন পাশ করিয়া ২৫ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারীকে
নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রে সকল কর্মখালির নোটিশ দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে।

শিব রাও কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী হইলে নিয়োগ বিনিময় কেন্দ্রগুলি এরূপভাবে
পুনর্গঠিত হইবে যাহাতে দালালদের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইবে। আমাদের
নিয়োগ কেন্দ্রগুলি জাপানী পদ্ধতিতে গঠিত হইলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে।
জাপানে নিয়োগ-বিনিময় কেন্দ্রগুলি কর্মপ্রার্থীদের ঋণদান করিয়া থাকে যাহাতে সে
বিশেষ ধরনের ট্রেনিং লইতে পারে অথবা দূরবর্তী স্থানে যেখানে নিয়োগের সম্ভাবনা
আছে সেইখানে যাইতে পারে। ঋণের টাকা পরে সুবিধামত কিস্তিতে আদায় করিয়া
লওয়া হয়।

মজুরি নির্ধারণ—সর্বনিম্ন মজুরি, ন্যায্য মজুরি এবং মজুর বোর্ডের ভূমিকা
(Wage Fixation—Minimum Wage, Fair Wage and the Role of
Wage Board) : ভারতে শিল্প-শ্রমিকদের মজুরি অত্যন্ত কম বলিয়া তাহাদের
কর্মোৎসাহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাইতেছে না। ইহা সত্য যে, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করিলে

জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং মজুরি ও মূল্যস্তর চক্রাকারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, মজুরি বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করা হইবে না। ভারতীয় শিল্পে মজুরি হার এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে শ্রমিকগণ জীবনধারণোপযোগী মজুরি পায়। ১৯৪৮ সালে অসংগঠিত শ্রমিকদিগকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে সর্বনিম্ন মজুরি আইন (Minimum Wages Act) পাশ করা হয়। এই আইনে কতিপয় তালিকাভুক্ত শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ এবং প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর উহা পুনর্বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মজুরি নির্ধারণের ব্যাপারে একটি নূতন পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মজুরি নির্ধারণের জ্ঞাত ত্রিপাক্ষিক মজুরি বোর্ড (Tripartite Wage Boards) গঠন করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, এবং সিমেন্ট-

শিল্পে মজুরি বোর্ডের সুপারিশ কার্যকরী করা হয়। ১৯৬১ সালের মজুরি বোর্ড পর বাগিচা-শিল্প, পাটশিল্প, কয়লাশিল্প, লৌহশিল্প ও ইস্পাতশিল্প, সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, বন্দর ও ডক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড গঠন করা হইয়াছে। মজুরি বোর্ডের সুপারিশ কোন কোন ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিকভাবে কার্যকরী করা হইয়াছে। বর্তমানে মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড পদ্ধতির গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

সর্বনিম্ন মজুরি ও ইহার প্রভাব (Minimum Wage and its Effects) : সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণের উদ্দেশ্য হইল মজুরি হারের নিম্নসীমা নির্ধারণ করা, যাহা অপেক্ষা কম মজুরি কাহাকেও দেওয়া যাইবে না। ইহার ফলে অসংগঠিত শিল্পে শ্রমিকদের শোষণ বন্ধ হইবে। মজুরি কম হইলে শ্রমিকদের দক্ষতা সাধারণত কম হয়। সর্বনিম্ন মজুরি আইন বলবৎ হইলে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে এবং ইহার ফলে তাহার দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। এখন প্রশ্ন হইল সর্বনিম্ন মজুরির ভিত্তি কি হইবে? সাধারণভাবে বলা যায় যে, শ্রমিকের মজুরি এরূপ হইবে যাহাতে শ্রমিক এবং তাহার পরিবারের পক্ষে উপযুক্ত ভরণপোষণের সংস্থান করিয়া সভ্য জীবনযাপন করা সম্ভব হয়। ডঃ একরয়েড (Dr. Aykroyd) হিসাব করিয়া বলিয়াছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্বে একটি ব্যক্তির সাধারণভাবে জীবনধারণের জ্ঞাত ২০ হইতে ২৫ টাকা লাগিত। এই ভিত্তিতে তিনি সর্বনিম্ন মজুরির হিসাব করিয়াছিলেন। বর্তমানের পরিবর্তিত মূল্যস্তরের ভিত্তিতে এই হিসাবের পুনর্বিচার করিয়া সর্বনিম্ন মজুরি হার স্থির করা প্রয়োজন। ১৯৬০ সালে ত্রিপাক্ষিক শ্রম অধিবেশন (Tripartite Labour Conference) সুপারিশ করে যে, ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের সর্বনিম্ন মজুরি মাসিক ১১০ টাকা হওয়া প্রয়োজন।

শিল্পক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সর্বনিম্ন মজুরির প্রভাব লক্ষ্য করা প্রয়োজন। কয়েকটি

শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরি আইন প্রযোজ্য হইলে অগ্রাগত শিল্পের শ্রমিকগণ যাহারা কম মজুরি পাইতেছে তাহারা মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলন শুরু করিবে এবং শিল্পশান্তি ব্যাহত হইবে। সুতরাং সর্বনিম্ন মজুরি যাহাতে সকল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সাধারণ অবস্থায় সকল শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরি আইন বলবৎ হইলে জাতীয় আয়ের অধিক অনুপাত শ্রমিকশ্রেণীর হাতে চলিয়া যাইবে এবং উद्यোক্তাদের মুনাফা হ্রাস পাইবে। মজুরি অধিক হওয়ার দরুন ভোগ্যবস্তুর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। আর এই বর্ধমান চাহিদা পূরণ করিবার জন্ত অধিকতর সম্পদ ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে নিযুক্ত হইবে। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মূলধনী বস্তুর উৎপাদন হ্রাস পাইবে। উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি করিতে ভারত অধিকতর আগ্রহী বলিয়া মূলধনী বস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধি কতখানি সমীচীন সে সম্পর্কে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করা প্রয়োজন। যে সকল শিল্পে শোষণের সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সকল শিল্পে আশু সর্বনিম্ন মজুরি বলবৎ করা প্রয়োজন এবং ভোগ্যপণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ আসিলে অগ্রাগত শিল্পে একটি জাতীয় সর্বনিম্ন মজুরি হার চালু করা উচিত হইবে।

১৯৪৮ সালের সর্ব নিম্ন মজুরি আইন (Minimum Wages Act, 1948) :
সর্বনিম্ন মজুরি সম্পর্কে এক ত্রিপাক্ষিক আলোচনাচক্রের পর ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে সর্বনিম্ন মজুরি আইন পাশ করা হয়। এই আইনের প্রধান প্রধান বিধানগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

(ক) কয়েকটি শোষণকারী শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরি স্থির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোন শিল্পে সারা রাজ্যে মোট ১০০০-এর কম শ্রমিক থাকিলে সর্বনিম্ন মজুরি আইন সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(খ) এই আইনে সর্বনিম্ন সময়গত মজুরি, সর্বনিম্ন ফুরনগত মজুরী, গ্যারান্টিয়ুক্ত সময়গত মজুরি এবং অতিরিক্ত কাজের (overtime rate) হার নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়। সর্বনিম্ন মজুরির মধ্যে থাকিবে, (১) মূল মজুরি এবং জীবনধারণের ভাতা অথবা (২) জীবন ধারণের ভাতা সমেত অথবা ভাতা ব্যতীত মূল মজুরি এবং স্বল্পমূল্যে প্রদত্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির অর্থমূল্য থাকিবে। এই আইনে বলা হইয়াছে, মজুরি নগদ টাকার অঙ্কে দিতে হইবে—অথবা রাজ্য সরকার বিবেচনা করিলে মজুরি আংশিকভাবে বা সম্পূর্ণরূপে সামগ্রীর অঙ্কে (in kind) দিতে পারিবে।

(গ) অনুসন্ধান কমিটি এবং উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করিয়া সর্বনিম্ন মজুরি স্থির করা এবং পরবর্তীকালে উহা সংশোধন করার ক্ষমতা রাজ্যসরকারকে দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্য উপদেষ্টা কমিটিগুলির কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিবার জন্ত একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

সর্বনিম্ন মজুরি আইন ক-তপশীলভুক্ত সকল শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইয়াছে। খ-তপশীলভুক্ত শিল্পে রহিয়াছে কৃষি; কয়েকটি রাজ্যে কৃষি-শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হইয়াছে। মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, মহীশূর, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী এবং কেৰালা রাজ্য সরকার ক-তপশীলভুক্ত শিল্প ব্যতীত অগ্রাণ্য কয়েকটি শিল্পেও সর্বনিম্ন মজুরি আইন সম্প্রসারিত করিয়াছেন।

১৯৪৮ সালের সর্বনিম্ন মজুরি আইনে বহু শোষণকারী শিল্পকে এই আইনের আওতা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। ফলে এই আইনের পরিধি খুবই সংকীর্ণ ছিল। অবশ্য এই জ্ঞাত কয়েকটি রাজ্য সরকার তালিকাভুক্ত শিল্প ব্যতীত অগ্রাণ্য শিল্প ক্ষেত্রেও এই আইন প্রয়োগ করিয়াছেন।

এই আইনে উল্লিখিত উপদেষ্টা বোর্ডকে স্থায়ী সংস্থায় পরিণত করিতে পারিলে তাহারা অধিকতর কার্যকরী হইবে বলিয়া মনে হয়। মূল সমস্যা হইল অধিকাংশ রাজ্যেই সর্বনিম্ন মজুরি আইন বলবৎ করিবার গ্রা্য উপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা নাই। প্রত্যেক শিল্পে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ এবং সংশোধন করিবার জ্ঞাত একটি করিয়া স্থায়ী সর্বনিম্ন মজুরি বোর্ড থাকা প্রয়োজন।

গ্রা্য মজুরির সমস্যা এবং ১৯৫০ সালের গ্রা্য মজুরি বিল (Problem of Fair Wages and the Fair Wages Bill of 1950) : সর্বনিম্ন মজুরি স্থির হইলে শিল্পে গ্রা্য মজুরি প্রবর্তন এবং লভ্যাংশ বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা করা যাইবে। এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত হইবে, শ্রমিকের দক্ষতা এবং শিল্পের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইবে।

গ্রা্য মজুরি কমিটির রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সর্বনিম্ন মজুরি শুধুমাত্র শ্রমিকের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনই মিটাইবে না—উহা শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করিবে। গ্রা্য মজুরি সর্বনিম্ন মজুরি এবং জীবন ধারণোপযোগী মজুরির (living wages) মধ্যবর্তী হইবে। গ্রা্য মজুরি শুধু শ্রমিক, তাহার পরিবারের খাত, বস্ত্র, এবং বাসস্থানেরই ব্যবস্থাই করিবে না—ইহা সন্তানদের শিক্ষা, চিকিৎসার বন্দোবস্ত এবং সামাজিক প্রয়োজন মিটাইবার উপযোগীও হইবে।

সর্বনিম্ন মজুরি, গ্রা্য মজুরি এবং জীবনধারণোপযোগী মজুরির মধ্যে সম্পর্ক লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। সাধারণত যে সকল শিল্পে মজুরিহার অত্যধিক কম বা যেখানে শোষণের সম্ভাবনা আছে সেখানে সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়। অধিকাংশ সর্বনিম্ন মজুরি আইনে জীবনধারণোপযোগী মজুরির মানদণ্ড গ্রহণ করা হয়। সাধারণ ভাবে জীবনধারণোপযোগী মজুরি বলিতে একরূপ মজুরি বুঝায় যাহা শ্রমিকদের সভ্য-সমাজের অধিবাসী হিসাবে সকল প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত।

অপরপক্ষে গ্রা্য মজুরি বলিতে বুঝায় সেই মজুরি যাহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন-শীলতার সমান এবং অগ্রাণ্য কাজে নিযুক্ত অনুরূপ শ্রমিকের মজুরি অপেক্ষা কম নয়।

সুতরাং গ্রায্য মজুরি—যাহা সর্বনিম্ন মজুরি অপেক্ষা অধিক কিন্তু জীবনধারণোপযোগী মজুরি অপেক্ষা কম—প্রবর্তন করাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতের গ্রায্য অল্পমত দেশে অতি সস্ত্র জীবনধারণোপযোগী মজুরী প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। অবশ্য চরম লক্ষ্য থাকিবে পর্যায়ক্রমে জীবনধারণোপযোগী মজুরি প্রবর্তন করা।

১৯৫০ সালে পার্লামেন্টে একটি গ্রায্য মজুরি বিল উপস্থিত করা হয়, কিন্তু পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ইহা আইনে পরিণত হইতে পারে নাই। এই বিলে কারখানা এবং খনি শ্রমিকদের গ্রায্য মজুরি নির্ধারণের ব্যবস্থা ছিল। গ্রায্য মজুরির নিম্নসীমা হইবে সর্বনিম্ন মজুরি এবং উচ্চসীমা শিল্পের মজুরিদানের ক্ষমতার (capacity of the industry to pay) দ্বারা নির্ধারিত হইবে। এই বিলে গ্রায্য মজুরি নির্ধারণের জন্ত রাজ্য গ্রায্য মজুরি বোর্ড গঠনের বন্দোবস্ত ছিল।

সরকার বর্তমানে পুনরায় গ্রায্য মজুরি বিল উপস্থাপনের কথা ভাবিতেছেন। সর্বনিম্ন মজুরি আইনের ক্রটি এই যে, সকল শিল্প এই আইনের আওতায় পড়ে নাই। অবশ্য গ্রায্য মজুরি প্রবর্তন করিলে ব্যয় বৃদ্ধির যুক্তিতে শিল্পপতিগণ ইহার বিরোধিতা করিবেন। সরকারী মজুরি নীতির লক্ষ্য হইল প্রকৃত মজুরি হার বৃদ্ধি করা। সরকার স্বীকার করিয়াছেন যে, শ্রমিক গ্রায্য মজুরি পাইবার অধিকারী কিন্তু বাস্তবে কোন সুনির্দিষ্ট ফরমুলা উদ্ভাবনা করা যে কঠিন তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সরকার প্রত্যেক শিল্পের জন্ত একটি পৃথক ত্রিপাক্ষিক মজুরি বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আজ পর্যন্ত ১২টি প্রধান শিল্পের ক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক মজুরি বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

গ্রায্য মজুরি নীতি কার্যকরী করিতে ত্রিপাক্ষিক মজুরি বোর্ড সর্বাপেক্ষা প্রশাসনিক পদ্ধতি বলিয়া মনে হয়। গ্রায্য মজুরি নির্ধারণ এবং লভ্যাংশ বাঁটোয়ারার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। বর্তমানে শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ, লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা, মজুরি ও বোনাসের ক্ষেত্রে যৌথ চুক্তি এবং সামাজিক বিচার-বোধের অনুকূল রাষ্ট্রীয় নীতির দরুন শ্রমিকদের জীবনযাত্রার কিছু মানোন্নত হইলেও এই বিষয়ে অগ্রগতি এখনও প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

ভারতীয় শিল্পে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা (Profit Sharing in Indian Industries) :

বোনাস ও
লভ্যাংশ
বাঁটোয়ারার
পার্থক্য

মালিক মজুরি ব্যতীত অতিরিক্ত লাভের (surplus profit) একটি অংশ শ্রমিকদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলে উহাকে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা বলে। লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা সাধারণত মালিক ও শ্রমিকের পূর্বনির্দিষ্ট চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বোনাসের সহিত লভ্যাংশ বাঁটোয়ারার পার্থক্য হইল যে, লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা মালিক ও শ্রমিকের একটি চুক্তির ফল অপর পক্ষে বোনাস নির্ভর করে মালিকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার উপর।

লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা সামাজিক বিচারবোধ জাগ্রত করে, শ্রমিক ও মালিকের সাধারণ স্বার্থ রক্ষা করে এবং শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা শিল্পে গণতন্ত্রের প্রসার ঘটায়। চুক্তি সম্পাদনের সময় শ্রমিক ও মালিক উভয় পক্ষ যদি পরস্পরকে বিশ্বাস করে তাহা হইলে লভ্যাংশ বাঁটোয়ারার উদ্দেশ্য সফল হইবে। ১৮২০ সালে ফ্রান্সে প্রথম লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা প্রবর্তন করা হয়। ১৮৭০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার প্রবর্তন হয়। ১৯৩৭ সালে ভারতে টাটা কোম্পানী এই ব্যবস্থার প্রথম প্রবর্তন করে।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা কমিটি (Profit Sharing Committee 1948) নিয়োগ করেন। এই কমিটি ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাহার রিপোর্ট দাখিল করেন।

এই কমিটি লভ্যাংশ বাঁটোয়ারাকে তিন দিক হইতে বিচার করিয়াছেন— (ক) উৎপাদন বৃদ্ধির উপায়, (খ) শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় এবং (গ) শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণের উপায়।

মূলধনের উপর ৬ শতাংশ হারকে মূলধনের গ্রাহ্য আয় বলা চলিবে। মোট উদ্ভূত মুনাফার ৫০ শতাংশ পাইবে শ্রমিক। কোন শ্রমিকের লাভের অংশ হইবে পূর্ববর্তী বারো মাসের মূল বেতনের সমানুপাতিক। যদি কোন শ্রমিকের প্রাপ্য অংশ তাহার মূল বেতনের ২৫ শতাংশের অধিক হয় তাহা হইলে সে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত পাইবে এবং অতিরিক্ত অংশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা হইবে।

কমিটি বস্ত্র, পাট, ইম্পাত, সিमेंট, সিগারেট এবং টায়ার নির্মাণ এই ছয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে এই পরিকল্পনা পাঁচ বৎসরের জুগ প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা নীতি আরো অনুসন্ধানসাপেক্ষ এবং তাহার পরই একটি গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত লওয়া চলিবে। তৃতীয় পরিকল্পনায় লভ্যাংশ বাঁটোয়ারা সম্পর্কে কোন উল্লেখ নাই।

১৯৬৪ সালের বোনাস কমিশনের রিপোর্ট (Bonus Commission Report) : শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে বিরোধের অগতম প্রধান কারণ হইল বোনাস। বোনাসসংক্রান্ত বিরোধের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৬১ সালে শ্রী. এম. আর মেহেরের সভাপতিত্বে ভারত সরকার একটি বোনাস কমিশন গঠন করেন। ১৯৬৪ সালে এই কমিশন তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

(ক) এতদিন পর্যন্ত শিল্পে মুনাফা হইলে তবেই শ্রমিকেরা বোনাস পাইত। কিন্তু এই নূতন আইনানুসারে কোম্পানীর লাভ না হইলেও শ্রমিকগণ মজুরির ৪ শতাংশ বা ৪০ টাকা (যাহা বেশি হইবে) সর্বনিম্ন বোনাস হিসাবে পাইবে। বোনাসের সর্বোচ্চ সীমা হইবে বার্ষিক বেতনের ২০ ভাগ। যে শ্রমিক এক বৎসরের কম সময় কাজ করিয়াছে তাহার বোনাস কার্যগত সময়ের সমানুপাতিক হইবে।

(খ) বোনাস নির্ধারণের জ্ঞাত কোম্পানীর মোট মুনাফা হইতে (১) অবক্ষয়জনিত ব্যয় ও আয়কর, (২) সংরক্ষিত তহবিলের ৪ শতাংশ আয় এবং (৩) বিনিয়োগিত মূলধনের ৭ শতাংশ আয় বাদ দিতে হইবে। কোম্পানীর মোট মুনাফা হইতে ঐ তিনটি খাতে প্রদেয় অর্থ বাদ দিলে অবশিষ্ট যে মুনাফা কোম্পানীর কাছে থাকিবে তাহার ৬০ শতাংশ শ্রমিকদের মধ্যে বোনাস হিসাবে বন্টন করিয়া দিতে হইবে আর বাকী ৪০ শতাংশ হইবে উদ্যোক্তাদের মুনাফা।

(গ) শ্রমিকের বেতন মাসিক ৭৫০ টাকার অধিক হইলে এরূপভাবে বোনাসের হিসাব করিতে হইবে যেন তাহার বেতন ৭৫০ টাকা। যাহারা মাসিক ১৬০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পায় তাহারাই বোনাস পাইবার অধিকারী।

(ঘ) এই বোনাস আইন বেসরকারী সকল প্রতিষ্ঠানে এবং কতিপয় সরকারী প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য হইবে। নূতন প্রতিষ্ঠানকে প্রথম ছয় বৎসর বোনাস প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

—————

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

সামাজিক নিরাপত্তা, শিল্পশ্রমিকের বাসগৃহ এবং শ্রমকল্যাণ

(Social Security, Industrial Housing and Labour Welfare)

ব্যক্তিজীবনে যে সকল দায় ও দায়িত্বের সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহাদের বিরুদ্ধে সমাজের করণীয় ব্যবস্থাসমূহকে সামাজিক নিরাপত্তা বলা হয়। দরিদ্র ব্যক্তিগণ এই সকল দায় দায়িত্বের বিরুদ্ধে এককভাবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে না। রোগ, পঙ্গুতা, বার্ধক্য, মৃত্যু এবং বেকারত্ব এই সকল দায় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক নিরাপত্তা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা (Social Security and Developmental Planning) : গণতান্ত্রিক শিল্প-সমাজ গঠনে সামাজিক নিরাপত্তা

অপরিহার্য। ১৯৪৮ সালে কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন (Employees' State Insurance Act) পাশ হইবার ফলে ভারতের সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ঘটিয়াছে। সামাজিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক বীমার (Social Insurance) মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। সামাজিক বীমা কেবলমাত্র আংশিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে অপরপক্ষে সামাজিক নিরাপত্তা নাগরিককে

সকল প্রকার অভাব হইতে মুক্ত করিবার ব্যবস্থা করে। আবার সামাজিক বীমা এবং সামাজিক সাহায্যের (Social Assistance) মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সামাজিক সাহায্যের ক্ষেত্রে শ্রমিক সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করে কিন্তু তাহাকে কোনরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে হয় না, যেমন ১৯২৩ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (Workmen's Compensation Act) ; অপরপক্ষে সামাজিক বীমার ক্ষেত্রে শ্রমিককেও নিয়মিতভাবে টাকা দিতে হয়, যেমন, কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন।

সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইলে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা এবং জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক নিরাপত্তার সুব্যবস্থা হইলে শ্রমিকগণ মালিকদিগের সহিত সহযোগিতা করিবে ফলে শিল্পে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সহজ হইবে। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি আমাদের পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া জাতীয় অর্থনীতিতে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার এক বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে, বিশেষ করিয়া, চেকোস্লোভাকিয়ার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহিত সামাজিক বীমাব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। ভারতে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইবে।

১৯২৩ সালে প্রথম শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে শ্রমিকদিগের ক্ষতিপূরণ আইন পাশ করা হয়। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন রাজ্যসরকার কতকগুলি প্রসূতি-কল্যাণ আইন (Maternity Benefit Acts) পাশ করেন। এই আইনানুসারে কর্মরত অবস্থায় শ্রমিক আহত হইলে অথবা তাহার মৃত্যু ঘটিলে সে ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকারী। পরবর্তীকালে এই আইনের সংশোধন করিয়া পেশাজনিত ব্যাধিকে (Occupational Diseases) ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৪৬ সালে এক সংশোধনীয় আইন পাশ করিয়া মাসিক ৩০০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪০০ টাকা উপার্জনকারী শ্রমিকদিগকে এই আইনের আওতায় আনা হয়। প্রসূতি-কল্যাণ আইনে স্ত্রী-শ্রমিকদের জন্ম প্রসূতি-ভাতার ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু শ্রমিকদিগের অজ্ঞতা এবং মালিক পক্ষের উদাসীনের দরুন এইসকল আইন বিশেষ ফলপ্রসূ হয় নাই। স্বাধীনতালাভের পর কর্মচারী রাজ্যবামা আইন (১৯৪৮) এবং শ্রমিক ক্ষতিপূরণ (সংশোধিত) আইন (১৯৬১) পাশ করিয়া সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করিবার চেষ্টা করা হয়। ১৯৬২ সালে শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইনের সংশোধন করিয়া ৫০০ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী শ্রমিকগণকে এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ক্ষতিপূরণের হার পরিবর্তন করা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিল্প-শ্রমিকের স্বাস্থ্য বীমাংক্রান্ত (Health Insurance) প্রশ্নটি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৪৩ সালে ভারত-সরকার শিল্প-শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবীমা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্ম ডাঃ আদারকরকে নিয়োগ করেন। ডাঃ আদারকর যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন তাহা পরীক্ষা করিবার জন্ম ভারত-সরকার ১৯৪৫ সালে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা হইতে দুইজন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ জানান। এই দুইজন বিশেষজ্ঞ আদারকর পরিকল্পনায় কিছু সংশোধনের সুপারিশ করেন। ডাঃ আদারকরের সংশোধিত পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া ১৯৪৮ সালে কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন পাশ করা হয়।

১৯৪৮ সালের কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন (Employees' State Insurance Act of 1948) : ১৯৪৮ সালের শ্রমিকদের রাজ্যবীমা আইনে যে বীমাকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এই আইনের প্রধান প্রধান বিধানগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

(ক) পরিধি : যে সকল শক্তিশালিত স্থায়ী কারখানায় অন্ততঃ ২০ জন শ্রমিক কাজ করে সেই সকল কারখানার ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে। যে সকল কর্মচারী ৪০০ টাকা বা তাহার কম মাসিক বেতন পান তাহারাই এই আইনের সুবিধা পাইবেন। এই আইন কাশ্মীর এবং জম্মু ব্যতীত সারা ভারতে প্রযুক্ত হইবে।

(খ) সাহায্য (Benefits) : এই আইনে পাঁচ ধরনের সাহায্যের ব্যবস্থা আছে।

(১) অসুস্থ অবস্থায় সাহায্য (Sickness Benefit) : অসুস্থ অবস্থায় বীমাকারী

শ্রমিক বৎসরে ৫৬ দিনের অর্ধেক মজুরির হারে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। (২) প্রসূতিকালীন সাহায্য (Maternity Benefit) : এই আইনে প্রত্যেক স্ত্রী-শ্রমিক সন্তান প্রসবের পূর্বে ছয় সপ্তাহ এবং প্রসবের পর ছয় সপ্তাহ দৈনিক ৭৫ পয়সা হারে সাহায্য পাইবে ; (৩) পঙ্গু অবস্থায় সাহায্য (Disablement Benefit) : বীমাকারী শ্রমিক কর্মরত অবস্থায় কোন দুর্ঘটনায় পড়িয়া পঙ্গু হইয়া পড়িলে নির্দিষ্ট হারে অর্থ সাহায্য পাইবে ; (৪) পোষাদের সাহায্য (Dependant's Benefit) : কারখানার কোন দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার বিধবা স্ত্রী এবং নাবালক পুত্র-কন্যা নির্দিষ্ট হারে অর্থ সাহায্য পাইবে ; (৫) চিকিৎসাগত সাহায্য (Medical Benefit) : বীমাকারী শ্রমিক অসুস্থ অবস্থায় বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পাইয়া থাকে। এই সুবিধা বীমাকারী শ্রমিকদের পরিবারবর্গের ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত করা যাইবে।

(গ) টাঙ্গা (Contributions) : শ্রমিক ও মালিক প্রদত্ত অর্থের উপর ভিত্তি করিয়া এই আইনে সামাজিক বীমাকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রমিকদের অংশ এবং মালিকদের দেয় ফী সংগ্রহের দায়িত্ব প্রধান মালিকের (Principal Employer) উপর হস্ত করা হইয়াছে।

(ঘ) পরিচালনা (Administration) : কর্মচারী রাজ্যবীমার পরিচালনাভার কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশন (Employees' State Insurance Corporation) নামে একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থার উপর হস্ত করা হইয়াছে। ইহার কার্যাবলী পরিচালনার জন্ত একটি স্থায়ী কমিটি থাকিবে। কর্পোরেশনকে পরামর্শ দিবার জন্ত একটি চিকিৎসাগত সাহায্য পঞ্চ (Medical Benefit Council) গঠিত হইবে।

(ঙ) অর্থ : এই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্ত যে অর্থের প্রয়োজন তাহা শ্রমিকদের রাজ্যবীমা তহবিল (Employees' State Insurance Funds) হইতে আসিবে। কর্মচারী, মালিক, কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য-সরকার বা অগ্ৰাহ্য প্রতিষ্ঠান যে অর্থ সাহায্য করে তাহা লইয়া এই তহবিল গঠিত হইবে। প্রথম পাঁচ বৎসর পর্যন্ত এই কর্পোরেশনের মোট প্রশাসনিক ব্যয়ের ঠিক অংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিয়াছেন।

১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে কর্মচারী রাজ্যবীমা কর্পোরেশন স্থাপিত হয়। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে দিল্লী, কানপুর ও পরে বোম্বাই-এ ইহা প্রবর্তন করার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাতে কানপুর ও দিল্লীর মালিকগণ বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, অগ্ৰাহ্য অঞ্চলে মালিকদের যখন রাজ্যবীমা ভাণ্ডারের অর্থ প্রদান করিতে হইতেছে না তখন তাহাদেরও ইহা হইতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। ফলে ১৯৫১ সালে এক সংশোধনী আইন পাশ করিয়া বলা হয় যে, দেশের সর্বত্র মালিকদের বামা বাবদ দেয় অর্থ, প্রথম হইতেই দিতে হইবে। অবশ্য যে সকল অঞ্চলে এই পরিকল্পনা কার্যকরী হইবে তাহাদের অধিক হারে অর্থ প্রদান করিতে হইবে। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই পরিকল্পনা

প্রথম দিল্লী এবং কানপুরে চালু করা হয়। পরে ধীরে ধীরে অগ্রাগ্র অঞ্চলেও এই পরিকল্পনাটিকে সম্প্রসারিত করা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে এই পরিকল্পনাটি ২১০টি কেন্দ্রে সম্প্রসারিত হইয়াছিল এবং ৩১'৩২ লক্ষ শ্রমিক এই আইনের আওতায় আসে। চতুর্থ পরিকল্পনায় যেখানেই ৫০০ বা ততোধিক শিল্প-শ্রমিক আছে সেখানেই এই আইনটিকে চালু করা হইবে। ১৯৬৫ সালে এই আইনের পরিধি সম্প্রসারিত করিয়া ৫০০ টাকা পর্যন্ত উপার্জনকারী শ্রমিকদিগকে ইহার আইনের আওতায় আনা হয়।

কর্মচারী রাজ্য-বীমা পরিকল্পনা ভারতীয় শিল্প-শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার পথে প্রথম পদক্ষেপ। বর্তমান আইনের পরিধি অবশ্য ব্যাপক নয়। সকল ব্যক্তি এবং সর্বপ্রকার বুঁকি এই আইনের আওতায় আসে নাই। ভবিষ্যতে বেকার বীমা-করণ এবং বার্ষিক বীমাকরণের জ্ঞাত বাহাতে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করা যায় সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

বেকার বীমা (Unemployment Insurance): ভারত কল্যাণমূলক রাষ্ট্র বলিয়া আশা করা যায়, জাতীয় সরকার ধীরে ধীরে বেকার বীমার পথে অগ্রসর হইবেন। ১৯৫৩ সালে শিল্প বিরোধ আইনের সংশোধন করিয়া ৫০ জন বা ততোধিক শ্রমিক কাজ করে এরূপ কারখানা এবং খনির শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বেকার অবস্থায় সাহায্যের (Unemployment Benefits) ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৪ সালে বাগিচা-শিল্প শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও বেকার অবস্থায় সাহায্যের ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের মনে হয় ২০ জন বা ততোধিক শ্রমিক নিয়োগকারী শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই আইনের আওতায় আনিতে পারিলে অধিকতর সুবিধা হইবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, বেকার সাহায্য আর বেকার-বীমা এক নয়। ১৯৫৩ সালে যে বেকার-সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা সাময়িক কর্মচ্যুতি (Lay-off) এবং ছাঁটাই-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বেকার বীমা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৫৫ সালে একটি কর্ম-সমিতি (Working Group) গঠন করেন। এই সমিতির মতে ভারতে বেকারবীমা পরিকল্পনা চালু করা সম্ভব এবং বাঞ্ছনীয় আর ইহা কার্যকর করিবার জ্ঞাত মালিক ও শ্রমিক উভয়েই প্রিমিয়াম দিবে। কিন্তু সরকার বর্তমানে বেকার-বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তনের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সাময়িক কর্মচ্যুতি এবং ছাঁটাই ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষতিপূরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। আমাদের মনে হয় পরীক্ষামূলকভাবে বেকারবীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। ১৯৫৮ সালে সরকার বেকার ত্রাণ তহবিল (Unemployment Relief Fund) গঠনের চেষ্টা করেন কিন্তু মালিকদের বিরোধিতার দরুন উহা পরিত্যক্ত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৬০ সালে কোম্পানী (সংশোধনী) আইন পাশ হওয়ায় শ্রমিকদের একটি বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই আইনে বলা হইয়াছে, যে সকল

কোম্পানী দেউলিয়া হইবে তাহাদের সম্পত্তি হইতে শ্রমিকদের পাওনা সর্বাগ্রে মিটাইতে হইবে।

১৯৬৫ সালে ভারত সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগ ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে একটি বীমা পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। অবশ্য এই পরিকল্পনাকে চালু করিবার জন্ত এখনও কোন আইন পাশ করা হয় নাই।

শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন (Employees' Provident Fund Act, 1952) : প্রভিডেন্ট ফাণ্ড অথবা পেনসনের দ্বারা শ্রমিকের বার্ধক্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। ভারতে শুধুমাত্র সরকারী কর্মচারীগণই পেনসনের সুযোগ পাইয়া থাকে। ১৯৫১ সালের পূর্ব পর্যন্ত শ্রমিকদের জন্ত বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কোন ব্যবস্থা ছিল না। স্বাধীনতালাভের পর সরকার শিল্প-শ্রমিকদের জন্ত বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড চালু করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ভারত সরকার একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড গঠনের নির্দেশ দেন। পরে ১৯৫২ সালে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন পাশ হইলে এই অর্ডিন্যান্স বাতিল হইয়া যায়। প্রথমে এই আইন ৫০ জন বা তদূর্ধ্ব কর্মী সমন্বিত সিমেন্ট, সিগারেট, ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ এবং বয়ন এই ছয়টি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত ছিল। অবশ্য এই আইনকে ৫০ জন অনূর্ধ্ব কর্মী সমন্বিত কারখানার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৬ এবং ১৯৫৮ সালে এই আইনের সংশোধন করিয়া সরকারী এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গুলিকে এই আইনের আওতায় আনা হয়। ১৯৬৩ সালের সংশোধনের দ্বারা কনট্রাক্টের নিয়োজিত শ্রমিকদেরও এই আইনের আওতায় আনা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ১০৫টি শিল্প এবং প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন চালু করা হয়। যে সকল শ্রমিক একটানা ২৪০ দিন কাজ করিয়াছে এবং যাহাদের মাসিক বেতন ১০০০ টাকার কম তাহারাই প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের অধিকারী। এই আইনানুসারে শ্রমিক তাহার মোট মজুরির ৬৪ শতাংশ প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে জমা দিবে, আর মালিকও সমান পরিমাণ অর্থ প্রদান করিবে। এই আইন কাশ্মীর ও জম্মু ব্যতীত সারা ভারতে চালু আছে। ১৯৬২ সালে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইনের সংশোধন করিয়া জমার পরিমাণ ৬৪ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৮ শতাংশ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ, সিমেন্ট এবং কয়লা শিল্পে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড জমার হার বৃদ্ধি করিয়া ৮ শতাংশ করা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ৪৫২ লক্ষ শ্রমিক এই আইনের সুবিধা লাভ করে এবং প্রভিডেন্ট ফাণ্ড খাতে মোট জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫০ কোটি টাকা।

এই পরিকল্পনা সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ইহা স্থায়ী শ্রমিক সমাজ এবং শিল্প-শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ অনুপ্রেরণা যোগাইবে।

আশা করা হইয়াছিল যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আরো ৪ লক্ষ শ্রমিককে এই আইনের আওতায় আনিয়া সকল শিল্প-শ্রমিককে ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কিন্তু কার্যত এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয় নাই। আশা করা যায় চতুর্থ পরিকল্পনায় উল্লিখিত লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হইবে।

মেনন কমিটির সুপারিশ এবং নূতন পরিকল্পনা (Menon Committee's Views and New Schemes) : সরকার আজ পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা পরস্পর সুসম্বন্ধ নয় বলিয়া নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছে। এই সকল কর্মসূচীকে সুসম্বদ্ধ করিতে পারিলে ব্যয়-সঙ্কোচ এবং দক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৫৮ সালে শ্রী ভি. কে. মেননের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক পরিকল্পনাগুলিকে সুসম্বদ্ধ করিবার সুপারিশ করেন। এই কমিটির প্রধান সুপারিশ হইল একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করিয়া উহার মাধ্যমে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং কর্মচারী রাজ্যবীমা পরিকল্পনা দুইটির সংযুক্তিসাধন করা। ১৯৫৮ সালে শ্রম-মন্ত্রীদেব অধিবেশনে মেনন কমিটির সুপারিশগুলি সমর্থন করা হয়।

এই কমিটির আর একটি সুপারিশ হইল শ্রমিকদিগকে গ্রাচুইটি (Gratuities) দেওয়ার দায়িত্ব মালিকদের উপর বাধ্যতামূলক করা। এই কমিটি সুপারিশ করে যে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডকে বিধিবদ্ধ পেনসন পরিকল্পনায় রূপান্তরিত করিতে হইবে।

মেনন কমিটির সুপারিশের সহিত সংগতি রাখিয়া সরকার শ্রমিকদের মৃত্যু ভ্রাণ তহবিল (Death Relief Fund), পারিবারিক পেনসন (Family Pension) এবং অবসরকালীন পেনসনের (Retirement Pension) ব্যবস্থা করিতেছেন। ১৯৬৪ সালে মৃত্যু ভ্রাণ তহবিল গঠন করা হইয়াছে। এই তহবিল হইতে শ্রমিকের মৃত্যু ঘটিলে তাহার উত্তরাধিকারীকে অন্ততঃ ৫০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে। পারিবারিক পেনসন হইল শ্রমিকের মৃত্যুর পর তাহার বিধবা স্ত্রী সারাজীবন অন্ততঃ মাসিক ২৫ টাকা সাহায্য পাইবে এবং পুত্র-কন্যারাও নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত অর্থ সাহায্য পাইবে। পারিবারিক পেনসনের খুঁটিনাটি লইয়া কেন্দ্রীয় সরকার গবেষণা করিতেছেন ; এই পরিকল্পনাটি শীঘ্রই বলবৎ হইবে বলিয়া মনে হয়। অবসরকালীন পেনসনও সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে কিন্তু ইহা চালু করিতে সময় লাগিবে।

আশা করা যাইতেছে সরকার একটি সমন্বয়কারী সংস্থা গঠন করিয়া কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন, কয়লাখনি প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন, এবং আসাম চা-বাগিচা আইনকে উহার অন্তর্ভুক্ত করিবেন।

শিল্পশ্রমিকদের বাসস্থান (Industrial Housing) : শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তার সহিত বাসগৃহের ব্যবস্থা এবং শ্রমকল্যাণকর কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। আমাদের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে গৃহনির্মাণ এবং শ্রমকল্যাণের বিশেষ ব্যবস্থা করা

হইয়াছে। পরিকল্পিত অর্থনীতির অগ্রগতির সহিত শিল্পায়ণ এবং নগরীকরণের (Urbanization) গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে। এই কারণে শিল্প-শ্রমিকদের বাসগৃহ নির্মাণের এক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাস করার দরুন শ্রমিকদের স্বাস্থ্য নষ্ট হয় এবং দক্ষতা হ্রাস পায়। অল্প ভাড়ায় শ্রমিকদের বাসস্থানের বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে। বাসগৃহ পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে ইহাকে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী হইতে হইবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জ্ঞাও বেকার-সমস্যা জর্জরিত ভারতে গৃহ নির্মাণের এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

১৯৪৯ সালে কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তর স্থির করেন যে, তাঁহারা শ্রমিক বাসস্থান পরিকল্পনা বাবদ মোট ব্যয়ের ঠিক অংশ কারখানা মালিক অথবা রাজ্যসরকারকে বিনা সুদে প্রদান করিবেন। অবশিষ্ট ঠিক অংশ রাজ্যসরকার এবং মালিকদের নিজেদেরই সংগ্রহ করিতে হইবে। অবশ্য এই পরিকল্পনা বিশেষ সফল হয় নাই। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ১৯৫২ সালে সাহায্যপ্রাপ্ত শিল্পশ্রমিকের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনা (Subsidized Industrial Housing Scheme) চালু করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিন ধরনের গৃহনির্মাণাগণ স্বর্ণ এবং সাহায্য পাইবেন :—(১) সরকার অনুমোদিত গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, যেমন ইমপ্ৰুভমেন্ট ট্রাস্ট; (২) সমবায় গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা, এবং (৩) শ্রমিকদের জ্ঞা গঠিত মালিকদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা। প্রথম পরিকল্পনাকালে ১৩২২ কোটি টাকা গৃহনির্মাণ বাবদ ব্যয় হয় এবং ৪৩,৮৩১টি বাসগৃহ নির্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২২২৫ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ৫৫,৮২৯টি বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহনির্মাণের জ্ঞা ২২৮ কোটি টাকা ব্যয় করিয়া ৭৩,০০০ বাসগৃহ নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে। খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় গৃহনির্মাণের জ্ঞা ৪৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বাসগৃহ নির্মাণের অগ্রগতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, উহা বিশেষ সন্তোষজনক নয়। আমাদের মনে হয় প্রতিটি বেসরকারী শিল্পের ক্ষেত্রে মালিক, শ্রমিক এবং সরকারকে লইয়া একটি সংযুক্ত গৃহনির্মাণ কমিটি গঠন করিলে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাইবে। এই ব্যবস্থার ফলে গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পরিচালনা সম্ভবপর হইবে এবং শিল্প-শ্রমিকদের জ্ঞা গৃহনির্মাণের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে শ্রমনীতি এবং শ্রমকল্যাণ (Labour Policy and Welfare Programmes in the Five Year Plans) : দক্ষতা এবং উৎপাদনশীলতা শ্রমকল্যাণের উপর বিশেষ নির্ভরশীল বলিয়া পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শ্রমনীতি একরূপভাবে রচনা করা হইয়াছে বাহাতে শ্রমকল্যাণ বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনাকালে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জ্ঞা সরকার কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ইহার ফলে শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি ঘটে, শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়,

সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়, এবং গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার অগ্রগতি ঘটে। সামাজিক নিরাপত্তামূলক এবং শ্রমকল্যাণের বিচ্ছিন্ন কর্মসূচীগুলিকে একত্রিত করিয়া এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া শ্রমঙ্গলের কোন চেষ্টা করা হয় নাই বলিয়া প্রথম পরিকল্পনাকালে শ্রমনীতি উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই।

প্রথম পরিকল্পনায় শ্রমঙ্গলের জুগ ৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়, কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া ২২ কোটি টাকা করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতিতেও বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ছিল। শ্রমিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিনিধিমূলক শ্রমিক-সংঘকে কয়েকটি সর্তাধীনে স্বীকৃতি

প্রথম দান এবং শ্রমিক-সংঘগুলির আর্থিক অবস্থার উন্নতিবিধান করিবার চেষ্টা করা হয়। শিল্পশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিকল্পনাকালে সালিশী এবং আপোষ এই উভয় পদ্ধতির উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু যৌথ দরাদরির উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। ইহা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমনীতির একটি বিশেষ ত্রুটি, কারণ শিল্প-বিরোধ মীমাংসায় যৌথ দরাদরি পদ্ধতিকে উৎসাহ দান করিলে তবেই শ্রমিক-সংঘ শক্তিশালী হইতে পারিবে।

শিল্প-পরিচালনায় শ্রমিকের অংশ গ্রহণ দ্বিতীয় পরিকল্পনার শ্রমকল্যাণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে শ্রমিক, মালিক এবং কারিগরদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত যৌথ পরিচালনা সমিতি (Joint Management Councils) যত অধিকসংখ্যক শিল্প-প্রতিষ্ঠানে গঠন করা যায় সরকার সেই নীতি গ্রহণ করেন। কিন্তু এই যৌথ পরিচালনা সমিতিগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা নাই—ইহারা শুধুমাত্র আলোচনা এবং সুপারিশই করিতে পারে। এই সময় ২৬টি যৌথ পরিচালনা সমিতি কাজ শুরু করে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় শ্রমিকের উৎপাদনশীলতার ভিত্তিতে মজুরি নির্ধারণের নীতি গ্রহণ করা হয়। সেই জুগ ঘোষণা করা হয় যে, শ্রমিকের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাইলে তবেই তাহার মজুরি বাড়িবে। আমাদের মনে হয়, অধিকতর দক্ষ শ্রমিকের জুগ বিশেষ ধরনের বীমা পরিকল্পনার ব্যবস্থা করিতে পারিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইত। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় মজুরিনিতি সংক্রান্ত যে সকল নির্দেশ ছিল তাহার মধ্যে আছে মজুরি কমিশনের (Wage Commission) নিয়োগ, জীবনযাত্রার ব্যয়সূচকের সংশোধন, ত্রিপাক্ষিক মজুরিবোর্ড স্থাপন এবং মজুরি গণনার (Wage Census) ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ছয়টি প্রধান শিল্পে ত্রিপাক্ষিক মজুরিবোর্ড স্থাপিত হয়। কিন্তু এখানেও সমন্বয় এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

তৃতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতি মূলত দ্বিতীয় পরিকল্পনার শ্রমনীতিরই এক সম্প্রসারিত রূপ। অবশ্য ইহাতে শ্রমিকদের শিল্প এবং শিল্প পরিচালনায় তৃতীয় পরিকল্পনাকালে অংশ গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ইহা কেবলমাত্র শিল্পে গণতান্ত্রিকতার প্রসারই করিবে না, শ্রমিক-মালিকের মধ্যে সহযোগিতাও বৃদ্ধি করিবে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কোন সুনির্দিষ্ট যৌথ দরাদরির নীতি গ্রহণ করা না হইলেও শিল্পবিরোধ মীমাংসার জন্য বাধ্যতামূলক সালিশীর পরিবর্তে অধিক পরিমাণে স্বেচ্ছামূলক সালিশীর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। এই সময় দক্ষতাবিধি (Code of Efficiency) এবং শৃঙ্খলাবিধি (Code of Discipline) চালু করা হয়।

মোটামুটি ভাবে বলা যায় তৃতীয় পরিকল্পনায় শিল্পনীতি গণতান্ত্রিকতার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। শিল্পে গণতন্ত্র বলিতে বুঝায় সর্বনিম্ন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং সর্বাধিক শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা। এই নীতিকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষতাবিধি, শৃঙ্খলাবিধি, শ্রমিকদের শিল্প পরিচালনায় অংশ গ্রহণ, শ্রমিকদের শিল্পশিক্ষার কর্মসূচী, এবং অধিক পরিমাণে স্বেচ্ছামূলক সালিশীর মারফৎ শিল্প-বিরোধের মীমাংসার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার শ্রমনীতিকে সফল করিতে হইলে শ্রমিকদের সুসংগঠিত করিতে হইবে এবং তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও দেশপ্রেমের আদর্শ জাগরিত করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শ্রমনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শ্রমিকের উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত মজুরি বৃদ্ধির সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। এই নীতি কার্যকরী হইলে ইহা মূল্যস্তর বৃদ্ধি রোধ করিতে পারিবে।

দেশে শ্রমনীতি কিভাবে কার্যকরী হইতেছে সে সম্পর্কে পর্যালোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বহুবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। ১৯৩১ সালে রয়েল কমিশন তাহার রিপোর্ট দাখিল করে, তাহার পর ১৯৪৬ সালে শ্রম অনুসন্ধান কমিটি (Labour Investigation Committee) কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর শিল্পজগতে এক ব্যাপক পরিবর্তন হইয়াছে। শিল্প উৎপাদনের বিকেন্দ্রীকরণ করা হইয়াছে এবং শিল্পে সরকারের ভূমিকা গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। শিল্প-শ্রমিক এবং পরিচালকদের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটিয়াছে। শ্রমিক আন্দোলনের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন ঘটতেছে। ইহা ব্যতীত গতিশীল ভারতীয় অর্থনীতিতেও রূপান্তর ঘটতেছে। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শ্রী পি. বি. গজেন্দ্র-গাদকারের নেতৃত্বে ১৬ জন সদস্য লইয়া জাতীয় শ্রম-কমিশন (National Labour Commission) গঠিত হয়। এই কমিশন শ্রমিকের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া তাহার রিপোর্ট দাখিল করিবে। আশা করা যায় ১৯৬৮ সালের শেষদিকে এই কমিশন সরকারকে তাহার সুপারিশসমূহ জানাইতে সফল হইবে।

জাতীয় শ্রম
কমিশন

প্রশ্নপত্র ও উত্তরসংকেত

(Questions and Answer Hints)

1. What policy would you advocate in respect of the rationalisation of industries in India ? Give reasons for your answer.

(C. U. B. Com. '58) [পৃষ্ঠা ২৬৬-৬৭]

2. Explain the main problems of the jute mill industry in the present times. What measures would you suggest to improve the competitive position of the industry in the world market ?

(C.U. B.A. '58) [পৃষ্ঠা ২৬০-৬৩]

3. Why was the Cotton Mill Industry of India concentrated in Bombay in its earlier stages ? What factors have brought about the dispersal of the industry in other areas in recent years ?

(C.U. B. Com. '52) [পৃষ্ঠা ২৫৭-৬০]

4. Consider the present position and future prospects of the jute industry in India.

(C.U. B.A. '52) [পৃষ্ঠা ২৬০-৬৩]

5. Examine the present position of Cotton Mill Industry in this country. What do you think of the future possibilities of this industry ?

(C.U. B.Com. '49) [পৃষ্ঠা ২৫৭-৬০]

6. Discuss the main problems of the Coal Mining Industry of India.

[পৃষ্ঠা ২৬৩-৬৬]

7. What are the current problems of the Indian Tea Industry ? Show how far these problems can be solved by implementing the main recommendations of the Plantation Enquiry Commission of 1956.

[পৃষ্ঠা ২৭৩-৭৫]

8. Enumerate the problems and possibilities of the Indian Iron and Steel Industry in relation to India's Five Year Plans.

[পৃষ্ঠা ২৭০-৭৩]

9. Examine the causes of recent labour unrest in India. What measures would you like to adopt for promoting industrial peace in the country ?

(C.U. B.A. '58) [পৃষ্ঠা ২৭৮-৮৪]

10. "The obstacles to the trade union movement in India are largely internal". Discuss the statement and examine the progress of the trade union movement in India.

(C.U. B.Com. '57)

[পৃষ্ঠা ২৮১-৮৪]

11. Examine the scope of compulsory arbitration in the settlement of Industrial Disputes in India. (C.U. B.A. '57 ; B.Com. '56)
[পৃষ্ঠা ২৮৬-৮৮]
12. Describe the present machinery for the settlement of industrial disputes in India. (C.U. B.A. '56) [পৃষ্ঠা ২৭৬-৭৮]
13. Give a brief history of the trade union movement in India. What obstacles have stood in the way of the movement ?
(C.U. B.A. '55) [পৃষ্ঠা ২৮১-৮৪]
14. Examine the scope of compulsory arbitration in Indian labour legislation. (C. U. B.Com. '53) [পৃষ্ঠা ২৮৫-৮৭]
15. Comment on the existing machinery for the settlement of industrial disputes in India. (C.U. B.A. '52) [পৃষ্ঠা ২৭৬-৭৮]
16. Indicate the chief causes of industrial disputes in India. What methods have been adopted for the settlement of Industrial disputes in the country ?
(C.U. B.A. '51) [পৃষ্ঠা ২৭৮-৮২]
17. What is "collective bargaining" ? Has collective bargaining succeeded in India ?
[পৃষ্ঠা ২৮৪-৮৬]
18. Would You advocate minimum wages for industrial labour in India ? What steps have been taken by the Government of India to ensure payment of minimum wages to industrial workers ?
(C.U. B.A. '59) [পৃষ্ঠা ২৯১-৯৪]
19. Examine the main features of the Minimum Wages Act, 1948. Discuss the principles that have been followed in fixing minimum wages in India. (C.U. B.Com. '58) [পৃষ্ঠা ২৯১-৯৪]
20. What are the chief defects of Indian labour and what, in your opinion, are the remedies for them ? (C.U. B.Com. '50)
[পৃষ্ঠা ২৯৪-৯৮]
21. Write a brief note on Indian Factory Acts and discuss in detail the main features of the 1948 Factory Act. [পৃষ্ঠা ২৮৮-৯০]
22. What is meant by Profit Sharing ? What are the possibilities of profit sharing in Industries ? [পৃষ্ঠা ২৯৫-৯৯]
23. Describe the principal measures adopted in recent years by

the Government of India to promote the welfare of industrial labour. (C. U. B.Com. '51) [পৃষ্ঠা ৩০০-৩০৮]

24. Give a brief account of the chief legislative measures adopted recently to promote the welfare of industrial labour in India. (C. U. B.A. '50) [পৃষ্ঠা ৩০০-৩০৮]

25. Briefly discuss the Social Security measures introduced by the Government of India since independence. [পৃষ্ঠা ৩০০-৩০৫]

26. Describe the salient features of the Employees' State Insurance Act of 1948. [পৃষ্ঠা ৩০০-৩০৫]

27. Enumerate the steps taken by the Government in the field of industrial housing during the First and Second Five Year Plans.

[পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬]

— — —

ষষ্ঠ খণ্ড

ষড়বিংশ অধ্যায়

ভারতীয় করব্যবস্থার সংস্কার

(Reforms of the Indian Tax System)

ভারতীয় করব্যবস্থা অবিগ্ৰস্ত, অপরিবর্তিত এবং অধোগতিশীল (regressive) ছিল। কর কাঠামোর ভিত্তি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ এবং কর প্রবঞ্চনাও অত্যধিক ছিল। ব্রিটিশ যুগে ভারতীয় করব্যবস্থা সংস্কারের কোনরূপ চেষ্টা করা হয় নাই। প্রতিরক্ষা এবং নিরাপত্তার জন্ত সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ ব্যয় করা হইত বলিয়া দেশের কল্যাণমূলক কাজকর্ম উপেক্ষিত হইয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার পরিকল্পিত অর্থনীতির উন্নয়নের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কর কাঠামোর সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে ডাঃ জন মাথাই-এর নেতৃত্বে কর অনুসন্ধান কমিটি (Taxation Enquiry Commission) গঠন করা হয়। ১৯৫৪ সালে এই কমিটি তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :

(ক) সরকারী আয়ের (Public Revenue) গতি বিশ্লেষণ করিয়া কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে, যুদ্ধ-পূর্বযুগের তুলনায় বর্তমান রাজস্ব বৃদ্ধির একমাত্র কারণ মুদ্রাস্ফীতি। পণ্যের উপর এবং পারিবারিক ভোগ্যবস্তুর উপর ধার্যকর ভারতীয় কর-ব্যবস্থায় অত্যধিক গুরুত্ব লাভ করিয়াছে—মোট আয়ের ৪৫ শতাংশ ইহা হইতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ করের অনুপাত ১৯৩৮-৩৯ সালে মোট আয়ের ১২ শতাংশ ছিল, ১৯৪৪-৪৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া মোট আয়ের ৪৫ শতাংশ হয় কিন্তু ১৯৫৩-৫৪ সালে হ্রাস পাইয়া ২৪ শতাংশে আসিয়া দাঁড়ায়।

(খ) সরকারী ব্যয়ের (Public Expenditure) গতি বিশ্লেষণ করিয়া কমিশন মন্তব্য করেন যে, সরকারী ব্যয়ের মধ্যে কল্যাণমূলক ব্যয়ের অনুপাত ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে। সরকারী ব্যয়ের দরুন অবশ্য আয়বৈষম্য হ্রাস পায় নাই, কারণ সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ জাতীয় আয়ের তুলনায় খুবই কম—মাত্র ১১ শতাংশ। উন্নয়নমূলক কাজে সরকারী রাজস্ব ব্যয় হইলে জনগণ কর প্রদানে বিরোধিতা করিবে না এবং তাহাদের কর দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে।

(গ) করভার বণ্টন (Incidence of Taxation) সম্পর্কে পর্যালোচনা করিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের উপর

করভার অনেক বেশি। গ্রামের তুলনায় শহরাঞ্চলে পরোক্ষ কর অধিকতর গতিশীল। উভয় অঞ্চলেই করভার বৃদ্ধির সুযোগ থাকিলেও গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর করভার বৃদ্ধির অধিকতর সুযোগ রহিয়াছে। কমিশন মনে করেন যে, কর-ভিত্তি প্রশস্ত করার যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে।

(ঘ) বিনিয়োগ এবং উন্নয়নী কর্মসূচীর গতি লক্ষ্য করিয়া কমিশন বলিয়াছেন যে, উন্নয়নমূলক কাজের জন্ত কর এবং ঋণের গুরুত্ব বৃদ্ধি করিতে এবং ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা হ্রাস করিতে হইবে। অবশ্য স্বল্পকালীন হাতিয়ার হিসাবে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকাও কমিশন স্বীকার করিয়াছেন।

করনীতি সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ (Tax Policy Recommended by the Commission) : উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে কমিশন কর সম্পর্কে কতকগুলি সাধারণ নীতি গ্রহণের সুপারিশ করিয়াছেন। প্রথমত, ধনবৈষম্য হ্রাস করিবার জন্ত প্রত্যক্ষ করকে অধিকতর গতিশীল করিতে হইবে এবং ঠিকভাবে কর ধার্য এবং আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, দেশের উন্নয়নের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন করের পরিধি এবং পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশনের মতে করব্যবস্থাকে এরূপভাবে গঠন করিতে হইবে যাহাতে উহা সকল প্রকার ভোগ যথাসম্ভব কমাইয়া সরকারী খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলেও বেসরকারী বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পরিমাণ কমাইবে না। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ ভোগ্যপণ্যের উপর কম হারে এবং বিলাসদ্রব্যের উপর অধিক হারে কর ধার্য করিতে হইবে। তৃতীয়ত, বেসরকারী ক্ষেত্রে শিল্পভোগকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কমিশন স্থায়ী সম্পদের ক্ষেত্রে বিশেষ বিনিয়োগের উপর ২৫ শতাংশ উন্নয়ন রিবেট (Development Rebate) এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে উৎপাদনের প্রথম ছয় বৎসরের জন্ত সম্পূর্ণ কর অব্যাহতির সুপারিশ করেন। চতুর্থত, অর্থনৈতিক অসাম্য যাহাতে শ্রমিকগণের মনে হতাশার সঞ্চার না করিতে পারে সেজন্ত কমিশন সুপারিশ করেন যে, কোন ব্যক্তির ব্যয়যোগ্য আয় (Disposable Income) যেন গড় পারিবারিক আয়ের ৩০ গুণের বেশি না হয়। অবশ্য এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে সময় লাগিবে।

সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্ত কমিশন আয়কর বৃদ্ধি, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি, উপযুক্ত মূল্যনীতি ধার্য করিয়া সরকারী আয় বৃদ্ধি, ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি, কৃষি আয়কর বৃদ্ধি, সম্পত্তিকর বৃদ্ধি এবং বিক্রয়কর বৃদ্ধির সুপারিশ করেন।

কর অনুসন্ধান কমিশনের সুপারিশ ভারতীয় কর ব্যবস্থার ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। দীর্ঘকালের অসংবদ্ধ এবং অধোগতিশীল কর কাঠামোর সংশোধন করিয়া দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সামগ্রিক করনীতি ইহার পূর্বে গ্রহণ করা হয় নাই। উন্নয়ন রিবেট এবং কর অব্যাহতি পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করিবে বলিয়া আশা করা যায়।

ঘাট্টিব্যয় সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশ বিশেষ সুচিন্তিত বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবত ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ঘাট্টিব্যয়ের ষথার্থ ভূমিকা এই কমিশন বিচার করিয়া দেখেন নাই।

যাহা হউক, সমতানীতি (equality), অনুপ্রেরণানীতি (incentive) এবং উন্নয়ন নীতি (development)—এই ত্রিবিধ নীতিকে ভিত্তি করিয়া কমিশন তাঁহার নূতন করনীতি নির্ধারণ করিয়াছেন। পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু রদবদল প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু সাধারণ বিচারে এই কমিশনের নীতি ভারতীয় অর্থনৈতিক বিকাশকে ঠিকপথে চালিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছে।

ভারতীয় কর সংস্কার সম্পর্কে ডাঃ ক্যালডরের প্রস্তাব (Dr. Kaldor's Proposal for Indian Tax Reform) : ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ক্যালডরকে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় রাজস্বের ভিত্তিতে ভারতীয় কর ব্যবস্থার সংস্কার সম্পর্কে সুপারিশ করিতে অনুরোধ করেন। কর অনুসন্ধান কমিশন যে সুপারিশ করেন তাহা পরিকল্পিত অর্থনীতির সাধারণ প্রয়োজন মিটাইতে পারে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার জ্ঞা যে অতিরিক্ত কর রাজস্বের প্রয়োজন ছিল তাহা কি ভাবে সংগ্রহ করা যায় সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জ্ঞা ডাঃ ক্যালডরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ক্যালডর তাঁহার সুপারিশ প্রধানত প্রত্যক্ষকরের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখেন। ক্যালডরের সুপারিশগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :

(ক) ডাঃ ক্যালডর ভারতীয় কর ভিত্তিকে সম্প্রসারিত করিবার নির্দেশ দেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি মূলধন লাভকর, ব্যক্তিগত ব্যয়কর, সম্পদকর এবং দানকর—এই চারিটি নূতন কর ধর্মের সুপারিশ করেন। আয়কর এবং এই চারিটি কর এক সঙ্গে ধর্ম করিয়া দেয় করের পরিমাণ হিসাব করিতে হইবে। আয়করের সর্বোচ্চ হার ৪৫ শতাংশের অধিক হইবে না।

(খ) অধ্যাপক ক্যালডর ব্যক্তিগত আয়করের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ব্যক্তিগত ব্যয়ের উপর গতিশীল হারে কর ধর্ম করিয়া, সম্পদের উপর বাৎসরিক কর ধর্ম করিয়া, দানের উপর কর ধর্ম করিয়া এবং আয়করের সর্বোচ্চ হার টাকায় সাত আনায় হ্রাস করিয়া ক্যালডর কর কাঠামোর সংস্কারসাধন করিতে চাহিয়াছেন। কোম্পানীকরের ক্ষেত্রে তিনি বন্টনযোগ্য সমস্ত মুনাফার উপর টাকায় ৭ আনা হারে কর বসাইবার এবং অগ্ণাত করের উচ্ছেদের সুপারিশ করেন। এই সকল পরিবর্তনের ফলে বৎসরে ৬০ হইতে ১০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগৃহীত হইবে।

(গ) আয়কর অত্যধিক গতিশীল হইলে উহা কর্মোত্তম, সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের ইচ্ছা কমাইয়া দেয়। অপরপক্ষে ব্যয়কর এবং সম্পদকরের এই ধরনের কোন ক্ষতিকারক প্রভাব নাই। উপরন্তু এই করগুলির সাহায্যে অধিক রাজস্ব আদায় করা সম্ভব হইবে।

(ঘ) কর ফাঁকি বন্ধ করিবার জ্ঞা ক্যালডর বাধ্যতামূলক হিসাব পরীক্ষার (compulsory auditing) সুপারিশ করেন। ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আয় ৫০,০০০ টাকার অধিক হইলে এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রে আয় ১০০,০০০ টাকার অধিক হইলে হিসাব পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। কর ফাঁকি বন্ধ করিতে পারিলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার জ্ঞা অতিরিক্ত রাজস্ব সংগৃহীত হইবে।

ডাঃ ক্যালডরের সুপারিশগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, তিনি এমন এক ধরনের করব্যবস্থা স্থাপ্তি করিতে চাহিয়াছিলেন যেখানে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু ধনবৈষম্য হ্রাস পাইবে এবং সম্পদশালী ব্যক্তিকেই সম্পদশূন্য ব্যক্তির তুলনায় অধিক ক্যালডর-প্রস্তাবের তাগ স্বীকার করিতে হইবে। ১৫ শতাংশ হারে সম্পদকর এবং ৮০ শতাংশ হারে দানকর ধার্য করিলে ইহা বিনিয়োগের যে উৎসাহ হ্রাস করিবে আয়করকে টাকায় ৭ আনায় হ্রাস করিয়াও তাহার প্রতিকার করা যাইবে না।

অবশ্য ইহার অর্থ এই নয় যে, ভারতীয় করব্যবস্থায় মূলধনলাভকর এবং দানকরের কোন ভূমিকা নাই। উন্নতিকামী অর্থনীতিতে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বৃদ্ধির সহিত অগ্রাগ্র দ্রব্যের তুলনায় মূলধনী দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং মূলধন লাভকে করযোগ্য আয় হইতে বাদ দিলে প্রত্যক্ষ করের কাঠামো অত্যন্ত অধোগতিশীল হইবে। ভারতের পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর হাতে যে মূলধন সঞ্চিত আছে তাহাতে বর্তমান অবস্থায় তাহারা প্রভূত মূলধন লাভ করিতে পারিবে। এই মূলধনী লাভ পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর শুধু ক্রয়ক্ষমতাই বাড়াইবে না, ইহা মুদ্রাস্ফীতিতেও ইন্ধন যোগাইবে। সুতরাং মূলধন লাভকে করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিলে দেশ লাভবান হইবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেট (Central Government's Budget for 1967-68) : ভারতের নতুন অর্থমন্ত্রী এবং উপপ্রধান মন্ত্রী শ্রী মোরারজী দেশাই পার্লামেন্টে ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেট পেশ করেন। পর পর দুই বৎসর প্রচণ্ড খরা এবং মুদ্রামান হ্রাসের ক্রটিপূর্ণ নীতির দরুন ভারতীয় অর্থনীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। মুদ্রামান হ্রাস এবং খরা মুদ্রাস্ফীতির চাপ বাড়াইয়া দেয় এবং পরিকল্পনার গতি রোধ করে। ১৯৬৫-৬৬ সালে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় আয় ৩.৭ শতাংশ হ্রাস পায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে জাতীয় আয় ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। অর্থাৎ ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে প্রকৃত উৎপাদন মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। মূল্যস্তর বৃদ্ধি, পরিকল্পনার ব্যর্থতা এবং স্থিতিশীল উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারসাম্য বাজেট প্রস্তুত করিতে মোরারজীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়।

মোরারজী দেশাই অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ঘাটতি ব্যয় বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৬৭-৬৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের রাজস্ব খাতে (revenue account) ২৪৫.২৪ কোটি টাকা উদ্ধৃত হয়। ইহার সহিত বাজেটে প্রস্তাবিত ৬৭.৭১

কোটি টাকা যোগ করিলে মোট উদ্ধৃত হইবে ৩১৩.৬৫ কোটি টাকা। অপর পক্ষে মূলধন খাতে (capital account) ৩১২.৮০ কোটি টাকা ঘাটতি হয়। সুতরাং সামগ্রিকভাবে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, ৮৫ লক্ষ টাকা উদ্ধৃত হয় অর্থাৎ সাধারণ বিচারে একটি ভারসাম্য বাজেটের চিত্র পাওয়া যাইতেছে।

অধিক পরিমাণে কর ধার্য করার ফলেই বাজেটে সমতা আনয়ন করা সম্ভব হইয়াছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালের আর্থিক বৎসরে কর রাজস্ব হইতে ১০.৬ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হইবে। বাজেটে ভারসাম্য আনয়ন করার জন্ত মোরারজী দেশাই করের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে সামান্য কিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। আয়কর প্রদানকারী বিবাহিত ব্যক্তির কর দানের যে সুবিধা আছে তাহার সহিত মোরারজী ১০,০০০ টাকার অনধিক উপার্জনকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্ভরশীল অভিভাবকদিগের ভরণপোষণ বাবদ ৪০০ টাকা স্থায়ী ভাতার প্রবর্তন করিয়াছেন। অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে সামান্য সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অনুপার্জিত আয়ের ক্ষেত্রে ১৫,০০০ টাকার পরিবর্তে ৩০,০০০ টাকার উপর হইতে সারচার্জ ধার্য করা হইবে।

শ্রীদেশাই বাৎসরিক আমানত পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme) চালু রাখিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু ভূতলিঙ্গম রিপোর্টে (Report on Rationalization and Simplification of Direct Taxation Laws) আমানত পরিকল্পনা উচ্ছেদের জন্ত সুপারিশ করা হইয়াছিল। দীর্ঘকালীন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, এই পরিকল্পনায় কোন নীট লাভ নাই, কারণ সরকারকে আমানত পুনরায় ফেরত দিতে হইবে। সুতরাং আশা করা যায় শীঘ্রই বাৎসরিক আমানত পরিকল্পনা উচ্ছেদ করা হইবে। বাৎসরিক আমানত পরিকল্পনা উঠাইয়া দিয়া শ্রীভূতলিঙ্গম উহার পরিবর্তে একটি পাবলিক প্রভিডেন্ট ফাণ্ড (Public Provident Fund) গঠনের সুপারিশ করিয়াছেন।

ব্যক্তিগত আয়ের ক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। প্রথমত, ৫০০ টাকার অনধিক ডিভিডেন্ড আয় করদাতার করযোগ্য আয় হইতে বাদ দেওয়া হইবে। ইহার ফলে মধ্যবিত্তশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাধারণ শেয়ারে টাকা লগ্নী করিতে উৎসাহিত হইবে। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তি এবং যৌথ হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে জীবনবীমা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড এবং পোস্ট অফিসের মেয়াদী আমানত সঞ্চয়ের জন্ত কর অব্যাহতি মোট আয়ের ২৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩০ শতাংশ করা হয়।

যে সকল কোম্পানীর অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (unutilized capacity) রহিয়াছে তাহাদের কিছুকিছু সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। অদক্ষ কোম্পানীগুলির প্রয়োজনীয় সংযুক্তিকরণের পথে যেসকল অসুবিধা ছিল তাহা দূর করা হইয়াছে। ভ্রমণ ব্যবসায়ে উৎসাহিত করিবার জন্ত ভারতীয় কোম্পানী পরিচালিত অনুমোদিত হোটেলগুলিকে

অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণা উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৬৭ সালের মার্চের পর যেসকল যন্ত্রপাতি বসানো হইবে তাহাদের ক্ষেত্রে ৩৫ শতাংশ অগ্রাধিকার হারে উন্নয়ন রিবেট দেওয়া হইবে।

এই সকল সুবিধাদান এবং প্রত্যক্ষ করহারের পরিবর্তনের ফলে বৎসরে ৫ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাস পাইবে। কর সংগ্রহ ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া এই ক্ষতি পূরণ করা হইবে।

পরীক্ষা করের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কয়েকটি দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে এবং কয়েকটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তিনটি যুক্তিতে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে : প্রথমত, রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইলে সেই সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ ভোগ হ্রাস করা প্রয়োজন ; দ্বিতীয়ত, যেসকল শিল্প বর্তমানে অধিক মুনাফা অর্জন করিতেছে তাহাদের মুনাফা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে করহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ; তৃতীয়ত, কিছু কিছু দ্রব্যের ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি সামাজিক দিক হইতে অব্যাহতি নয় বলিয়া উহাদের উপর করভার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য, জুতা, সিগারেট, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, প্লাস্টিক দ্রব্য, রেয়ন, অ্যালুমিনিয়াম, প্রভৃতি দ্রব্যের উপর করভার বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং কয়েকটি নূতন দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। চা-এর রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার জ্ঞাত কিলো প্রতি রপ্তানি শুল্ক ২৪ পয়সা হ্রাস করা হইয়াছে। পাট রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পাটজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে ; ম্যাংগানিজ এবং লৌহ-আকরিকের উপর রপ্তানি শুল্ক উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হইয়াছে।

আভ্যন্তরীণ ভোগ হ্রাস করিয়া রপ্তানিযোগ্য উদ্ভূত বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে চা, কফি, তামাক এবং জুতার উপর শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে মুদ্রামান হ্রাস করার পরও রপ্তানি বাণিজ্যের বিশেষ কোন উন্নতি না হওয়ায় এই ধরনের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সাধারণ লোকের যথেষ্ট অসুবিধা হইবে, কারণ চা, কফি, জুতা এবং মিহি কাপড় বাবদ তাহাকে অধিক ব্যয় করিতে হইবে। পেট্রলের দাম বৃদ্ধির ফলে বাসের ভাড়া বৃদ্ধি পাইবে। ডাক, টেলিফোন এবং টেলিগ্রাফের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ লোক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

অ্যালুমিনিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যের উপর করভার বৃদ্ধি করায় এই শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হইবে।

দেশাই বাজেট বিপর্যস্ত ভারতীয় অর্থনীতিকে স্থায়িত্ব দানের চেষ্টা করিয়াছে। এই সঙ্কটকালে ষাটটি ব্যয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অপেক্ষা বাজেটে সমতা আনিয়া অর্থনীতিতে স্থায়িত্ব বিধান করা অধিকতর প্রয়োজন। দেশাই বাজেট দেশে অসন্তোষ এবং নৈরাশ্রের সৃষ্টি করিলেও ইহা যে একটি নিভুল এবং বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ইহা অনস্বীকার্য।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে অর্থসম্পদের বণ্টন

(Allocation of Financial Resources between the
Centre and the States)

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন (Government of India Act) পাশ হইবার পর কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে অর্থসম্পদের বণ্টন সমস্তা নূতন গুরুত্বলাভ করিয়াছে। এই আইনানুসারে মোট অর্থসম্পদকে চারিটিভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) সম্পূর্ণভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থ, (২) সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক সরকারের প্রাপ্য অর্থ, (৩) কতকগুলি কর কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যে বণ্টন করিতে হইবে এবং (৪) কতকগুলি কর কেন্দ্র ধার্য এবং আদায় করিয়া প্রাদেশিক সরকারগুলিকে দিবে।

নিয়েমার এবং দেশমুখ বাঁটোয়ারা (The Niemeyer Award and the Deshmukh Award) : কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে কোন্ ভিত্তিতে আর্থিক সম্পদের বণ্টন হইবে তাহা স্থির করিবার জন্ত ১৯৩৬ সালে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ স্মার অটো নিয়েমারকে আমন্ত্রণ জানান হয়। নিয়েমার সুপারিশ করেন যে, আয়করের শতকরা ৫০ ভাগ প্রদেশসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। তিনি কয়েকটি ঘাটতি প্রদেশকে অর্থ সাহায্য দিবারও নির্দেশ দেন। পাট রপ্তানি-শুল্কের ৬২½ শতাংশ পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। সরকার মোটামুটিভাবে নিয়েমারের সুপারিশগুলি গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের দরুন নিয়েমারের বাঁটোয়ারার পরিবর্তন অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ১৯৪৮ সালে কেন্দ্র এবং প্রদেশগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্ত শ্রী এ. আর. সরকারের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সুপারিশ করেন যে, প্রদেশগুলির আয়করের অংশ ৫০ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬০ শতাংশ করিতে হইবে। অবশ্য সরকার এই সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই। ১৯৪৯ সালে ভারত সরকার আয়কর এবং পাটের রপ্তানি শুল্কের অংশ বণ্টন নির্ধারণ করিবার জন্ত শ্রীচিন্তামুখ দেশমুখকে আহ্বান করেন। দেশমুখ যে সুপারিশ করেন সরকার তাহা গ্রহণ করেন এবং উহা ১৯৫২ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত চালু ছিল।

দেশমুখ বাঁটোয়ারায় পশ্চিমবঙ্গ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দেশমুখ বাঁটোয়ারা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাবের অংশ কমিয়া যায় এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, আসাম এবং উড়িষ্যার অংশ বাড়িয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে আয়করের অংশ ২০ শতাংশ হইতে হ্রাস পাইয়া ১২ শতাংশ হয় এবং বোম্বাই-এর অংশ ২০

শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২১ শতাংশ করা হয়। দেশ বিভাগে বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গ আয় করের অধিক অংশ পাইবার দাবী রাখে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের অংশ হ্রাস করিয়া কোন্ নীতি অনুযায়ী বোম্বাই-এর অংশ বৃদ্ধি করা হইল তাহা জানা যায় নাই। জন ঘনত্ব এবং সংগ্রহের ভিত্তিতে বোম্বাই-এর তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের দাবি অধিক ছিল। দেশমুখ বাঁটোয়ারায় পাট রপ্তানি শুল্কের ভাগাভাগি তুলিয়া দিয়া পাট উৎপাদনকারী প্রদেশগুলিকে নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য দিবার সুপারিশ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ ১০৫ লক্ষ টাকা, আসাম ৪০ লক্ষ টাকা, বিহার ৩৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ৫ লক্ষ টাকা পাইবে।

ভারতীয় রাজ্যগুলির আর্থিক সম্পর্ক (Financial Integration of Indian States) : স্বাধীনতা লাভের পর বিভিন্ন করদ রাজ্যসমূহ ভারত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইহাদের সহিত কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সম্পর্ক কি ভাবে নির্ধারিত হইবে তাহা স্থির করিবার জগ্ন শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি তিনটি নীতির উপর এই আর্থিক সম্পর্ক স্থির করেন।

প্রথমত, আর্থিক ব্যাপারে প্রদেশসমূহের মত করদ রাজ্যগুলির (Princely States) উপরেও কেন্দ্রের কর্তৃত্ব থাকিবে। দ্বিতীয়ত, প্রদেশগুলির ত্রায় করদ রাজ্যসমূহও একই নীতি অনুসারে অর্থ সাহায্য পাইবে। তৃতীয়ত, কেন্দ্রীয় সরকার করদ রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও আর্থিক সাহায্য প্রদান ও কর বণ্টন নিজস্ব কর্মচারীর দ্বারা পরিচালনা করিতে পারিবেন। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠনের পর করদ রাজ্যসমূহ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলে এই সমস্তার অবসান ঘটে।

ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা (System of Federal Finance in India) : কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের মধ্যে শাসন ক্ষমতা বণ্টনের ভিত্তিতে সরকার এককেন্দ্রীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের হইতে পারে। এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে আয়-ব্যয়ের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে গ্ৰস্ত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারই রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় পরিচালনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্য এই দুই ধরনের সরকার থাকে বলিয়া উহাদের আয়-ব্যয়কে পৃথক করার প্রয়োজন হয়। প্রশাসনিক সুবিধা, ব্যয়সঙ্কোচ এবং দক্ষতা—এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্বের উৎসগুলিকে বণ্টন করা হয়।

ভারতীয় সংবিধানে রাজস্বের উৎসগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে—কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List), রাজ্য তালিকা (State List) এবং যুগ্ম তালিকা (Concurrent List)। রাজ্যগুলি যে রাজস্ব সংগ্রহ করে তাহা তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় অপরিাপ্ত বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলির বাজেটের ঘাটতি পূরণের জগ্ন অহুদান (Grants-in-Aid) দিয়া থাকেন।

সংবিধানের ২৮০ (১) ধারায় বলা হইয়াছে যে, সংবিধান চালু হইবার দুই বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রপতি একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) নিযুক্ত করিবেন এবং

তাহার পর প্রতি পাঁচবৎসর পরপর একটি করিয়া অর্থ কমিশন নিযুক্ত করিবেন। অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে আয়কর, পাট রপ্তানি শুল্ক, প্রভৃতির পুনর্বণ্টন এবং কেন্দ্র কর্তৃক রাজ্য সরকারসমূহকে অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। ভারতের নূতন সংবিধানে রাজস্ব বণ্টন ব্যাপারে সাধারণত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানকেই অনুসরণ করা হইয়াছে।

প্রথম অর্থ কমিশন (First Finance Commission) : সংবিধানের ২৮০ (১) ধারা অনুযায়ী ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে শ্রী কে. সি. নিয়োগীর সভাপতিত্বে প্রথম অর্থ কমিশন গঠিত হয়। কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল :—

(ক) আয়কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের বণ্টন : কমিশন স্থির করেন যে, আয়কর হইতে প্রাপ্ত নীট রাজস্বের ৫৫ শতাংশ (পূর্বে ইহা ৫০ শতাংশ ছিল) রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হইবে এবং জনসংখ্যা ও কর সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টন করা হইবে। কমিশন রাজ্য সরকারগুলির প্রাপ্য অংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে ৮০ শতাংশ এবং সংগ্রহের ভিত্তিতে ২০ শতাংশ নির্ধারণের নির্দেশ দেন। আয়করের বণ্টনযোগ্য ভাগের হইতে বোম্বাই ১৭.৫ শতাংশ, যুক্ত প্রদেশ ১৫.৭৫ শতাংশ, মাদ্রাজ ১৫.২৫ শতাংশ, পশ্চিম-বাংলা ১১.২৫ শতাংশ, বিহার ৯.৭৫ শতাংশ, মধ্য প্রদেশ ৫.২৫ শতাংশ, রাজস্থান ও উড়িষ্যা প্রত্যেকে ৩.৫ শতাংশ, পাঞ্জাব ৩.২৫ শতাংশ, এবং আসাম ২.২৫ শতাংশ পাইবে।

(খ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Union Excises) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে ৮৬ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়। এই কারণে রাজ্যসরকারসমূহ তাহাদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করিবার দাবি জানায়। কমিশন তামাক, দিয়াশলাই এবং উদ্ভিজ্জ ঘি-এর উপর ধার্য কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ প্রদান করার নির্দেশ দেন। রাজ্যের প্রাপ্য অর্থ জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের ১৮.২৮ শতাংশ যুক্তপ্রদেশ, ১০.৩৭ শতাংশ বোম্বাই, ১৬.৪৪ শতাংশ মাদ্রাজ এবং ৭.১৬ শতাংশ পশ্চিম বাংলা লাভ করে।

(গ) পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অনুমান (Grants-in-Aid) : কমিশন পাট উৎপাদক রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট অর্থ সাহায্য দিবার সুপারিশ করেন। পশ্চিমবঙ্গ ১৫০ লক্ষ টাকা, আসাম ৭৫ লক্ষ টাকা, বিহার ৭৫ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ টাকা পাইবে বলিয়া স্থির করা হয়।

(ঘ) অগ্রান্ত অনুদান : রাজ্যসরকারসমূহের আদায়ীকৃত রাজস্ব প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি বৎসর রাজ্যগুলিকে অর্থ সাহায্য দিয়া থাকেন। রাজ্যের বিশেষ দায়িত্ব, সমস্যা, অনগ্রসরতা ইত্যাদি বিষয় বিচার করিয়া উহার অনুদানের

পরিমাণ স্থির করা হয়। প্রথম অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ ৮০ লক্ষ টাকা, উড়িষ্যা ৭৫ লক্ষ টাকা, সোঁরাষ্ট্র ও মহীশূর ৪০ লক্ষ টাকা, পাঞ্জাব ১২৫ লক্ষ টাকা, আসাম ১০০ লক্ষ টাকা এবং ত্রিবাঙ্কুর কোচিন ৪৫ লক্ষ টাকা পায়। ইহা ব্যতীত প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নকল্পে বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মধ্যভারত, হায়দ্রাবাদ, রাজস্থান, পেপসু, উড়িষ্যা ও পাঞ্জাবের জন্য বিশেষ অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার কমিশনের সমস্ত সুপারিশ গ্রহণ করায় নিঃসংশয়ে পরবর্তী কমিশনগুলির মর্ষাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নিয়মারের বন্টন প্রদেশগুলির বাজেটে সমতা বিধানের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল। কিন্তু অর্থ কমিশন সমাজসেবামূলক কাজ এবং জাতীয় প্রয়োজনের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করায় অর্থসম্পদ বন্টন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

স্মার অটো নিয়মার এবং দেশমুখ কেন্দ্রীয় রাজস্বের একটি বিশেষ দিক লইয়া আলোচনা করেন। কিন্তু প্রথম অর্থ কমিশন সামগ্রিকভাবে রাজ্যসমূহের অর্থনৈতিক সমগ্রা এবং উন্নয়নের কথা চিন্তা করিয়া অর্থ বন্টনের নির্দেশ দিয়াছেন। অবশ্য আয়কর বন্টনের ক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট রাজ্যে জনসংখ্যার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলেই ইহাকে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। আয়করের এক বৃহৎ অংশ বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে সংগৃহীত হয় কিন্তু জনসংখ্যার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলে এই দুই রাজ্যের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বন্টনের ব্যাপারেও অল্প সকল নীতি বাদ দিয়া একমাত্র জনসংখ্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় অর্থ কমিশন (Second Finance Commission) : ১৯৫৬ সালে শ্রী কে. শান্তনমকে সভাপতি করিয়া দ্বিতীয় অর্থকমিশন গঠিত হয় এবং ১৯৫৭ সালে এই কমিশন তাহার রিপোর্ট দাখিল করে। এই কমিশনের উপর আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, মৃত্যুকর, এবং রেলমাগুলের উপর ধার্য কর—এই চারিটি কর বন্টনের নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব হস্ত ছিল। ইহা ব্যতীত রাজ্যগুলিকে প্রদত্ত অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণের দায়িত্বও ইহার উপর দেওয়া হয়।

প্রথম কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বাৎসরিক ২৩ কোটি টাকা রাজ্যসমূহের প্রাপ্য ছিল। দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৪০ কোটিতে দাঁড়ায়। দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া এই অর্থের বন্টন করা হইয়াছিল : উন্নত রাজ্যগুলিকে অধিক সাহায্য করা প্রয়োজন কারণ তাহা হইলে উন্নয়নের গতিবেগ বৃদ্ধি পাইবে ; দ্বিতীয়ত, সমতার নীতি অনুযায়ী অনুন্নত রাজ্যগুলিকে অধিকতর সাহায্য করিতে হইবে যদিও এই সাহায্যের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যাইবে না। কমিশন উন্নয়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অর্থ বন্টন করার ফলে সমতার নীতি উপেক্ষিত হইয়াছে।

(ক) আয়কর : আয়কর লব্ধ রাজস্বের শতকরা ৬০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেওয়া হয় এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জুতা ১ ভাগ বরাদ্দ করা হয়। প্রথম অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থ শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং ২০ ভাগ সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টনের সুপারিশ করেন। কিন্তু শিল্প-সমৃদ্ধ অপেক্ষাকৃত কম জনসংখ্যা সমন্বিত রাজ্যগুলি এই নীতির তীব্র প্রতিবাদ জানায় বলিয়া কমিশন এই নীতির সংশোধন করেন। কমিশন সুপারিশ করেন যে, রাজ্যসরকারগুলির প্রাপ্য অর্থ শতকরা ৯০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ১০ ভাগ সংগ্রহের ভিত্তিতে বণ্টিত হইবে।

(খ) মৃত্যু কর (Estate duty) : সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পত্তির উপর মৃত্যু কর ধার্য এবং আদায় করে এবং সমস্ত টাকাটাই রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। মৃত্যুকর বাবদ যে অর্থ আদায় হয় তাহার শতকরা ১ ভাগ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জুতা রাখিয়া বাকী অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। মৃত্যু কর বাবদ প্রাপ্ত মোট রাজস্ব হইতে ১ ভাগ বাদ দিয়া বাকী অংশকে স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক রাজ্য স্বাবর সম্পত্তির অংশ রাজ্যে অবস্থিত স্বাবর সম্পত্তির মূল্য অনুপাতে পাইবে। অস্বাবর অংশ জনসংখ্যার অনুপাতে রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হইবে।

(গ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : প্রথম অর্থ কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগ রাজ্যগুলিকে দিবার সুপারিশ করেন। দ্বিতীয় কমিশন রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ হ্রাস করিয়া শতকরা ২৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। রাজ্যগুলির প্রাপ্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ২০ ভাগ বণ্টিত হইবে।

(ঘ) রেলমাগুলের উপর কর : কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জুতা শতকরা ০.২৫ ভাগ রাখিয়া বাকী আদায়ীকৃত টাকাটা রাজ্যসমূহের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। রাজ্যে অবস্থিত রেলপথের দৈর্ঘ্য অনুসারে রাজ্যের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত হইবে।

(ঙ) পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অনুদান : পাট রপ্তানি শুল্কের পরিবর্তে পাট উৎপাদক অঞ্চলগুলি নিম্নলিখিতরূপ অনুদান পাইবে—পশ্চিমবঙ্গ ১৫২.৬২ লক্ষ টাকা, আসাম ৭৫ লক্ষ টাকা, বিহার ৭২.৩১ লক্ষ টাকা এবং উড়িষ্যা ১৫ লক্ষ টাকা পাইবে। অবশ্য এই সাহায্য ১৯৫২-৬০ সালের পর বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

(চ) সাধারণ অনুদানের ক্ষেত্রে কমিশন উন্নয়নের ভিত্তিকেই গ্রহণ করিয়াছেন—অন্য কোন কঠোর নিয়ম মানেন নাই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ৩২৫ লক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য পাইবে এবং পাটের জুতা অর্থসাহায্য বন্ধ হইলে ১৯৬০ সালের পর হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৪৭৫ লক্ষ টাকা হইবে।

এই কমিশনের সুপারিশগুলি নানাদিক হইতে সমালোচনা করা হইয়াছে। আয়কর এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বণ্টনের ভিত্তি হিসাবে জনসংখ্যার উপর মূল্যায়ন অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার দরুন পশ্চিমবঙ্গ এবং বোম্বাই রাজ্যের প্রতি অবিচার করা হইয়াছে। পরিশেষে রাজ্যে রেলপথের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে রেলমাগুল অর্থ বণ্টন না করিয়া মোট যাত্রীচাপের (Traffic pressure) ভিত্তিতে করা উচিত ছিল। এই নীতির দরুন পশ্চিমবঙ্গ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তৃতীয় অর্থ কমিশন (Third Finance Commission) : ১৯৬০ সালের শ্রী এ. কে. চন্দ্রের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রপতি তৃতীয় অর্থ কমিশন নিযুক্ত করেন। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে কমিশন তাহার রিপোর্ট দাখিল করেন। ভারত সরকার এই কমিশনের সকল সুপারিশই গ্রহণ করেন। এই কমিশনের সুপারিশগুলি পাঁচ বৎসরের পরিবর্তে চার বৎসর কার্যকর রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থার দরুন চতুর্থ অর্থ কমিশন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল একযোগে চলিতে থাকিবে। কমিশনের প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি বর্ণনা করা হইল :

(ক) আয়কর : আয়কর লব্ধ নীচ রাজ্যস্বের শতকরা ৬৬ $\frac{২}{৩}$ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হইবে। রাজ্যসরকারগুলির প্রাপ্য অর্থ শতকরা ৮০ ভাগ জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং শতকরা ২০ ভাগ সংগ্রহের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে। এই কমিশনের সুপারিশ অনুসারে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি পাইবে ১.৫ ভাগ।

(খ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : কমিশন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক বাবদ সংগৃহীত অর্থের শতকরা ২০ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দিবার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যগুলি সংগৃহীত অর্থের শতকরা ২৫ ভাগ পাইত। অবশ্য দ্বিতীয় কমিশনের সুপারিশে মাত্র ৮টি দ্রব্যকে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তৃতীয় কমিশনের সুপারিশে অন্তঃশুল্কের অধীনস্থ দ্রব্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৩৫ করা হয়। ইহার ফলে শতকরা হার হ্রাস পাইলেও রাজ্যগুলির মোট প্রাপ্য অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

বিক্রয়করের পরিবর্তে চিনি, মিলবস্ত্র এবং তামাকের উপর ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব রাজ্যগুলিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(গ) মৃত্যুকর : মৃত্যুকর বণ্টনের ব্যাপারে তৃতীয় অর্থ কমিশন কোনরূপ নূতন সুপারিশ করেন নাই। দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের নীতিই অনুসরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের সুপারিশ ছিল যে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জম্ম ১ ভাগ রাখিয়া বাকী অংশ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ভিত্তিতে দুইভাগে বিভক্ত করা হইবে। অবশ্য তৃতীয় কমিশন নির্দেশ দেন যে, অস্থাবর সম্পত্তি হিসাবের ব্যাপারে ১৯৬০ সালের আদমশুমারীর পরিসংখ্যান গ্রহণ করা হইবে।

(ঘ) রেলযাত্রী মাগুলের উপর করের পরিবর্তে অনুদান : রেলযাত্রী মাগুলের

উপর প্রাপ্ত নির্দিষ্ট অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের পরিবর্তে তৃতীয় কমিশন এই বাবদ রাজ্যগুলিকে বাৎসরিক ১২.৫ কোটি টাকার অনুদানের সুপারিশ করিয়াছেন। এই সুত্রবাবদ পশ্চিমবঙ্গ পাইবে ৭০ লক্ষ টাকা।

(৬) সরকারী অনুদান : কমিশন সাধারণ অনুদান হিসাবে ১০টি রাজ্যকে ১১০.২৫ কোটি টাকা দিবার সুপারিশ করেন। ইহার মধ্যে ৫২ কোটি টাকা উহাদের চলতি রাজস্বের ঘাটতি মিটাইবে। অবশ্য সরকারী অনুদান সম্পর্কে সরকার কমিশনের সুপারিশ আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

তৃতীয় অর্থ কমিশন পশ্চিমবঙ্গ, মাদ্রাজ ও অণ্ড্রা কয়েকটি রাজ্য ব্যতীত অপর সকল রাজ্যে পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্ত বাৎসরিক ২ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করেন।

অনুদানসংক্রান্ত একটি সুপারিশ ব্যতীত সরকার ইহার অপর সকল সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য কমিশনের সকল সুপারিশ সম্পর্কে উহার সদস্তগণ একমত ছিলেন না। পরিবহণব্যবস্থা উন্নয়নের জন্ত অনুদান দেওয়া সম্পর্কে শ্রী জি. আর. কামাত কমিশনের সহিত একমত হন নাই। ইহা ব্যতীত পরিবহণব্যবস্থার উন্নয়নের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও অণ্ড্রা চারিটি রাজ্যকে বাদ দেওয়ার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলা যায় যে, কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশ উড়িষ্যা এবং রাজস্থানের গ্রাম্য অনুন্নত রাজ্যগুলিকে যতখানি উপকার করিবে উন্নত রাজ্যগুলিকে ততটা করিবে না।

কমিশন বলেন যে, রাজ্যসমূহ মনে করে যে, সরকারী আয়-ব্যয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রপ্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের উপর রাজ্যগুলির নির্ভরশীলতা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা শাসনব্যবস্থায় রাজ্যসরকারের দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির বিশেষ অন্তরায়।

চতুর্থ অর্থ কমিশন (Fourth Finance Commission) : ১৯৬৪ সালের মে মাসে ডাঃ পি. ভি. রাজামান্নারের সভাপতিত্বে চতুর্থ অর্থ কমিশন গঠন করা হয় এবং এই কমিশন ১৯৬৫ সালের আগষ্ট মাসে তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করেন। চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশগুলি ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে পাঁচ বৎসর কার্যকরী থাকিবে। ইহার ফলে চতুর্থ অর্থ কমিশন এবং চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল একযোগে চলিতে থাকিবে। এই কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি নিয়ে বর্ণনা করা হইল—

(ক) আয়কর : এই কমিশনের আয়করলব্ধ রাজস্বের শতকরা ৭৫ ভাগ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের নির্দেশ দেন। রাজ্যগুলি তাহাদের প্রাপ্য অংশ বৃদ্ধি করিবার জন্ত যে যুক্তি উপস্থাপিত করে তাহারই ফলে কমিশন উহাদের প্রাপ্য অংশ ৬৬.৬ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৭৫ শতাংশ করে। রাজ্যসরকারগুলির

প্রাপ্য অংশ জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৮০ ভাগ এবং কর সংগ্রহের ভিত্তিতে শতকরা ২০ ভাগ নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাপ্য অংশ হইয়াছে শতকরা ১০.২১ ভাগ।

(খ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক : কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের শতকরা ২০ ভাগ পাইবে। তৃতীয় অর্থ কমিশন মাত্র ৩৫টি দ্রব্যকে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনে আনয়ন করে। চতুর্থ অর্থকমিশন বলেন যে, যে সকল দ্রব্যের উপর কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য আছে এবং আগামী পাঁচ বৎসরে যে সমস্ত দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইবে সকলই রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে বন্টিত হইবে।

আয়করের হায়া এই ক্ষেত্রেও সরকার কমিশনের সুপারিশ সম্পূর্ণরূপে মানিয়া লইয়াছেন।

(গ) বস্ত্র, তামাক এবং চিনির উপর বিক্রয়করের পরিবর্তে অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের সবটাই রাজ্যসমূহ পাইবে। বিক্রয়করের পরিবর্তে অন্তঃশুল্ক বাবদ মোট সংগৃহীত অর্থের শতকরা ১ ভাগ কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলগুলির জন্ত, শতকরা ১৫ ভাগ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জন্ত এবং শতকরা ০.৫ ভাগ নাগাভূমির জন্ত প্রদত্ত হইবে।

আয়কর এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক এই দুইটি কর হইতে রাজ্যগুলির আয় বৃদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা নাই, কারণ রাজ্যসরকারগুলি আয়করের শতকরা ৭৫ ভাগ পায়—রাজ্যগুলির অংশ আরও বৃদ্ধি পাইলে কেন্দ্রীয় সরকার ইহার পরিচালনায় উৎসাহ হারাইবে; কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের হার এবং ব্যাপ্তিও ব্যাপক, ইহা অধিকতর বৃদ্ধির আর কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং রাজ্যগুলির পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধির ফলে যে বাট্টি দেখা দিবে তাহা পূরণে এই দুইটি উৎস বিশেষ কার্যকরী হইবে না। সম্পদ-কর এবং কর্পোরেশন করকে বণ্টনযোগ্য করে পরিণত করিয়া বিনাসর্তে রাজ্যগুলির অনুদানের পরিমাণ হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিবে।

(ঘ) মৃত্যুকর (Estate duty) : কেন্দ্রীয় সরকার সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর ধার্য এবং আদায় করে এবং সমস্ত টাকাটাই রাজ্যসরকারদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেয়। কেন্দ্র-শাসিত অংশের জন্ত শতকরা ২ ভাগ রাখিয়া বাকী অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।

(ঙ) রেলযাত্রী মাগুলের উপর করের পরিবর্তে অনুদান : রেলযাত্রী মাগুলের উপর প্রাপ্ত রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের পরিবর্তে তৃতীয় অর্থ কমিশন এই বাবদ রাজ্যগুলিকে বাৎসরিক ১২.৫০ কোটি টাকা অনুদানের সুপারিশ করিয়াছিলেন। চতুর্থ অর্থ কমিশন কোনরূপ নূতন সুপারিশ না করিয়া ঐ ব্যবস্থাকেই চালু রাখিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

(চ) সরকারী অনুদান : তৃতীয় কমিশনের সুপারিশে রাজ্যগুলি ৬৩.৭৫ কোটি

টাকা অনুদান পাইত। চতুর্থ অর্থ কমিশন অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশ করেন। কমিশন ভারতের রাজ্যসমূহের জন্ম মোট ১২১৮২ কোটি টাকা সাধারণ অনুদানের সুপারিশ করেন। নিয়ে সরকারী অনুদানের সুপারিশ এবং সরকারের সিদ্ধান্তের একটি তালিকা দেওয়া হইল :

তৃতীয় কমিশন অনুমোদিত অনুদান (কোটি টাকার হিসাব)		চতুর্থ কমিশনের সুপারিশ (কোটি টাকার হিসাব)	সরকারের সিদ্ধান্ত (কোটি টাকা)
১। অন্ধ্র	২৫০	৭২২	১৩৫১
২। আসাম	৬০০	১৬৫২	১৬৫২
৩। বিহার	০৭৫	—	—
৪। গুজরাট	৫২৫	—	—
৫। জম্মু ও কাশ্মীর	২০০	৬৫৭	৬৭৫
৬। কেরালা	৬২৫	২০৮২	২০৮২
৭। মধ্যপ্রদেশ	৩০০	২৭০	২৭০
৮। মাদ্রাজ	৩০০	৬৮৪	৬৮৪
৯। মহীশূর	৬৭৫	১৮২৪	২০৮২
১০। নাগাভূমি	২৭৫	৭০৭	৭০৭
১১। উড়িষ্যা	১৩২৫	২২১৮	২২১৮
১২। রাজস্থান	৫২৫	৬৭৩	৬৭৩
১৩। উত্তর প্রদেশ	—	—	২৮৫
	৬৩৭৫	১২১৮২	১৪০৬১

উল্লিখিত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, সরকার অন্ধ্র, মহীশূর এবং উত্তর-প্রদেশকে কমিশনের সুপারিশ অপেক্ষাও অধিক অর্থ সাহায্য করিবার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। সরকারকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, কারণ ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে অন্ধ্র, মহীশূর, এবং উত্তরপ্রদেশ সরকার এক আদেশ জারী করিয়া মহার্ঘ-ভাতা বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করে কমিশন সেই ব্যয়ের কথা বিবেচনা করেন নাই। কেন্দ্রীয় সরকার এই কমিশনের একজন সদস্য অধ্যাপক ডি. জি. কার্তিকে রাজ্যগুলির ব্যয়ভারের হিসাব করিয়া সুপারিশ দিবার জন্ম অনুরোধ করেন। কার্তিকে সুপারিশের উপর ভিত্তি করিয়া অন্ধ্র, মহীশূর এবং উত্তরপ্রদেশকে যথাক্রমে ৬২২ কোটি টাকা, ২৫৮ কোটি টাকা এবং ২৮৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত অনুদান দেওয়া হয়।

(ছ) সাধারণ সুপারিশ (General Recommendations) : চতুর্থ অর্থ কমিশন যুক্তরাষ্ট্রীয় আয়ব্যয় সম্পর্কে কতকগুলি মূল্যবান সাধারণ নির্দেশদান করিয়াছেন। সাধারণ অর্থসংক্রান্ত উভয়ের স্বার্থজড়িত ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে

আলোচনার জন্ত একটি সংস্থা গঠন, অর্থ কমিশনকে প্রয়োজনীয় এবং সর্বাধুনিক তথ্য সরবরাহের জন্ত কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের একটি স্থায়ী সংস্থা গঠন এবং রাজ্যসমূহের ঋণ সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিবার জন্ত একটি সংস্থা গঠনের নির্দেশ দিয়াছেন। বর্তমান আন্তঃসরকার ঋণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিবার জন্ত কমিশন একটি সমীক্ষা পরিচালনার অধিকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন।

চতুর্থ কমিশনের বণ্টন নীতি রাজ্যগুলির ঘাটতি পূরণে সহায়তা করিবে। কিন্তু রাজ্য সরকারগুলিকেও এ বিষয়ে বেশ কিছু পরিমাণ আর্থিক দায়িত্ব মূল্যায়ন বহন করিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনাকালে তাহাদের অধিক অর্থ সংগ্রহ এবং ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হইবে।

এই কমিশনের সকল সুপারিশ সম্পর্কে সকল সদস্য একমত হন নাই। চতুর্থ কমিশনের সুপারিশের ফলে রাজ্যগুলির পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেও ইহা সকল রাজ্যকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আয়করের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির অংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে সত্য কিন্তু পূর্বের মত যৌথ কারবারের আয়কর হইতে রাজ্যগুলিকে বঞ্চিত করা হইয়াছে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, যৌথ-কারবারের নিকট হইতে আয় করের অধিক অংশ পাওয়া যায়। আয়কর বণ্টনের ক্ষেত্রে সংগ্রহের তুলনায় জনসংখ্যার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ প্রভৃতি অধিক আয়কর সংগ্রহকারী রাজ্যগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। রেলযাত্রী মাগুলের উপর করের পরিবর্তে রাজ্যগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইয়াছে। রেলযাত্রীর ভাড়া বহুল পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে উহা বাবদ কর আদায়ে পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে কিন্তু রাজ্যগুলির প্রাপ্য অংশ ১৯৬১-৬২ সালের সমান রাখা হইয়াছে। অবশ্য রেলপথ কনভেনশন কমিটির সুপারিশ অনুসারে পরে রাজ্যগুলির অনুদানের পরিমাণ সংশোধনের কথা বলা হইয়াছে। পরিশেষে, কেন্দ্রীয় রাজস্ব হইতে ঘাটতি রাজ্যগুলিকে যে সাধারণ অনুদান দিবার ব্যবস্থা আছে তাহার ফলে রাজ্যগুলি নিজেদের রাজস্ব বৃদ্ধির কোনরূপ চেষ্টা করিবে না। রাজস্ব বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ইহারা কর সংগ্রহের ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাইবে।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের অর্থ-ব্যবস্থা (Central and State Finance)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয় ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৮-৩৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আয় ছিল ৪৮ কোটি টাকা, উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৬-৬৭ সালে ২৪৫৭ কোটি টাকা হয়। আশা করা যাইতেছে যে, ১৯৬৭-৬৮ সালের শেষে উহা ২৭৩২ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইবে। ১৯৩৮-৩৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৫ কোটি টাকা, ১৯৬৬-৬৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২২৮২ কোটি টাকা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৪২৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় (Revenue and Expenditure of the Central Government) : ১৯৬৭-৬৮ সালের যে চূড়ান্ত বাজেট মোরারজী দেশাই পার্লামেন্টে পেশ করেন তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট আয় ২৭৩২ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ঐ বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় ২৪২৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে ৮৫ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস হইল বাণিজ্যশুল্ক, কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ব্যক্তিগত আয়-কর, সুপার কর, কর্পোরেশন কর, মূলধন লাভ কর, কেন্দ্রের আয়ের উৎস সম্পদ কর, এবং দান কর। কেন্দ্রীয় সরকার রেলপথ এবং ডাক ও তার বিভাগের মুনাফার একাংশ পাইয়া থাকেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং ট্যাকশাল হইতেও সরকারের কিছু আয় হইয়া থাকে। অসামরিক প্রশাসন (ফী ও জরিমানা বাবদ), অসামরিক কর্ম ব্যবস্থা (Civil works) এবং অগ্নাশ্রম বিবিধ সূত্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু আয় হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিরক্ষা, অসামরিক এবং মূলধন খাতে ব্যয় করিয়া থাকেন। স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীর যাবতীয় ব্যয় এবং অবসর প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের পেনসন ইত্যাদির জন্ত ব্যয় প্রতিরক্ষা দপ্তর হইতে করা হয়। বেসামরিক শাসন, ঋণ বাবদ সুদ, উদ্বাস্ত পুনর্বাসন, খাতের জন্ত অর্থ সাহায্য প্রভৃতি অসামরিক ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। শিল্প, রেলপথ, ডাক ও তার, আকাশপথ, নদী পরিকল্পনা প্রভৃতি উন্নয়নের জন্ত যে ব্যয় হয় তাহা মূলধন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

ভারতের জাতীয় ঋণের বর্তমান অবস্থা (Recent Trends in India's Public Debt) : অবিভক্ত ভারতে সুদ বহনকারী মোট ঋণের পরিমাণ ১৯৩৮-

৩২ সালে ১২০৫.৭৬ কোটি টাকা ছিল। ১২৪৫-৪৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ২৩০৮.৩২ কোটি টাকা হয়। সামরিক প্রয়োজনে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইহা সরকারের প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ায় সরকার বাধ্য হইয়া কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করেন। স্বাধীনতা লাভের পর সরকারকে ঋণ-দানে জনগণের অনিচ্ছার অবসান ঘটে। ১২৪৮-৪৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট সুদপ্রদানকারী ঋণের পরিমাণ ছিল ২৪৫৫.৮০ কোটি টাকা,—১২৫৫-৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩১১.৫২ কোটি টাকা হয়। সরকারের ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১২৫৬-৫৭ সালের শেষে ঋণের পরিমাণ ছিল ৩৬৭৬ কোটি টাকা, ১২৬৫-৬৬ সালের শেষে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ১১,১০২ কোটি টাকা হয়।

১২৬৭ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪,৩৫৫ কোটি টাকা। ১২৬৭-৬৮ সালের বাজেট হিসাব হইতে দেখা যায় যে, ১২৬৭-৬৮ সালের শেষে ভারতে আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬৩১৩ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫৪১৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে মোট সরকারী ঋণ প্রথম পরিকল্পনা কালের তুলনায় ছয়গুণ বৃদ্ধি পাইবে।

সরকারী ঋণ বিক্রয়যোগ্য (marketable) অথবা বিক্রয় অযোগ্য হইতে পারে। মোট ঋণের অধিকাংশই বিক্রয়যোগ্য ঋণ এবং এই ধরনের ঋণের মধ্য দিয়াই উহা অর্থ-ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করিতে পারে। অংশতঃ ভাসমান ঋণ (floating debt) এবং অংশত স্থায়ী ঋণ লইয়া বিক্রয়যোগ্য ঋণ গঠিত হয়। ক্ষুদ্র সঞ্চয় লইয়া বিক্রয় অযোগ্য ঋণ গঠিত হয়।

ভারতের সরকারী ঋণের পরিমাণের সহিত যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী ঋণের তুলনা করা যাইতে পারে। ১২৫৮ সালের শেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ঋণ জাতীয় উৎপাদনের ৬০ শতাংশ ছিল, যুক্তরাজ্যে উহা জাতীয় উৎপাদনের ১৭০ শতাংশ ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী ভারতের সরকারী ঋণ ১২৫৮-৫৯ সালে মোট জাতীয় উৎপাদনের ৪৫ শতাংশ ছিল।

সরকারী ঋণের কত অংশ সুদ বাবদ রাজস্ব হইতে ব্যয় হয় তাহা জানিতে পারিলে উহার ভার বুঝিতে পারা যাইবে। আভ্যন্তরীণ ঋণের উপর সুদ প্রদানের কালে আয় বন্টন প্রভাবিত হয় কিন্তু যদি অধিকাংশ লোকই সরকারী ঋণপত্র ক্রয় করে তাহা হইলে উহা আয় বন্টনকে প্রভাবিত করিতে পারে না। ১২৫৮-৫৯ সালে সরকারী ঋণের সুদ বাবদ মোট রাজস্ব হইতে ৭ শতাংশ ব্যয় হইত, অপরপক্ষে যুক্তরাজ্যে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহার অনুপাত ছিল যথাক্রমে ১৬ শতাংশ এবং ১১ শতাংশ।

সরকারী ঋণকে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল এই দুইভাগে ভাগ করা যায়।

ভারত সরকারের শতকরা ২০ ভাগ ঋণ উৎপাদনশীল আয়, শতকরা ১০ ভাগ মাত্র অনু-
ৎপাদনশীল অর্থাৎ ইহার দ্বারা কোন উৎপাদনশীল সম্পদের সৃষ্টি হয় না। পূর্বে ভারত
সরকারের অনুৎপাদনশীল ঋণের অনুপাত অধিক ছিল।

যে ঋণ পরিশোধের জন্ত কোন সময়সীমা নির্দিষ্ট থাকে না তাহাকে দীর্ঘ মেয়াদী
ঋণ বলে আর স্বল্পকালের মধ্যেই যে ঋণ পরিশোধ করিতে হয় তাহাকে স্বল্প-
মেয়াদী ঋণ বলে। ভারতসরকারের ঋণের শতকরা ৬০ ভাগ হইল দীর্ঘমেয়াদী
ঋণ। ভারত সরকারের ঋণের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে,
সরকারী ঋণের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

কয়েকটি প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় করের আলোচনা করা হইল।

(ক) আয়কর (Income Tax) : কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর ধার্য এবং
আদায় করেন। ১৮৬০ সালে এদেশে প্রথম আয়কর স্থাপন করা হয় এবং
ইহার পর বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া ইহা বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছাইয়াছে।
১৮৬০ সালের আইনে কৃষিগত এবং অকৃষিগত উভয়প্রকার আয়ের উপরই
আয়কর ধার্য করা হইত। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয়সরকার শুধুমাত্র অ-কৃষিগত
আয়ের উপরই কর ধার্য করিতে পারেন। কৃষিগত আয়কর রাজ্যসরকার ধার্য
করিয়া থাকেন।

১৮৮৬ সাল হইতে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত আয়কর ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করিবার
চেষ্টা করা হয়। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তীকালে আয়কর ব্যবস্থার প্রশাসনিক
উন্নতি হয় এবং আয়করকে অধিকতর গতিশীল করা হয়। ১৯৩২ সালে
আয়কর নির্ধারণে স্টেপ পদ্ধতির (Step System) পরিবর্তে স্ল্যাব পদ্ধতির (Slab
System) প্রবর্তন করা হয়।

১৯১২ সালে ভারতে প্রথম অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profits Tax)
ধার্য করা হয়। অবশ্য ইহা মাত্র এক বৎসরকাল বলবৎ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্ব
যুদ্ধের সময় পুনরায় অতিরিক্ত মুনাফা কর ধার্য করা হয়। এই কর ১৯৪০ সাল
হইতে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল এবং ১৯৩২ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে
১৯৪৬ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত যে মুনাফা অর্জিত হইয়াছে তাহাদের ক্ষেত্রে
এই কর প্রযোজ্য হইবে। ১৯৪৬ সালে মুদ্রাস্ফীতি রোধের উদ্দেশ্যে এই কর তুলিয়া
দিয়া ব্যবসায় মুনাফা কর (Business Profits Tax) ধার্য করা হয়। এই কর
১৯৪২ সালে তুলিয়া দেওয়া হয়।

কর অনুসন্ধান কমিশন সুপারিশ করেন যে, আয়করের অব্যাহতির সীমা ৪,২০০
টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০০ টাকা করিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণমাচারী তাঁহার ১৯৫৭-৫৮
সালের বাজেটে এই সুপারিশ গ্রহণ করেন। ১৯৬৬-৬৭ সালে শচীন চৌধুরী আয়করের
যে পরিকল্পনা করেন তাহার ফলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সীমা ৪০০০ টাকা এবং

যৌথ হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে উহা ৭০০০ টাকায় ধার্য করা হয়। বিবাহিত ব্যক্তি অথবা নাবালক সহ উত্তরাধিকারীশূন্য অবিভক্ত হিন্দুপরিবারের ক্ষেত্রে প্রথম ৪০০০ টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত থাকিবে। একটি সন্তান আছে এরূপ ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৪,৪০০ টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত থাকিবে। অবিবাহিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২৫০০ টাকা পর্যন্ত কর মুক্ত থাকিবে। কর অনুসন্ধান কমিশন পারিবারিক সাহায্য এবং বিবাহ সাহায্য (family allowance and marriage allowance) দিবার নির্দেশ দেয়।

১২৬৭-৬৮ সালের বাজেটে মোরারজী দেশাই কিছু অতিরিক্ত সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন। অভিভাবকদের ভরণপোষণের জ্ঞা নির্দিষ্ট ৪০০ টাকার সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অবশ্য অভিভাবকের বাৎসরিক ব্যক্তিগত আয় ১০০০ টাকার কম হইলে তবেই এই সুবিধা পাওয়া যাইবে।

ডাঃ ক্যালডর তাঁহার রিপোর্টে আয়করের হার ৪০ শতাংশ হইতে ৫০ শতাংশের মধ্যে স্থির করার নির্দেশ দেন। অনুপার্জিত আয়ের উপর ১ শতাংশ হইতে ১½ শতাংশ বাৎসরিক সম্পদ কর বসানোর সুপারিশও ক্যালডর করেন। কৃষ্ণাচারী ১২৫৭-৫৮ সালের বাজেটে সম্পদকর প্রবর্তন করেন কিন্তু আয়কর এবং সুপার করের সীমা সামান্য হ্রাস করেন। বর্তমানে ব্যক্তিগত আয়কর ব্যতীত মূলধন লাভ কর, দান কর, এবং সম্পদকর চালু থাকায় কর ভিত্তি সম্প্রসারিত হইয়াছে।

প্রতিরক্ষা ও উন্নয়নমূলক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন নূতন কর ধার্যের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। ১২৬৪-৬৫ সালের বাজেটে প্রথম আয়করের যুক্তিসিদ্ধ পুনর্গঠনের চেষ্টা করা হয় এবং ১২৬৬-৬৭ সালে উহা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করা হয়। ১২৬৫-৬৬ সালের বাজেটে আয়করের সহিত সুপারকর যুক্ত করিয়া এবং ব্যক্তিগত আয়কর হ্রাস করিয়া সমগ্র কর ব্যবস্থাকে সরল করিবার চেষ্টা করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং কর ফাঁকি হ্রাস পাইবে। ইহা ব্যতীত পুরাতন বাধ্যতামূলক আমানত পরিকল্পনার পরিবর্তে একটি নূতন বার্ষিক আমানত পরিকল্পনা (Annuity Deposit Scheme) প্রবর্তন করা হয়। বার্ষিক ২৫,০০০ টাকার অধিক আয়ের ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা প্রযোজ্য হইবে। ১২৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ব্যক্তিগত আয়ের সর্বোচ্চ সীমা ৫০০০ টাকায় ধার্য করা হয়।

ভারতীয় আয়কর ব্যবস্থায় সর্বাপেক্ষা বড় ত্রুটি হইল কর প্রবঞ্চনা। ডাঃ ক্যালডরের হিসাবানুসারে বৎসরে ২০০ হইতে ৩০০ কোটি টাকা আয়কর ফাঁকি দেওয়া হয়। শ্রীমহাবীর ত্যাগীর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন অনুসন্ধান কমিটি ১২৫২ সালে যে রিপোর্ট দাখিল করে তাহাতে কর ফাঁকির সমস্যাটি আলোচিত হইয়াছে। এই কমিটির মতে যে কোন কর ব্যবস্থার দুইটি উদ্দেশ্য থাকিবে—ইহা সংলোককে উৎসাহ দিবে এবং অসংলোককে উপযুক্ত শাস্তি দান করিবে। এই উদ্দেশ্যে কমিটি বর্তমান

আয়কর আইনের কতকগুলি সংশোধনের নির্দেশ দিয়াছেন। ইহার মধ্যে রহিয়াছে কর প্রবঞ্চকদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা, অভিযুক্ত করা এবং শাস্তি দানের ত্যাগী কমিটি

জ্ঞাত একটি পৃথক সংস্থা স্থাপন করা, যে সকল কর প্রবঞ্চক ৫০০০ টাকার অধিক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে গেজেটে তাহাদেব নাম প্রকাশ করা এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠান পরিচালিত ব্যবসায় যে কর অব্যাহতির ব্যবস্থা আছে তাহা সঙ্কুচিত করা যাহাতে বৃহৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এই ব্যবস্থার অত্যাশ্রয়যোগ গ্রহণ করিতে না পারে। কমিটি আরও বলেন যে, কর প্রবঞ্চনা সত্যই ঘটিয়াছে কিনা ইহা নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা আপাল কর্তৃপক্ষের থাকিলেও, আয়কর অফিসার যে অর্থদণ্ড দিবে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার উহার থাকিবে না।

সরকার ত্যাগী কমিটির যে সকল সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

আয়কর বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের একটি প্রধান উৎস। বর্তমানে রাজস্বের পরিমাণের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৬৬-৬৭ সালে আয়কর হইতে ২২৪ কোটি টাকা আয় হয়।

(খ) সম্পদ কর (Wealth Tax) : ১৯৫৬ সালে ক্যালডর ভারতীয় কর সংস্কারের যে প্রস্তাব করেন তাহাতে সম্পদ কর স্থাপনের নির্দেশ আছে। এই সম্পদ কর স্কাগুনেভিয়ার দেশগুলির অনুরূপ। ক্যালডর সর্বনিম্ন স্কাগুনে (১ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ টাকা) ০.৩ শতাংশ হারে কর ধার্যের সুপারিশ করেন। সর্বোচ্চ স্কাগুনে (১৫ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের সম্পত্তির ক্ষেত্রে) ১.৫ শতাংশ হারে সম্পদ কর ধার্য করা হইবে। ক্যালডর সম্পদ করের ক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা কর অব্যাহতির সীমা ধার্য করেন। সকল প্রকার সম্পত্তির উপর এই কর প্রযুক্ত হইবে।

আয়কর ও সম্পদ কর একযোগে ধার্য করিলে করদানের ক্ষমতা অনুযায়ী (Ability to Pay) কর আদায় করা যায়। আয়কর যেমন মূলধনের বুদ্ধিপূর্ণ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রভেদ করিয়া থাকে সম্পদকরের সেক্ষেপ কোন ক্ষতিকারক প্রভাব নাই। পরিশেষে বলা যায় যে, আয় গোপন করা সহজ কিন্তু সম্পত্তি গোপন করা কঠিন। আয়কর এবং সম্পত্তিকর একই সঙ্গে ধার্য করিলে কর ফাঁকি দেওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পাইবে। অবশ্য সম্পত্তিকর ধার্য এবং আদায় করায় যথেষ্ট প্রশাসনিক অসুবিধা রহিয়াছে।

কৃষ্ণমাচারী ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে সম্পদকর ধার্য করেন। ব্যক্তি, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার এবং ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উপর সম্পদকর ধার্য করা হয়। ব্যক্তির ক্ষেত্রে ২ লক্ষ টাকা এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে ৪ লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা কর অব্যাহতির সীমা ধার্য করা হয়। ইহার পর গতিশীলহারে করহার বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৬০ সাল হইতে কোম্পানীর উপর সম্পদকরের বিলোপ করা হইয়াছে।

১৯৫৭ সালের সম্পদকর আইনে অছিভুক্ত সম্পত্তি (Trust property), আসবাবপত্র, গৃহস্থালীর সামগ্রী, বস্ত্রাদি, ব্যক্তিগত অথবা পারিবারিক ভোগের জ্ঞাত ব্যবহৃত অগ্নাত দ্রব্য, ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত রত্নালঙ্কার, এবং ২০,০০০ টাকা মূল্য পর্যন্ত ব্যবসায়গত যন্ত্রপাতি সম্পদকর হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। অবশ্য আরও কয়েকটি সম্পদকে এই কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইলেও করের হার নির্ধারণের সময় তাদের মূল্য হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভারতে বসবাসকারী বিদেশী নাগরিক দেয় সম্পদকরের ৫০ শতাংশ দিবে।

১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে মোরারজী দেশাই সম্পদকরের হারে উল্লেখযোগ্য রদবদল করেন। করের হার বৃদ্ধি করা হয় এবং স্লাম পদ্ধতিতে কিছু সংশোধন করা হয়। নূতন কোম্পানীর শেষারের ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ বৎসর যে কর অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে তাহার অবসান করা হয়। ১৯৬৩-৬৪ সালের বাজেটে ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত রত্নালঙ্কারের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি তুলিয়া লওয়া হয়।

১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে কৃষ্যমাত্রার সম্পদ করের নূতন হার ঘোষণা করেন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সীমা ২ লক্ষ টাকা হইতে হ্রাস করিয়া ১ লক্ষ টাকা এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে উহা ৪ লক্ষ টাকা হইতে ২ লক্ষ টাকা করা হয়। ৪ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে করহার ০.৫ শতাংশ হারে ধার্য করা হয়। অগ্নাত স্লামগুলিও পুনর্বিভাগ করা হইয়াছে।

ব্যক্তি এবং অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের উপর সম্পদকর ব্যতীত কৃষ্যমাত্রার পৌর সম্পত্তির উপর সম্পদকর (Wealth Tax on Urban Property) প্রবর্তন করেন। একলক্ষ বা ততোধিক জনসংখ্যা সমন্বিত শহরে পৌর সম্পত্তির (জমি বা গৃহ) উপর এই কর ধার্য করা হইয়াছে। বিভিন্ন শহরের আয়তন অনুযায়ী পৌর সম্পত্তির উপর অতিরিক্ত সম্পদ করের বিভিন্নরূপ কর অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। ১ লক্ষ হইতে ৪ লক্ষ জনসমন্বিত শহরে কর অব্যাহতির পরিমাণ ২ লক্ষ টাকা ; ৪ লক্ষ হইতে ৮ লক্ষ জনসমন্বিত শহরে কর অব্যাহতির পরিমাণ ৩ লক্ষ টাকা, ৮ লক্ষ হইতে ১৬ লক্ষ জন সমন্বিত শহরে কর অব্যাহতির পরিমাণ ৪ লক্ষ টাকা ; পরিশেষে,

১৬ লক্ষ অধিক জন সমন্বিত শহরে কর অব্যাহতির সীমা ৫ লক্ষ টাকা। এই কর অব্যাহতি ব্যতীত নগরের আয়তন নির্বিশেষে

২ লক্ষ টাকা কর অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। কর অব্যাহতির উদ্দেশ্যে যে পৌর সম্পত্তি আছে তাহার উপর গতিশীল হারে অতিরিক্ত সম্পদকর (Additional Wealth Tax) ধার্য করা হইয়াছে।

(গ) ব্যয় কর (Expenditure Tax) : অধ্যাপক ক্যালডরই সর্বপ্রথম ব্যয়কর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। একই সঙ্গে ব্যয়কর এবং আয়কর ধার্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ছিল ; ক্যালডর সমতা এবং অর্থনৈতিক সুবিধার যুক্তিতে ব্যয়করকে সমর্থন করেন।

কৃষ্যচারী ১২৫৭-৫৮ সালের বাজেটে ব্যক্তি এবং অবিভক্ত হিন্দুপরিবারের উপর এই কর ধার্যের প্রস্তাব করেন। তদনুসারে, ১২৫৭ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে ব্যয়কর আইন পাশ হয়। ১২৫৮ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই আইন বলবৎ করা হয়। কিন্তু এই কর পরিচালনায় অত্যধিক ব্যয়ের তুলনায় ইহা হইতে লব্ধ রাজস্ব খুবই নগণ্য। এই কারণে পাঁচ বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৬২-৬৩ সালে এই কর তুলিয়া লওয়া হয়। কিন্তু বিলাস ভোগের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্যচারী ১২৬৪-৬৫ সালের বাজেটে পুনরায় ব্যয়করের প্রবর্তন করেন। নূতন কর হার ১২৫৭ সালের তুলনায় কম ছিল। কর অব্যাহতির সীমা ৩৬,০০০ টাকায় ধার্য করা হয় এবং কর পরবর্তী স্লামগুলির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হইতে ২০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে। শ্রীশচীন চৌধুরী ১২৬৬-৬৭ সাল হইতে ব্যয়কর তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই কর হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব মাত্র ৬০ লক্ষ টাকা ছিল। অপরপক্ষে ইহা আদায় করিতে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হইতেছিল।

ব্যয়কর একটি বাৎসরিক কর এবং ইহাতে বিশেষ সুরক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। ১২৫৭ সালের আইনানুযায়ী ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা অব্যাহতির পরিমাণ ছিল। অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের প্রধান ব্যক্তি তাহার স্ত্রী এবং সন্তানের জন্ম যে কেবলমাত্র ৩০,০০০ টাকা অব্যাহতি ছিল তাহাই নয়, প্রত্যেক সহ-উত্তরাধিকারীর জন্ম ৩০০০ টাকা করিয়া মোট ৬০,০০০ পর্যন্ত অব্যাহতি পাইবার ব্যবস্থা ছিল। এই কর স্লাম পদ্ধতিতে গতিশীল হারে ধার্য করা হইয়াছিল। করের হার এইরূপ ছিল :

প্রথম ১০,০০০ টাকার জন্ম ১০% হারে

১০,০০০ টাকা হইতে ২০,০০০ টাকার জন্ম ২০%

২০,০০০ টাকা হইতে ৩০,০০০ টাকার জন্ম ৪০%

৩০,০০০ টাকা হইতে ৪০,০০০ টাকার জন্ম ৬০%

৪০,০০০ টাকা হইতে ৫০,০০০ টাকার জন্ম ৮০%

৫০,০০০ টাকা বা ততোধিক ব্যয়ের জন্ম ১০০%

ব্যয়কর স্থাপনের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয় :—

প্রথমত, দেশে আয়কর রহিয়াছে এবং ইহার হার যথেষ্ট গতিশীল, ইহার উপর আবার ব্যয়কর চাপাইলে করভার দুঃসহ হইয়া উঠিবে। উপরন্তু ব্যয়কর একটি জটিল কর এবং ইহা সংগ্রহ করিতে নানা প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

দ্বিতীয়ত, মিসেস হিক্স বলিয়াছেন, এই কর সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় কারণ বৃহৎ পরিবারের স্বভাবতই ব্যয় অধিক হইবে এবং তাহার উপর এই করের ভার অত্যধিক হইবে। তৃতীয়ত, কৃষি-আয়করকে ব্যয়কর হইতে মুক্তি দিতে হইবে কারণ রাজ্য সরকার এই কর ধার্য করিয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় লোকে তাহাদের আয়কে কৃষি-আয় হিসাবে চালাইতে চেষ্টা করিবে। চতুর্থত, আয়করের পরিবর্তে ব্যয়কর

ধার্য করা হইলে, সঞ্চয়, করের আওতার বাহিরে চলিয়া যাইবে ফলে ইহা ধনী লোকের সম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। ইহা রোধ করবার জ্ঞা যদি সম্পত্তি কর স্থাপন করা হয় তাহা হইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস পাইবে এবং ব্যয়করের প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হইবে।

অধ্যাপক ক্যালডর ব্যয়করের সমর্থনে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছেন। প্রথমত, ব্যক্তির আয় তাহার কর প্রদানের প্রকৃত মানদণ্ড নয়—ব্যয় ক্ষমতাই তাহার কর প্রদানের ষ্ণার্থ মানদণ্ড হইতে পারে। দ্বিতীয়ত, ডাঃ লিটল ব্যয়কর সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, কাজের আকারে ব্যক্তি সামাজিক ভাণ্ডারে যাহা দিতেছে তাহা অপেক্ষা ভোগের আকারে সামাজিক ভাণ্ডার হইতে সে যাহা গ্রহণ করিতেছে তাহাই কর প্রদানের ভিত্তি হওয়া উচিত। তৃতীয়ত, ব্যয়কর স্থাপিত হইলে ধনীলোকের অপ্রয়োজনীয় বিলাস ব্যয় কমিবে, সঞ্চয়ের ইচ্ছা বাড়িবে, ফলে দেশের মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু আয়কর ধার্য করিলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবার কোন কারণ নাই। পরিশেষে, ব্যয়কর স্থাপিত হইলে উচ্চহারে ডিভিডেন্ট প্রদান করা সমাজের দিক হইতে অবাস্তিত বলিয়া মনে করা হইবে না এবং কোম্পানী বাজার হইতে অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে। প্রশাসনিক অশুবিধা এবং ব্যয়কর সংগ্রহের ব্যয় অধিক হওয়ার দরুন ১৯৬৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) মূলধন লাভ কর (Capital Gains Tax) : কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির মধ্যে ভারতেই প্রথম মূলধন লাভ কর স্থাপন করা হয়। ১৯৪৭ সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী লিয়াকৎ আলী খাঁ প্রথম এই কর স্থাপন করেন কিন্তু এই কর হইতে আশানুরূপ আয় না হওয়ায় দুই বৎসর পরে উহা তুলিয়া লওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে ক্যালডরের সুপারিশের পর কৃষ্ণমাচারী মূলধন লাভ কর পুনঃপ্রবর্তন করেন। এই কর পুনঃস্থাপনের তিনটি উদ্দেশ্য ছিল—আয় বৈষম্য হ্রাস করা, উন্নয়নের জ্ঞা অর্থ সংগ্রহ করা এবং আয়করের কয়েকটি ক্রটি সংশোধন করা।

মূলধন লাভ বা ক্ষতি বলিতে সম্পদের মূল্যের বৃদ্ধি বা হ্রাস বুঝায়। মূলধন লাভ ক্ষটি (accrued) হইলেই কর ধার্য করা হইবে না—বিক্রয় দ্বারা মূলধন লাভ হাতে আসিলে (realized) তবেই কর ধার্য করা হইবে। শেয়ার, জমি, বাড়ি, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যে মূল্যে ক্রয় করা হইয়াছিল তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিলে মূলধন লাভ হইবে। রক্ষণশীল দেশে “আয়” সম্পর্কে ধারণা হইল ইহা কর প্রদান ক্ষমতার পরিচায়ক এবং ইহা নিয়মিতভাবে অর্জিত হয়। কিন্তু মূলধন লাভ সম্পূর্ণ আকস্মিক এবং গোভন্স বলেন যে, “উৎস হইতে আয়-প্রবাহ হিসাবে ইহার উদ্ভব নয়—স্বয়ং উৎসকে বিক্রয় করায় ইহার উদ্ভব।” কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ স্বীকার করেন যে, মূলধন বিক্রয় হইতে যে অনিয়মিত আয় হয় তাহাও ব্যক্তির ক্রয়শক্তি এবং

কর প্রদানের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে মূলধন লাভ ঘটবে। মূলধন লাভ কর ধার্য করিলে রাষ্ট্র এই মুনাফার অংশ পাইবে।

কর অনুসন্ধান কমিশন এই কর পুনঃপ্রবর্তনের বিপক্ষে মত দিয়াছিলেন। কারণ কমিশন দেখিয়াছিলেন, যে দুই বৎসর ইহা চালু ছিল সেই সময় ইহা হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব হ্রাস পাইয়াছিল এবং বেসরকারী বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ইহা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছিল। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করিবার জগ্ন কমিশন মূলধন লাভ কর পুনঃ প্রবর্তন না করিয়া আয়করের হার বৃদ্ধি করিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন। অবশ্য ক্যালডর মনে করেন যে, ১৯৪৮ সালে যে যুক্তিতে মূলধন লাভ কর তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা অত্যন্ত দুর্বল। ক্যালডর গ্রায়বিচারের ভিত্তিতে এই কর পুনঃ প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, মূলধন লাভকে আয়করের আওতার বাহিরে রাখা গ্রায় বিচারের ভিত্তিতে সমর্থন করা যায় না কারণ ইহার ফলে এক বিশেষ শ্রেণীর করদাতার প্রতি পক্ষপাতপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। ক্যালডরের সুপারিশ অনুযায়ী ভারত সরকার ১৯৫৬ সালে আয়কর আইনের সংশোধন করিয়া মূলধন লাভ কর প্রবর্তন করেন। (১) বাধ্যতামূলক সম্পত্তি গ্রহণ, (২) কোম্পানী ভাঙ্গিয়া গেলে অংশীদারগণের মধ্যে সম্পত্তি বন্টন এবং (৩) বাসগৃহ ইত্যাদি সম্পত্তি বিক্রয়ের দরুন যে মূলধন লাভ হয় তাহার উপর এই কর ধার্য করা হইয়াছে। এইভাবে মুদ্রাস্ফীতির সময় যাহারা মূলধন সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রকৃত মুনাফা অর্জন করিতেছিল তাহাদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৯৪৭-৪৮ হইতে ১৯৪৯-৫০ সালে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত টাকায় এক আনা হারে মূলধন-লাভ কর ধার্য করা হয় এবং মূলধন-আয় ১০ লক্ষ টাকার অধিক হইলে তবেই সর্বোচ্চ হার টাকায় ৫ আনা ধার্য করা হইত। ক্যালডরের মতে করের এই হার অত্যন্ত কম। ক্যালডর বলেন যে, মূলধনলাভ ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং আয়করের প্রান্তিক হার টাকায় ৭ আনার অধিক হইবে না।

১৯৫৬ সালের ফিনান্স আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার মূলধন লাভকে আয়করের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই আইন অনুসারে কর হার টাকায় ৪ আনা ধার্য করা হয়। কোন বৎসর ৫০০০ টাকার কম মূলধন লাভ হইলে তাহার উপর এই কর ধার্য করা হইবে না। মূলধন লাভের উপর কোন অতিরিক্ত কর (Super Tax) দিতে হইবে না কিন্তু টাকায় ৪ আনা হিসাবে আয়কর দিতে হইবে।

১৯৬৩ সালের ফিনান্স আইনে ঘোষণা করা হয় যে, সম্পত্তি অর্জনের এক বৎসরের মধ্যে উহা বিক্রয় করা হইলে যে মূলধন লাভ হইবে উহা সাধারণ আয়ের গ্রায় আয়কর এবং সুপার করের আওতায় আসিবে।

১৯৬৪ সালের ফিনান্স আইনে তিনটি প্রধান পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমত, পূর্বে যে ২৫ শতাংশ সর্বোচ্চ সীমা ছিল তাহা তুলিয়া দিয়া মূলধন লাভকর গতিশীল হারে ধার্য করা হয়। দ্বিতীয়ত, বাড়ী এবং জমির ক্ষেত্রে করের হার বিভিন্ন

হইবে। তৃতীয়ত, বোনাস-শেয়ার বিক্রয় করা হইলে যে মূলধন লাভ হইবে তাহার উপর কর ধার্য করা হইবে।

(৬) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক (Central Excise Duties) : বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্বের একটি প্রধান উৎস হইল কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক। ১৯৩৪ সালে কতকগুলি দেশীয় শিল্পকে সংরক্ষণ দেওয়ায় বাণিজ্য শুল্ক হইতে রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইলে চিনি ও দিয়াশলাই-এর উপর এই কর বসানোর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় অধিক অর্থের প্রয়োজন দেখা দেওয়ায় পুরাতন অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করা এবং নূতন নূতন দ্রব্যের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর দুইটি কারণে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়—শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি। চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজ্যসরকারগুলি কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের ২০ শতাংশ পাইবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ভারত সরকার ক্ষুদ্র শিল্পসমূহের উন্নয়নের জন্ত তাহার অন্তঃশুল্ক ধার্যের ক্ষমতা ব্যবহার করিতেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ক্ষুদ্র এবং মাঝারি দিয়াশলাই কারখানার ক্ষেত্রে বিভেদমূলক অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইয়াছে। খাদি এবং হস্তচালিত তাঁতবস্ত্রকে উৎসাহিত করিবার জন্ত সরকার মিলবস্ত্রের উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করেন কিন্তু খাদি এবং তাঁত বস্ত্রকে কর হইতে অব্যাহতি দেন। ১৯৫৪ সালে সিঙ্ক বস্ত্র, জুতা, সাবান এবং অগ্নাশ্রু দ্রব্যের অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয় কিন্তু ক্ষুদ্র কারখানায় উৎপাদিত ঐ সকল দ্রব্যকে কর অব্যাহতি নতুবা বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়।

স্বাধীনতা লাভের পর সিগারেট, বস্ত্র, কৃত্রিম সিঙ্ক, সিমেন্ট, সাবান, জুতা, বৈদ্যুতিক পাখা, বাল্ব, ব্যাটারী, কাগজ, উলবস্ত্র, রং প্রভৃতির উপর অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে কৃষ্ণমাচারী চিনি, মোটর স্পিরিট, ভেজ তৈল, সিমেন্ট, লৌহপিণ্ড, তামাক, দিয়াশলাই, কাগজ এবং ডিজেল তেলের উপর অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেটে অন্তঃশুল্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই সময় প্রতি টন সিমেন্টে অন্তঃশুল্ক ২০ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২৪ টাকা করা হয়। পরবর্তীকালের সকল বাজেটেই অতিরিক্ত রাজস্ব সংগ্রহের জন্ত অন্তঃশুল্কের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালের বাজেটে প্রথম কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা দানের ব্যবস্থা করা হয়। দাম হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে অন্তঃশুল্কের হার কমানো হয়। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে চিনি, সিগার সিগারেট, ডিজেল তেল এবং কাঁচা তামাকের উপর অন্তঃশুল্ক বৃদ্ধি করা হয়; সূতা এবং তুলা বস্ত্রের উপর বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৬৭-৬৮ সালের বাজেটে চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য, জুতা, সিগারেট, পেট্রোল, প্লাস্টিক দ্রব্য, রেয়ন, এলুমিনিয়াম এবং মিহি সূতার উপর অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করা হয় এবং কয়েকটি দ্রব্যের উপর সর্বপ্রথম অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের অধীনস্থ দ্রব্যের সংখ্যা মাত্র ১২ ছিল ; বর্তমানে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৪ হইয়াছে। আবার করের হারও বহুবার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সেইজন্ম বিগত ১৬ বৎসরে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক রাজস্বের গুরুত্ব বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১২৫০-৫১ সালে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে লব্ধ রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৬৮ কোটি টাকা, ১২৬৬-৬৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৮৮০ কোটি টাকা হয়। বিগত ১৬ বৎসরে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক রাজস্ব সরকারের মোট কর রাজস্বের ১৭ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৪২ শতাংশ হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক একটি উৎপাদনশীল কর এবং সাধারণ ভোগ্যবস্তুর উপর এই কর ধার্য করা হইলে ইহা হইতে পূর্বাশ্রিত রাজস্ব আদায় হইবে। কিন্তু সাধারণ ভোগ্যবস্তুর উপর কর ধার্য করিলে দরিদ্র জনগণের উপর এই করের বোঝা বিশেষ ভারস্বরূপ হইবে।

কর অনুসন্ধান কমিশন চিনি, কেরোসিন, চা, কাপড় এবং দিয়াশালাই এর উপর অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি করিতে এবং উলবস্ত্র, বৈদ্যুতিক বাল্ব, ব্যাটারী, কাগজ, সেলাইকল, রং ও বার্নিস, বিস্কুট, মুংশিল্পজাত দ্রব্য, কাঁচ ও কাঁচের দ্রব্য, এবং উদ্ভিজ্জ তেলের উপর নূতন কর স্থাপন করিতে নির্দেশ দেন। কর হার বৃদ্ধি এবং নূতন কর স্থাপনের দক্ষন কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক হইতে রাজস্ব ৪০ হইতে ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে। ১২৫৫-৫৬ এবং ১২৫৬-৫৭ সালের বাজেটে কমিশনের অন্তঃশুল্ক সংক্রান্ত সকল সুপারিশই কার্যকরী করা হয়। প্রায় প্রত্যেক বৎসরই বাজেটে অন্তঃশুল্কের হার বৃদ্ধি এবং নূতন দ্রব্যের ক্ষেত্রে উহা ধার্য করা হয়।

(৫) সম্পত্তিকর বা মৃত্যুকর (Estate Duty or Death Duty) : মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির উপর ধার্য করকে সম্পত্তিকর বা মৃত্যুকর বলে। ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবার পূর্বে এই কর সরকারকে দিতে হয়। ১২৫৩ সালে ভারতে এই কর ধার্য করা হয়। সংবিধান অনুসারে কৃষি-জমি ব্যতীত অগ্নাশ্রিত সম্পত্তির উপর কেন্দ্রীয় সরকার মৃত্যুকর ধার্য এবং আদায় করিবে এবং কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলসমূহের জন্ম শতকরা ২ ভাগ রাখিয়া বাকী অংশ রাজ্যগুলির মধ্যে বন্টন করিয়া দিবে। এই কারণে মৃত্যুকর কেন্দ্রীয় আয়-ব্যয় ব্যবস্থা এবং রাজ্যের আয়-ব্যয় ব্যবস্থার প্রান্তসীমায় অবস্থিত।

রাজস্ববৃদ্ধি এবং ধনবৈষম্য হ্রাস করিবার জন্ম অর্থনীতিবিদগণ এই করকে সমর্থন করিয়া থাকেন। আয়করের তুলনায় মৃত্যুকর ফাঁকি দেওয়া খুবই কঠিন এবং কর্মস্পৃহার উপর ইহার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া নাই। ধনবৈষম্য হ্রাস করিয়া মৃত্যুকর একটি প্রয়োজনীয় সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করে।

অবশ্য অনেকে বলেন যে, এই কর ব্যক্তিগত সঞ্চয় হ্রাস করিয়া মূলধন গঠন ব্যাহত করে। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সঞ্চয়

এবং ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন এবং বে-সরকারী সঞ্চয় বৃদ্ধি পর্যাাপ্ত না হইলে রাষ্ট্র উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি বেসরকারী সঞ্চয় পর্যাাপ্ত না হয় তাহা হইলে সরকার তাহার নিজস্ব সঞ্চয় বৃদ্ধি করিবে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ১৯৫৩ সালে মৃত্যুকর আইন পাশ করা হয়। ইহার দুইটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—ধনবৈষম্য হ্রাস করা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্ত অর্থসংগ্রহ করা। ১৯৫৮ সালে এক সংশোধনী আইন পাশ করিয়া কর ধার্যের সীমা ১০০,০০০ টাকা হইতে নামাইয়া ৫০,০০০ টাকা করা হয়। মুদ্রিত মত সৈনিকের সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অব্যাহতি দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতের মৃতব্যক্তির সমগ্র সম্পত্তির উপর মৃত্যুকর ধার্য করা হয়। নগদ টাকা, স্বর্ণপিণ্ড, রত্নালঙ্কার, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ি ইত্যাদি করের আওতায় পড়ে। মৃত্যুর দুইবৎসর পূর্বে যে সকল সম্পত্তি দান করা হইয়াছে তাহাও এই করের আওতায় পড়িবে। কিন্তু মৃত্যুর ছয় মাস পূর্বে জনকল্যাণমূলক কাজে যাহা দান করা হইয়াছে তাহা করের আওতায় আসিবে না। স্ন্যাব পদ্ধতিতে এই কর ধার্য করা হয়। বর্তমানে এই করের সর্বনিম্ন হার ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ হার হইল ৮৫ শতাংশ। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে শট্টান চৌধুরী মৃত্যুকরের হার বৃদ্ধি করেন।

এই কর ধার্য করিবার পর ধনিক সম্প্রদায় তাহাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি দান করিয়া এই কর ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। সেইজন্ত ক্যালডর দানকর স্থাপনের সুপারিশ করেন। ইহার ফলে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি পাইবে এবং উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পত্তি দান করিবার প্রবণতাও হ্রাস পাইবে। মৃত্যুকরের সহিত দানকর স্থাপন করিলে কর ফাঁকি দেওয়া কঠিন হইবে।

(ছ) দানকর (Gift Tax) : সুসংহত কর ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ক্যালডর দানকর প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে প্রথম দানকর ধার্য করা হয়। মৃত্যুকর ফাঁকি দিবার পথ হইল দানকর। কর ফাঁকি বন্ধ করিবার জন্ত দানকর স্থাপন করা অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। মৃত্যুকরের ত্রায় দানকরের উদ্দেশ্য হইল ব্যক্তির সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তর করিবার স্বাধীনতার সঙ্কোচ করা। হেনরি সিমন্স মন্তব্য করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং উহা হইতে লব্ধ আয় ব্যক্তির প্রতি সমাজের প্রদত্ত সুযোগের দান। উত্তরাধিকারীগণ যাহাতে এই সুযোগের মূল্য দেয় সেই উদ্দেশ্যে সম্পত্তি কর বসানো হয়। দানকর সম্পত্তিকরের পরিপূরক কারণ ইহা না থাকিলে কর ফাঁকি দেওয়া খুবই সহজ হইবে।

কোন ব্যক্তি তাহার সম্পত্তি দান করিলে এই দানের উপর কর ধার্য করাকে দানকর বলে। ক্যালডর মৃত্যুকর তুলিয়া দিয়া সাধারণ দানকর স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছিলেন কিন্তু ভারতসরকার মৃত্যুকর না তুলিয়া দানের উপর পৃথকভাবে দানকর ধার্য করেন।

১৯৫৮ সালের দানকর আইনানুসারে কর ধার্যের সীমা হইল ১০,০০০ টাকা। কিন্তু ১৯৬৪-৬৫ সালে কৃষ্যমাচারী ইহা হ্রাস করিয়া ৫০০০ টাকা করেন। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে শচীন চৌধুরী পুনরায় কর ধার্যের সীমা ১০,০০০ টাকা করেন। ভূদান এবং সম্পত্তি দান আন্দোলনে যাহা দান করা হইবে তাহা এই করের আওতায় আসিবে না। ইহা ব্যতীত শ্রমিকদের বোনাস, ব্যবসায় পরিচালনার জ্ঞাত দান, দাতব্য প্রতিষ্ঠানকে দান এই করের আওতায় আসিবে না। সম্পত্তি মন্দির বা অন্য কোন সাধারণ উপাসনালয়কে প্রদত্ত দানকে এই কর হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম ৫০,০০০ টাকার ক্ষেত্রে ৪ শতাংশ হারে কর দিতে হইবে এবং এই করের সর্বোচ্চ হার হইল ৫০ শতাংশ এবং ১৫ লক্ষ টাকার অধিক স্ল্যাবে ইহা প্রযোজ্য। ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে দানকরের হারকে পুনর্বিভাগ করিয়া মৃত্যুকরের হারের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে।

দানকর স্থাপনের ফলে সাধারণভাবে দান করার প্রবণতা হ্রাস পাইবে এবং বর্তমান সঙ্কটে এই স্বত্র হইতে কিছু পরিমাণ রাজস্বও পাওয়া যাইবে। ১৯৬৫-৬৬ সালে ৩ কোটি টাকার কিছু বেশি এই উৎস হইতে পাওয়া যায়।

(জ) অতিরিক্ত মুনাফা কর (Super Profits Tax) : ১৯৬৩-৬৪ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে কোম্পানীর আয়ের উপর অতিরিক্ত মুনাফাকর ধার্য করা হয়। কোম্পানীর মুনাফা হইতে আয়কর এবং সুপার কর বাদ দিবার পর উহা তাহার আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভের ৬ শতাংশের অধিক হইলে কোম্পানীকে অতিরিক্ত মুনাফা কর দিতে হইবে। এইরূপ মুনাফার পরিমাণ আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভের ৬ শতাংশের অধিক কিন্তু ১০ শতাংশের কম হইলে করের হার শতকরা ৫০ ভাগ এবং ১০ শতাংশের অধিক হইলে করের হার শতকরা ৬০ ভাগ হইবে।

অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এই করের সমর্থনে কয়েকটি যুক্তি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রথমত, সমাজের আর সকলের গ্রায কোম্পানী-গুলিকেও ক্রমবর্ধমান জাতীয় দায়িত্ব বহন করিতে হইবে; দ্বিতীয়ত, এই করের ফলে কোম্পানীর অতিরিক্ত মুনাফা হ্রাস পাইবে এবং তৃতীয়ত, এই করের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা যাইবে।

অতিরিক্ত মুনাফা কর যোথ কোম্পানীগুলিকে বিশেষভাবে আঘাত করে এবং মূলধন বাজারে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এই করের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত যুক্তি-বিপক্ষে যুক্তি গুলি উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমত, এই কর দক্ষতা এবং গতি-শীলতার উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। ফার্মটি যতই দক্ষ এবং গতিশীল হইবে ততই মূলধন অনুপাতে তাহার মুনাফা হইবে। কিন্তু মুনাফা হারের সহিত করহারের যোগসূত্র স্থাপন করায় দক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষ অনুবিধার সম্মুখীন হয়। দ্বিতীয়ত, যুক্তিসঙ্গত রিজার্ভকাণ্ড গঠনের ক্ষমতাও ব্যাহত হয়।

শিল্প সম্প্রসারণের জন্য মূনাফার পূর্ণ নিয়োগ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। তৃতীয়ত, এই কর সামান্যতির পরিপন্থী। গতিশীলকরের নীতি ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, উহা কোম্পানী আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। বিভিন্ন প্রকার শেয়ারে অর্থবিনিয়োগ করিলে বুঁকির তারতম্য হয়। কোন কোন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বুঁকির পরিমাণ অধিক। কিন্তু সকল ধরনের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে একই ধরনের আয় নির্ধারণ করার ফলে বুঁকি-পূর্ণ বিনিয়োগ ব্যাহত হইবে। চতুর্থত, এই কর উচ্চ মূনাফা অর্জনকারী কোম্পানীর ডিভিডেণ্ড প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছে এবং ডিভিডেণ্ড বণ্টনের উপর একটি সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করিয়াছে। কোম্পানীগুলি ডিভিডেণ্ড হ্রাস করিলে জনসাধারণ কোম্পানীর শেয়ারে অর্থ বিনিয়োগ করিতে উৎসাহ দেখাইবে না। পঞ্চমত, কর অব্যাহতি লাভের জন্য কোম্পানীর পরিচালক নানারূপ অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া মূনাফা কম দেখাইবে। এই কর অপচয়মূলক ব্যয় বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিবে।

অতিরিক্ত মূনাফাকরের বিরুদ্ধে সমালোচনা এরূপ তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল যে, ১৯৬৪-৬৫ সালের বাজেটে এই কর তুলিয়া দেওয়া হয়। বর্তমানে অতিরিক্ত মূনাফা করের পরিবর্তে কোম্পানীর মূনাফার উপর সারট্যাক্স (Sur tax) ধার্য করা হয়। সার-ট্যাক্স ২ লক্ষ টাকার অধিক অথবা মূলধন ভিত্তির (Capital base) ১০ শতাংশ অপেক্ষা অধিক কোম্পানীর করধার্যযোগ্য মূনাফার (chargeable profits) উপর বসিবে। এই কর অতিরিক্ত মূনাফার ৩৫ শতাংশ হইবে।

রাজ্য সরকারসমূহের আয়-ব্যয় ব্যবস্থা (Revenue and Expenditure of State Governments) : বর্তমানে ব্যয় বৃদ্ধির ফলে অধিকাংশ রাজ্য সরকারের বাজেটে ঘাটতি দেখা দিয়াছে এবং তাহারা রাজস্বের নূতন নূতন উৎস অন্বেষণ করিতেছে।

রাজ্য সরকারসমূহের রাজস্বের প্রধান প্রধান উৎস হইল বিক্রয়কর, ভূমিরাজস্ব, প্রমোদকর, জুয়া ও বাজীর উপর ধার্যকর, স্ট্যাম্পকর, সেচকর, বনরাজস্ব, রেজিস্ট্রী ফী এবং আবগারী শুল্ক। বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং কেরালা এই সাতটি রাজ্যে কৃষি আয়কর রাজস্বের একটি প্রধান উৎস। ইহা ব্যতীত রাজ্যসমূহ আয়কর, কেন্দ্রীয় অন্তঃস্থলের অংশ, মৃত্যুকরের সম্পূর্ণ অংশ, রেলমাগুলের পরিবর্তে বাৎসরিক অনুদান এবং সাধারণ অনুদান পাইয়া থাকে। মদ, গাঁজা আকিম প্রভৃতি মাদক দ্রব্যের উপর আবগারী শুল্ক ধার্য করা হয়। কয়েকটি রাজ্যে মত্তপান নিষিদ্ধ হওয়ায় আবগারী শুল্ক হইতে রাজস্বের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পাইয়াছে। পূর্বে ভূমিরাজস্বই রাজ্যসরকারের প্রধান আয়ের উৎস ছিল কিন্তু বর্তমানে ইহার গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছে। অপরপক্ষে বিক্রয় কর, প্রমোদকর এবং কৃষি আয়করের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রধানত, বেসামরিক পরিচালনা এবং সমাজসেবা খাতে রাজ্যসরকার তাহার রাজস্ব ব্যয় করিয়া থাকে। সাধারণ পরিচালনা, পুলিশ, বিচার, জেল ইত্যাদি

বেসামরিক পরিচালনার অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, সমবায়, পশুচিকিৎসা ইত্যাদি সমাজসেবার অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ, শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য খাতে রাজ্য সরকারের অধিকাংশ আয়ই ব্যয় হইয়া থাকে। অবশ্য বর্তমানে সমাজকল্যাণমূলক ব্যয়ের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

(ক) বিক্রয় কর (Sales Tax) : বিক্রয় কর রাজ্য সরকারের একটি উৎপাদন-শীল রাজস্বের উৎস। ১৯৩৮ সালে মধ্যপ্রদেশে সর্বপ্রথম এই কর ধার্য করা হয়। ইহার পর ১৯৩৯ সালে মাদ্রাজে এবং ১৯৪১ সালে বাংলাদেশে বিক্রয়কর ধার্য করা হয়। বর্তমানে সকল রাজ্যেই বিক্রয়কর বলবৎ আছে। স্বাধীনতা লাভের পর বোম্বাই ও মাদ্রাজে মতপান নিষিদ্ধ হওয়ায় আবগারী রাজস্ব হ্রাস পায় আর এই ঘাটতি পূরণের জন্ত বিক্রয় করের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যে বিক্রয়কর বা ক্রয়কর (Purchase Tax) আয়ের একটি প্রধান উৎস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসমূহের মোট রাজস্বের $\frac{1}{5}$ অংশ পাওয়া যায় বিক্রয় কর হইতে। যুক্তরাজ্যে ১৯৪০ সালে ভোগ হ্রাস করিবার জন্ত ক্রয়কর স্থাপন করা হয়। বিক্রয়কর বিক্রয়ের উপর ধার্য করা হয় এবং বিক্রেতার নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয় কিন্তু ক্রয় কর ক্রেতার নিকট হইতে আদায় করা হয়। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই প্রয়োজনীয় ভোগ্যবস্তুর উপর বিক্রয়কর ধার্য করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কাঁচাপাটের উপর, উত্তরপ্রদেশ সরকার আখের উপর এবং মাদ্রাজ সরকার কাঁচা চামড়ার উপর ক্রয় কর ধার্য করেন।

বিক্রয় কর দুই ধরনের হইতে পারে—একবিন্দু কর (single point tax) এবং বহু বিন্দু কর (multiple point tax)। বহু বিন্দু কর ব্যবস্থায় বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে কর ধার্য করা হয় বলিয়া চূড়ান্ত ভোগকারীর নিকট দ্রব্যটি পৌঁছিবার পূর্বে বহুবার উহার উপর কর ধার্য হয়। বিভিন্ন বিক্রয় পর্যায়ের মধ্যে একবার মাত্র কর আদায় করা হইলে উহাকে একবিন্দু কর বলে। একবিন্দু করের হার সাধারণত বহুবিন্দু করের তুলনায় কম হয়। বহুবিন্দু কর ব্যবস্থার সুবিধা এই যে ইহা ফাঁকি দেওয়া কঠিন। মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং মহীশূরে বহুবিন্দু বিক্রয় কর ধার্য আছে। উত্তর প্রদেশে বিক্রয় করের ক্ষেত্রে একবিন্দু এবং বহুবিন্দু এই উভয় নীতিই অনুসরণ করা হয়।

একবিন্দু কর ব্যবস্থায় সাধারণত সর্বশেষ বিক্রেতার নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। এইজন্ত সর্বশেষ বিক্রেতাকে কর দিবার জন্ত সমস্ত ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব রাখিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গ, পাঞ্জাব, মধ্যভারত এবং দিল্লীতে একবিন্দু বিক্রয় কর ধার্য করা হইয়াছে।

সম্প্রতি পশ্চিম বাংলায় বিক্রয় করের পরিধি এবং হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১.৫০ টাকার অতিরিক্ত মূল্য থাক্তর উপর বিক্রয় কর ধার্য করিয়াছেন এবং বিলাসদ্রব্যের ক্ষেত্রে কর হার ৭ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১০ শতাংশ

করা হইয়াছে। সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, কতকগুলি দ্রব্য যাহারা পূর্বে-বিক্রয়ের শেষ পর্যায়ে করের আওতায় আসিত এখন হইতে উহারা বিক্রয়ের প্রথম পর্যায়ে করের আওতায় আসিবে। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গ বিক্রয় কর একবিন্ডু কর এবং বহু বিন্ডু করের সংমিশ্রণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯৬৬ সালের ১লা আগষ্ট হইতে পশ্চিমবঙ্গে বিক্রয় করের সাধারণ হার ৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬ শতাংশ করা হইয়াছে।

বিক্রয় কর একটি উৎপাদনশীল এবং নমনীয় কর। রাজ্যের প্রয়োজন অনুসারে এই করের পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু এই করের প্রধান ত্রুটি যে ইহা একটি অধোগতিশীল কর। সাধারণ ভোগ্যবস্তুর উপর এই কর ধার্য করা হইলে দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর ইহার অধিক ভার পড়ে। বিক্রয় করের আর একটি ত্রুটি যে, কর ধার্যের ব্যাপারে সর্বভারতীয় একরূপতা নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয় কর ধার্যের ব্যাপারে সমতা আনয়নের চেষ্টা করিতেছেন। ১৯৫৭ সালের নভেম্বর মাসে রাজ্য অর্থমন্ত্রী সম্মেলনে স্থির হয় যে, চিনি তামাক, এবং মিল বস্ত্রের উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হইবে এবং ১৫টি রাজ্যে ১৭টি বিলাসদ্রব্যের উপর সমান হারে বিক্রয় কর ধার্য করা হইবে। মিল বস্ত্র, তামাক এবং চিনির উপর বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক ধার্য করা হয় এবং তৃতীয় অর্থ কমিশন সুপারিশ করেন যে, এই তিনটি দ্রব্যের উপর ধার্য অতিরিক্ত অন্তঃশুল্কের সমস্তটাই সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে দিতে হইবে।

১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে রাজ্যগুলির অর্থ-সংগ্রহের দুইটি পন্থা নির্ধারণ করা হয়।

প্রথমত, আন্তঃরাজ্য বিক্রয়ের উপর কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর ২ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩ শতাংশ করা। ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই হইতে ইহা কার্যকরী হয়। দ্বিতীয়তঃ, আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে সকল দ্রব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তাহাদের ক্ষেত্রে বিক্রয় করের সর্বোচ্চ হার ২ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩ শতাংশ করা। এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যসমূহ ১৯৬৬ সালের ১লা জুলাই হইতে কয়লা, তুলা, সূতা, চামড়া, লোহ ও ইস্পাত, পাট এবং তৈলবীজের উপর স্থানীয় বিক্রয় করের হার পুনর্নির্ধারণ করিতে পারিবে।

বিক্রয় করকে কেন্দ্রীকরণ করা হইলে রাজ্যগুলি তাহার বিরোধিতা করিবে। সুতরাং আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের উপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। ইহার জঘ্ন আন্তঃরাজ্য বিক্রয় কর কমিশন (Inter-State Sales Tax Commission) নিয়োগ করা উচিত। ইহা বিভিন্ন রাজ্যে বিক্রয় কর আইনে একরূপতা আনিবার চেষ্টা করিবে। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন বলবৎ হইলে এই বিষয়ে কিছু অগ্রগতি হইয়াছে।

বিক্রয় করের মোটামুটি তিনটি সমস্যা রহিয়াছে। প্রথমত, কম খরচে কি ভাবে

সর্বাধিক রাজস্ব আদায় করা যায় ; দ্বিতীয়ত, কি পদ্ধতি গ্রহণ করিলে কর ফাঁকি রোধ করা যাইবে এবং তৃতীয়ত, কিভাবে এই করের স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা যায়। এ সম্পর্কে কর অনুসন্ধান কমিশন মন্তব্য করিয়াছেন যে, কমহারে বহু বিন্দু বিক্রয় কর স্থাপন করা ভারতের পক্ষে আদর্শ হইবে। এই কর নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের স্পর্শ করিবে ফলে করের পরিধি প্রসারিত হইবে। বিলাস-দ্রব্যের ক্ষেত্রে উচ্চহারে বিক্রয় কর ধার্য করা উচিত। রাজ্যসরকারের আয়ের উৎস হিসাবে বিক্রয় কর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিবে।

(খ) কৃষি আয়কর (Agricultural Income Tax) : ভারতে কৃষি আয়কর রাজ্য সরকারের এলাকাধীন বিষয়। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন পাশ হইবার পর হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ কৃষি আয়কর ধার্য করিবার অধিকার লাভ করে। ১৯৩৮ সালে বিহার সরকার প্রথম কৃষি আয়কর ধার্য করেন। বর্তমানে গুজরাট, পাঞ্জাব এবং অন্ধ্র প্রদেশে সকল রাজ্যে কৃষি আয়কর ধার্য আছে। অবশ্য বিভিন্ন রাজ্যে করের হার এবং কর অব্যাহতির সীমা সম্পর্কে ব্যাপক পার্থক্য রহিয়াছে। কর অনুসন্ধান কমিশন সুপারিশ করে যে, সকল রাজ্যেই কৃষি আয়কর ধার্য করিবে, কর হার গ্রায্য স্তর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং কর অব্যাহতির সীমা ৩০০০ টাকায় ধার্য করিতে হইবে।

জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর এই স্বত্ব হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে যে, দেশের ফসল উৎপাদনকারী ৫৫ শতাংশ অঞ্চল এই করের আওতায় আসে নাই।

প্রশ্ন হইল, কৃষি আয়কর ভূমি রাজস্বের সহকারী কর হিসাবে থাকিবে না ভূমি-রাজস্বের স্থান অধিকার করিবে? কর অনুসন্ধান কমিশন ভূমি রাজস্বের উচ্ছেদ সমর্থন করেন নাই কারণ ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহা হইতে ৭০ কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় ভূমিরাজস্ব উচ্ছেদ করিয়া কৃষি আয়কর স্থাপন করা সম্ভব নয়। কৃষি আয়করের সহিত অল্পহারে ভূমিরাজস্ব ধার্য করাই উপযুক্ত ব্যবস্থা হইবে।

প্রশ্নপত্র ও উত্তরসংকেত

1. Describe briefly the Kaldor proposals for Indian Tax reform. To what extent have these proposals been implemented?

(C. U. B. Com. '59) [পৃষ্ঠা ৩১২-১৩]

2. Give a brief general outline of the proposals of the last Taxation Enquiry Commission of India. (C. U. B. A. '57)

[পৃষ্ঠা ৩১০-১২]

3. Give a brief outline of the main recommendations of the Indian Taxation Enquiry Commission of 1953-54.

(C. U. B. Com. '56) [পৃষ্ঠা ৩১০-১২]

4. Examine critically Kaldor's proposals for tax reform in the context of the needs of India's developing economy.

(C. U. B. A. '62) [পৃষ্ঠা ৩১২-১৩]

5. Examine critically the existing allocation of financial resources between the centre and the states in India.

(C. U. B. Com. '52) [পৃষ্ঠা ৩২২-২৫]

6. Examine the recommendations of the Third Finance Commission in dealing with the problem of allocation of financial resources to the states in India. (C. U. B. Com. '65) [পৃষ্ঠা ৩২১-২২]

7. Examine the recommendations of the Fourth Finance Commission in dealing with the problem of allocation of financial resources to the states in India. [পৃষ্ঠা ৩২২-২৫]

8. Critically examine the existing arrangements regarding distribution of financial resources between the union and the state Governments in India. (C. U. B. Com. '68) [পৃষ্ঠা ৩২২-২৫]

9. Examine the case for and against the introduction of the Capital Gains Tax in India. (C. U. B. A. '61, B. Com. '63) [পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৫]

10. Examine the case for and against the imposition of the Expenditure Tax and Wealth Tax in India.

(C. U. B. A. '59, '61, '65, B. Com. '61) [পৃষ্ঠা ৩৩০-৩৩]

11. Discuss the importance of (1) Income Tax and (2) Central Excise duties in the financial system in India. (C. U. B. Com. '65)

[পৃষ্ঠা ৩২৮-৩০, ৩৩৫-৩৬]

12. Write a note the Public Debt of India.

(C. U. B. Com. '65, B.A. '65) [পৃষ্ঠা ৩২৬-২৮]

13. Examine the arguments for and against the imposition of Estate duty in India. (C. U. B. Com. '54) [পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৭]

14. Argue the case for and against the imposition of death duties in India. (C. U. B. Com. '53) [পৃষ্ঠা ৩৩৬-৩৭]

15. Discuss the merits of Sales Taxes. Examine the justification of levying such taxes in this country. (C. U. B. Com. '50)

[পৃষ্ঠা ৩৪০-৪২]

16. What are the main justifications of introducing a Gift tax in India ? [পৃষ্ঠা ৩৩৭-৩৮]

17. Discuss the merits and demerits of introducing a Capital gains tax in a developing economy like India. [পৃষ্ঠা ৩৩৩-৩৫]

সপ্তম খণ্ড

উনত্রিংশ অধ্যায়

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং বিলবাজার পরিকল্পনা

(Indian Banking Structure, The Reserve Bank and the Bill Market Scheme)

ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত—সুসংগঠিত ক্ষেত্র এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র। সুসংগঠিত আধুনিক ক্ষেত্রে রহিয়াছে, (১) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, (২) রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, (৩) ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাঙ্ক ; ইহারা তপশীলভূক্ত এবং তপশীল-বহিভূত এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং (৪) বিনিময় ব্যাঙ্ক। দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের লইয়া অসংগঠিত ক্ষেত্র গঠিত। মহাজন, শেঠ, সাহকর, সুফ, এবং গ্রাম্য-মহাজন এই শ্রেণিতে পড়ে। এই দুই ধরনের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ব্যতীত পোষ্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। সুতরাং ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ভিত্তিতে রহিয়াছে বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ব্যাঙ্কার, যৌথমূলধনী ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক। মধ্যমস্তরে রহিয়াছে সুসংগঠিত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক এবং শীর্ষদেশে রহিয়াছে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নামে অভিহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বা রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় কাজ করিতেছে। সাধারণ ব্যাঙ্কিং কাজকারবার ব্যতীত উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্কিং কাজও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। ইহা সমবায়, কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পকে ঋণদান করে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৪৯ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনানুসারে বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। গ্রাশনাল এবং গ্রিণ্ডলেস ব্যাঙ্ক, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক, কার্ট গ্রাশনাল সিটি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বহির্বাণিজ্য অর্থ সরবরাহের একচেটিয়া কর্তৃত্ব করিতেছে। আমানত গ্রহণ, দানন দেওয়া প্রভৃতি সাধারণ ব্যাঙ্কিং কাজকর্মও ইহারা করিতেছে ; বর্তমানে ইহারা আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও অর্থ সরবরাহ করিতেছে। সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনীয় ব্যাঙ্কিং কাজকারবার করিয়া থাকে। বর্তমানে গ্রাম্য ঋণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইতেছে। দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্বের বাহিরে। ইহারা নিজেদের ইচ্ছানুসারে ব্যবসায় চালায়, উচ্চ সুদের হার আদায় করে, এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাধারণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসিতে চায় না। দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে কোনরূপ সংগঠন নাই। এই সকল ব্যাঙ্কারের জুটাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি কার্যকরী করা কঠিন হয়।

১৯৬৩ সালে ব্যাঙ্কিং আইনানুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে তাহার বলে ইহা দেশীয় ব্যাঙ্কারগণকেও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবে।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Reserve Bank of India) :

(ক) গঠন ও পরিচালনা : ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনানুসারে ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠিত হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পরে ইহা সরকারের নিকট হইতে নোট প্রচলন ক্ষমতা এবং ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুরুতে শেয়ার হোল্ডারদের যৌথব্যাঙ্ক হিসাবে গঠিত হয় এবং ইহার আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৫ কোটি টাকা। ১৯৪২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে জাতীয়করণ করা হয়। ইহার শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ারের বাজার দাম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

১৯৪৮ সালের আইনানুসারে ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর এবং গভর্নরগণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত অথবা নিযুক্ত হইতেন। বর্তমানে ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ড একজন গভর্নর, তিনজন ডেপুটি গভর্নর, চারজন ডিরেক্টর, অপর ছয়জন ডিরেক্টর এবং একজন সরকারী কর্মচারী এই ১৫ জন সদস্য লইয়া গঠিত। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং নয়াদিল্লীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চারিটি লোকাল বোর্ড আছে। লোকাল বোর্ডের সদস্য সংখ্যা পাঁচ এবং ইহার সকলেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হন। লোকাল বোর্ডের সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ ৪ বৎসর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের পর সরকার এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হইয়াছে। ব্যাঙ্ক জাতীয় স্বার্থে সরকারের নির্দেশ কার্যকরী করে। অবশ্য কোন নির্দেশ জারী করিবার পূর্বে অর্থমন্ত্রী এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এবিষয়ে আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(খ) কার্যাবলী : কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল কাজই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। ইহার প্রধান প্রধান কাজগুলি হইল (১) কাগজী মুদ্রার প্রচলন, (২) সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবে কাজ করা, (৩) বাণিজ্য ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঋণদান নিয়ন্ত্রণ, (৪) শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসাবে কাজ করা। ইহার গৌণ কাজগুলির মধ্যে রহিয়াছে (১) টাকার বহিমূল্য রক্ষা করা, (২) কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা এবং (৩) অর্থসংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ করা। এই সকল কাজ ব্যতীত পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ইহাকে উন্নয়নমূলক বঙ্ক কাজও করিতে হয়।

একটাকার নোট ব্যতীত অল্প সকল প্রকার নোট প্রচলনের একচেটিয়া অধিকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। এক টাকার নোটগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রীর দপ্তরে ছাপানো হইয়া থাকে। সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে সরকারের পক্ষে ইহা সকল প্রকার আর্থিক লেনদেনের কাজ সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইহা বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা, সরকারী ঋণ পরিচালনা এবং নূতন ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে ইহা অগ্রাধিকার ব্যাঙ্ককে তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে।

১৯৪৯ সালে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন এবং ১৯৫৬ সাল ও ১৯৬২ সালে ইহার সংশোধন পাশ হইবার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনানুসারে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট তাহাদের কাজের সাপ্তাহিক বিবরণ দাখিল করিতে হইত এবং মেয়াদী আমানতের ২ শতাংশ ও চলতি আমানতের ৫ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হইত। ১৯৫৬ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইনানুসারে এই অনুপাত বৃদ্ধি করিয়া মেয়াদী আমানতের ক্ষেত্রে ২ শতাংশ হইতে ৮ শতাংশ এবং চলতি আমানতের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হইতে ২০ শতাংশ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। ১৯৬২ সালের সংশোধনী আইনানুসারে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে তাহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের ৩ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিতে হয়। ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাশ হইবার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গুণগত এবং নির্বাচন-মূলক (qualitative and selective credit control) ঋণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। ১৯৫৬ সাল হইতে “নিয়ন্ত্রণ-মূলক সম্প্রসারণ” (controlled monetary expansion) নীতিকে কার্যকর করার উদ্দেশ্যে নির্বাচনমূলক এবং গুণগত ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। ১৯৬৩ সালের ব্যাঙ্কিং আইনানুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তপশীল বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলির উপরও সম্প্রসারিত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহায়তায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বহিমূল্য রক্ষা করে। ১৯৪৯ সালের পূর্বে একটি ভারতীয় টাকা ০.২৬৮৬৯১ গ্রাম স্বর্ণের সমান ছিল। ১৯৪৯ সালে মুদ্রামান হ্রাসের পর একটি টাকা ০.১৮৬৬২১ গ্রাম স্বর্ণের সমান হয় এবং ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত এই হার বজায় থাকে। ১৯৬৬ সালে পুনরায় মুদ্রামান হ্রাস করা হইলে বিনিময় হার দাঁড়ায় ১টা = ০.১১৮৫১৬ গ্রাম স্বর্ণ। ১৯২৭ সালে টাকা ও ষ্টার্লিং-এর অনুপাত এইরূপ ছিল ১টা = ১ শি. ৬ পে. এবং এই হার ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৯৬৬ সালে মুদ্রামান হ্রাস হইলে টাকা ও ষ্টার্লিং অনুপাত হয় ১টা = ১ শি.। বিনিময় ব্যাঙ্কের সহায়তায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ভারতের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (exchange control system) পরিচালনা করিয়া থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ বিভাগ কৃষি ঋণ সমস্যা লইয়া কাজ করে। পরিশেষে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইস্যু এবং ব্যাঙ্কিং বিভাগের সাপ্তাহিক কার্যবিবরণী প্রকাশ করিয়া থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থসংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া একটি মাসিক বিবরণীও নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্দেশ্য হইল, (১) একটি শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত বাণিজ্য ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সৃষ্টি করা, (২) গুণগত, পরিমাণগত এবং নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির মধ্যে সমন্বয়সাধন করা, (৩) গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা, (৪) শিল্পে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা এবং (৫) ভারতের অসংগঠিত এবং অল্পমত টাকার বাজারের উন্নতিসাধন করা।

(গ) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাজের পর্যালোচনা : রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশে স্বেচ্ছা হার কমাইতে সফল হইয়াছে। কম খরচে টাকা স্থানান্তরে পাঠাইতে ব্যাঙ্ক সফল হইয়াছে। সরকারী ঋণ পরিচালনার ক্ষেত্রেও ইহা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। স্বাধীনতার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। ১৯৫২ সালে বিলবাজার পরিকল্পনা চালু করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশের ঋণব্যবস্থায় যথেষ্ট স্থিতিস্থাপকতা আনিয়াছে। কৃষি ঋণদানের ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। সাম্প্রতিককালে শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণদানের উদ্দেশ্যে কতকগুলি অর্থ-কর্পোরেশন গঠনে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্রশিল্প এবং সমবায়ের প্রয়োজনীয় ঋণের একটি সমীক্ষা করে। ইহার উদ্দেশ্য এই যে, ইহাদের ঋণদানে উৎসাহিত করিবার জন্ত বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে কোন বিশেষ সুবিধাদানের প্রয়োজন আছে কি না তাহা বিশ্লেষণ করা। এই সমীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, ১৯৬১ সালের জুনের শেষে ক্ষুদ্রশিল্পসমূহকে, প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ২৭ কোটি টাকা—ইহা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণের ২½ শতাংশ। সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ২ কোটি টাকা—উহা তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির মোট ঋণের ১ শতাংশ অপেক্ষাও কম। এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণদানে উৎসাহিত করিবার জন্ত বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৬০ সালে পরীক্ষামূলক ভাবে ক্ষুদ্রশিল্প প্রদত্ত ঋণের জন্ত গ্যারান্টি ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬৩ সাল হইতে ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই ঋণ গ্যারান্টি পরিকল্পনাকে স্থায়ী এবং ইহার কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করা হয়।

অবশ্য দেশীয় ব্যাঙ্ককারদিগের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যর্থ হইয়াছে। ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার এই অসংগঠিত অংশকে সুনিয়ন্ত্রিত করা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার আধুনিক ক্ষেত্রের সহিত ইহার সমন্বয় সাধন করার ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সফল হয় নাই। ইহা ব্যতীত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির একচেটিয়া প্রভাব খর্ব করিবার জন্ত এবং ভারতীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ কিছুই করে নাই। এই সকল ত্রুটি সত্ত্বেও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে এক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হওয়ার পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মুদ্রাস্ফীতি রোধ, ষাট্টি ব্যয় এবং উন্নয়নমূলক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে জাতীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করিয়া আসিতেছে।

(ঘ) ঋণদাতা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভূমিকা : বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ সরবরাহ করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ। এই জন্ত শেষ পর্যায়ের ঋণদাতা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কার্যাবলী পর্যালোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন। ১৯৩৪ সালের

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনে ঋণদানের নিয়মগুলি অত্যন্ত কঠোর ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইতে হইলে বাণিজ্য ব্যাঙ্কে প্রমাণ করিতে হইবে যে, ইহা নির্ধারিত পথে ব্যবসা চালাইতেছে। দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কটিকে ‘গ্রহণযোগ্যতার’ (eligibility) নীতি পূরণ করিতে হইবে। এই সকল কঠোরতার ফলে বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি সঙ্কটের সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট বিশেষ সাহায্য পায় নাই।

উদাহরণ স্বরূপ ত্রিবাঙ্কুর ট্রাশনাল ও কুইলন ব্যাঙ্কের পতন উল্লেখ করা যাইতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে ১৯৩২ সালে এই ব্যাঙ্ক ফেল করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনমনীয় নিয়মের জন্ত ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কের পতন ঘটে।

ঋণদান ব্যাপারে কঠোরতা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৭ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করা হয়। ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনানুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণদানের ক্ষমতা প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্লাস-স্টিগেল (Glass-Steagall) আইনানুসারে ঋণদানের কঠোরতা হ্রাস করিয়া যেমন বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির উন্নতি সাধন করা হইয়াছে ভারতেও সেইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

১৯৫০-৫১ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অতি সামান্য পরিমাণ ঋণ দান করে—মাত্র ১৬ কোটি টাকা; ১৯৬১-৬২ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৭৬ কোটি টাকা হয়।

ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন (Bank Rate Changes) : ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন করিয়া ঋণনিয়ন্ত্রণ করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অত্যন্ত প্রধান কাজ। সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা যায়। ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পাইলে ঋণ সঙ্কোচ ঘটিবে, টাকার যোগান হ্রাস পাইবে এবং ফটকা কারবার ও মজুতদারী প্রতিরোধ করিবে।

অনেকে এই যুক্তি দেখান যে, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করিলে ব্যাঙ্ক, বীমা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মূলধন-মূল্য (Capital value of assets) হ্রাস পাইবে ফলে ইহার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। অবশ্য স্বল্প মেয়াদী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিলে এই ক্ষতি পরিহার করা যাইবে।

(ক) ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক রেট ৩% হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৩½% হয়। বহুদিন ধরিয়া সুলভ মুদ্রানীতি অনুসরণ করিবার পর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক নমনীয় সুদের নীতি গ্রহণ করে। ঋণ ব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হওয়ায় টাকার যোগান বাজারের প্রয়োজন মত না হইয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশে স্থির করা হয়। এই সময়, ১৯৫১ সালে বিল বাজার পরিকল্পনা চালু করা হয়। ইহার ফলে ভারতের টাকার বাজারের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্তৃত্ব আরো বৃদ্ধি পায়।

ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধির সহিত কোরিয়া-যুদ্ধজনিত তেজী বাজারের অবসান হয়।

ইহার ফলে ফটকা কারবারীগণ মজুতদ্রব্য বাজারে ছাড়িতে শুরু করে এবং মূল্যস্তর নিম্নগামী হয়। মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব অনিবার জ্ঞাত সরকার দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং ইহার ফলে ১৯৫২ সালের শেষে মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব আসে।

(খ) ১৯৫৭ সালের মে মাসে ব্যাঙ্ক রেট ৩½% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪% করা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে মুদ্রাস্ফীতির যে সম্ভাবনা ছিল তাহা রোধ করিবার উদ্দেশ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুদের হার বৃদ্ধি করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সময় যে নীতি গ্রহণ করে তাহাকে 'নিয়ন্ত্রণমূলক অর্থসম্প্রসারণ' (Controlled monetary expansion) বলে। নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উচ্চ ব্যাঙ্ক রেটের এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

সুদের এই হার পরিবর্তনের পশ্চাতে কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমত, বাণিজ্য বিলগুলির (Usance Bill) সুদের হার ছিল ৩%, ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে ইহা বাড়িয়া ৩½% এবং নভেম্বর মাসে ৩¾% হয়। ইহা ব্যতীত ষ্টাম্প শুল্কও যথেষ্ট বাড়াইয়া কাষতঃ বাণিজ্য বিলগুলির সুদের হার ৪% হয়। বাণিজ্য বিলের সুদের হার বাড়ানোর জ্ঞাত ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ছিল।

দ্বিতীয়ত, ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির গ্রহণযোগ্য ঋণের মূল্য দাঁড়ায় ৪% এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা অপেক্ষাও অধিক হয়। ইহাকেই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের “ঋণদান হার” (lending rate) বলে। ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারীর পর হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান হার ৪% হয় কিন্তু “ঋণগ্রহণ হার” (borrowing rate) ৩½% হয়। ঋণদান হার এবং ঋণগ্রহণ হারের মধ্যে এই পার্থক্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নীতির পরিপন্থী বলিয়া ইহাকে অধিকদিন চলিতে দেওয়া উচিত নয়। ১৯৫৭ সালের মে মাসে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করিয়া ৪% করা হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণদান হার এবং ঋণগ্রহণ হারের মধ্যে পার্থক্য দূর হয়।

তৃতীয়ত, সুদের হার বাড়ানোর আরও একটি বিশেষ প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার দ্বিতীয় বৎসরে বৈদেশিক মুদ্রার সংকট চরমে আসিয়া পৌঁছায়। এই অবস্থার অবসানের জ্ঞাত বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণগ্রহণ করা অপরিহার্য বলিয়া বিবেচনা করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিগণ ভারতে আসেন এবং পরিকল্পনায় মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিত হন। এই অবস্থায় বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণ পাইতে হইলে উহার কর্তৃপক্ষের মনে এই বিশ্বাস উৎপাদন করানো প্রয়োজন যে, মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত নীতি ভারত গ্রহণ করিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই সুদের হার বৃদ্ধি করা হয়।

১৯৬০ সালের ১লা অক্টোবর ঘোষণা করা হয় যে, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ঋণ পাইবে না। কোন ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে পরিমাণ রিজার্ভ রাখিবে তাহার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ হিসাবে লইতে পারিবে। ইহার সহিত একটি নির্দেশ জারী করিয়া ঘোষণা করা হয় যে, তাহার

যেন নিজেদের সুদের হার বৃদ্ধি করে এবং স্বল্পকালীন আমানতের উপর দেয় সুদের হারের সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করে। অন্ততঃ ৩% সুদের হার বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং সর্বনিম্ন সুদের হার হইবে ৫%। স্বল্পকালীন আমানতের ক্ষেত্রে সুদের হার ২% এর অধিক হইবে না।

(গ) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে ত্রিমুখী নীতি (three-tier system) অনুসরণ করে তাহার ফলে ১৯৬০ হইতে '৬২ সালের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে দেয় ঋণের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

(ঘ) ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন : ১৯৬৩ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক রেট ৪% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪½% করা হয়। ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন টাকার মূল্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

(ঙ) ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর এবং ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন : মোট চাহিদা মোট যোগান অপেক্ষা অধিক হওয়ায় মূল্যস্তর দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মূল্যস্তরের উদ্ভবগতি রোধ করিবার জন্ত পাঁচ মাসের মধ্যে দুবার ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন করিতে হয়। যখন অতিরিক্ত চাহিদা দেশের উন্নয়নের গতি ব্যাহত করিয়া উহাকে অবাস্তিত পথে পরিচালিত করিতেছিল তখন মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার জন্ত টাকার মূল্য বৃদ্ধির নীতি গ্রহণ করা হয়।

১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট ৪½% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫% করে। মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্ত রিজার্ভব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেট বৃদ্ধি করে। পূর্বে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে কোটা পদ্ধতিতে ঋণ প্রদান করিত। বর্তমানে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া ব্যাঙ্কের নীট নগদ অনুপাত (net liquidity ratio) অনুযায়ী ঋণ দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ লইলে ক্রমবর্ধমান হারে সুদ দিতে হইবে। আরও বলা হয় যে, ভারতের বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলি এবং বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দিয়া থাকে সেই ঋণের ক্ষেত্রে সুদের সর্বাধিক হার ২% হইবে।

ব্যাঙ্কের নিজের কাছে ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে নগদ অর্থ জমা আছে এবং সরকারী ঋণপত্রে ব্যাঙ্কের যে বিনিয়োগ আছে তাহাদের মোট সমষ্টি হইতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বাদ দিলে ব্যাঙ্কের নীট নগদ অর্থের অনুপাত পাওয়া যাইবে। ব্যাঙ্কের নীট নগদ অর্থ অনুপাত তাহার মোট আমানতের শতকরা ২৮ ভাগ বা অধিক হইলে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক রেটে অর্থাৎ শতকরা ৫% হারে ঋণ লইতে পারিবে। ব্যাঙ্কের নীট নগদ অর্থের অনুপাতের পরিমাণ মোট আমানতের ১% বা অধিক কম হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে।

১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্যাঙ্ক রেট ৫% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৬% করা হয়। ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের তুলনায় ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে খাণ্ডশস্ত্রের

পাইকারী দাম ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এই সময় তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভব্যাঙ্কের নিকট হইতে অধিক ঋণ গ্রহণের চেষ্টা করে। এই সকল কারণের জন্ত ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অধিকতর কঠোর করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়।

আশা করা হইয়াছিল যে, ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পাইলে সকল স্বেচ্ছা হারই বৃদ্ধি পাইবে। স্বেচ্ছা হার বৃদ্ধি পাইলে (১) সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে, (২) সীমাবদ্ধ বিনিয়োগযোগ্য অর্থ অধিকতর বিচক্ষণতা এবং সতর্কতার সহিত ব্যবহৃত হইবে। যে সকল প্রকল্প হইতে শুধু মাত্র প্রান্তিক মুনাফার আশা আছে সেগুলি বাতিল হইয়া যাইবে এবং (৩) সক্রিয় চাহিদা ও মূল্যস্ফূর্ত হ্রাস পাইবে। কিন্তু কার্যত এই সকল প্রত্যাশা ফলপ্রসূ হয় নাই। ভারতীয় অর্থনীতিতে অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্র (non-monetized sector) ব্যাপক বলিয়া ব্যাঙ্ক রেট পরিবর্তন করিয়া মুদ্রাস্ফীতি রোধ করার কার্যকারিতা বিশেষ সীমাবদ্ধ। ঋণের এক বৃহৎ অংশ অর্থ-বহির্ভূত ক্ষেত্র হইতে পাওয়া যায়। ফিসক্যাল নীতি পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ (physical control) পদ্ধতির সহিত একযোগে কার্যকরী হইলে তবেই আর্থিক নীতি ফলপ্রসূ হইবে।

১৯৫৬ সালের সংশোধনী আইনে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন ক্ষমতা এবং দায়িত্ব (Reserve Bank's New Powers and Responsibilities under the Amendment Act of 1956) : দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে নিয়ন্ত্রিত ঋণ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে ১৯৩৪ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনী আইনের বলে একদিকে নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নমনীয়তা আসে আর অপরদিকে বাণিজ্য ব্যাঙ্কের অনিয়ন্ত্রিত ঋণদান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকূল হয়। এই সংশোধনী আইনের সহিত নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (selective credit control operations) যুক্ত হইয়া কি ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রিত অর্থ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) নোট প্রচলন পদ্ধতির পরিবর্তন : ১৯৩৪ সালের আইন অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি অনুসরণ (Proportional Reserve System) করিত। এই পদ্ধতি অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট প্রচলিত কাগজী মুদ্রার ৪০ শতাংশ স্বর্ণ এবং ষ্ট্যালিং ঋণপত্রে জমা রাখিত আর বাকী ৬০ শতাংশ ভারত সরকারের ঋণপত্র, হুণ্ডি ও রৌপ্য মুদ্রার জমা রাখা হইত। মোট স্বর্ণের মূল্য ৪০ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না। ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের সদস্য হইবার পর কাগজী মুদ্রার জামিন হিসাবে ষ্ট্যালিং ঋণপত্র ব্যতীত অগ্রাণু বৈদেশিক মুদ্রাও গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট চরম আকার ধারণ করিলে ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিয়া আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বনিম্ন

রিজার্ভ পদ্ধতির (Minimum Reserve System) প্রবর্তন করে। এই পদ্ধতি অনুসারে ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্র এবং ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ, এই মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ইচ্ছামত কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবে। প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্রের জমার পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০ কোটি টাকা করিতে পারিবে।

১৯৫৭ সালে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের অধিকতর অবনতি ঘটিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বিতীয় সংশোধনী আইন দ্বারা নোট প্রচলন পদ্ধতির আরও এক দফা পরিবর্তন করে। এই সংশোধনী আইনানুসারে মোট ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন পরিমাণ কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবে। ইহার মধ্যে স্বর্ণের মূল্য অন্ততঃপক্ষে ১১৫ কোটি টাকা হইবে।

(খ) রিজার্ভ অনুপাতের পরিবর্তন : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সদস্য ব্যাঙ্কগুলিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট যে সর্বনিম্ন রিজার্ভ মজুত রাখিতে হয় তাহার অনুপাত পরিবর্তন করিয়া ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ভারতেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হইতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনানুসারে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট উহাদের চলতি ও মেয়াদী আমানতের যথাক্রমে ৫ শতাংশ ও ২ শতাংশ রাখিতে হয়। ১৯৫৬ সালে সংশোধনী আইনের দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির জমার পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির ক্ষমতা দেওয়া হয়। এই সংশোধনী আইনের বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির চলতি ও মেয়াদী আমানতের চারগুণ পর্যন্ত (অর্থাৎ চলতি আমানতের ২০ শতাংশ ও মেয়াদী আমানতের ৮ শতাংশ) বৃদ্ধি করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত অতিরিক্ত আমানতের জমা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রিজার্ভ দাবী করিতে পারিবে।

(গ) নির্বাচনমূলক ঋণনিয়ন্ত্রণ : অনুরূপ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক ঋণ ব্যবস্থার বিশেষ ভূমিকা আছে। সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থায় সাংগঠনিক পরিবর্তনের দরুন নূতন নূতন চাপ কেন্দ্রের সৃষ্টি এবং পুরাতন চাপ কেন্দ্রগুলির স্থানান্তর ঘটিতেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অতি সত্বর এই চাপকেন্দ্রগুলি আবিষ্কার করিবে এবং উহাদের পরিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিবে। ব্যাঙ্ক রেটের পরিবর্তন বা খোলা বাজারের কাজের ফলে সমগ্র অর্থনীতি প্রভাবিত হয়—কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ইহা প্রভাবিত করিতে পারে না। অর্থনীতির কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।

ভারতের গ্রাম্য অনুরূপ দেশে সরকার দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জগু প্রভূত পরিমাণ বিনিয়োগ করিতেছে, এক্ষেপে নির্বাচন মূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির চাপ কমানো হয়। নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী লইয়া ফটকাবাজী এবং মজুতদারীর ফলে যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে তাহা প্রতিরোধ করিবার জগু নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। অগাধ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের যোগান অব্যাহত রাখিয়া শুধুমাত্র খাণ্ডশস্ত্র মজুত

এবং ফটকা কারবার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ঋণ হ্রাসের জ্ঞা নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নয় বৎসর যাবৎ এই পদ্ধতির সাহায্যে “অর্থনৈতিক চাপকেন্দ্রগুলি” (particular pressure points) নিয়ন্ত্রণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। ১৯৫৬ সাল হইতে আজ পর্যন্ত ইহা খাতিশস্ত্রের মজুত বৃদ্ধি ও তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি বন্ধ করিবার জ্ঞা ব্যবহৃত হইতেছে। খাতিশস্ত্রের মজুত বৃদ্ধির জ্ঞা ঋণদান প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ঐ ঋণের জ্ঞা প্রয়োজনীয় রিজার্ভের পরিমাণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ফটকাবাজী ও মজুতদারী কমে নাই। ইহার কারণ হইল (১) মোট ঋণের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী না হইলে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সফল হইবে না (২) দেশের সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ অসম্পূর্ণ এবং (৩) অসম্বদ্ধ দেশীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা।

১৯৫৬ সালের মে হইতে সেপ্টেম্বর মাসে সমস্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ও দুইটি রাষ্ট্রীয়-মালিকানাভুক্ত ব্যাঙ্কে ধান ও চাল মজুত করিবার জ্ঞা কোনরূপ দান না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। এইভাবে নির্দেশনামা জারি করিয়া খাতিশস্ত্র, ছোলা ও ডাল এবং বস্ত্রের উপর নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে খাতিশস্ত্রের জ্ঞা ঋণ ও দান দিবার সময় মজুত দ্রব্য মূল্যের ৪০ শতাংশ রিজার্ভ রাখার নির্দেশ দেয়। চিনির উপরও এই সত্ত্বে নিয়ন্ত্রণ ধার্য করা হয়। খাতিশস্ত্রের ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ সফল না হইলেও চিনির ক্ষেত্রে ইহা কার্যকরী হইয়াছিল। ১৯৫৮ সালের ১লা জুলাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিবার জ্ঞা বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির নিকট আবেদন করেন। এই আবেদনের ফলে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে নৈতিক প্রণোদন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত না হইলেও মুদ্রাস্ফীতি দমন করিবার জ্ঞা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পদ্ধতির উপর বিশেষ আস্থা স্থাপন করিয়াছে। ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক পূর্ববর্তী বৎসরে ঐ মাসের গমের উপর মোট দেয় ঋণের ৬৬% শতাংশ এবং খাতিশস্ত্রের উপর ৮০ শতাংশের অধিক ঋণ দিতে পারিবে না। পরে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বাদামের উপরও এই নিয়ন্ত্রণ জারি করে। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এক নির্দেশ জারী করিয়া বলে যে, তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি যে ঋণ দিবে তাহার জ্ঞা ৪৫ শতাংশ হারে জামিন রাখিতে হইবে। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে অত্যাণ্ড তৈলবীজের ক্ষেত্রেও নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়।

প্রধানত, ব্যবসায়গত ঋণের ক্ষেত্রেই নির্বাচনমূলক ঋণদান নীতির প্রয়োগ করা হয়। শিল্প-কারখানায় ঋণদানের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় নাই। দ্রব্যসামগ্রী স্থানান্তরে প্রেরণের জ্ঞা ঋণদানকেও এই নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই।

১৯৬২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার পূর্ববর্তী নির্দেশ নাকচ করিয়া খাতশস্ত্রের বিরুদ্ধে এবং বাদাম ও অত্যাণ্ড তৈলবীজের বিরুদ্ধে ঋণদানের জগ্ৰ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নূতন নির্দেশ জারী করে। অবস্থার উন্নতি দেখা দেওয়ায় ১৯৬১ সালের মে মাসে চিনি এবং গমের বিরুদ্ধে ঋণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলিয়া লওয়া হয়।

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাঁচা পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের বিরুদ্ধে ঋণদানের ক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারণ করে। কিন্তু ১৯৬১ সালের আগষ্ট মাসে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ তুলিয়া লওয়া হয়।

১৯৬৩-৬৪ সালে নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী ছিল, অবশ্য বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছিল। চিনি এবং বাদামের বিরুদ্ধে ঋণ নিয়ন্ত্রণে কিছু পরিবর্তন করা হইয়াছিল। এই সময় প্রথম গুদামজাত দ্রব্যের রসিদের পরিবর্তে ঋণদান নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের আওতায় আনা হয়। ১৯৬২-৬৩ সালের চিনির উৎপাদন কম হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬৩ সালের এপ্রিল মাসে চিনির উপর নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করিবার জগ্ৰ তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির উপর নির্দেশ জারী করে।

১৯৬৪ সালে খাতশস্ত্রের মূল্যবৃদ্ধি এবং ব্যাঙ্কঋণ লইয়া খাতশস্ত্র মজুত করিয়া ফটকাবাজী বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে খাতশস্ত্রের ক্ষেত্রে ঋণদান ব্যবস্থার সংশোধন করা হয়। ১৯৬৪ সালের আগষ্ট মাসে নির্দেশ জারী করিয়া খাতশস্ত্রের জামিনে ঋণের পরিমাণ ৩৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫০ শতাংশ এবং গুদামজাত রসিদের ক্ষেত্রে উহা ২৫ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৪০ শতাংশ করা হয়।

প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জগ্ৰ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খাতশস্ত্র, তৈলবীজ এবং উদ্ভিজ্জ তৈলের বিরুদ্ধে ঋণদান ব্যবস্থাকে কঠোরতর করে। ধান ও চাল, বাদাম এবং গম ও অত্যাণ্ড খাতশস্ত্রের বিরুদ্ধে ঋণের উপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করা হয়।

১৯৬৫ সালের ২০ শে নভেম্বর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৬৫-৬৬ সালের ব্যস্ততার সময়ে (১৯৬৫ সালের নভেম্বর হইতে ১৯৬৬ সালের এপ্রিল) নির্বাচনমূলক উদারনৈতিক ঋণনীতি (selective liberalisation of credit) ঘোষণা করে। এই নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল অতিরিক্ত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা। প্রতিরক্ষা সামগ্রী, রপ্তানিকারক, এবং সরকার কর্তৃক খাত সংগ্রহের ব্যাপারে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির ঋণদান ব্যাপারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উদারনীতি অবলম্বন করে। এই সকল ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্করেটে ব্যাঙ্কগুলিকে পুনঃ অর্থ সরবরাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু অত্যাণ্ড উদ্দেশ্যে ঋণদান ব্যবস্থা কঠোর করে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে এক কোটি টাকার অধিক ঋণদানের পূর্বে ইহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পূর্ব অনুমতি লইতে হইবে।

নির্বাচনমূলক উদারনৈতিক ঋণনীতি ১৯৬৬-৬৭ সালেও কর্ম ব্যস্ততার ঋতুতে

অনুসৃত হয়। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তাহার সহিত মোকাবিলা করিবার জন্ত এই নীতি গ্রহণ করা হয়। এই নীতির ফলে রপ্তানি ও শিল্প উৎপাদন এবং শিল্পসংক্রান্ত কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশের আমদানি বৃদ্ধি পাইবে। ১৯৬৬-৬৭ সালের ঋণ নীতির উদ্দেশ্য ছিল শিল্পসমূহকে অর্থ সরবরাহ করা যাহাতে তাহারা তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারে এবং রাজ্যসরকারগুলি খাত সংগ্রহের কর্মসূচী কার্যকরী করিতে পারে। ব্যাঙ্কগুলিকে এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হয় যেন সাময়িক ঋণ সম্প্রসারণের ৮০ শতাংশ শিল্প এবং আমদানি রপ্তানি বিলের বিরুদ্ধে দেওয়া হয়।

অত্যাগত দেশের ছায়া আমাদের দেশেও নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণের সাফল্য অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। যেটুকু সাফল্য অর্জিত হইয়াছে সাধারণ ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সহিত নির্বাচনমূলক ঋণ ব্যবস্থার সংযোগের দরুন সম্ভবপর হইয়াছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই নীতি অতিরিক্ত ফটকাবাজী রোধ করিতে সহায়তা করিয়াছে।

(ঘ) ১৯৬০ সালের ঋণ নিষ্পেষণ (credit squeeze) : ১৯৬০ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক পরিমাণগত এবং নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি প্রবর্তন করে। ১৯৬০ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেয় যে, শেষবারের বিরুদ্ধে ৫,০০০ টাকার জমা তাহারা যে ঋণ দিবে তাহার জমা ৫০ শতাংশ হারে জামিন রাখিতে হইবে। ইহা ব্যতীত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রথম ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করে।

ইহার সহিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রয়োজনমত অতিরিক্ত জমা আবদ্ধ করার (impounding the increase in bank deposits) নীতি অনুসরণ করিতেছে। ১৯৬০ সালের মার্চ মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ২৫ শতাংশ জমা রাখিতে বাধ্য করে। পরে ঐ বৎসর মে মাসেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলিকে ৫০ শতাংশ জমা রাখিতে বাধ্য করে।

১৯৬১ সালের জানুয়ারী মাসে টাকার বাজারে প্রবল চাপের সৃষ্টি হওয়ায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত জমা আবদ্ধ রাখার নিয়ম বাতিল করিয়া দেয়। ১৯৬২ সালে সংশোধনী আইন পাশ হইবার পর হইতে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের স্থায়ী এবং চলতি আমানতের ৩ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখে।

পরিবর্তনশীল অনুপাত পদ্ধতি এবং নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতির সাহায্যে কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণশীল অর্থনীতির চাপ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই দুই হাতিয়ার একত্রে মুদ্রাস্ফীতির বেগ এবং ফটকা কারবার প্রতিরোধ করিতে পারে। কিন্তু ঋণ নিয়ন্ত্রণ নীতি এককভাবে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে পারে না। অনুরত দেশ মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে হইলে ঋণ নীতির ও ফিসক্যাল নীতির সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল কাঁচা টাকা বাজার হইতে যতদূর সম্ভব সরাইয়া লওয়া এবং এইভাবে অপেক্ষাকৃত দুপ্রাপ্য দ্রব্যের

ক্ষেত্রে টাকার চাপ হ্রাস করা। ইহার জন্ত প্রয়োজন টাকার নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ। এই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তাহার ঋণ নীতি পরিচালনা করিয়াছে। একসঙ্গে যাহাতে সকল ক্ষেত্রে ঋণের অভাবে উৎপাদন ব্যাহত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। সংক্ষেপে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের দায়িত্ব হইল এরূপভাবে টাকা ও ঋণের সম্প্রসারণ ঘটানো যাহাতে শিল্প এবং বাণিজ্যের নিয়মিত ও বিধিবদ্ধ প্রয়োজন মিটিয়া যায় এবং ফটকা ও অগ্রাগ্র অল্পপাদনশীল কাজের জন্ত ঋণ ব্যবস্থা বন্ধ হয়। এইজন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ নীতিকে টাকার নিয়ন্ত্রণমূলক সম্প্রসারণ নীতি (controlled monetary expansion) বলা হয়।

ভারতীয় টাকার বাজার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ নীতি (Indian Money Market and the Reserve Bank's Policy of Controlled Expansion) : ভারতীয় টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য হইল যে, সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্র পাশাপাশি অবস্থিত। সংগঠিত ক্ষেত্রে রহিয়াছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, ভারতীয় ষোঁথমূলধনী ব্যাঙ্ক এবং বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক। আধা-সরকারী সংস্থা, বে-সরকারী বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারী মালিকানাধীন জীবনবীমা কর্পোরেশন এবং বৃহদায়তন ষোঁথমূলধনী প্রতিষ্ঠানসমূহ টাকার বাজারে ঋণদাতা হিসাবে কাজ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কল-লোন দালাল (call loan broker), ষ্টক দালাল, ঠিকা-সওদা কোম্পানী (hire purchase companies), গৃহ নির্মাণ সংস্থা, চিৎফাণ্ড (chit funds) প্রভৃতি ব্যাঙ্ক-বহির্ভূত অর্থ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। বিভিন্ন ধরনের দেশীয় ব্যাঙ্কার লইয়া টাকার অসংগঠিত বাজার গঠিত। ভারতের এই দুই ধরনের টাকার বাজার পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন।

এই দুই ধরনের টাকার বাজারের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বাজারে সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিলবাজার সৃষ্টির চেষ্টা করে কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়। সংগঠিত ক্ষেত্রেও ইহা পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করে নাই। ১৯৩৭ সাল হইতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশীয় ব্যাঙ্কারদিগের সহিত সরাসরি সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে কিন্তু দেশীয় ব্যাঙ্কারগণ তাহাদের ব্যাঙ্কিং ব্যতীত অগ্রাগ্র কাজকর্ম ত্যাগ করিতে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক তাহাদের হিসাব-পত্র পরীক্ষা করিতে দিতে অসম্মত হওয়ায় এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীল বহির্ভূত ব্যাঙ্কগুলির সহিত দেশীয় ব্যাঙ্কারদিগকেও টাকা পাঠানোর সুবিধা দিয়া থাকে। সম্প্রতি ১৯৬৩ সালের ব্যাঙ্কিং (বিবিধ বিষয়ক) আইন [Banking Laws (Miscellaneous Provision) Act] অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দেশীয় ব্যাঙ্কার সমেত জনগণের নিকট হইতে আমানত গ্রহণকারী সকল প্রতিষ্ঠানের উপর প্রভূত নিয়ন্ত্রণক্ষমতা লাভ করিয়াছে। ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদানের জন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের

প্রয়াস এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গ্যারাণ্টি পরিকল্পনার ফলে ঋণগ্রহীতাগণ বিশেষ লাভবান হইবে।

ভারতীয় টাকার বাজারের বৈশিষ্ট্য এবং উন্নয়ন ও তজ্জনিত মুদ্রাস্ফীতির দরুন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতি বিভিন্ন দিকে ক্রিয়াশীল। একদিকে যাহাতে ঋণের যোগান অতিরিক্ত না হয় আর অপর দিকে যাহাতে কঠোর ঋণ নিয়ন্ত্রণের দরুন ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ব্যাহত না হয়—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিয়াছে। একদিকে দেশের সম্পদ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইবার পথে যেন টাকার কোন অভাব না হয় ইহাও যেমন লক্ষ্য রাখিতে হইবে সেইসঙ্গে অপর দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে মুদ্রাস্ফীতি যেন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই নীতিকে টাকার নিয়ন্ত্রিত সম্প্রসারণ নীতি বলে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণের অত্যধিক প্রসারে যেমন বাধা দিতেছে তেমনি প্রয়োজনমত উহার প্রসারে সাহায্যও করিতেছে।

১৯৬৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্বাচিত উদারনৈতিক ঋণ নীতি (selective liberalization of credit) ঘোষণা করে। এই নীতি অনুসারে প্রতিরক্ষা, রপ্তানি ও খাচা উৎপাদনের জন্ত ঋণ সম্প্রসারণ আর একইসঙ্গে কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্ত ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। প্রতিরক্ষা, রপ্তানি এবং খাচাসংগ্রহের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে ঋণের যোগান বৃদ্ধি করা হয় কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ঋণ নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা হয়।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিলবাজার পরিকল্পনা (Bill Market Scheme of the Reserve Bank) : বিলবাজার পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে জানা প্রয়োজন কি ভাবে বাণিজ্যবিলের সৃষ্টি হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি সহজেই ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ধরা যাক, একজন চিনি উৎপাদক তিন মাসের ধারে একজন পাইকারী ব্যবসায়ীকে চিনি বিক্রয় করিল এবং চিনি উৎপাদক তাহার নামে একটি বিল তৈয়ারী করিল। চিনি উৎপাদকের নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে সে ব্যাঙ্কে গিয়া বিলটি ভান্ডাইয়া লইবে। যদি চিনি উৎপাদক নামকরা ব্যবসায়ী হয় এবং বিল গ্রহণকারীর বাজারে সুনাম থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক এই বিল বাট্টা করিবে। আবার ব্যাঙ্কের টাকার প্রয়োজন হইলে সে ঐ বিল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে।

১৯৫২ সালের পূর্বে ভারতে বিলবাজার বিশেষ চালু ছিল না। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও কতকগুলি বিশেষ কারণের জন্ত ভারতে বিলবাজার

গড়িয়া উঠে নাই। প্রথমত, বিলবাজার গড়িয়া তুলিবার জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিশেষ মনোযোগ দেয় নাই। দ্বিতীয়ত, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের পূর্বে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ছিল এবং ইহা বাণিজ্য ব্যাঙ্ক হিসাবেও কাজ করিত। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সহিত অন্যান্য বাণিজ্য

বিলবাজার
সৃষ্টির অনুরোধ

ব্যাঙ্কের রেযারেবি থাকায় বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের প্রতিবেশী সমগোত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ লইতে এবং বিল সম্পর্কে তাহাদের অবস্থা জানাইতে অনিচ্ছুক ছিল। তৃতীয়ত, ভারতে বিলের যথেষ্ট অভাব রহিয়াছে। গোলাঘরের অভাবে অধিক পরিমাণে কৃষি বিল তৈয়ারী করাও সম্ভব হইত না। ইহা ব্যতীত ভারতের সর্বত্র একই সময়ে বিলের চাহিদা দেখা দেয়, ইহাতে একই সময় ব্যাঙ্কের উপর চাপ পড়ে বলিয়া বিল ভাদানোর সুবিধা হয়। আবার বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিও অধিক পরিমাণে সরকারী ঋণপত্র কিনিয়া তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিতেই অধিকতর আগ্রহী। চতুর্থত, আঞ্চলিক ভাষায় লিখিত বহু প্রকার ছপ্তির অস্তিত্ব বিলবাজার প্রসারে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। পরিশেষে, বিলের উপর উচ্চহারে স্ট্যাম্পকর স্থাপনও বিলবাজার প্রসারের একটি বিশেষ অন্তরায়।

১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্করেট ৩% হইতে ৩½% এ বৃদ্ধি পাইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলবাজার পরিকল্পনা প্রবর্তন করে। প্রথমে এই পরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে গৃহীত হয় এবং পরে ইহাকে ভারতীয় টাকার বাজারের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত করা হয়। বিলবাজার পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ঋণদানের ব্যাপারে স্থিতিস্থাপকতার সৃষ্টি করা।

বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের খাতকদের ঋণ দিবার সময় তাহাদের নিকট হইতে যে সকল চলতি প্রতিক্রতিপত্র (demand promissory notes) গ্রহণ করে, উহার ভিত্তিতে নিজেরা সমপরিমাণ টাকার ২০ দিনের মেয়াদী প্রতিক্রতিপত্র (usance promissory notes) তৈয়ারী করিয়া ঐ দুই প্রকার ছপ্তি জামিন হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট জমা রাখিয়া স্বল্পমেয়াদী ঋণ লইতে পারিবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বিলের পরিবর্তে প্রচলিত ব্যাঙ্ক রেট অপেক্ষা ½% কম সুদ লইবে এবং স্ট্যাম্প করার অর্ধেক বহন করিবে। প্রথমে সীমাবদ্ধ আকারে এই পরিকল্পনা চালু করা হয়। যে সকল তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে ১০ কোটি টাকা তাহারাই এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে। কোন ব্যাঙ্ক ২৫ লক্ষ টাকার কম ঋণ লইতে পারিবে না এবং প্রত্যেক বিলের টাকার পরিমাণ অন্ততঃপক্ষে এক লক্ষ টাকা হওয়া চাই।

১৯৫২-৫৩ সালে বিলবাজার পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় ১৯৫৩ সালের জুন মাসে এই পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করা হয়। যে সকল তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ অন্ততঃ ৫ কোটি টাকা তাহাদেরও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে এই পরিকল্পনাকে আরও সম্প্রসারিত করা হয় এবং সকল তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কেই বিলবাজার পরিকল্পনার সুযোগ দেওয়া হয়। ন্যূনতম ঋণের পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার পরিবর্তে ৫ লক্ষ টাকা এবং প্রত্যেক বিলের অর্থের সর্বনিম্ন পরিমাণ এক লক্ষের পরিবর্তে কমাইয়া ৫০ হাজার টাকা করা হয়। এইভাবে ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলিও এই পরিকল্পনার সুবিধালাভ করে।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে রপ্তানি সম্প্রসারণে সহায়তা করিবার জ্ঞান বিলগুলিকেও (export bill) বিলবাজার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক রপ্তানি বিল ঋণ পরিকল্পনা (Export Bills Credit Scheme) প্রবর্তন করিয়া ঋণ গ্রহণ ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করে।

যদিও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই পরিকল্পনাকে বিলবাজার পরিকল্পনা বলা হইয়াছে তথাপি ইহা প্রকৃত বিলবাজার নয় কারণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু মেয়াদী ছাড়ের জামিনে ঋণ প্রদান করে মাত্র—বিল পুনর্বাট্টা করা হয় হয় না। দ্বিতীয়ত, দেশীয় ব্যাঙ্কারগণকে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই বলিয়া এই পরিকল্পনা ব্যাপক জটিলমূহ

হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি এই পরিকল্পনার সুযোগ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিয়াছে কিন্তু ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাঙ্কগুলি এই পরিকল্পনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। চতুর্থত, ১৯৫৬ সাল হইতে স্বল্পতার সুদের হার এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ষ্ট্যাম্প করের অর্ধেক বহনের সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়। ইহার ফলে বিলবাজার পরিকল্পনার জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। পঞ্চমত, ঋণ দিবার সময় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আবেদনকারী ব্যাঙ্কের নিকট যে সকল খুঁটিনাটি অনুসন্ধান করে তাহা ব্যাঙ্কগুলি আপত্তিজনক বলিয়া মনে করে। এই কারণে অনেক ব্যাঙ্ক এই পরিকল্পনার সুবিধা লইতে আগ্রহী নয়।

গ্রেট ব্রিটেনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে বিলবাজার পরিকল্পনার সম্ভাবনা আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রেট ব্রিটেনে ব্যাঙ্কের শাখাসমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তারবার্তা মারফৎ লেনদেনের ব্যবস্থা হওয়ায় আভ্যন্তরীণ বিলবাজার উঠিয়া যায়। কিন্তু ভারতে এখনো পর্যন্ত তারবার্তা মারফৎ লেনদেন জনপ্রিয় হয় নাই এবং ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তারও প্রয়োজনের তুলনায় কম। ইহা ব্যতীত গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক নাই বলিলেই চলে। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ উন্নয়নের যে সম্ভাবনা

কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সফল হইলে ভারতে বিলবাজারের সাফল্য লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং গ্রেট ব্রিটেনে যে কারণের জ্ঞান বিলবাজার লোপ পাইয়াছিল ভারতে সেই সকল কারণের অস্তিত্ব নাই। সুপরিচালিত হইলে ভারতে বিলবাজার পরিকল্পনা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিতে পারিবে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিল বাজার পরিকল্পনার সুবিধা প্রধানত, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লওয়া হইতেছে। এই সকল ক্ষেত্রেও প্রধানত, ঋতুগত প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ঋণ ব্যবহৃত হয়। এই ব্যবস্থাকে ভারতীয় টাকার বাজারের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য পরিণত করা প্রয়োজন। বিল বাজার পরিকল্পনার সহায়তায় কেবলমাত্র সাময়িকভাবে অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থাই রিজার্ভ ব্যাঙ্কের একমাত্র লক্ষ্য না হইয়া যাহাতে সকল প্রকার ব্যবসায়ের লিপ্ত ব্যক্তিগণ ইহার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে তাহা দেখা প্রয়োজন।

ত্রিংশ অধ্যায়

যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক, গ্রামীণ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক

(Joint Stock Banking, Rural Banking and the State Bank)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিক্ষিপ্তভাবে প্রচুর যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠে। অনেক ছোট ছোট ব্যাঙ্ক যাহাদের মূলধনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ইহারা সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের খুঁকি ব্যতীত অগ্রাণু খুঁকি লইতে আরম্ভ করে। যুদ্ধের সময় শিল্পপতিগণ নিজেদের শিল্পে মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে অনেক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। অপরিপুষ্ট মূলধন এবং অবাঞ্ছিত ঋণদান নীতির জগু বহু ব্যাঙ্কের পতন ঘটে। ব্যাঙ্কের পতন ঘটিলে আমানতকারী বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই কারণে ১৯৪৬ সালে সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে যে কোন ব্যাঙ্কের হিসাব পরীক্ষা করিবার এবং ব্যাঙ্কের কাজকর্ম অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হইলে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের ক্ষমতা দেন। স্থায়ী প্রতিকারের উদ্দেশ্যে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন পাশ হয়।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের প্রধান প্রধান বিধানাবলী (Main Provisions of the Banking Companies Act of 1949) : ১৯৪৯ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নয়নের এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের দ্বারা ব্যাঙ্কিং কোম্পানীগুলির উপর কতকগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর কতকগুলি ক্ষমতা ও দায়িত্ব গুস্ত করা হয়। এই আইনের প্রধান প্রধান বিধানগুলি নিম্নলিখিতরূপ :

(১) ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর আদায়ীকৃত মূলধন এবং রিজার্ভের সর্বনিম্নসীমা নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিটি ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর অন্ততঃপক্ষে ৫০ হাজার টাকার মূলধন থাকা চাই। কোন ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর একাধিক রাজ্যে কার্যালয় থাকিলে উহার অন্ততঃ ৫ লক্ষ টাকা মূলধন ও রিজার্ভ থাকিতে হইবে এবং কলিকাতা বা বোম্বাই শহরে কার্যালয় থাকিলে মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা হইতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে অপরিপুষ্ট মূলধন লইয়া ব্যাঙ্ক ব্যবসায় করা চলিবে না।

(২) প্রত্যেক ব্যাঙ্ক তাহার নীট মুনাফা হইতে ২০ শতাংশ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিবে। রিজার্ভ ফাণ্ড আদায়ীকৃত মূলধনের সমান না হওয়া পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিবে।

(৩) প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তাহার মোট চলতি ও মেয়াদী আমানতের ২০ শতাংশ নগদ টাকা, স্বর্ণ বা অনুরোধিত ঋণপত্রে নিজের কাছে মজুত রাখিতে হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যাঙ্কের হাতে নগদ টাকা পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিবে।

(৪) কয়েকজন শিল্পপতি যাহাতে ব্যাঙ্ক ব্যবসাতে একচেটিয়া স্থাপন করিতে না পারে

সেজ্ঞ কোন একজন অংশীদারকে মোট ভোট সংখ্যার ৫ শতাংশের বেশী ভোট রাখিবার অধিকার দেওয়া হইবে না।

(৫) রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি ব্যতীত কোন ব্যাঙ্ক, অথবা কোন ব্যাঙ্ক, ব্যবসায় করিতে পারিবে না। ব্যাঙ্কের ফটকা কারবার করার বা আনুষঙ্গিক কোম্পানী গঠনের উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

(৬) একাধিক ব্যাঙ্ক যাহাতে একই পরিচালকগোষ্ঠী ও ম্যানেজার দ্বারা পরিচালিত না হয় এবং ব্যাঙ্কের সম্পদ যাহাতে ঐ সকল ব্যক্তির ব্যবসায়ে নিয়োজিত না হয় সে জ্ঞাত ও বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছে।

(৭) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কগুলির কাজকর্ম তদারক এবং হিসাবপত্র পরীক্ষা করিতে পারিবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে নিয়মিতভাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হিসাবপত্র দাখিল করিতে হইবে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের সংযুক্তিকরণের প্রস্তাব মঞ্জুর অথবা বাতিল করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থাকিবে। নূতন শাখা স্থাপন করিতে হইলে ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

এ পর্যন্ত ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের বহুবার সংশোধন করা হইয়াছে। ব্যাঙ্কের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, ম্যানেজার বা অথবা কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রহিয়াছে। কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর বেতন অত্যধিক মনে হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা কমাইয়া দিবার নির্দেশ দিতে পারিবে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলির বোর্ডের মিটিং-এ যোগ দিবার জ্ঞাত পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করিবার দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর গুরুত্ব করা হইয়াছে। কোন ব্যাঙ্ক ভারতের বাহিরে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় পরিচালনা করিতে চাহিলে তাহাকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি লইতে হইবে।

১৯৬২ সালের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইনে কতকগুলি নূতন ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমত, প্রত্যেক ব্যাঙ্ককে তাহার চলতি ও মেয়াদী আমানতের অন্ততঃ ২৫ ভাগ নগদ টাকা, স্বর্ণ অথবা অনুমোদিত ঋণপত্রে নিজের কাছে জমা রাখিতে হইবে; পূর্বে ইহা ছিল ২০ শতাংশ; দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্কের রিজার্ভের পরিমাণ আদায়ীকৃত মূলধনের সমান হইলেও তাহাকে নীট মুনাফার ২০ ভাগ রিজার্ভ ফাণ্ডে জমা রাখিতে হইবে; তৃতীয়ত, ১৯৬২ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী (সংশোধন) আইন পাশ হইবার পর যে সকল নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইয়াছে তাহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ৫০,০০০ এর পরিবর্তে ৫ লক্ষ টাকা হইবে। চতুর্থত, সকল ব্যাঙ্ক এবং অর্থ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ঋণদান সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিবার বিশেষ ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে দেওয়া হইয়াছে।

ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রভূত ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা দেশে যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের সহায়ক হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই আইন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দান করিলেও ইহা

দেশে ব্যাঙ্ক ফেল রোধ করিতে পারে নাই এবং ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সমস্যাগুলির পরিপূর্ণ সমাধান আজও হয় নাই। ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার মূল সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করিয়া উহার সমাধানের পন্থা নির্দেশ দিবার জন্ত একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যাঙ্কিং কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে সর্বশেষ ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি যে সকল সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছিল বর্তমানের সমস্যাগুলি তাহা হইতে ভিন্ন। বর্তমান পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নয়নকল্পে সুপারিশ করিবার জন্ত একটি ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা প্রয়োজন।

১৯৬৩ সালের ব্যাঙ্কিং আইনের প্রধান বিধানবলী (Main Provisions of the Banking Laws [Miscellaneous Provisions] Act of 1963) :
১৯৬৩ সালে ব্যাঙ্কিং (বিবিধ-বিধান) আইন পাশ হওয়ায় ব্যাঙ্ক ও অগ্রাণু অর্থ-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে প্রভূত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

এই আইনানুসারে জামিন ব্যতীত (ক) কোন ডিরেক্টর ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না; (খ) কোন প্রতিষ্ঠান বা প্রাইভেট কোম্পানীর ডাইরেক্টর ব্যাঙ্কের অংশীদার বা ম্যানেজিং এজেন্ট হইলে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না; (গ) কোন পাবলিক কোম্পানীর চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা ম্যানেজিং এজেন্টের অংশীদার ব্যাঙ্কের সহিত যুক্ত থাকিলে ব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না। যদি ব্যাঙ্ক এবং আমানতকারীদের স্বার্থে প্রয়োজন হয় তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ৫ জন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের অতিরিক্ত ডাইরেক্টর নিযুক্ত করিতে পারিবে। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ ঋণ দিতে পারিবে, কত টাকা পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ব্যক্তি বা কোম্পানীর পক্ষে গ্যারান্টি দিতে পারিবে, সুদের হার কি হইবে এ সম্পর্কে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নির্দেশ জারী করিতে পারিবে।

আমানতকারীর স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই সকল পরিবর্তন করা হইয়াছে। যে সকল প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ করে কিন্তু ব্যাঙ্কের পর্যায়ে পড়ে না তাহাদেরও এই আইনের আওতায় আনা হইয়াছে। ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত যে সকল আইন দেশে প্রচলিত ছিল তাহারা এই ধরনের প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। কিন্তু এই সকল প্রতিষ্ঠানের আমানতের পরিমাণ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। আমানত সম্পর্কে নিয়মিত রিপোর্ট দাখিল করার কোন বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা না থাকায় এই ধরনের আমানতের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন। এই সকল প্রতিষ্ঠান স্থায়ী আমানতের উপর উচ্চ হারে সুদ দিয়া থাকে এবং সাধারণ অবস্থায় ইহা সুদের হারকে প্রভাবিত করে। এই কারণে এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন। ১৯৬৩ সালের ব্যাঙ্কিং আইনের বলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিয়া ব্যাঙ্ক বহির্ভূত প্রতিষ্ঠানের ব্যাঙ্কিং কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল প্রতিষ্ঠানের আদায়ীকৃত

মূলধন, রিজার্ভ, বিনিয়োগ, ঋণের সূত প্রভৃতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার এবং ইহাদের ব্যবসায় পরিচালনা সম্পর্কে নির্দেশ দিবার অধিকার লাভ করিয়াছে।

অদূর ভবিষ্যতে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, ঠিকা-সওদাকারী প্রতিষ্ঠান (hire purchase finance companies), গৃহনির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ব্যাঙ্ক বহির্ভূত অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব বাড়িবে। বর্তমানের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে জনসাধারণের নিকট হইতে প্রাপ্ত আমানত সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করিতে হয়। ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ তারিখে ব্যাঙ্কিং কার্যে লিপ্ত কিন্তু ব্যাঙ্ক পর্যায়েভুক্ত নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ছিল ১৮৬ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে ৮৫ শতাংশ স্বল্পকালীন আমানত এবং ইহা সরাসরি ব্যাঙ্কগুলির সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। ব্যাঙ্কিং কার্যে লিপ্ত কিন্তু ব্যাঙ্ক নয় এরূপ প্রতিষ্ঠান সমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করিবার জুলা ১৯৬৬ সালে ব্যাঙ্কিং আইনের মারফৎ দুইটি নির্দেশনামা জারি করা হয়।

আমানত বীমা পরিকল্পনা (Establishment of Deposit Insurance Corporation) : ব্যাঙ্ক ফেলের আতঙ্ক দূর করিবার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতে আমানত বীমা পরিকল্পনা প্রবর্তন করে। ব্যাঙ্ক ফেলের প্রতিবিধান হিসাবে আমানত বীমা পরিকল্পনা গ্রহণের প্রস্তাব পূর্বে এদেশে বহুবার উত্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫০ সালে গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধান কমিটি (Rural Banking Enquiry Committee) নীতিগত ভাবে ইহা সমর্থন করিলেও এদেশে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের জুলা সুপারিশ করেন নাই। ১৯৫৪ সালে শ্রুত কমিটি আমানত বীমা প্রবর্তনের সুপারিশ করেন, কিন্তু এই সময় হইতে মোটামুটিভাবে ব্যাঙ্ক ফেলের সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় প্রশ্নটি সাময়িকভাবে চাপা থাকে। কিন্তু ১৯৬০ সালে মহারাষ্ট্রের লক্ষ্মী ব্যাঙ্ক এবং কেরলের পালাই ব্যাঙ্কের বিপর্যয় ঘটবার পর সরকার আর নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারিলেন না। ১৯৬২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভারতে আমানত বীমা কর্পোরেশন গঠিত হয়। ইহা একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর ইহার চেয়ারম্যান। এই কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন এক কোটি টাকা, ইহার সমস্তটাই বিলি করা হইয়াছে এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহা গঠন ক্রয় করিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক হইতে কর্পোরেশন ৫ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণগ্রহণ করিতে পারিবে।

পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর এই কর্পোরেশনের পরিচালনা ভার গ্রস্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মনোনীত ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্প সম্পর্কে অভিজ্ঞ দুইজন বেসরকারী সদস্য। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর এই পরিচালকমণ্ডলীর চেয়ারম্যান। দৈনন্দিন কার্য

পরিচালনার অগ্র পরিচালকমণ্ডলী নিজেদের মধ্য হইতে একটি কার্যনির্বাহক কমিটি (Executive Committee) গঠন করিবে। ১৯৬১ সালে আমানত বীমা কর্পোরেশন আইন পাশ হওয়ার সময় ভারতে কার্যরত সকল বাণিজ্য ব্যাঙ্কেই রেজিস্ট্রি করিয়া এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে যে সকল ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে তাহারাও রেজিস্ট্রিভুক্ত হইয়া এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বর্তমানে প্রত্যেক বীমাকৃত ব্যাঙ্কের প্রতি আমানতকারীর ১৫০০ টাকা পর্যন্ত আমানতের বীমা ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের, রাজ্য সরকারের, বৈদেশিক সরকারের এবং ব্যাঙ্ক কোম্পানীর আমানত বীমা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নয়। এই ব্যবস্থার ফলে বর্তমানে প্রতি পাঁচজন আমানতকারীর চারজনের আমানত এবং মোট ব্যাঙ্ক আমানতের ২৪ শতাংশ নিরাপদ হইল। প্রয়োজন এবং সঙ্গতি অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব অনুমতি লইয়া কর্পোরেশন বীমার সীমা বাড়াইতে পারিবে। ১৯৩৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমানত বীমা প্রবর্তনের সময় প্রতি আমানতকারীর ২,৫০০ ডলার পর্যন্ত বীমা পরিকল্পনাভুক্ত ছিল, পরে ১৯৫০ সালে উহা বৃদ্ধি করিয়া ১০,০০০ ডলার করা হয়।

বর্তমানে প্রতি ১০০ টাকায় আমানত বীমার বাৎসরিক প্রিমিয়াম হার হইল ৫ পয়সা। প্রয়োজন হইলে কর্পোরেশন ইহা ১৫ পয়সা পর্যন্ত বৃদ্ধি করিতে পারিবে। বীমাকৃত ব্যাঙ্ক সময় মত প্রিমিয়াম দিতে না পারিলে কর্পোরেশন ক্ষুদ্র আদায় করিবে। ক্ষুদ্রের হার ৮ শতাংশ পর্যন্ত হইতে পারিবে।

বীমাকৃত ব্যাঙ্কগুলির সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার উপর আমানত বীমা ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল আমানত বীমা কর্পোরেশন বীমাকৃত ব্যাঙ্কসমূহের কার্যাবলী তদারক করিতে পারে কিন্তু ভারতে আমানত বীমা কর্পোরেশন কোন ব্যাঙ্কের কার্যাবলী তদন্ত করিতে পারে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কই অগ্রাগ্র ব্যাঙ্কের কার্যাবলী তদারক করিতে পারে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্পোরেশনের ব্যাঙ্কার বলিয়া কর্পোরেশনকে আর এই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। অবশ্য কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে কোন বীমাকৃত ব্যাঙ্ক সম্পর্কে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিতে অধ্যুযুক্ত করিতে পারে। ১৯৬২ সালে বীমাকৃত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ২৮৭, কিন্তু ১৯৬৬ সালের শেষে উহা হ্রাস পাইয়া ১০০ হয়। স্বেচ্ছামূলক সংযুক্তিকরণের ফলে বীমাকৃত ব্যাঙ্কের সংখ্যা হ্রাস পায়। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কর্পোরেশন নয়বার বীমাকৃত ব্যাঙ্কের আমানতকারীর ৩২ কোটি টাকার পাওনা মিটাইয়াছে।

কর্পোরেশনের দুইটি তহবিল আছে—আমানত বীমা তহবিল (Deposit Insurance Fund) এবং সাধারণ তহবিল (General Fund); প্রিমিয়াম বাবদ যে দুইটি তহবিল টাকা আদায় হয় তাহা আমানত বীমা তহবিলে জমা হয় আর মূলধন বিনিয়োগ করিয়া কর্পোরেশনের যে আয় হয় তাহা লইয়া সাধারণ তহবিল গঠিত হইবে।

আমানতবীমা জীবনবীমা, অগ্নিবীমা অথবা জাহাজবীমা হইতে স্বতন্ত্র। আমানত বীমা মাল্যব সৃষ্ট বিপর্যয় রোধ করে কিন্তু অগ্নাগ্র বীমাগুলি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের রক্ষা কবচ। এইরূপ ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার তত্ত্ব (theory of probability) প্রয়োগ করা ব্যতীত আর কিছুই করিবার থাকে না কিন্তু আমানত বীমার ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির কার্য-কলাপ তদারক করিয়া ব্যাঙ্ক বিপর্যয় রোধ করা যায়। এই কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল আমানত বীমা কর্পোরেশন দেশের সকল ব্যাঙ্কের কাজকর্ম তদারক করিয়া থাকে। কিন্তু, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, ভারতীয় আমানত বীমা কর্পোরেশন সরাসরি বীমাকৃত ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ পরীক্ষা করিতে পারে না।

ব্যাঙ্ক বিপর্যয় সমাজের উপর সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে যাহাতে আমানতকারীর সঞ্চয় বিনষ্ট না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমানতবীমা কর্পোরেশন গঠন করা হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানতকারীর আমানত নষ্ট হইলে সে ভোগ্যব্যয় হ্রাস করিবে, ইহার ফলে মন্দা দেখা দিবে এবং সমগ্র সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ব্যাঙ্ক ফেল পড়িলে ব্যাঙ্ক যদি আমানতকারীর সমগ্র আমানত ফেরৎ দিতে না পারে তাহা হইলে বীমা তহবিল হইতে আমানত-দায় মিটানো হইবে। এই ব্যবস্থার ফলে ব্যাঙ্কের উপর আমানতকারীর আস্থা দৃঢ় হইবে এবং তাহার অকারণ গুজবে ভীত হইয়া ব্যাঙ্ক হইতে আমানত তুলিবার জগু ছুটিবে না। এই পরিকল্পনা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কে টাকা জমানোর অভ্যাস গড়িয়া তুলিবে এবং দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। বীমাকৃত ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ সতর্কতার সহিত তদারক করা হইবে বলিয়া তাহার। তাহাদের ক্রটিসমূহ দূর করিবার জগু সচেষ্ট হইবে। কিন্তু ব্যাঙ্ক ফেলের প্রকৃত কারণ হইল অর্থনৈতিক সঙ্কট। মন্দাজনিত সঙ্কটের ফলে যে ব্যাঙ্ক বিপর্যয় ঘটে তাহা সমাধান করা এই কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভবপর নয়, কিন্তু আমানত বীমা কর্পোরেশন স্থাপন যে ভারতীয় ব্যাঙ্ক ব্যবসার ক্ষেত্রে একটি নিভুল এবং কাম্য পদক্ষেপ ইহা অনস্বীকার্য।

বাণিজ্যব্যাঙ্ক, স্ফ্রফকমিটি এবং বেসরকারী ক্ষেত্রে অর্থসাহায্য (Commercial Banks, Shroff Committee and Finance for the Private Sector) : দেশের দ্রুত শিল্পায়ণের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যব্যাঙ্কগুলি শিল্পসমূহকে মধ্যমেয়াদী ঋণ দিবে কিনা স্বভাবতই এই প্রশ্ন জাগিবে। ১৯৩১ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং অনুসন্ধানকমিটি (Indian Central Banking Enquiry Committee) সুপারিশ করেন যে, বড় বড় সঙ্কতিগ্রস্ত ব্যাঙ্কগুলি শিল্পকে মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবে। কিন্তু ইহার পর ভারতে শিল্প মূলধনের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে শিল্পকে মধ্যমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী ঋণদানের জগু বহু অর্থ সরবরাহ এবং উন্নয়ন কর্পোরেশন গঠিত হইয়াছে।

শিল্প-বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অনুপ্রবেশের প্রশ্নটি ১৯৫৪ সালে গঠিত স্ফ্রফ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কমিটির মতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ব্যাঙ্ক

গুলি নিজেদের বিবেচনা অনুসারে শিল্পে দীর্ঘকালীন ঋণ দিবে এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়।

ক্ষম কমিটির
সুপারিশ
কমিটি ব্যাঙ্ক এবং আণ্ডাররাইটারদের একটি সংস্থা (consortium) গঠনের সুপারিশ করেন। এই সংস্থা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ক্রয় করিবে। অবশ্য এখনো পর্যন্ত ক্ষম কমিটির সুপারিশ কার্যে পরিণত করা হয় নাই।

ক্ষম কমিটি আরও কয়েকটি গঠনমূলক সুপারিশ করেন। প্রথমত, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন ও মজুরীর ক্ষেত্রে একরূপতা আনিবার জন্ত একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যে সকল তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের ১ কোটি বা ততোধিক টাকার আমানত আছে তাহারা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিলবাজারে পরিকল্পনার সুবিধা পাইবে। তৃতীয়ত, টাকা পাঠানোর খরচ এবং সময় কমানোর জন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবে। চতুর্থত, ব্যাঙ্ক আমানতকারীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিনযুক্তরাষ্ট্রের হ্যায় একটি আমানত বীমা কর্পোরেশন গঠন করিতে হইবে। পঞ্চমত, সকল শ্রেণীর ব্যাঙ্কের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি সারা ভারত ব্যাঙ্ক সংঘ (All India Association of Banks) গঠন করিতে হইবে। ষষ্ঠত, দেশীয় ব্যাঙ্কদের কার্যকলাপ সুসংগঠিত করিতে হইবে। সপ্তমত, ক্ষুদ্রশিল্পের মূলধনের প্রয়োজন মিটাইবার জন্ত একটি বিশেষ উন্নয়ন কর্পোরেশন (Special Development Corporation) গঠন করিতে হইবে। দেশের অর্থসম্পদ একত্রিত করিবার জন্ত ইন্স্যুরাউস, বিনিয়োগ ট্রাস্ট, ইউনিট ট্রাস্ট প্রভৃতি নূতন সংস্থা গঠন করিতে হইবে। দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনে উৎসাহিত করিবার জন্ত রাষ্ট্রীয় মালিকানা এবং পরিচালনাদীনে একটি শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (Industrial Development Corporation) গঠন করিতে হইবে। সরকার এই কমিটির অধিকাংশ সুপারিশই গ্রহণ করিয়াছেন।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেসরকারী ক্ষেত্রে যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে হইলে বেসরকারী ক্ষেত্রে অধিকতর অর্থসরবরাহের প্রয়োজন। বর্তমানে সরকার শিল্পের মুনাফার মোটা অংশ করবাবদ গ্রাস করিতেছে আর ইহার ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি ব্যাঙ্ক হইতে অধিক পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। এইরূপ অবস্থায় কমিটির কনসোর্টিয়াম গঠনের সুপারিশ যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়। বাণিজ্য ব্যাঙ্কের উন্নয়নের জন্ত ক্ষম কমিটির গঠনমূলক সুপারিশগুলি গৃহীত হইলে বাণিজ্যব্যাঙ্কগুলি দেশের শিল্পায়ণের অধিকতর উপযোগী হইবে।

ভারতে গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Rural Banking in India) : সুসংগঠিত আধুনিক ধরনের ব্যাঙ্কব্যবস্থার সুবিধা শুধুমাত্র শহরগুলিই পাইয়া থাকে। গ্রামাঞ্চলে দেশীয় ব্যাঙ্কার, জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ প্রসারিত। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কও গ্রামাঞ্চলে কিছু সংখ্যক শাখা স্থাপন করিয়াছে। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা জানিতে হইলে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) সমবায় ব্যাঙ্ক (Co-operative Banking) : ভারতীয় সমবায় ব্যাঙ্কের গঠন যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সর্বনিম্নে রহিয়াছে প্রাথমিক গ্রাম সমবায় সমিতি, উহার পর রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে অর্থ সরবরাহ করে। আদায়ীকৃত মূলধন, গঠন রিজার্ভ তহবিল, জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠানের আমানত, এবং রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণ হইতে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের কার্যকরী মূলধন সংগৃহীত হয়। সমবায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার শীর্ষদেশে রহিয়াছে রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক (State Co-operative Bank)। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ এবং সুস্বচ্ছ করিবার জন্ত প্রত্যেক রাজ্যেরই শীর্ষদেশে একটি করিয়া রাজ্যসমবায় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা রাজ্য সরকারের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণদান করে আর কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলি প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়া থাকে। রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক টাকার বাজার এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মারফৎ শীর্ষব্যাঙ্ক এবং প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

বর্তমানে আসাম ব্যতীত প্রত্যেক রাজ্যেই একটি করিয়া শীর্ষব্যাঙ্ক আছে। আসামে দুইটি শীর্ষসমবায় ব্যাঙ্ক রহিয়াছে। এই শীর্ষসমবায় ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের কাজকর্মের জন্ত সাধারণত ঋণ এবং আমানতের উপর নির্ভর করে। শীর্ষসমবায় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের এক চতুর্থাংশ আসে বাণিজ্যব্যাঙ্কগুলির নিকট হইতে ঋণ হিসাবে আর বাকি অংশ পাওয়া যায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সরকার এবং অগ্রাণ্ড উৎস হইতে।

১৯৬৫-৬৬ সালে কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩৮১ এবং উহাদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮১,১২৭; কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মোট আমানতের দুই-তৃতীয়াংশ আসে ব্যক্তিগত সঞ্চয় হইতে এবং এক তৃতীয়াংশ পাওয়া যায় প্রাথমিক সমবায় ব্যাঙ্কগুলি হইতে।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সাম্প্রতিক সমীক্ষা হইতে জানা যায় যে, মাদ্রাজ এবং বোম্বাই ব্যতীত অগ্রাণ্ড রাজ্যে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার খুবই উচ্চ। বোম্বাই এবং মাদ্রাজে সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে সরকার সুলভে অর্থ সাহায্য করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করায় ঐ দুই রাজ্যে সমবায়ের সুদের হার কম। অতীতে বহুবার মাদ্রাজ ও বোম্বাই সরকার সমবায় সমিতিগুলির ষাটটি পূরণের জন্ত অর্থ সাহায্য করিয়াছেন এবং প্রশাসনিক ব্যয়ের একাংশ বহন করিয়াছেন। অগ্রাণ্ড রাজ্যের বোম্বাই এবং মাদ্রাজের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদী সুদের হার ৮½% এবং দীর্ঘকালীন সুদের হার ৬½% এর অধিক যাহাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

(খ) জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক (Land Mortgage Banks) : সমবায় ঋণদান সমিতিগুলি কৃষকদিগকে কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিতে পারে

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করা ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। জমি বন্ধকের বিনিময়ে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি কৃষকদিগকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ সরবরাহ করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া জার্মানীতে দীর্ঘকালীন কৃষিঋণ সরবরাহের উদ্দেশ্যে বহু পূর্বেই জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ভারতে ১৯২০ সালে পাঞ্জাবে প্রথম জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। পাঞ্জাব এ বিষয়ে অগ্রণী হইলেও এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা সেখানে সফল হয় নাই। ১৯২২ সালে মাদ্রাজে কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবার পর হইতে এই ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার দ্রুত সম্প্রসারণ হইতে থাকে। পরে মাদ্রাজের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া অন্ধ্রাঙ্গ রাজ্যেও জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

পুরাতন ঋণ পরিশোধ, জমির স্থায়ী উন্নতি, জমি ক্রয় এবং জমির দায় মোচন এই চারটি উদ্দেশ্যে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দান করিয়া থাকে।

জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত দুইভাবে তাহাদের মূলধন সংগ্রহ করে— ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া এবং জনসাধারণের নিকট হইতে আমানত সংগ্রহ করিয়া। ডিবেঞ্চারগুলি সাধারণত রাজ্য সরকারের গ্যারান্টি বহন করে। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই সকল ডিবেঞ্চারের ২০ শতাংশ ক্রয় করিয়া এই সকল জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে সাহায্য করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের সংগৃহীত অর্থ গ্রামীণ জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলিকে সরবরাহ করে আর উহারা তাহাদের সদস্যদের ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে গ্রামীণ জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে সরাসরি ঋণ পাইয়া থাকে। উত্তরপ্রদেশে গ্রামীণ জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কগুলি নিজেরাই ডিবেঞ্চার বিক্রয় করিয়া মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে।

সমবায় ব্যাঙ্কের দ্বারা জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের অগ্রগতিও শুধুমাত্র মাদ্রাজ এবং বোম্বাই-এ সন্তোষজনক; অন্ধ্রাঙ্গ রাজ্যে ইহাদের বিশেষ প্রসার ঘটে নাই। এই ব্যাঙ্কগুলির সুদের হার অত্যধিক। ইহা ব্যতীত শিক্ষণপ্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ কর্মচারীর অভাবে ঋণ মঞ্জুরের ব্যাপারে অথবা বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। প্রয়োজনের সময় ঋণ না পাইলে ঋণ গ্রহণের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। এই ব্যাঙ্কগুলির আর একটি ত্রুটি হইল যে, ইহারা ছোট আকারের, ইহাদের মূলধনের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয় বলিয়া অধিকাংশ ঋণের পরিমাণ ৫০০০ টাকার অনধিক।

দেশে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করিতে হইলে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং রাজ্য কৃষি বিভাগের কার্যের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় জমিবন্ধকী ব্যাঙ্কের উচিত উপযুক্ত কর্মীর সাহায্যে ঋণদান ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা এবং প্রচারপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনীয় তথ্য তুলিয়া ধরা। রাজ্য সরকার, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের উচিত পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষভাবে জমিবন্ধকী ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্কে অর্থ সাহায্য করা এবং উহাদের পুনর্গঠনের জ্ঞান পরিকল্পনা রচনা করা।

(গ) গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির সুপারিশের পর্যালোচনা (Analysis of the Recommendations of the Rural Banking Enquiry Committee) : ১৯৫০ সালে গ্রামীণ ঋণ এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা পুনর্গঠনের জন্ত গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন :

(১) কমিটির মতে গ্রাম্য সঞ্চয় সংগ্রহ এবং ঋণদান ব্যবস্থা সমবায়ের নীতিতে পরিচালিত হওয়া উচিত।

(২) বাণিজ্য ব্যাঙ্কসমূহ ঘাহাতে গ্রামাঞ্চলে অধিক পরিমাণ শাখা স্থাপন করে সেই উদ্দেশ্যে তাহাদের উৎসাহদান করা উচিত। গ্রামাঞ্চলে পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। সমবায় ব্যাঙ্ক এবং সমবায় ঋণদান সমিতিগুলিকে বিশেষ সুবিধা দিতে হইবে যেমন, পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কম হারে টাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করা। সমবায় ব্যাঙ্ক এবং সমবায় সমিতিগুলি জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেট বিক্রয়ের অনুমোদিত এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবে।

(৩) কমিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে ছিলেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের ক্রেটিসমূহ সংশোধন করিবার জন্ত কমিটি কতকগুলি প্রতিবিধানের উল্লেখ করেন। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বেসরকারী মালিকানাধীনে থাকিলেও সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধীনে থাকিয়া ইহা উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহযোগী হিসাবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিবে।

(৪) কমিটি সমগ্র দেশের জন্ত একটি কেন্দ্রীয় কৃষি ঋণ কর্পোরেশন (Agricultural Credit Corporation) গঠনের সুপারিশ করেন।

কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন (Agricultural Refinance Corporation) : ১৯৬৩ সালের পূর্বে ভারতে জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কৃষি উন্নয়নের জন্ত দীর্ঘকালীন ঋণদান করিত না। কিন্তু কৃষির প্রয়োজন অনুযায়ী ঋণ দিবার সামর্থ্য এই ব্যাঙ্কগুলির ছিল না। শিল্প-অর্থ-কর্পোরেশন এবং শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র শিল্পের ক্ষেত্রেই দীর্ঘকালীন ঋণদান করিবে—কৃষি ইহাদের কার্য পরিধির বহির্ভূত। বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি সাধারণত কৃষির প্রয়োজনের ঋণদান করে না। কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন স্থাপন ভারতীয় কৃষিঋণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বহুদিন ধরিয়া দেশে এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। প্রসঙ্গতঃ ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, সতের বৎসর পূর্বে গ্রামীণ ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি সমগ্র দেশের জন্ত একটি কেন্দ্রীয় কৃষি ঋণ কর্পোরেশন স্থাপনের সুপারিশ করেন।

১৯৬৩ সালের ১লা জুলাই কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন গঠিত হয়। কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ২৫ কোটি টাকা—ইহা ২৫,০০০ শেয়ারে বিভক্ত এবং

প্রতিটি শেয়ারের মূল্য ১০,০০০ টাকা। কর্পোরেশন পাঁচ কোটি টাকার শেয়ার লইয়া গঠন কাজ শুরু করে। প্রারম্ভিক পাঁচ কোটি টাকা শেয়ার মূলধনের মধ্যে

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কর্পোরেশন, তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি ৫০ শতাংশ শেয়ার কিনিবে; শেয়ার সম্পূর্ণরূপে বিলি না হইলে অবশিষ্ট শেয়ারও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিনিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক শেয়ারের মূল্য এবং উহার উপর অন্ততঃ ৪½ শতাংশ হারে লভ্যাংশের জামিন রহিয়াছে। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেশনকে আরও ৫ কোটি টাকা বিনা সুদে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ হিসাবে দিবে। প্রয়োজন বোধ করিলে কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হইতে তাহার আদায়ীকৃত ও সঞ্চিত মূলধনের ২০ ভাগ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

কৃষি পুনঃ অর্থসরবরাহ কর্পোরেশন একটি স্বয়ংশাসিত সংস্থা। কর্পোরেশনের কার্যভার নয়জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি পরিচালকমণ্ডলীর উপর হস্ত রহিয়াছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কৃষিঋণবিভাগের ভারপ্রাপ্ত ডেপুটি গভর্নর এই পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি।

কৃষি উন্নয়নের জন্ত কর্পোরেশন দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী ঋণদান করিবে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের সংস্পর্শে আসিবে না। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক ইত্যাদি কৃষি ঋণদান কাজে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ কৃষকদিগকে কার্যাবলী

যে ঋণদান করিয়াছে তাহা পূরণ করিবার জন্তই ইহা তাহাদের দীর্ঘমেয়াদী ঋণদান করিবে। এই ঋণ ২৫ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। কর্পোরেশন ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণদান করিতে পারিবে। কর্পোরেশন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিবে।

ভারতীয় কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে কর্পোরেশন একটি দীর্ঘদিনের অভাব পূরণ করিয়াছে। কৃষিঋণ পুনর্গঠনে সহায়তা করিয়া ইহা কৃষিকে এক নূতন রূপ দানে সমর্থ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বল্পমেয়াদী এবং মধ্যমেয়াদী কৃষি ঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের যে ভূমিকা, দীর্ঘকালীন কৃষিক্ষেত্রের বাজারে কর্পোরেশন সেই ভূমিকা গ্রহণ করিবে। নিজে স্বয়ং ঋণ সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করা অপেক্ষা অগ্রাগ্র ঋণদান সংস্থাগুলিকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

১৯৬৬ সালের ৩০শে জুলাই কর্পোরেশনের কার্যকালে তিন বৎসর পূর্ণ হয়। এই সময়ে কর্পোরেশন ৩৬টি পরিকল্পনা অনুমোদন করে এবং ২৮.৫৭ কোটি টাকা পুনঃ সরবরাহ করে।

ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ (The Imperial Bank and its Nationalization) : ভারতের বাণিজ্য ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয় টাকার বাজারে ইহা এক বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল।

১৯২১ সালে মাদ্রাজ, বোম্বাই এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলি একত্রিত হইয়া ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক গঠন করে। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত ইহা সাধারণ ব্যাঙ্ক ব্যবসায় ব্যতীত সরকারের ব্যাঙ্কার হিসাবেও কাজ করিত। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত কাজের অবসান ঘটিলেও যে সকল স্থানে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কোন শাখা ছিল না সেই সকল স্থানে ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এজেন্ট হিসাবে কাজ করিত। ফলে এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় টাকার বাজারে বেসরকারী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়া অগ্নাগ্র বাণিজ্য ব্যাঙ্কের তুলনায় বিশিষ্টতা অর্জন করিয়াছে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক বাণিজ্য বিল পুনর্বাটী করিত এবং দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অর্থ সরবরাহ করিত। ইহা সমবায় সমিতিগুলিকেও পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ সরবরাহ করিত।

স্বাধীনতা লাভের পর এই ব্যাঙ্কটির বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ আনয়ন করা হয়। ইহা বৈদেশিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হইত, মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যক্তি আমলাতান্ত্রিক মনোভাব লইয়া ইহা পরিচালনা করার দরুন কয়েকটি বৈদেশিক শিল্প-অভিযোগ প্রতিষ্ঠান ইহা হইতে সাহায্য পাইত—ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি উপেক্ষিত হইত, ব্যাঙ্কের উচ্চপদে কোন ভারতীয়কে গ্রহণ করা হইত না, অগ্নাগ্র ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি ইহার সহিত প্রতিযোগিতায় পাল্লা দিতে পারিত না—ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে এই সকল অভিযোগ আনা হয়। এই সকল অভিযোগ দূর করিবার জ্ঞান এই ব্যাঙ্কটিকে জাতীয়করণ করিবার দাবি প্রবল হইয়া উঠে। অবশেষে ১৯৫৫ সালে ইহাকে জাতীয়করণ করা হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা (Establishment of the State Bank) :
গ্রাম্য ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে ছিল। কিন্তু সারা ভারত গ্রাম্য ঋণ জরিপ কমিটির (১৯৫২) (All India Rural Credit Survey Committee) সুপারিশ অনুসারে ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করা হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ২০ কোটি টাকা অনুমোদিত মূলধন এবং ৫৬২৫ কোটি টাকা আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া কাজ আরম্ভ করে। ১৯৫৫ সালের রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক আইনানুসারে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার হোল্ডারদের ক্ষতিপূরণ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। শেয়ার হোল্ডারদের কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণপত্রে ক্ষতিপূরণ লইবার অথবা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের শেয়ার রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের শেয়ারে রূপান্তরিত করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকার মোট শেয়ার মূলধনের ৫৫ শতাংশ রাখিয়া অবশিষ্ট ৪৫ শতাংশ শেয়ার অগ্নাগ্রদের ভিতর বণ্টন করিয়া দিবে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালনাভার ২০ জন সদস্যবিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় বোর্ডের উপর ন্যস্ত আছে। চেয়ারম্যান, সহকারী চেয়ারম্যান, দুইজন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং

আরো ১৬ জন ডাইরেক্টর লইয়া ব্যাঙ্কের কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহিত পরামর্শ করিয়া চেয়ারম্যান এবং সহকারী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন।

সরকারের অনুমোদন লইয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়া অগ্রাগ্রহ ব্যাঙ্কের কার্যভার গ্রহণ করিতে পারিবে। ১৯৬০ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ৪০০ শাখা স্থাপন করিবে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের এই সকল শাখাসমূহ সম্ভবতঃ লাভজনক হইবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং সরকারের সহায়তায় একটি সুসম্বদ্ধ এবং উন্নয়ন তহবিল (Integration and Development Fund) গঠন করিয়া নূতন শাখা স্থাপনের দরুন যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করা হইবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ৪০০ শাখা অফিস স্থাপন করিয়াছে। ১৯৬০ সালের জুলাই হইতে ১৯৬১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ২৫টি অতিরিক্ত শাখা স্থাপন করা হইয়াছে। কার্তে কমিটির সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ১৯৬০ সালের জুলাই হইতে ১৯৬৫ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে ৩০০ নূতন শাখা স্থাপন করিবে বলিয়া ঘোষণা করে। ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৬৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ৭০৪টি শাখা অফিস খোলা হয়। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের গুরুত্ব ক্রমশই বৃদ্ধি পাইবে। জাতীয়করণের পর রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের মর্যাদা এবং ক্ষমতা উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং ইহার কার্যপরিধি বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে।

কৃষি এবং ক্ষুদ্রশিল্পে অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের ভূমিকা (Role of the State Bank in the Provision of Agricultural Finance and Finance for Small Industries) : রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণ বাণিজ্য ব্যাঙ্কের কাজ করিয়া থাকে এবং কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যে ঋণ সরবরাহ করে। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের তুলনায় রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গ্রামাঞ্চলে অধিক পরিমাণ ঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে এবং নবগঠিত শাখাসমূহের সাহায্যে গ্রামের সঞ্চয় সংগ্রহ করে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক কৃষির ক্ষেত্রে সরাসরি ঋণদান করে না। ইহা সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ সরবরাহ করে এবং উহার কৃষিপণ্য বিক্রয়ের জ্ঞাত ঋণদান করিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতিগুলিকে টাকা পাঠানোর যে সুবিধা দান করিয়াছে তাহা ১৯৬৪ সালে ৩ কোটি টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৫ সালে ২৬২ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতিগুলিকে ১৯৬৫ সালে ৫১.৩ কোটি টাকা ঋণদান করে, ১৯৬৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৬২.৯ কোটি টাকা হয়। জমি বন্ধকী ব্যাঙ্কের ডিবেঞ্চার ক্রয় করিয়া রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক উহাদের সাহায্য করিয়া থাকে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক গুদামঘর নির্মাণ পরিকল্পনায় অর্থ-সাহায্য করিয়াছে। গুদামঘর রসিদের পরিবর্তে দাদন দিয়া ব্যাঙ্ক গুদামঘর পরিকল্পনাকে জনপ্রিয় করিয়াছে। গুদামঘর রসিদের পরিবর্তে দাদনের পরিমাণ ক্রমশই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কের কাজ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে ক্ষুদ্রশিল্পকে ঋণদানের যে পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা (Pilot Scheme) করা হয় তাহা সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ব্যাঙ্ক ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ক্ষুদ্রশিল্পকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৫৬ সালে ১১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়। ১৯৬৫ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৬ কোটি টাকা হয়। বিক্রয়যোগ্য সমস্ত কাঁচামালের জামিনে ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্রশিল্পকে ঋণ দিয়া থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক নিজে অথবা রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রশিল্পকে ঋণ দিয়া থাকে। বর্তমানে ক্ষুদ্রশিল্পে ঋণদান কর্মসূচীকে সম্প্রসারিত করিবার জন্ত উদার নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে, সুদের হার হ্রাস করা হইয়াছে এবং ঋণ গ্রহণের সর্তাবলী সহজতর করা হইয়াছে। সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্রশিল্পে প্রদত্ত ঋণকে ঋণ গ্যারাণ্টি পরিকল্পনার (Credit Guarantee Scheme) অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক ক্ষুদ্রশিল্পগুলিকে ৭ বৎসরের জন্ত মধ্যমেয়াদী ঋণ দিতেছে। ঋণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্ত রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক পশ্চিমবঙ্গ, বোম্বাই, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ এবং রাজস্থানের রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের সহিত চুক্তি করিয়া স্থির করিয়াছে, যে সকল স্থানে রাজ্য অর্থ সরবরাহ কর্পোরেশনের কার্যালয় নাই সেখানে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক উহার এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবে।

বাণিজ্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ (Nationalization of Commercial Banks in India) : ১৯৫৫ সালে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর সকল বাণিজ্য ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করিবার জন্ত দেশে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। ব্যাঙ্ক জাতীয় করণের প্রশ্নটি একেবারে নূতন নয়। ১৯৪৮ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ভারতের ব্যাঙ্ক এবং বীমাব্যবস্থা জাতীয়করণের নীতি অনুমোদন করে। অবশু ইহাকে কার্যকরী করিবার জন্ত কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বাণিজ্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করা হয়।

প্রথমত, বেসরকারী ব্যাঙ্কগুলি সামান্য আদায়ীকৃত মূলধন লইয়া জনগণের প্রভূত পরিমাণ আমানত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে আর ইহার ফলে একচেটিয়া মালিকানা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হইতেছে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষমতা অবাঞ্ছিতভাবে কেন্দ্রীভূত হইতেছে। মহালানবীশ কমিটি দেখাইয়াছেন যে, দেশের স্বপক্ষে যুক্তি

১ শতাংশ পরিবারের হাতে ৭৫ শতাংশ স্টক রহিয়াছে। একচেটিয়া মনোপলি অনুসন্ধান কমিশনের মতে মালিকানা নিয়ন্ত্রণের তুলনায় পরিচালনা নিয়ন্ত্রণের অধিকতর কেন্দ্রীভবন ঘটিয়াছে এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক স্থূলভ ঋণদান নীতি অর্থনৈতিক কেন্দ্রীভবন বৃদ্ধিতে সহায়তা করিয়াছে : ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সমাজে ধনবৈষম্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করিবে।

দ্বিতীয়ত, ভারতে শিল্পপতিদের সহিত ব্যাঙ্কের অবাঞ্ছিত যোগাযোগ থাকায় ব্যাঙ্ক

ব্যবসায় প্রধানত, শিল্পপতিদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি বাণিজ্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণগ্রহণ করিয়া ফটকা কারবারে টাকা খাটায়। ফটকা কারবারীরা কৃত্রিমভাবে মূল্য বাড়াইয়া প্রচুর মুনাফা অর্জন করে এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে ইন্ধন যোগায়। সম্প্রতি প্রকাশিত ভিভিয়ান বোস কমিশনের (Vivian Bose Commission) রিপোর্ট হইতে ব্যাঙ্কগুলির বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনভঙ্গ, প্রতারণা-মূলক কাজ প্রভৃতি সমাজবিরোধী এবং জাতীয়তাবিরোধী কার্যকলাপ প্রকাশিত হইয়াছে।

তৃতীয়ত, বাণিজ্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হইলে গ্রামাঞ্চলে এবং ছোট ছোট শহরে নূতন নূতন শাখা স্থাপন করিয়া আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় সংগ্রহ করা সহজ হইবে।

চতুর্থত, বাণিজ্য ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে ব্যাঙ্কব্যবস্থা স্পষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ব্যাঙ্ক ফেলের আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইবে। আমানতকারীর মনে পরিপূর্ণ আস্থার সঞ্চার হইবে, সঞ্চয় নিরাপদ মনে করিয়া তাহারা অধিক সঞ্চয়ে আগ্রহী হইবে। উপরন্তু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইলে আমানত বীমা কর্পোরেশন বাবদ কোন ব্যয় করিতে হইবে না।

পঞ্চমত, জাতীয়করণ করা হইলে হিসাববিহীন টাকা এবং গোপন টাকা সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে। কর ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে একই ব্যক্তি বিভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা রাখে। ইহার ফলে প্রকৃত আয় গোপন করিয়া কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হয়। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হইলে ইহা বন্ধ হইবে।

ষষ্ঠত, বাণিজ্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ঋণনিয়ন্ত্রণ নীতি অধিকতর কার্যকরী হইবে। টাকাকড়ি সৃষ্টি করা রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার, কিন্তু ব্যাঙ্কগুলিও পরোক্ষভাবে টাকা সৃষ্টি করিতে পারে। টাকা সৃষ্টির ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একচেটিয়া অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলিকে জাতীয়করণ করা প্রয়োজন।

সপ্তমত, বর্তমানে প্রতিরক্ষা এবং উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জন্ত প্রভূত অর্থের প্রয়োজন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হইলে সরকার প্রয়োজন মত ব্যাঙ্ক আমানত উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত বে-সরকারী ব্যাঙ্কগুলি বৎসরে ৪০ কোটি টাকার ছায় মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হইলে সরকার এই মুনাফা লাভ করিবেন।

অষ্টমত, বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির ভূমিকার কথা বিবেচনা করিয়া জাতীয়করণের সমর্থন করা হয়। বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্কগুলির ২৬ কোটি টাকার ছায় আমানত আছে কিন্তু ইহারা ভারতে তাহাদের মূলধন বিনিয়োগ করে না। ইহারা ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলির সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে। উপরন্তু ইহারা যে মুনাফা অর্জন করে তাহা বিদেশে লইয়া যায় এবং ইহার ফলে আমাদের বানিজ্য ব্যালান্সের উপর চাপ পড়ে। জাতীয়করণ করা হইলে এই অসুবিধার অবসান ঘটিবে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিসমূহ উপস্থাপিত করা হয়। প্রথমত, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইলে আমলাতন্ত্রের প্রসার ঘটিবে এবং বিপক্ষে যুক্তি পরিচালনা দক্ষতার অবনতি ঘটিবে। বেসরকারী উद्यোগের ক্ষেত্রে পরিচালনা দক্ষতা সরকারী উद्यোগ অপেক্ষা অনেক বেশী।

দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সমস্যা দেখা দিবে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের জন্ত ১০০ কোটি টাকার ত্রায় ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। বর্তমানের অর্থ দঙ্কটের সময় এইরূপ প্রভূত ক্ষতিপূরণ সরকারের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করিবে।

তৃতীয়ত, বর্তমানে মোট আমানতের প্রায় ৩০ শতাংশ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক মারফৎ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হইয়াছে। বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের মোট আমানতের এক-চতুর্থাংশ সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগ করিতেছে। এরূপ অবস্থায় জাতীয়করণের পথে অগ্রসর হইবার সার্থকতা কোথায়?

চতুর্থত, বর্তমানে আমানতকারীর নিরাপত্তার জন্ত জাতীয়করণের প্রশ্ন আর উঠিতে পারে না কারণ ভারতীয় আমানত বীমা কর্পোরেশন যথেষ্ট দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছে।

পঞ্চমত, ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) আদর্শে গঠিত। এখানে সরকারী এবং বেসরকারী উভয় ধরনের উद्यোগকে স্বীকার করা হইয়াছে। বেসরকারী শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্য করে বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলি; ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইলে বেসরকারী উद्यোগের ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিবে।

ষষ্ঠত, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় যে সকল ত্রুটি বিদ্যুতি রহিয়াছে তাহা জাতীয়করণ না করিয়া অত্র উপায়েও দূর করা যায়। সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গলদ দূর করা যায় সুতরাং জাতীয়করণের ত্রায় চরম নীতি গ্রহণ করা অনাবশ্যক।

সরকার বর্তমানে জাতীয়করণের পরিবর্তে বাণিজ্য ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের (Social Control of Commercial Banks) নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

একত্রিংশ অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থা, মুদ্রাঙ্কন এবং মূল্যস্তর

(Monetary Systems, Coinage and the Price Level)

ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা নানাবিধ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। প্রথমে রৌপ্যমান, তারপর স্বর্ণমান, ইহার পর স্বর্ণবিনিময় মান এবং পরিশেষে স্টার্লিং বিনিময় মান—ভারতীয় মুদ্রা ব্যবস্থা এই সকল পরিবর্তনের ভিতর দিয়া বর্তমান অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বর্তমানে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য এবং ইহার মুদ্রাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থা বলে। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক স্বর্ণ ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া টাকার সহিত স্বর্ণের সমতা বজায় রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। সংক্ষেপে ভারতের মুদ্রাব্যবস্থার বিবর্তন আলোচনা করা হইল :

(ক) ১৮৩৫-১৮২৩ সাল—রৌপ্যমানের যুগ (Silver Standard) : ১৮৩৫ সাল হইতে ১৮২৩ সাল পর্যন্ত ভারতে রৌপ্যমান প্রচলিত ছিল। ১৮৩৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত অঞ্চলে প্রথমে রৌপ্যমান চালু হয় রৌপ্যমুদ্রামান ও পরে সমগ্র দেশে ইহা বিনিময়ের বিহিত মাধ্যম হিসাবে গৃহীত হয়। এইভাবে একক রৌপ্যমান ব্যবস্থা দেশে চালু হয় কারণ স্বর্ণমুদ্রা বিহিত মুদ্রা হিসাবে আর গ্রহণ করা হইত না। রৌপ্যমান ব্যবস্থায় লোকে প্রয়োজনমত রৌপ্য লইয়া বিনা ব্যয়ে সরকারী টাকশালে গিয়া ইহা মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে পারিত।

কিন্তু ১৮৭৩ সালের পর পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রৌপ্যখনি আবিষ্কৃত হওয়ায় রৌপ্যের যোগান বৃদ্ধি পায়, ফলে স্বর্ণ ও রূপার বিনিময় হার বক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। রূপার বিনিময়মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ভারতের বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতে স্বর্ণমান প্রবর্তন সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জ্ঞা ১৮২৩ সালে হার্সেল কমিটি (Harshell Committee) গঠিত হয় এবং ইহা রৌপ্যমান পরিত্যাগ করিবার জ্ঞা সুপারিশ করে। ১৮২৩ সালে রৌপ্যমান বাতিল করা হয়।

(খ) ১৮২৩ হইতে ১৮২৮ সাল—রূপান্তর যুগ (Period of Transition) : হার্সেল কমিটির মতে স্বর্ণমান গ্রহণ করিবার পূর্বে কিছু সময়ের রূপান্তর যুগ প্রয়োজন হইবে। ১৮২৮ সালে ফাউলার (Fowler Committee) নামে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটির মতে ভারতে পর্যায়ক্রমে স্বর্ণমান প্রবর্তন করিতে হইবে।

(গ) ১৮৯৯ হইতে ১৯১৭—স্বর্ণ বিনিময় মান (Gold Exchange Standard) :

এই সময় ভারতে স্বর্ণ বিনিময় মান প্রচলিত ছিল। ভারতে এই স্বর্ণবিনিময় মান মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ায় লর্ড কেন্স আনন্দিত হন এবং বলেন যে, ভারতের গ্রায় অল্পরত দেশে ইহা আদর্শ মুদ্রাব্যবস্থা। স্বর্ণ বিনিময় ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ লেনদেনে রৌপ্যমুদ্রা প্রামাণিক মুদ্রা (Standard Coin) হিসাবে চালু থাকে। আন্তর্জাতিক লেনদেনের ব্যাপারে রৌপ্যমুদ্রাকে ১ শিলিং ৪ পে. হারে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্তিত করা হইত। এই মুদ্রাব্যবস্থাকে সুস্থভাবে কার্যকরী করার জ্ঞান ভারতে টাকায় এবং লণ্ডনে স্টার্লিং-এ রিজার্ভ রাখা হইত। ১৯১৩ সালে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করিবার জ্ঞান চেম্বারলিন কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশনের মতে স্বর্ণ বিনিময় মান ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু ১৯১৬ সাল হইতে চেম্বারলিন কমিশন রূপার যোগান হ্রাস পাওয়ায় উহার বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রেসাম নিয়ম কার্যকরী হয় এবং লোকে টাকা গলাইয়া বিক্রয় করিয়া লাভবান হইতে থাকে। ১৯১৭ সালের আগষ্ট মাসে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদ করা হয়।

(ঘ) ১৯১৭ সালের আগষ্ট হইতে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর—অস্থায়ী বিনিময়হারের অস্থিতকর পর্যায় : এই সময় সরকার স্বর্ণ বিনিময় মান রক্ষা করার জ্ঞান বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে টাকার বিনিময়হার এইভাবে স্থির হয়, ১ টাকা = ২শি. ৪পে.। ১৯২০ সালে ব্যাবিংটন স্মিথ কমিটির (Babington Smith Committee) সুপারিশ অনুসারে সরকার বিনিময় মূল্য এক টাকা = ২ শিলিং করেন।

(ঙ) ১৯২০ হইতে ১৯২৭ সাল—অপূর্ণ নিষ্ক্রিয়তার যুগ (Period of Masterly Inactivity) : ১৯২৫ সাল পর্যন্ত সরকার কোন বিশেষ বিনিময় হার বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। ১৯২৫ সালে হিলটন-ইয়ং কমিশন (Hilton-Young Commission)

ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থার বিবিধ সূত্রপ্রসারী সংশোধনের সুপারিশ করেন। কমিশন স্বর্ণ বিনিময় মানের তীব্র সমালোচনা করেন এবং স্বর্ণ পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। কমিশন বলেন যে, স্বর্ণ বিনিময় মান মুদ্রাব্যবস্থার স্থিতিস্থাপকতাকে ব্যাহত করিয়াছে এবং অহেতুক ভাবে ভারতীয় মুদ্রাব্যবস্থাকে ব্রিটিশ মুদ্রাব্যবস্থার সহিত যুক্ত রাখিয়াছে। কমিশনের মতে স্বর্ণ পিণ্ডমান গ্রহণ করিলে ভারত অর্ধ স্বাধীন মুদ্রা নীতি গ্রহণ করিতে পারিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হিসাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্থাপনের সুপারিশও এই কমিশন করিয়াছিলেন। টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে কমিশন ১টা = ১শি. ৬পে. করার সুপারিশ করেন কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ টাকার বিনিময় হার ১শি. ৪পে. করার পক্ষপাতি ছিলেন। যাহাই হউক, সরকার কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া টাকার বিনিময় হার ১শি. ৬পে. করেন এবং ১৯৩৫ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন।

(চ) ১৯২৭ হইতে ১৯৩১ সাল—ছদ্ম স্বর্ণপিণ্ডমান (Camouflaged Gold Bullion Standard) : ১৯২৭ সালের আইনানুসারে টাকার মূল্য ৮'৪৭ গ্রেণ বিশুদ্ধ স্বর্ণের সমান করা হয় আর উহা ১শি. ৬ পেন্সের সমান ছিল। ছদ্ম স্বর্ণ পিণ্ডমান বৈদেশিক পাওনা মিটাইবার জন্ত স্বর্ণের প্রয়োজন হইলে লণ্ডনে রক্ষিত স্টার্লিং দ্বারা মিটানো যাইত। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, ১৯৩১ সাল পর্যন্ত ভারতে স্বর্ণমান ও স্টার্লিং মানের এক মিশ্র সংস্করণ চালু ছিল।

(ছ) ১৯৩১ হইতে ১৯৩৯ সাল—স্টার্লিং বিনিময়মান (Sterling Exchange Standard) : ১৯৩১ সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিলে স্টার্লিং বিনিময় ভারত সরকার ছদ্ম স্বর্ণপিণ্ডমান পরিত্যাগ করিয়া স্টার্লিং মান গ্রহণ করে। এইভাবে ভারত পুনরায় ব্রিটিশ মুদ্রানীতির অধীন হইয়া পড়ে। অধীন দেশ হিসাবে ভারত স্টার্লিং বিনিময় মানের আওতায় আসিয়া নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় ভারতের রপ্তানি বিশেষভাবে হ্রাস পায়। স্টার্লিং বিনিময় মানের অধীনে থাকার ফলে ভারতকে আমদানির পাওনা মিটাইবার এবং “হোম চার্জের” জন্ত প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ রপ্তানি করিতে হইত। ভারতীয় অর্থনীতিবিদগণ টাকার মূল্য ১শি. ৬পে. হইতে নামাইয়া ১শি. ৪পে. করার পরামর্শ দেন। তাঁহারা মনে করেন যে, ইহার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে এবং স্বর্ণের বহির্গমন রোধ করা যাইবে। কিন্তু টাকার মূল্য হ্রাস করার ইচ্ছা সরকারের ছিল না। ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইহা দেশের মুদ্রা এবং ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাকে দৃঢ়তর করে। ভারতের মুদ্রা ব্যবস্থার সামগ্রিক দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর আসিয়া পড়ে। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ১টাকা = ১শি. ৬ পেন্স, এই বিনিময় হার রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য হয়। ভারতের বর্তমান মুদ্রা-ব্যবস্থাকে স্বর্ণসমতা মান (Gold Parity System) বলা হয়।

দ্বিতীয় যুদ্ধ ও পরবর্তীকালে ভারতীয় মুদ্রা এবং বিনিময় (Indian Currency and Exchange during and after the Second World War) : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উৎপাদন, বাণিজ্য এবং মূল্যস্তরের উপর যে ক্ষুদ্রপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে তাহা মুদ্রা এবং বিনিময় ব্যবস্থার উপরও প্রতিক্রিয়া করে।

(ক) বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control) : যুদ্ধের সময় ভারতরক্ষা আইনানুসারে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন করা হয় এবং যাহাতে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা একত্রিত এবং সংরক্ষণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ পরিচালনার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বহির্ভূত দেশগুলির সহিত বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত লেনদেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পরিচালিত হইত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির মধ্যে কানাডা, নিউফাউন্ডল্যান্ড এবং হংকং বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত

হয়। ডলার ও অনমনীয় মুদ্রা (Hard Currencies) সরকার বাধ্যতামূলকভাবে সংগ্রহ করিত এবং সাম্রাজ্য ডলার পুল (Empire Dollar Pool) জমা দিত। সাম্রাজ্য ডলার পুল স্টার্লিং অঞ্চলের ডলারের একটি সাধারণ ভাণ্ডার ছিল। এই ডলার তহবিলটি লণ্ডনে অবস্থিত ছিল এবং সাম্রাজ্য ডলার পুলের সদস্যগণ অপরিহার্য না হইলে এই তহবিল হইতে ডলার উঠাইত না। যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইবার পরও ১৯৪৭ সালের ভারতীয় বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকে।

(খ) বিনিময় হার (Exchange Rate): দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স অল্পকূল থাকায় বিনিময় হার হ্রাসের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। যুদ্ধকালীন সময়ে ১টা = ১শি. ৬পে., এই বিনিময় হার প্রচলিত ছিল। যুদ্ধোত্তর যুগে ব্রিটেনের বাণিজ্য ব্যালান্সে সংকট দেখা দেওয়ায় সে পাউণ্ডের মূল্য ৩০.৫ শতাংশ হ্রাস করে। বাধ্য হইয়া আত্মরক্ষার জ্ঞাত ভারতকেও টাকার সমপরিমাণ মূল্য হ্রাস করিতে হয়। ফলে পাউণ্ডের সহিত টাকার বিনিময় হার সমান থাকিয়া যায়। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পুনরায় টাকার ৩৬.৫ শতাংশ মূল্য হ্রাস করা হয়। বর্তমানে ১টা = ১শি., এই বিনিময় হার প্রচলিত আছে।

(গ) মুদ্রাস্ফীতি পরিবর্তন (Coinage Changes) : যুদ্ধের সময় রূপার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় রূপার টাকা এবং আধুলি নির্মাণ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। টাকা এবং আধুলিতে রূপার পরিমাণ হ্রাস করা হয় এবং এক টাকার ও দু' টাকার কাগজী নোট চালু করা হয়। ১৯৫৭ সালের এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯০৬ সালের ভারতীয় মুদ্রাস্ফীতি আইন ১৯৫৫ সালের আগষ্টে সংশোধন করা হয়। টাকা প্রামাণিক মুদ্রা হিসাবেই চালু থাকে কিন্তু বর্তমানে ইহা ১০০ পয়সায় বিভক্ত।

(ঘ) অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচলন ও উজ্জ্বলিত মূল্য বৃদ্ধি : যুদ্ধের ব্যয় মিটাইবার জ্ঞাত প্রভূত পরিমাণ টাকার সৃষ্টি করা হয় এবং ইহার দরুন প্রবল মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। কালো বাজার ও মুনাফাশিকার এবং অবরুদ্ধ চাহিদার প্রভাবে এই মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধোত্তর কালেও চলিতে থাকে। ১৯৫১ সালে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করিলে মুদ্রাস্ফীতি কিছু পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, তীব্র খাদ্যসঙ্কট এবং প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির দরুন পুনরায় মুদ্রাস্ফীতি প্রবল আকার ধারণ করে। ১৯৫৭ সালের মে মাসে পাইকারী দামের সূচক-সংখ্যা ছিল ১০২ (১৯৫২-৫৩ = ১০০), ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাসে উহা হ্রাস পাইয়া ১০৬ হয় কিন্তু ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ২০৪.২-এ আসিয়া দাঁড়ায়।

(ঙ) স্টার্লিং পাওনা : যুদ্ধের সময় ভারত সরকার ব্রিটেন ও অন্যান্য মিত্রশক্তির পক্ষে ভারত হইতে প্রভূত পরিমাণ সামরিক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল। ইহার পরিবর্তে ভারত সরকার স্টার্লিং ঋণপত্র লাভ করে। এই স্টার্লিং জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যুদ্ধের সময় প্রভূত পরিমাণ কাগজী মুদ্রা সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে

ভারতের স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৭৩৩ কোটি টাকা। কি ভাবে এই স্টার্লিং পাওনা মিটানো হইবে এ সম্পর্কে ভারত সরকার এবং ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বহুবার আলোচনা হইয়াছে। বর্তমানে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে বৈদেশিক মুদ্রার যে ঘাটতি তাহা স্টার্লিং পাওনা হইতে মিটানো হইতেছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে যে ঘাটতি ব্যয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার পিছনে স্টার্লিং পাওনাকে নিয়োজিত করা হইয়াছে।

ভারতের স্টার্লিং পাওনা (India's Sterling Balances) : স্টার্লিং পাওনা বলিতে বুঝায় ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারতের পাওনা স্টার্লিং। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারত ব্রিটেনের দেনাদার ছিল কিন্তু যুদ্ধের পর ভারত তাহার নিকট পাওনা স্টার্লিং ব্রিটেনকে শোধ করিল, উপরন্তু দেখা গেল ভারত পাওনাদার দেশে পরিণত হইয়াছে এবং ব্রিটেনের নিকট হইতে তাহার বিপুল পরিমাণ স্টার্লিং পাওনা হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্বে মোট স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি টাকা। যুদ্ধের পর ১৯৪৫-৪৬ সালে ১৭৩৩ কোটি টাকা এবং দেশ বিভাগের পর ইহা ১৫১৬ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

ব্রিটেনের নিকট হইতে স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধির কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমত, যুদ্ধের পূর্বেও ভারত তাহার কাগজী মুদ্রা প্রচলনের পিছনে সকল সময়ই কিছু পরিমাণ স্টার্লিং ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে জমা রাখিত। ১৯৩৯ সালে এই জমার পরিমাণ ছিল ৬৪ কোটি টাকা।

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধের সময় ভারত সরকার ব্রিটেন ও মিত্র দেশগুলিকে প্রভূত পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করিয়াছিল। এই বাবদ যে পাওনা হয় তাহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে স্টার্লিং ঋণপত্রে জমা হয়।

তৃতীয়ত, ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়ের একাংশ বহন করিতে রাজী হয়। ইহার দরুনও ব্রিটেনের নিকট ভারতের পাওনা বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থত, যুদ্ধের সময় ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স অত্যন্ত কুল হয়। ব্রিটেনের নিকট হইতে ভারতের উদ্ভূত পাওনা টাকা জমা হইতে থাকে।

পঞ্চমত, ভারতবাসীদের হাতে যে ডলার এবং স্টার্লিং বাবদ অগ্ন্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চিত ছিল স্টার্লিং জমা রাখিয়া তাহা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ব্রিটেনের এই দেনা পরিশোধের প্রস্ন উঠে। ক্ষমতাস্ব অধিষ্ঠিত রক্ষণশীল দল নানা অজুহাত দেখাইয়া ভারতের এই পাওনা পরিশোধ করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ করে। তাহারাই এই যুক্তি দেখায় যে, জাপানী আক্রমণ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্য ব্রিটেনকে বহু ব্যয় করিতে হইয়াছে, সুতরাং এই পাওনার একাংশ ভারতের বহন করা উচিত। কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দ বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, ভারত ঐ যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই, সুতরাং ভারতের যুদ্ধব্যয়ভার বহন করিবার কোন প্রস্নই উঠে না।

বুটেন আরও যুক্তি দেখায় যে, ভারত সরকার উচ্চমূল্যে মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিকে দ্রব্য সরবরাহ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের নেতৃবৃন্দ প্রমাণ করেন যে, নিয়ন্ত্রিত মূল্যেই দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হইয়াছিল। সুতরাং মূল্য বেশি লওয়ার ফলে স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ বৃদ্ধির যুক্তি অবাস্তব। ভারতের গ্রায় অল্পমত দেশ প্রতিরক্ষা খাতে যুদ্ধকালীন সময়ে এরূপ ব্যয় বৃদ্ধি করে যে, অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম হয়। ১৯৪৪-৪৫ সালে ভারতের যুদ্ধব্যয় ৪৫০ কোটি টাকা হয়। ভারতের গ্রায়সম্পত্ত, স্টার্লিং পাওনা অস্বীকার করা হইলে ভারতীয় অর্থনীতির যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কষ্টসাধ্য হইবে। আরও বলা হয় যে, প্রতি বৎসর ভারতকে ১০ কোটি স্টার্লিং দিলে বুটেনের জাতীয় আয় মাত্র ১ শতাংশ হ্রাস পাইবে।

যাহা হউক, ইতিমধ্যে বুটেনে মন্ত্রিসভার পরিবর্তন ঘটে এবং শ্রমিকদল সরকার গঠন করেন। নূতন সরকার ভারতের স্টার্লিং পাওনা স্বীকার করেন এবং ঘোষণা করেন যে, কিস্তিতে ভারতের স্টার্লিং পাওনা মিটানো হইবে। ১৯৪৭ সালের চুক্তি অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডে এক নম্বর হিসাব এবং দুই নম্বর হিসাব নামে দুইটি হিসাব খোলে। এক নম্বর হিসাব হইল চলতি হিসাব এবং দুই নম্বর হিসাব হইল আটক হিসাব (Blocked Account)। এক নম্বর হিসাব হইতে প্রয়োজনানুসারে স্টার্লিং উঠাইয়া লওয়া চলিবে কিন্তু দুই নম্বর হিসাবে যে স্টার্লিং জমা থাকিবে তাহা ব্রিটিশ সরকারের সম্মতি ব্যতীত উঠানো যাইবে না। ১৯৫১ সালে একটি চুক্তি সম্পাদন করিয়া স্থির হয় যে, ১৯৫৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত দুই নম্বর হিসাব হইতে এক নম্বর হিসাবে ৩৫০০ কোটি পাউণ্ড স্থানান্তরিত করা চলিবে।

প্রথম পরিকল্পনাকালে মোট ঘাটতি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৫৩২ কোটি টাকা। ইহার সমস্তটাই স্টার্লিং পাওনা হইতে মিটানো হয় বলিয়া ঘাটতি ব্যয় হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করিবার লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করা হইলেও প্রকৃত ঘাটতি ব্যয় হয় ২৪৮ কোটি টাকা। ইহা স্থির হয় যে, মাত্র ২০০ কোটি টাকা স্টার্লিং পাওনা হইতে মিটানো হইবে।

১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রভূত ঘাটতি দেখা দেয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ২০০ কোটি টাকার কিছু বেশি স্টার্লিং তুলিতে হয়। ১৯৫৬ সালের জানুয়ারী মাসে আমাদের স্টার্লিং জমার পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৪০ কোটি টাকা, ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে উহা হ্রাস পাইয়া ৫৩৩ কোটি টাকা হয় এবং ১৯৫৭ সালে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। ১৯৫৮ সালের মার্চের শেষে স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ হয় ২৬৭ কোটি টাকা। ১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে যখন তৃতীয় পরিকল্পনা আরম্ভ হয়, তখন স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩৬ কোটি টাকা। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রারম্ভে স্টার্লিং পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র ৮৬ কোটি টাকা। বর্তমান আইনানুসারে সরকার ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র (স্টার্লিং সমেত) জমা রাখিয়া কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবে।

১৯৪৯ সালের মুদ্রামান হ্রাস (Devaluation of the Indian Rupee in September, 1949) : ১৯৪৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে ভারতীয় টাকার মূল্য ৩০.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়। টাকার ডলার মূল্য ৩০.২২৫ সেন্ট হইতে হ্রাস পাইয়া ২১ সেন্টে আসিয়া দাঁড়ায় এবং টাকার স্বর্ণমূল্য ০.২৬৮৬২১ গ্রাম হইতে হ্রাস পাইয়া ০.১৮৬৬২১ গ্রাম হয়। ঐ সময় স্টার্লিং মূল্য একই অনুপাতে হ্রাস পাওয়ায় টাকার সহিত স্টার্লিং-এর বিনিময় হার (১ টাকা = ১ শি. ৬ পে.) অক্ষুণ্ণ থাকে।

যুদ্ধোত্তরকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বৃটেনের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকে। ইহার ফলে বৃটেনের স্বর্ণ এবং ডলার রিজার্ভ হ্রাস পাইতে থাকে। মুদ্রামান হ্রাস না করিয়া বৃটেনের পক্ষে ডলার ঘাটতি মিটাইবার বা রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বৃটিশ শিল্পের তুলনায় মার্কিন শিল্পের উৎপাদন দক্ষতা অধিক হওয়ায় কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। এরূপ অবস্থায় বৃটেনের পক্ষে মুদ্রামান হ্রাস করা ব্যতীত অত্র কোন উপায় ছিল না। বাধ্য হইয়া ১৯৪৯ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃটেন ডলারের হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস করে। বৃটেন পাউণ্ডের বিনিময় হার হ্রাস করায় স্টার্লিং এলাকার সহিত ব্যবসায়-বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্ত ভারতও টাকার মূল্য ৩০.৫ শতাংশ হ্রাস করে।

যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক মূল্যস্ফীতির বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের রপ্তানি হ্রাস এবং আমদানি বৃদ্ধি পাইতেছিল। উপরন্তু এই সময় তীব্র খাণ্ডসঙ্কট দেখা দেওয়ায় বাহির হইতে খাণ্ডশস্ত্র আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে ভারত বাধ্য হয়। যুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ চাহিদা মিটানোর জন্ত ভোগ্যপণ্যের আমদানি বৃদ্ধি পায়, এবং শিল্পের জন্ত যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি পায়। এই সকল কারণে আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে আরম্ভ করে। রপ্তানি বাড়াইবার জন্ত এবং মুদ্রামান হ্রাসকারী আমাদের স্টার্লিং প্রতিদ্বন্দ্বীগণ যাহাতে আমাদের অর্থের বিনিময়ে তাহাদের বাণিজ্য বৃদ্ধি করিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে মুদ্রামান হ্রাস করা হয়। যদি মুদ্রামান হ্রাস করা না হইত তাহা হইলে ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র, সিংহলের চা, দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাংগানিজ, পূর্ব আফ্রিকার বাদাম, এবং ডাণ্ডির পাটজাত দ্রব্য ভারতের তুলনায় সুবিধাজনক বাজার পাইত। সেইজন্ত তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী জন মাথাই বলেন যে, বৃটেন ও স্টার্লিং এলাকার অগ্রাঙ্ক দেশ মুদ্রামান হ্রাস করায় ভারতকেও বাধ্য হইয়া উহাদের পথ অনুসরণ করিতে হইল।

পাকিস্তান মুদ্রামান হ্রাস করে নাই, কারণ সে মনে করিয়াছিল যে, মুদ্রামান হ্রাস না করিয়া সে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করিবে। পাকিস্তান এই সময় আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য না হওয়ায় তাহার পক্ষে এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হওয়ায় তাহার পক্ষে কোন একক নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। পাকিস্তান মুদ্রামান হ্রাস না করার ফলে তাহার অর্থনীতিতে বিপর্যয়

দেখা দেয় এবং পরিশেষে ১৯৫৫ সালের ৩১শে জুলাই পাকিস্তানও তাহার মুদ্রামান হ্রাস করিতে বাধ্য হয়।

মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ডলার অঞ্চলে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের উন্নতি ঘটে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৮৩.৪৫ কোটি টাকা, ১৯৪৯-৫০ সালে উহা হ্রাস পাইয়া ১১৮.৮৯ কোটি টাকা হয় এবং ১৯৫০-৫১ সালে উহা আরও হ্রাস পাইয়া ২২.০১ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। মুদ্রামান হ্রাসের ফলেই যে ইহা সম্ভব হইয়াছিল ইহা অনস্বীকার্য। অবশ্য ১৯৫১-৫২ সালে ঘাটতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২০.৯৬৩ কোটি টাকা হয়।

এই সময় উচ্চ মূল্য এবং পাকিস্তান হইতে কাঁচামাল পাওয়ার অনিশ্চয়তা থাকায় পাট ও তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। পাট এবং তুলা উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে স্বয়ংনির্ভরশীলতার অভিধান চালানো হয় তাহার ফলে ১৯৫২ সাল হইতে ১৯৫৪ সালে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। খাদ্য ও কাঁচামালের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দরুন প্রথম পরিকল্পনার শেষ পর্ধ্যায় ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সে ঘাটতি হ্রাস পায়। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী দ্বিতীয় পরিকল্পনা চালু করিবার কিছুকাল পরেই আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের চরম অবনতি ঘটে এবং অবশেষে ১৯৬৬ সালের জুন মাসে পুনরায় ভারত মুদ্রামান হ্রাস করিতে বাধ্য হয়।

১৯৬৬ সালের জুন মাসের মুদ্রামান হ্রাস (Devaluation of the Indian Rupee in June, 1966) : ১৯৬৬ সালের জুন মাসে দ্বিতীয়বার টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনাকালে আমাদের বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থার ক্রমাগত অবনতি ঘটিতে থাকে আর ইহার দরুন বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট তীব্রতর হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরে (১৯৬৫-৬৬) ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮৬৫ কোটি টাকা আর আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৯০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ৫২৫ কোটি টাকার গ্রাঘ ঘাটতি হয়। অত্যাধিক বলা যায় যে, আমাদের রপ্তানি-মূল্যের দ্বারা আমদানি বিলের ৬২ শতাংশ পূরণ হয়। আর বাকীটা সাহায্য, আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ঋণগ্রহণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস করিয়া পূরণ করা সম্ভব হয়। ভারতীয় পরিকল্পনা রচয়িতাগণ চাহিয়াছিলেন আমদানি নিয়ন্ত্রণ এবং রপ্তানি সাহায্য দান করিয়া উচ্চমান বিনিময় হার (Overvalued Exchange Rate) রক্ষা করিতে। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে মৌলিক ভারসাম্যহীনতা থাকায় এইরূপ কৃত্রিম অবস্থা

কারণ অধিক দিন চলিতে পারে না। শুধুমাত্র বাণিজ্য ব্যালান্সেই ঘাটতি হয় নাই, মূল্যস্তরও ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে পাইকারী দামের সাধারণ সূচক ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং তৃতীয় পরিকল্পনাকালে উহা ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ সালে দশ বৎসরের তুলনায় সাধারণ মূল্যস্তর ৮০ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯৪৯ সালের পর টাকার সরকারী মূল্যহার অপরিবর্তিত ছিল।

অগ্রাণু দেশে মূল্যান্তর এরূপ অধিক পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নাই সুতরাং ইহার দরুন আমাদের রপ্তানিবাজার ক্রমশই সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছিল। আভ্যন্তরীণ মুদ্রাস্ফীতির দরুন উৎপাদন দেশীয় চাহিদা মিটাইবার কাজে নিয়োজিত হয় এবং মূল্য বৃদ্ধির ফলে রপ্তানির প্রতিযোগিতার ক্ষমতা হ্রাস পায়। এই সঙ্গে আমদানির জগু চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং উহা পূরণ করিবার জগু অসং উপায়ের আশ্রয় লওয়া হয়। একাধিকবার আমদানি শুদ্ধ বৃদ্ধি করা হয়। রপ্তানিকারীদের আর্থিক প্রেরণা দিবার উদ্দেশ্যে রপ্তানি অনুপ্রেরণা পরিকল্পনার সম্প্রসারণ করা হয়। রপ্তানির জগু এক নতুন ট্যাক্স ক্রেডিট সার্টিফিকেট পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে সাহায্যদান এবং ট্যাক্স ক্রেডিট দিবার দরুন সরকারী তহবিলের উপর বিশেষ চাপ পড়ে। কিন্তু এই সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রপ্তানির পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই।

সাময়িক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া রপ্তানি সম্প্রসারণ করা সম্ভব ছিল না বলিয়া সরকার ১৯৬৬ সালের ৫ই জুন তারিখে টাকার মূল্য ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করেন।

মুদ্রামান হ্রাসের ফলে আন্তর্জাতিক লেনদেনে একটি ভারতীয় টাকার মূল্য হইল ০.১১৮৫১৬ গ্রাম স্বর্ণ, পূর্বে উহা ছিল ০.১৮৬৬২১ গ্রাম স্বর্ণ। একটি বিনিময় হার মার্কিন ডলারের বিনিময়ে এখন ৭.৫০ টাকা (পূর্বহার ছিল ১ ডলার = ৪.৭৬ টাকা) এবং একটি স্টার্লিং পাউণ্ডের বিনিময়ে ২১ টাকা পাওয়া যাইবে (পূর্বে উহার হার ছিল ১ পাউণ্ড = ১৩.৩৩ টাকা)।

ভারতীয় অর্থনীতি যাহাতে মুদ্রামান হ্রাসের সুবিধা লাভ করিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে শিল্পের কাঁচামাল এবং উপাদানের ক্ষেত্রে আমদানি নীতি উদার করা হয়। যদিও আমদানির মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু আমদানি শুদ্ধ হ্রাস করার দরুন কিছু সুবিধা পাওয়া যাইবে। অশোধিত তৈলের উপর আমদানি শুদ্ধ রদ, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের উপর আমদানি শুদ্ধ হ্রাস এবং মুদ্রামান হ্রাসের পূর্ব দামে শিল্প এবং ভোগকারীদের নিকট উহা সরবরাহের দায়িত্ব সরকার ঘোষণা করেন। আশা করা হইয়াছিল যে, কাঁচামাল এবং উপাদানের আমদানির ক্ষেত্রে উদার নীতি অনুসরণ করায় এবং আমদানিকৃত খাদ্যশস্য, সার, কেরোসিন ও ডিজেল তেলের উপর সাহায্য দান করায় মূল্যান্তর বৃদ্ধি পাইবে না। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূরণ হয় নাই।

মুদ্রামান হ্রাসের ফলে রপ্তানি সম্প্রসারিত হইবে বলিয়া রপ্তানি কর ক্রেডিট পরিকল্পনা তুলিয়া লওয়া হয়। আমদানি শুদ্ধ হ্রাস করায় যে ক্ষতি হইবে তাহা পূরণ করিবার জগু পাটজাত দ্রব্য, চা, কফি, গোলমরিচ, অভ্র, কাঁচা তুলা, চামড়া, নারিকেলকাতার উপর রপ্তানি শুদ্ধ ধার্য করা হয়।

সুবিধা মুদ্রামান হ্রাসের প্রত্যাশিত সুবিধাগুলি আলোচনা করা হইল :

প্রথমত, সরকার মনে করিয়াছিলেন যে, বিভিন্ন প্রকার রপ্তানি সাহায্যের পরিবর্তে মুদ্রামান হ্রাসের দ্বারা রপ্তানির প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি করিলে উহা অধিকতর

স্থায়ী হইবে। মুদ্রামান হ্রাসের দরুন রপ্তানি শিল্পে বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে দেশের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়ত, মুদ্রামান হ্রাসের পর আমদানি সম্পর্কে যে উদার নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে আমদানিকৃত কাঁচামালের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহা উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে মুদ্রাস্ফীতির চাপ প্রতিহত হইবে এবং অন্তঃস্ফুরের মাধ্যমে যে অধিকতর অর্থ সংগ্রহ করা যাইবে তাহা উন্নয়নের কাজে লাগিবে।

তৃতীয়ত, মুদ্রামান হ্রাসের দরুন মুনাফা বিদেশে পাঠানো এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ-কারীর মূলধন এবং রপ্তানি প্রদানের ভার হ্রাস পাইবে।

চতুর্থত, মুদ্রামান হ্রাসের ফলে স্বর্ণের চোরা চালান প্রভৃতি সমাজবিরোধী কার্যকলাপ হ্রাস পাইবে।

পঞ্চমত, মুদ্রামান হ্রাসের পর আমদানিকৃত কাঁচামালের বর্ধিত প্রবাহের দরুন শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা পরিপূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। মুদ্রামান হ্রাসের ফলে ভারত রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারিবে এবং চোরা পথে বৈদেশিক মুদ্রার বহির্গমন বন্ধ হইবে। মুদ্রামান হ্রাসের দরুন ঋণের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে কিন্তু বৈদেশিক সাহায্যের মূল্য (ভারতীয় টাকার হিসাবে) বৃদ্ধি পাইবে—এক খাতে লাভ অত্র খাতে লোকসানের সহিত কাটাকাটি হইয়া যাইবে। পরিশেষে মনে রাখা দরকার যে, যাহারা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে, মুদ্রামান হ্রাস তাহাদের উপর একধরনের কর এবং যাহারা তাহা অর্জন করে মুদ্রামান হ্রাস তাহাদের উপর এক ধরনের সাহায্য (Subsidy)।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, মুদ্রামান হ্রাস আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের ত্রায় মুহূর্তমধ্যে কোন বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। সাফল্যের অনেকখানি নির্ভর করে এই হাতিয়ারটির প্রয়োগ কৌশলের উপর।

মুদ্রামান হ্রাসের সর্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হইল যে, ইহা মুদ্রাস্ফীতিতে প্রেরণা যোগাইবে। আমদানীকৃত খাদ্য ও সারের উপর সাহায্য দান করিয়া এবং অশোধিত তৈলের উপর আমদানি শুল্ক হ্রাস করিয়াও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করা যাইবে না। শিল্পের কাঁচামাল এবং উপাদানের আমদানি নীতি উদার করা সত্ত্বেও প্রত্যাশিত শিল্পোন্নয়ন ঘটে নাই।

১৯৬৬-৬৭ সালের ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের পর্যালোচনা হইতে দেখা গিয়াছে যে, টাকার মূল্য হ্রাসের প্রকৃত উদ্দেশ্যই পূরণ হয় নাই—ইহা রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে পারে নাই। ১৯৬৬ সালে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিবর্তে রপ্তানি হ্রাস পায়। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল হইতে ডিসেম্বর এই নয়মাসে ভারতের মোট রপ্তানি আয় হইয়াছিল ১১৫১ মিলিয়ন ডলার কিন্তু ১৯৬৫ সালের ঐ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ছিল ১২৬৩ মিলিয়ন ডলার অর্থাৎ ১২২ মিলিয়ন ডলার রপ্তানি হ্রাস পায়।

ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পাট, এবং চায়ের ক্ষেত্রে নতুন রপ্তানি শুষ্ক মুদ্রামানহাসের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ইহা ব্যতীত আমাদের প্রতিযোগিতা তহাদের রপ্তানি শিল্পে সাহায্যদানের নীতি গ্রহণ করে। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, প্লাস্টিক, কাগজ এবং রাসায়নিক দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমাদের তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় এবং ভারতীয় দ্রব্যের নিম্নমানের দরুন আমরা বিদেশের বাজারে বিক্রয় বাড়াইতে পারি নাই।

মুদ্রামান হ্রাস দীর্ঘস্থায়ী সুফল প্রদান করিতে পারে না। প্রথ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ সরোজকুমার বসুর মতে ভারতের রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্যের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক বলিয়া মুদ্রামান হ্রাসে ভারতের কোন সুবিধা হইবে না, উপরন্তু ইহার সিদ্ধান্ত

ফলে আভ্যন্তরীণ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং টাকার আন্তর্জাতিক খ্যাতি বিনষ্ট হইবে। প্রথ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ গ্যাডগিলের মতে বহিঃশক্তির প্রভাবে ভারত টাকার মূল্য হ্রাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ডাঃ লোকনাথনের মতে টাকার মূল্য হ্রাসের ফলে আমদানিকৃত দ্রব্যসামগ্রী এবং আমদানিকৃত কাঁচামাল ও উপাদানের উপর নির্ভরশীল দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া যাইবে এবং ইহার ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি অবশ্যস্বাবী। মোরারজী দেশাইও বলিয়াছিলেন যে, এই হঠকারিতাপূর্ণ কাজের দরুন শুধু টাকার মূল্যই হ্রাস পায় নাই, ভারতের মর্যাদাও হ্রাস পাইয়াছে।

ভারতের বর্তমান মুদ্রামান ব্যবস্থা (Present Monetary Standard of India) : আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ভারতে স্টার্লিং বিনিময় মান (Sterling Exchange Standard) প্রচলিত ছিল এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বহিমূল্য রক্ষা করিত। স্টার্লিং-এর হিসাবে টাকার মূল্য ছিল ১ টাকা = ১ শিং ৬ পেঃ। ১৯৪৭ সালের মার্চ হইতে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হয়। অর্থভাণ্ডারের সকল সদস্য দেশকেই তাহার মুদ্রার স্বর্ণ বিনিময় হার ঘোষণা করিতে এবং বজায় রাখিতে হয়। ভারতের একটি টাকার মূল্য ছিল ০.২৬৮৬৯১ গ্রেন বিশুদ্ধ স্বর্ণ। স্বর্ণসমতা হার এরূপভাবে স্থির করা হয় যাহাতে পূর্বের ত্রায় এক টাকা ১ শিং ৬ পেন্সের সমান হয়। এই ব্যবস্থার ফলে টাকাকে যে কোন বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরিত করা সম্ভবপর হইবে। এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক স্টার্লিং ব্যতীত অগ্রাণ্য বৈদেশিক মুদ্রা রাখে কিন্তু ১৯৪৭ সালের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইনানুসারে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ সম্প্রসারিত হওয়ার দরুন টাকা ডলার অথবা অগ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর করা সম্ভব নয়।

ভারতের বর্তমান যে মুদ্রাব্যবস্থা তাহাকে স্বর্ণসমতামান (Gold Parity Standard) বলা হয়। ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হওয়ায় ভারতীয় স্বর্ণসমতামান টাকা একটি স্বাধীন মুদ্রায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

বাণিজ্য ব্যালান্স ক্রমাগত প্রতিকূল হইতে থাকায় ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারত

টাকার মূল্য ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করে। নূতন বিনিময়হার হইল $\text{₹} 1 = ২১$ টাকা এবং ১ ডলার = ৭.৫০ টাকা। বর্তমানে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক টাকার বহির্মূল্য ১টা = ১শি. এই হারে বজায় রাখিয়াছে। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সম্মতি লইয়া ইহা করা হইয়াছে।

বর্তমানে কাগজী মুদ্রার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ভারত সরকারের মন্ত্রীদপ্তর এক টাকার নোট প্রচলন করে; আর অত্যাশ্চর্য্য সকল প্রকার নোট প্রচলনের দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের। ১৯৩৪ সালের আইনানুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট প্রচলনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতি (Proportional Reserve System) অনুসরণ করিত। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোট প্রচলিত কাগজী মুদ্রার ৪০ শতাংশ স্বর্ণ এবং স্টার্লিং-এ জমা রাখিত আর বাকী ৬০ শতাংশ সরকারী ঋণপত্র, ছপ্তি এবং রূপার মুদ্রায় জমা রাখিত। অবশ্য মোট স্বর্ণের মূল্য ৪০ কোটি টাকার কম হইতে পারিবে না। ১৯৪৭ সালে ভারত আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডারের সদস্য হইবার পর কাগজী মুদ্রার জামিন হিসাবে স্টার্লিং ঋণপত্র ব্যতীত অত্যাশ্চর্য্য বিদেশী মুদ্রা ও ঋণপত্র গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণে চরম অবনতি দেখা দিলে ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করিয়া আনুপাতিক রিজার্ভ পদ্ধতির পরিবর্তে সর্বনিম্ন রিজার্ভ পদ্ধতি সর্বনিম্ন রিজার্ভ পদ্ধতির (Minimum Reserve Method) প্রবর্তন করা হয়। এই ব্যবস্থা অনুসারে ৪০০ কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণপত্র ও মুদ্রা এবং ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ এই মোট ৫১৫ কোটি টাকা জমা রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক খুশিমত কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবে। বিশেষ প্রয়োজন হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বৈদেশিক মুদ্রা ও ঋণপত্রের রিজার্ভ ৪০০ কোটি টাকা হইতে কমাইয়া ৩০০ কোটি করিতে পারিবে। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয় সংশোধন আইন দ্বারা এই আইনের সংশোধন করা হয়। স্থির হইয়াছে যে, ২০০ কোটি টাকার স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন পরিমাণ কাগজী মুদ্রা প্রচলন করিতে পারিবে। এই ২০০ কোটি টাকার মধ্যে অন্ততঃ ১১৫ কোটি টাকা স্বর্ণ-মুদ্রায় জমা রাখিতে হইবে। কলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ৮৫ কোটি টাকায় নামিয়া আসে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাঙ্ক এবং ভারত (IMF, IBRD and India) : ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অর্থভাণ্ডারের উদ্দেশ্য হইতেছে (১) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রসারে সহায়তা করিয়া সদস্য দেশগুলির জাতীয় আয় বৃদ্ধি করা, (২) বিনিময় হারে স্থায়িত্ব রক্ষা করা এবং প্রতিযোগিতামূলক মুদ্রামান পরিহার করা, (৩) বহুমুখী লেনদেন ব্যবস্থা (Multilateral System of Payments) প্রতিষ্ঠিত করা, এবং (৪) ভবিষ্যতে বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ

শিথিল করা। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের নিয়মানুসারে স্বর্ণকে সাধারণ মুদ্রামান হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক দেশের মুদ্রাকেই স্বর্ণের সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। প্রত্যেক সদস্য দেশকে স্বর্ণ অথবা ডলারের হিসাবে তাহার মুদ্রার মূল্য ঘোষণা করিতে হয়। প্রত্যেক সদস্য দেশ তাহার মোট দেয় জমার ২৫% স্বর্ণ দিয়া জমা রাখিবে আর বাকী ৭৫% নিজ দেশের মুদ্রায় জমা দিবে।

কোন দেশ অর্থভাণ্ডারের বিনা অনুমতিতেই নির্দিষ্ট বিনিময় হারের ১০ শতাংশ পর্যন্ত পরিবর্তন করিতে পারে। যদি আন্তর্জাতিক লেনদেন হিসাবে “মৌলিক ভারসাম্য-হীনতা” দেখা দেয় তাহা হইলে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের অনুমতি লইয়া কোন সদস্য দেশ বিনিময় হারে ১০% এর অধিক পরিবর্তন করিতে পারিবে।

স্বর্ণমানের তুলনায় এই ব্যবস্থা শ্রেয়, কারণ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকিলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার অপরিবর্তিত থাকে কিন্তু আভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির স্থায়িত্ব রক্ষা করা যায় না। আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার যে বিনিময়হার প্রবর্তন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহাকে “নিয়ন্ত্রিত আন্তর্জাতিক বিনিময় মান” (Controlled International Exchange Standard)

বলে; ইহা যুগপৎ আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সদস্য হইয়া ভারত বিশেষভাবে লাভবান হইয়াছে। ১৯৪৯ সালে মুদ্রামান হ্রাসের পূর্বে ভারত তাহার বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য অর্থভাণ্ডার হইতে ৯ কোটি ডলার ঋণ পায়। ১৯৫২ সালে পুনরায় বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাটতি পূরণ করিবার জন্য ভারত আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে সাহায্য পায়। ১৯৫৭ সালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাস্ফীতি চরমে উঠিলে অর্থভাণ্ডার ভারতকে ২০ কোটি ডলার ঋণ মঞ্জুর করে।

ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে আরও সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা চিন্তা করিতে হইলে এই সংস্থার ধারাগুলি জানা প্রয়োজন। কোন সদস্য দেশ তাহার মোট এক বৎসরের প্রাপ্য অংশের ২৫ শতাংশ বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে। অবশ্য বর্তমানে কোন সদস্য দেশ তাহার প্রাপ্য অংশের ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিতে পারিবে। মোট ক্রয়ের সর্বোচ্চ সীমা সংশ্লিষ্ট সদস্য দেশের দেয় অংশের ২০০% এর অধিক হইবে না। এই হিসাবানুসারে ভারতের মোট সীমা হইল ৪২৭ মিলিয়ন ডলার। ১৯৫৭ সালে ভারত ২০০ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় করিয়াছে। সুতরাং ভারত এখন আর মাত্র ২২৭ মিলিয়ন ডলার বা ১০৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা কিনিতে পারিবে।

কিন্তু বর্তমানে আরও ঋণ গ্রহণের সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে। ১৯৫৮ সালে দিল্লীতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের যুক্ত সম্মেলনে ভারতের গ্রায অল্পমত দেশগুলির অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব ও উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে

আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সদস্য দেশগুলির 'কোটার' পরিমাণ ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হইবে বলিয়া স্থির হয় এবং ইহার এক-চতুর্থাংশ স্বর্ণের আকারে দিতে হইবে। ফলে ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে ভারত অর্থভাণ্ডারে তাহার কোটা আরও ২০০ মিলিয়ন ডলার বাড়াইবার সিদ্ধান্ত করে। ইহার এক চতুর্থাংশ স্বর্ণে এবং বাকী হস্তান্তর-অযোগ্য, সুদবিহীন টাকার ঋণপত্রে (non-interest bearing, non-negotiable rupee securities) রাখা হয়। এই ব্যবস্থার ফলে ভারতের আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে অধিকতর সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার বিশেষ অবনতি ঘটিলে অর্থভাণ্ডার ভারতকে ১৯৬২ সালের জুলাই হইতে ১৯৬৩ সালের জুনের মধ্যে ১২৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দান অনুমোদন করে। পুনরায় ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ভারত অর্থভাণ্ডার হইতে ২০০ মিলিয়ন ডলার সঙ্কটকালীন ঋণ পায়।

১৯৬৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত অর্থভাণ্ডারের নিকট ভারতের মোট দায়ের পরিমাণ ছিল ৩২৫ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে ভারত তাহার 'কোটা' ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে সিদ্ধান্ত করে। কোটা বৃদ্ধির দরুন সদস্য দেশগুলি অর্থভাণ্ডার হইতে অধিক সাহায্য পাইবে। ভারতের কোটার পরিমাণ ৬০০ মিলিয়ন ডলার হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭৫০ মিলিয়ন ডলার হয়। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থার অবনতি রোধ না হওয়ায় ১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারত সরকার টাকার মূল্য ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করে। অর্থভাণ্ডার ভারতের এই মুদ্রামান হ্রাস অনুমোদন করে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ২৮২ কোটি টাকা, ১৯৬৬ সালের নভেম্বর মাসে উহা হ্রাস পাইয়া ২৭৬ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মুদ্রামান হ্রাসের পরও অবস্থার কোনই উন্নতি হয় নাই এবং ভারত ১৯৬৬ সালের এপ্রিল-নভেম্বরে সমগ্র সঙ্কটকালীন সাহায্য ১৮৭.৫ মিলিয়ন ডলার অর্থভাণ্ডার হইতে গ্রহণ করে। বর্তমানে ভারত অর্থভাণ্ডারের তৃতীয় বৃহত্তম ঋণগ্রহণকারী দেশ। অর্থভাণ্ডার হইতে ভারতের বর্তমানে মোট ঋণের পরিমাণ ৪২৫.১ মিলিয়ন ডলার।

আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (International Bank for Reconstruction and Development), সংক্ষেপে বিশ্বব্যাঙ্ক নামেই পরিচিত।

ইহা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দীর্ঘ-বিশ্বব্যাঙ্ক ও ভারত

মেয়াদী বৈদেশিক বিনিয়োগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জগু প্রতিষ্ঠিত হয়।

১০,০০০ মিলিয়ন ডলার অনুমোদিত মূলধন লইয়া এই ব্যাঙ্ক তাহার কাজ শুরু করে কিন্তু ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহার মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ২১,০০০ মিলিয়ন ডলার হয়।

এই ব্যাঙ্ক ইউরোপের যুদ্ধবিধ্বস্ত শিল্পসমূহের পুনর্গঠন এবং অনুরূপ দেশসমূহের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ করিয়াছে। ১৯৫২ সালে এশিয়ার দেশগুলিতে এই ব্যাঙ্ক ১০০০ মিলিয়ন ডলার ঋণদান করে। ১৯৬৬ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ভারত এই ব্যাঙ্ক হইতে ১০০০ মিলিয়ন ডলারের অধিক ঋণ পাইয়াছে। ভারত এই ব্যাঙ্ক হইতে সর্বাধিক পরিমাণ ঋণ পাইয়াছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক বিশেষ কোন প্রকল্পকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে ঋণদান করে—ইহা সাধারণ উদ্দেশ্যে ঋণদান করে না। বর্তমানে ইহা সদস্য দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে ঋণদান করিতেছে। বৈহৃতিক শক্তি ও পরিবহণ প্রকল্পের জন্ত এই ব্যাঙ্ক প্রভূত ঋণ দিয়াছে, কারণ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্রুত সম্প্রসারণ ইহাদের উপর নির্ভর করে। অবশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। এই কারণে ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষেত্রে পরিপূরক ঋণও দিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে রেলপথের উন্নয়নের জন্ত দামোদর উপত্যকার শিল্পাঞ্চলে ঋণদান করা হয়। ঐ অঞ্চলে বেসরকারী উদ্যোগে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প সম্প্রসারণের জন্ত ঋণদান করা হয়। ইহা ব্যতীত কৃষি ও শিল্পোন্নয়নের জন্ত বহুমুখী পরিকল্পনাগুলিকে ঋণদান করা হইয়াছে।

১৯৫৬ সালের ২০শে জুলাই তারিখে আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই কর্পোরেশন একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্বব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত। এই প্রতিষ্ঠানটি অনুরূপ দেশের বেসরকারী উদ্যোগকে সরকারী গ্যারান্টি আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন ও ভারত ব্যতিরেকেই সাহায্য করিবে। ১৯৬২ সালের জুনমাসে কর্পোরেশনের মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২০.৭ মিলিয়ন ডলার। ১৯৬৫ সালের মধ্যভাগে কর্পোরেশন ৩২টি দেশে ১৩৭ মিলিয়ন ডলার ঋণদান করে। ইহার মোট বিনিয়োগের অর্ধাংশ দরিদ্র দেশগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।

আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন এবং বিশ্বব্যাঙ্ক দুইটি পৃথক প্রতিষ্ঠান কিন্তু তাহারা এক-যোগে কাজ করে। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান। এই কর্পোরেশন প্রত্যক্ষভাবে উন্নত এবং অনুরূপ দেশগুলির বেসরকারী শিল্প উদ্যোগে মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে। বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে সরকারী গ্যারান্টির প্রয়োজন হয় কিন্তু কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ লইতে হইলে উহা প্রয়োজন হয় না। কর্পোরেশনের বিনিয়োগ ঋণমূলধন এবং শেয়ার মূলধনের মধ্যবর্তী। অর্থাৎ এই ঋণের জন্ত সুদ দিতে হয় এবং শিল্পোদ্যোগের মুনাফা ও সম্প্রসারণে অংশ-গ্রহণের কিছু অধিকার বলবৎ হয়। কর্পোরেশনের বিনিয়োগ তিন ধরনের তিনটি ধারায় চলে। প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে কর্পো-রেশন শুধুমাত্র সুদ আদায় করে। এই ঋণ আট দশ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, যে প্রতিষ্ঠানে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়

তাহার লভ্যাংশ পাওয়ার অধিকার কর্পোরেশনের থাকিবে। তৃতীয়ত, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের 'স্টক' কিনিবার অথবা বিনিয়োগকে স্টকে রূপান্তরিত করিবার অধিকার কর্পোরেশনের থাকিবে। আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ভারত ও অগ্রান্ত অনুরূপত দেশের বেসরকারী শিল্পোদ্যোগ লাভবান হইয়াছে, কারণ সরকারী গ্যারাণ্টি ব্যতিরেকেই ইহার কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ পাইতে পারে। ১৯৬১-৬২ সালে কর্পোরেশনের ধারার সংশোধনের ফলে কর্পোরেশন বর্তমানে শেয়ার-মূলধনে বিনিয়োগ করিতে এবং শেয়ার আণ্ডাররাইট করিতে পারে। কর্পোরেশন তাহার কার্যকালের প্রথম ছয় বৎসরে দুইবার ভারতকে ঋণদান করিয়াছে। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কর্পোরেশন কট্টিক সোডা কারখানা স্থাপনের জ্ঞাত জয়ন্তী কেমিক্যাল কোম্পানীকে ঋণদান করে। ১৯৬৬ সালের শেষ পর্যন্ত কর্পোরেশন ভারতকে ১১.২ মিলিয়ন ডলার ঋণদান করিয়াছে।

১৯৬০ সালের নভেম্বর হইতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এসোসিয়েসন (International Development Association) নামে আর একটি নূতন সংস্থা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কাজ আরম্ভ করিয়াছে। ইহা বিশ্বব্যাঙ্কের অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠান এসোসিয়েসন এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে ইহারও প্রেসিডেন্ট।

অনুরূপত দেশগুলির উন্নয়নমূলক সাহায্যের অধিকতর ভার শিল্পোন্নত দেশগুলির গ্রহণ করা উচিত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ধারণার ফলে উন্নয়ন এসোসিয়েসনের জন্ম হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের সদস্যগণ এই এসোসিয়েসনের সদস্য হইতে পারিবে। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত সমেত ২২টি দেশ এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল এবং তাহাদের মোট প্রাথমিক চাঁদার পরিমাণ ছিল ৭৬৫ মিলিয়ন ডলার। বর্তমানে সুইডেনের অনুপূরক চাঁদার ফলে এই মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ৭৭৫ মিলিয়ন ডলার হইয়াছে। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এসোসিয়েসনের সুদবিহীন দীর্ঘমেয়াদী ঋণ উন্নতিকামী দেশগুলির নিকট বিশেষ আকর্ষণীয়। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত এই সংস্থা ২২টি দেশে ১১০০ মিলিয়ন ঋণ দান করিয়াছে। ইহার মধ্যে ৫৫ মিলিয়ন ডলার ব্যতীত সবটাই অনুরূপত দেশের উন্নয়ন প্রকল্পে নিয়োজিত হইয়াছে। ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এসোসিয়েসন ভারতকে ৮৯১ মিলিয়ন ডলার ঋণদান করিয়াছে। রেলপথ নির্মাণ, টেলি-যোগাযোগ ব্যবস্থা, জলসেচ, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি প্রকল্পে ঋণদান করা হইয়াছে। এই সংস্থার ঋণ ৫০ বৎসরের মধ্যে পরিশোধযোগ্য, ইহা সুদবিহীন কিন্তু বৎসরে ০.৭৫% সার্ভিস চার্জ বহন করিতে হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত ভারত বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে ১৪৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসর ভারত বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণের জ্ঞাত আবেদন করে এবং ২২৭ মিলিয়ন ডলার ঋণ পাইতে সমর্থ হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের পরিসংখ্যান হইতে দেখা যায় যে, এশিয়ার দেশ-গুলির মধ্যে ভারতই ব্যাঙ্ক হইতে সর্বাধিক ঋণ পাইয়াছে। ১৯৬৬ সালের ৩০ শে জুন

পৰ্যন্ত ভারত বিশ্বব্যাঙ্ক হইতে ১০০০ মিলিয়ন ডলার ঋণ পায়। সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ, উভয়েই ঋণ পায়। রেলপথ পুনর্গঠন, কৃষিউন্নয়ন, বৈদ্যুতিক শক্তি সম্প্রসারণ, বন্দর উন্নয়ন, দামোদর বহুমুখী পরিকল্পনা, এবং এয়ার-ইণ্ডিয়া ইন্টার-ন্যাশনালের জন্ত ভারত সরকার ঋণ পাইয়াছে, আর লৌহ ও ইস্পাতশিল্প সম্প্রসারণ ও বৈদ্যুতিক শক্তি সম্প্রসারণের জন্ত বেসরকারী উদ্যোগ এবং শিল্পঋণ এবং বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICIC) অর্থ সাহায্য পাইয়াছে।

অল্পমত দেশগুলির অর্থনৈতিক বিকাশসাধনে এই সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার এক বিশেষ ভূমিকা রহিয়াছে।

ভারতে যুদ্ধকালীন এবং যুদ্ধোত্তর যুগের মুদ্রাস্ফীতি (War and Post-War Inflation in India) : যোগানের তুলনায় চাহিদা অতিরিক্ত হইলেই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যদি যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহা হইলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, ভোগ, উৎপাদন এবং টাকার যোগানের মধ্যে ভারসাম্যের অভাব ঘটিলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব হইতে আমরা জানিতে পারি যে, পূর্ণনিয়োগ অবস্থা বলবৎ থাকিলে টাকার যোগান বৃদ্ধির সমান অল্পপাতে মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু পূর্ণনিয়োগ অবস্থা আসিবার পূর্বে টাকার যোগান বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি পাইবে না।

টাকার যোগান বৃদ্ধির দরুন জনগণের ক্রয়শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে যে বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি হইবে তাহা বর্ধিত উৎপাদন হইতে মিটানো যাইবে। সুতরাং বর্ধিত চাহিদার সহিত যদি বর্ধিত উৎপাদনের সৃষ্টি হয় তাহা হইলে টাকার যোগান বৃদ্ধি পাইলেও মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে না। অবশ্য পূর্ণনিয়োগ অবস্থা আসিবার পূর্বে কাঁচামাল, মূলধনী যন্ত্রপাতি অথবা দক্ষ শ্রমিকের অভাবে অর্ধ-মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিতে পারে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্যস্ফূর্ত উদ্ভব হইতে থাকে। মুখ্যত ফটকাবাজীর জন্ত এই মূল্যবৃদ্ধি ঘটে এবং ইহা প্রায় তিনমাস কাল স্থায়ী হয়। ইহার পর মূল্যস্ফূর্ত নামিয়া আসে এবং ১৯৪০ সালে দেশে শুধুমাত্র প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতি (Latent Inflation) দেখা যায়। এই প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতির ভিতর কিছু পরিমাণ অতিরিক্ত চাহিদা ছিল কিন্তু ব্যবসায়ীরা মুদ্রের পূর্বে যে সকল দ্রব্য মজুত করিয়াছিল তাহা বাজারে ছাড়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে নাই।

১৯৪১ সালে এই প্রচ্ছন্ন মুদ্রাস্ফীতি প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিতে রূপান্তরিত হয় এবং জনজীবনে উহার প্রভাব ছড়াইয়া পড়ে। ১৯৪১ সালে ভারত সরকার দেশ হইতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে প্রভূত দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ করে। ইহার ফলে জনগণের

ভোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, মূল্যবৃদ্ধির সুযোগ লইয়া কটকা এবং কালোবাজারীর সৃষ্টি হয়।

১২৪১ সালে জাপান যুদ্ধে যোগদান করিলে মুদ্রাস্ফীতি আরও বৃদ্ধি পায়। ১২৪৩ সালে মূল্যস্তর চরমে উঠে। ১২৪১-৪৩ সালে ভারতে পূর্ণনিয়োগের পূর্বকালীন খোলা মুদ্রাস্ফীতি (Open Inflation) ঘটে। এই মুদ্রাস্ফীতিকে “খোলা মুদ্রাস্ফীতি” বলা হইয়াছে, কারণ এই সময় সরকার মুদ্রাস্ফীতি দমনের জন্ত কোনরূপ কার্যসূচী গ্রহণ করেন নাই।

১২৪৩ সালের শেষের দিকে সরকার অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ এবং রেশনিং প্রথা চালু করেন। এই সময় হইতে কাগজী মুদ্রার প্রচলনও কমাইয়া ফেলা হয়, জনগণের অতিরিক্ত ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্ত সরকারী ঋণগ্রহণ কর্মসূচীকে জোরদার করা হয় এবং কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্ত ‘অধিক খাণ্ড ফলাও’ আন্দোলন প্রবর্তন করা হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ‘খোলা মুদ্রাস্ফীতি’ অবদমিত মুদ্রাস্ফীতিতে (Suppressed Inflation) রূপান্তরিত হয়।

যুদ্ধোত্তর যুগে আবার ‘খোলা মুদ্রাস্ফীতি’ প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। যুদ্ধের সময় লোকে স্বেচ্ছামূলকভাবে যে ক্রয়হ্রাস করে যুদ্ধোত্তর যুগে তাহা পুনরায় বৃদ্ধি পায়, এবং চাহিদার সহিত যোগানের সামঞ্জস্য না হওয়ায় মুদ্রাস্ফীতি যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। যুদ্ধোত্তর যুগে জনগণের বর্ধিত ক্রয় ইচ্ছার সহিত সমান হারে বিক্রয়যোগ্য ভোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি না পাওয়ার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। কাগজী মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে এই অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ১২৪৫ হইতে ১২৫০ সালের মধ্যে টাকার যোগান ৫০০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

এই সময় সরকার মজুরি হার সংশোধন এবং মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি করায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। কারণ অবদমিত মুদ্রাস্ফীতিতে ইহা নূতন ইন্ধন যোগায় এবং ইহাকে আধ খোলা মুদ্রাস্ফীতিতে রূপান্তরিত করে। ১২৪৭ সালে জাতীয় সরকার খাণ্ডদ্রব্য এবং চিনির ক্ষেত্রে বিনিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করার পরিপূর্ণ খোলা মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং মূল্যস্তর নিজস্ব গতিতে বাড়িয়া চলে।

১২৪৮ সালে সরকার পুনরায় খাণ্ড এবং বস্ত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করে এবং মুদ্রাস্ফীতি দমন করিবার জন্ত ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর মধ্যে আছে (১) ঘাটুতি বাজেট হ্রাস করা, (২) কোম্পানীর লভ্যাংশ বণ্টন সীমাবদ্ধ করা, (৩) বিলাসদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করা, (৪) ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ বৃদ্ধি করা, (৫) অতিরিক্ত মুনাফা কর বাবদ টাকা ফেরত দেওয়া বন্ধ রাখা, (৬) কর হ্রাস ও ক্ষতিপূরণ দিয়া শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করা এবং (৭) খাতে স্বয়ং নির্ভরশীলতা অর্জন করা। এই সকল কার্যসূচী গ্রহণ করার দরুন মূল্যবৃদ্ধি রোধ হয় এবং খোলা মুদ্রাস্ফীতি পুনরায় অবদমিত মুদ্রাস্ফীতিতে রূপান্তরিত হয়। ১২৪৯ সালের সেপ্টেম্বর

মাসে মুদ্রামান হ্রাসের পর মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা করিয়া সরকার একটি আট-দফা কার্যসূচী গ্রহণ করে। এই কার্যসূচীর প্রধান প্রধান ব্যবস্থাগুলি হইল (১) খাত-শস্ত্র, বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত এবং কয়লার মূল্য হ্রাস, (২) অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে কটকা এবং আগাম (Forward Market) বাজার বন্ধ করা, (৩) সরকারী ব্যয় হ্রাস করা এবং (৪) সরকারী কর্মচারীদের জ্ঞাত বাধ্যতামূলক সঞ্চয় পরিকল্পনা প্রবর্তন করা। মুদ্রাস্ফীতি-বিরোধী এই সকল কার্যক্রম গ্রহণ করায় মূল্যসূত্র হ্রাস পায় কিন্তু কোরিয়ান যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পুনরায় মূল্যসূত্রের উর্ধগতির সূত্রপাত ঘটে।

কোরিয়ার যুদ্ধকে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাভাস বলিয়া মনে করা হইয়াছিল বলিয়া দ্রব্যসামগ্রীর মজুতদারী আরম্ভ হইয়া যায় এবং মূল্যসূত্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫১ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ক্রমাগত মূল্যসূত্র বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসে মূল্যসূত্র চরম পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছায়। এই ১২ মাসের মধ্যে মূল্যসূত্র ১২০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতি দমন করিবার জ্ঞাত সরকার মুদ্রাস্ফীতি বিরোধী কার্যসূচী আরও জোরদার করে এবং ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্ক রেট ৩% হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৩৫% করা হয়। ঋণের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মজুত করার জ্ঞাত ঋণ গ্রহণের উৎসাহ হ্রাস পায়।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যসূত্র (Price Level during the First and Second Plans) : ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হয়। পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে মূল্যসূত্র ২১ শতাংশ হ্রাস পায় এবং স্বল্পকালীন মন্দার ভাব দেখা দেয়। রিজার্ভব্যাঙ্ক কর্তৃক ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি এবং মজুত মাল ছাড়িয়া দিবার প্রবণতার দরুন এই মন্দা দেখা দেয়। সরকার অবশ্য মূল্যসূত্র স্থিতিশীল করিবার জ্ঞাত কয়েকটি কার্যসূচী গ্রহণ করে। এই সকল কর্ম-সূচীর মধ্যে রহিয়াছে রপ্তানি শুল্কের উচ্ছেদ অথবা হ্রাস, পাটজাত দ্রব্য ও কাপড়ের উপর রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ শিথিলকরণ এবং বহু দ্রব্যের উপর আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হ্রাস। এই সকল ব্যবস্থার ফলে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মূল্যসূত্রের সূচক হ্রাস পাইয়া ৩৮৯-এ আসিয়া থাকে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের আগষ্ট মাস হইতে মূল্যসূত্র পুনরায় বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে।

অনুকূল আবহাওয়ার দরুন প্রথম পরিকল্পনাকালে কৃষিউৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করে। ইহার দরুন ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৫ সালের জুন পর্যন্ত কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য কমিতে থাকে। এই সময় শিল্প উৎপাদনও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৫ সালের মে-জুন মাসে মূল্যসূত্র সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়া আসে। ১৯৫৫ সালের মে মাসে পাইকারী দামের সাধারণ সূচক সংখ্যা ৩৪২-এ আসিয়া দাঁড়ায়। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৫৫ সালের জুন মাসের মধ্যে মূল্যসূত্র প্রকৃতপক্ষে ১৫০ শতাংশ হ্রাস পায়। ১৯৫৫ সালের জুন মাস হইতে মূল্যসূত্র ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসর হইতে যে মুদ্রাস্ফীতি আরম্ভ হয় তাহা দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে চলিতে থাকে। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে মুদ্রাস্ফীতির এক নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পাইকারী দামের সূচক সংখ্যা ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ১০৫.১ ছিল (ভিত্তি বৎসর ১৯৫২-৫৩ সাল) ; ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১২৭.৫-এ আসিয়া দাঁড়ায়। ইতিমধ্যে সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার ব্যয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ের কোন সূচক সংখ্যা পাওয়া না যাইলেও শ্রমিকদিগের ভোগ্যবস্তুর সূচক (Consumer Price Index for Working Class) হইতে তাহাদের অবস্থা মোটামুটি আন্দাজ করা যাইতে পারে। ভোগ্য বস্তুর সূচক ১৯৫৬-৫৭ সালে ১০৭ ছিল, ১৯৫৭-৫৮ সালে ১১২-এ আসিয়া দাঁড়ায়, এবং ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে ১২৫ হয় (ভিত্তি বৎসর ১৯৪২ সাল)।

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্য নীতি (Price Policy under the Third Plan) : ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার মূল্য হ্রাসের সময় অর্থমন্ত্রী স্বীকার করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যসুতরের তীব্র উর্ধ্বগতি ঘটিয়াছে। শ্রীশচীন চৌধুরী বলেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে সাধারণ মূল্যসুতর ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রতি বৎসর গড়ে ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সর্বভারতীয় ভোগ্যবস্তুর মূল্যের সূচক ১৯৬৩ সালের মার্চে ১৩০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৬৬ সালের মার্চে ১৭৪-এ আসিয়া দাঁড়ায় (ভিত্তি ১৯৪২ সাল)।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে পাইকারী দামের সাধারণ সূচক ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, খাজদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় ২৭ শতাংশ, শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় ২৫ শতাংশ এবং শিল্পের কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি পায় ৪৫ শতাংশ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের এবং শিল্পের কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল। ইহার ফলে পরিকল্পনার আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং ইহা অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মানের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও পরিকল্পনা কমিশন তৃতীয় পরিকল্পনায় কোন উপযুক্ত মূল্যনীতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে নাই। সামগ্রিক ভাবে কোন মূল্যনীতি গ্রহণ না করিয়া বিশেষ ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধের জগু বিচ্ছিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় কিন্তু একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্য নীতি গ্রহণের ফলে অগাধ ক্ষেত্রে উহার পরিবর্ত-প্রভাব কি দেখা দিবে তাহা চিন্তা করা হয় নাই। তৃতীয় পরিকল্পনার মূল্যনীতি অপরিকল্পিত এবং অপরিপাক। মূল্যের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থার আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার মূল্য নীতিতে ইহা উপেক্ষিত হইয়াছে। ইহাতে শুধুমাত্র বলা হইয়াছে যে, মূল্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং আর্থিক পদ্ধতির সহিত ফিস্‌ক্যাল পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া মূল্যনীতিকে সফল করিতে হইবে। যে সকল উপাদান অর্থনৈতিক কাজকর্ম সম্প্রসারণ করে এবং

আভ্যন্তরীণ সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি করে তাহাদের সহিত যে সকল উপাদান দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি করে তাহাদের পার্থক্য করা প্রয়োজন। সম্পদকে সম্প্রসারণশীল ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিবার জন্ত যে “কার্গত মূল্য বৃদ্ধি” (functional rise in prices) অপরিহার্য তাহার সহিত সম্পদের ঘাটতিজনিত মুদ্রাস্ফীতিতে পার্থক্য করা প্রয়োজন। সাধারণত কার্গত মূল্য বৃদ্ধি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার সহায়ক।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, মূল্যের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিবর্তন না করিয়া কোনরূপ মূল্যনীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

সম্প্রসারণশীল অর্থব্যবস্থায় অনমনীয় মূল্য-কাঠামো উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করিতে পারে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি করিলে মূল্যস্ফূর্ত স্থির রাখিতে হইলে অতিরিক্ত আয়ের সহিত অতিরিক্ত উৎপাদনের সৃষ্টি করিতে হইবে এবং মূল্য বৃদ্ধি না পাইলে অতিরিক্ত উৎপাদন করা যাইবে না। আমাদের পরিকল্পনা-রচয়িতাগণ ইহা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় বলা হইয়াছে যে, ধীরগতিতে মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি (বৎসরে ৪ হইতে ৫ শতাংশ বৃদ্ধি) সহ্য করিতে হইবে, কারণ ইহা সম্প্রসারণের সহায়ক। কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনাকালে মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ তিন বৎসরে অভূতপূর্ব মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি ঘটে—মূল্যস্ফূর্ত বৎসরে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

সাম্প্রতিক অতিরিক্ত মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি এবং শিল্পগত মন্দা (Recent Excessive Price-rise and Sectoral Industrial Recession) :
পরিকল্পনা রচয়িতাগণ বিশ্বাস করেন যে, উন্নয়নকালে ধীর গতিতে মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে। সম্পদকে সম্প্রসারণশীল ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিবার জন্ত কার্গত মূল্য-বৃদ্ধি অপরিহার্য। ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৬২ সালে যে বাৎসরিক ৬ শতাংশ মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি পায় মোটামুটিভাবে তাহা অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ১৯৬২ সাল হইতে যে কোন কারণেই হউক না কেন মূল্যস্ফূর্ত তীব্রগতিতে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৬২ সালের মার্চ হইতে ১৯৬৩ সালের মার্চের মধ্যে পাইকারী মূল্যের সূচক ১২০.৮ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৩০.২-এ আসিয়া দাঁড়ায় (১৯৫২-৫৩=১০০) পুনরায় ১৯৬৩ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৭ সালের মে মাসে মূল্য সূচক ১৩০.৯ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ২০৮.৩ হয়। বিগত চার বৎসরে ভারতে যে মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার প্রধান কারণ খাণ্ড ঘাটতি আর সেইজন্য ইহাকে কার্গত মূল্যবৃদ্ধি বলা চলিবে না। ইহা ব্যতীত ১৯৬৩-৬৭ সালে বৎসরে ১৫ শতাংশ মূল্য বৃদ্ধি পায়; ইহাকে কোন মতেই সম্প্রসারণ সহায়ক মুহূর্ত মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধি বলিয়া অভিহিত করা যায় না।

অত্যধিক মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধির দরুন বাঁধা এবং নিম্ন আয় সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাইয়াছে, মূল্য-মজুরী চক্রাকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সম্পদ ও আয় বণ্টনের উপর

প্রতিকূল প্রভাব পড়িয়াছে এবং মজুতকরণ বিশেষ উৎসাহ পাইয়াছে। এই ধরনের অত্যধিক মূল্যস্তর বৃদ্ধি গণতান্ত্রিক দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার পরিপন্থী বলিয়া ইহাকে অবশ্যই পরিহার করিতে হইবে।

১২৫৫ সাল হইতে ১২৬৫ সাল পর্যন্ত ভারতে যে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় তাহার কারণ মোট যোগানের তুলনায় মোট চাহিদার বৃদ্ধি। ১২৬৬-৬৭ সালে মুদ্রাস্ফীতি এক জটিল আকার ধারণ করে। চাহিদার তুলনায় যোগান দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সুতরাং মূল্য বৃদ্ধির দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হইবে মুদ্রাস্ফীতি ঘটয়াছে এবং উৎপাদন হ্রাসের ও অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হইবে যে, মন্দা দেখা দিয়াছে। সুতরাং বর্তমানে মূল্যস্তরে স্থায়িত্ব আনিতে হইলে সামগ্রিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং মন্দার উচ্ছেদ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হইল, শিল্পে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না কেন? আমদানি এবং কাঁচামালের ঘাটতির দরুন বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হইতেছে না। কিন্তু গত দুই বৎসরে কৃষকদের আয় হ্রাস পাওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইয়াছে। এই কারণে কতকগুলি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বর্তমানে মূল্য হ্রাস করা অপেক্ষা উৎপাদন হ্রাস করার নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তথাপি বলা যায় যে, কৃষি উৎপাদনের ঘাটতিই হইল মূল সমস্যা।

এই সমস্যার মূলে দুইটি কারণ রহিয়াছে : (১) ক্রটিপূর্ণ কৃষি পরিকল্পনা এবং (২) বিগত দশ বৎসরে অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি। কৃষি পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা প্রয়োজনানুরূপ হয় নাই। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার দরুন বর্তমানে মূল্যস্তর অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। দ্বিতীয়ত, খাদ্য ঘাটতির সুযোগ লইয়া একদল অসৎ ব্যবসায়ী মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্যে ফটকাকারবার এবং খাদ্য মজুত করিয়া সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছে। তৃতীয়ত, অত্যধিক চাহিদা মূল্যস্তরে ঊর্ধ্বগতি সৃষ্টি করিতে সহায়তা করিতেছে। ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ ব্যয় এবং পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রভূত সরকারী ব্যয়ের ফলে সক্রিয় চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। বর্তমানে প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং রপ্তানি বৃদ্ধি চাহিদা বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়াছে। সুতরাং বলা যায় যে, চাহিদা এবং যোগান উভয় শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে বর্তমানে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে।

মূল্যস্তর বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিবার জন্য চাহিদা এবং যোগান উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে। স্বল্পকালীন সময়ে একই সঙ্গে চাহিদা এবং যোগানকে একরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে যাহাতে অতিরিক্ত চাহিদাকে বাজার হইতে প্রতিবিধান করা হয়। যতদিন পর্যন্ত খাদ্য ঘাটতি থাকিবে ততদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু রাখিতে হইবে। স্বল্পকালীন সময়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং

বরাদ্দ প্রথা ব্যতীত খাত্তশস্ত্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে খাত্ত কর্পোরেশন গঠন করেন। এই কর্পোরেশনের ভিত্তর দিয়া সরকার খাত্তশস্ত্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছেন। দীর্ঘকালীন সময়ের কথা বিবেচনা করিয়া বলা যায় যে, একটি সুসম্বদ্ধ কৃষিনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে সাংগঠনিক পরিবর্তন আনয়ন করিতে হইবে। মুদ্রাস্ফীতি দমন করিতে হইলে (১) উৎপাদন, বিশেষ করিয়া কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং (২) জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি প্রতিরোধ করিতে হইবে।

চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্ত তিন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করিতে হইবে; (১) অপ্রয়োজনীয় ব্যয় যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে; (২) ঘাটতি ব্যয় যতদূর সম্ভব পরিহার করিতে হইবে এবং (৩) ঋণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে অধিকতর কঠোর করিতে হইবে।

প্রসঙ্গত ইহা মনে রাখা প্রয়োজন যে, মূল্যস্ফূর্ত বৃদ্ধির সময় কালো টাকার লেনদেন বৃদ্ধি পায়। কারণ সর্বদাই এই আশঙ্কা থাকে যে, হিসাববিহীন টাকা ধরা পড়িয়া যাইবে এবং সরকার উহা বাজেয়াপ্ত করিয়া লইবে। এইজন্ত কালো টাকা লইয়া প্রয়োজনীয় খাত্তদ্রব্য মজুত করিবার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ইহাতে অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। সুতরাং মূল্য স্থিতিকরণ নীতি গ্রহণ করিবার পূর্বে হিসাববিহীন টাকা খুঁজিয়া বাহির করা এবং দেশ হইতে সরাইয়া ফেলা প্রয়োজন। সরকার ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং ঋণদান ব্যবস্থা কঠোর করিয়াছেন। কিন্তু কালো টাকা বাহির এবং বাজেয়াপ্ত করার ব্যাপারে সরকার কোন কঠোর নীতি অনুসরণ করেন নাই।

যোগানের দিকে খাত্তশস্ত্রের মূল্য উৎপাদক, পাইকারী বিক্রেতা এবং খুচরা বিক্রেতা—সকল স্তরেই নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে এবং চাপকেন্দ্রগুলিতে বিধিবদ্ধ বরাদ্দ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে। যদি মুদ্রাস্ফীতি এবং মন্দা প্রতিরোধ করিতে হয় তাহা হইলে অতি সত্ত্বর কৃষিউৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। কৃষিজ দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যও স্থিতিশীল হইবে। যদি শ্রমিকেরা খাত্ত এবং অগ্রাণু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উচিত মূল্যে কিনিতে পায় এবং শিল্প গ্রাহ্য মূল্যে কাঁচামাল পায় তাহা হইলে দুইটি প্রধান ব্যয় বৃদ্ধিকারী প্রভাব (মজুরি বৃদ্ধির দাবী এবং কাঁচামালের ব্যয় বৃদ্ধি) প্রতিহত হইবে এবং স্বাভাবিকভাবেই মূল্যস্ফূর্তে স্থিতিশীলতা আসিবে।

অষ্টম খণ্ড

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা এবং

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন

(Foreign Trade, Foreign Exchange and
State Trading Corporation)

১৮৬২ সালে সুরেন্দ্র খাল খোলা হইলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের নবযুগের সূত্রপাত হয়। ইহার পর হইতেই ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ দীর্ঘগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৮৬২ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের মূল্য ছিল ২০ কোটি টাকা— ১৯১৩-১৪ সালে ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ৩৭৬ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিবহনের অন্ত্রবিধার দরুন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায়, যুদ্ধোত্তর কালে জাপানের তীব্র প্রতিযোগিতার দরুন ১৯২০-২২ সালে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল হয়। ১৯২৩ সাল হইতে পুনরায় ভারতের বহির্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ১৯২৮-২৯ সালে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০৪ কোটি টাকা। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় ভারতে কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তানিকারক দেশ হিসাবে ভারত বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিশ্ববাণিজ্যের অবস্থায় উন্নতি দেখা দিলে ১৯৩৩-৩৪ সালে পুনরায় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের গঠন হইতে তাহার অন্তর্গত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কৃষিজ দ্রব্য এবং কাঁচামালই ভারতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল। ১৯৩৯ সালে ভারতের মোট রপ্তানি বাণিজ্যের ২৯ শতাংশ ছিল পণ্যদ্রব্য এবং বাকী ৭১ শতাংশ ছিল কৃষিজাত দ্রব্য এবং কাঁচামাল। কাঁচা তুলা, পাট, তৈলবীজ, চা এবং কাঁচা চামড়া—এইগুলিই প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল।

ভারতের শিল্পজাতদ্রব্য তাহার নিজস্ব চাহিদা মিটাইবার পক্ষে পর্যাপ্ত না হওয়ায় ভারত বিদেশ হইতে শিল্পজাতদ্রব্য আমদানি করিত। মোটর গাড়ি, বস্ত্র, চামড়ার দ্রব্য, সাইকেল, সেলাই কল, লৌহদ্রব্য, ঔষধ, রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতি ভারত বিদেশ হইতে আমদানি করিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের আমদানি সামগ্রীর ৬৪ শতাংশ ছিল পণ্যদ্রব্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স (Balance of Trade)

অনুকূল ছিল। ইচ্ছা করিয়াই এই বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকূল রাখা হইত কারণ ইংলণ্ডকে প্রতিবৎসর ৩০ হইতে ৫০ কোটি টাকা “হোম চার্জ” (Home Charge) মিটাইতে ভারত বাধ্য ছিল। ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক যুক্তরাজ্যের সহিত সর্বাধিক ছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে যুক্তরাজ্য হইতে আমাদের আমদানির ৩২ শতাংশ পাওয়া যায় এবং আমাদের মোট রপ্তানির ৪৫ শতাংশ যুক্তরাজ্যে যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরবর্তীকালে ভারতের বহির্বাণিজ্য (India's Foreign Trade during and after the Second World War) :

(ক) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ, গঠন এবং গতির পরিবর্তন ঘটে। যুদ্ধপূর্ব যুগের তুলনায় এই সময় ভারতের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পাইলেও বাণিজ্য ব্যালান্স উদ্ভূত হইবার প্রবণতা দেখা দেয়। ১৯৪১-৪২ সালে বাণিজ্য ব্যালান্সের উদ্ভূতের পরিমাণ ছিল ৮০ কোটি টাকা, ইহা বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৪৩-৪৪ সালে উদ্ভূতের পরিমাণ হয় ৮৪ কোটি টাকা। এই সময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিপরিবর্তনও স্মৃতিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সহিত বাণিজ্য অব্যাহত থাকিলেও জাপান, জার্মান প্রভৃতি অক্ষশক্তিগুলির (Axis) সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ছিন্ন হয়। এই সময় ভারত পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলিতে শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করিতে আরম্ভ করে।

যুদ্ধের সময় ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে শিল্পজাত দ্রব্যের অনুপাত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তুলা বস্ত্রের রপ্তানি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। দেশে নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠায় দেশেই কাঁচামালের পূর্ণ ব্যবহার হইতে থাকে আর সেই কারণে কাঁচামালের রপ্তানি হ্রাস পায়।

(খ) দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইলে ভারত সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্রাস করেন। আশা করা হইয়াছিল, যে, নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করিয়া পণ্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করিতে পারিলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাইবে। ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৪৮ এই নীতি অনুসরণ করা হয় বলিয়া আমদানি বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮-৪৯ সালে আমদানি উদ্ভূতের পরিমাণ হয় ১৮৩.৪৫ কোটি টাকা।

আমদানি রপ্তানির এই বিরাট পার্থক্য শুধুমাত্র আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিলতার জগুই হয় নাই—দেশবিভাগও ইহার জগু দায়ী। দেশবিভাগের পূর্বে ভারত কাঁচা পাট রপ্তানি করিত কিন্তু দেশ বিভাগের পর ভারত কাঁচাপাট আমদানি করে। কাঁচা তুলাও যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি করা হয়। ইহার উপর আবার খাণ্ড সঙ্কট দেখা দেওয়ায় ভারত প্রভূত পরিমাণে খাণ্ডশস্ত্র আমদানি করিতে বাধ্য হয়। কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও ভারতকে চাল, গম, কাঁচা তুলা এবং পাট আমদানি করিতে হয়। আবার রপ্তানি হ্রাস পাওয়ায় ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পায়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের অবাধ আমদানি নীতি ১৯৪৯ সালে বাতিল করা হয়।

১৯৪২ সালে টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়। ইহার ফলে রপ্তানি বৃদ্ধি এবং আমদানি হ্রাস পায়। ১৯৫১ সালে সরকার বহির্বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন করেন। রপ্তানি বৃদ্ধিতে উৎসাহিত না করিয়া দেশের সম্পদ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইবার জন্ত ব্যবহার করার নীতি গ্রহণ করা হয়। কয়েকটি দ্রব্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ করা হয় এবং অপর কয়েকটি দ্রব্যের রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। পাট ও তুলাজাত দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি করা হয় এবং নূতন দ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্ক ধার্য করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনাকালে যে বহির্বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা হয় তাহার বৈশিষ্ট্যগুলি এইরূপ : প্রথমত, রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং শুধুমাত্র প্রথম পরিকল্পনা সেই সকল সামগ্রীই আমদানি করা চলিবে যাহা জাতীয় স্বার্থ এবং পরিকল্পনার জন্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, দেশের বাণিজ্য ব্যালান্সের ঘাটতি যতদূর সম্ভব হ্রাস করিতে হইবে।

পরিকল্পনা কমিশন আশা করিয়াছিলেন যে, প্রথম পরিকল্পনাকালে ২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে চলতি বাণিজ্য খাতে ঘাটতি অনেক কম হয় এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রা তহবিল হইতে মাত্র ১২১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা তোলা হয়। কৃষি উৎপাদন অভূতপূর্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘাটতির পরিমাণ হ্রাস পায়। প্রথম পরিকল্পনার শেষ পর্বায়ে সরকার অপেক্ষাকৃত উদারতার নীতি অনুসরণ করেন এবং যে সকল দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ উৎপাদন পর্যাপ্ত নয় সেগুলি আমদানির অন্তিমতি দান করেন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা রচনার সময় হিসাব করা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনাধীন পাঁচ বৎসরে ৪২৪০ কোটি টাকা মূল্যের সামগ্রী আমদানি করা হইবে। অপর পক্ষে এই সময়ে রপ্তানি মূল্য হইবে ৩০০০ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত বিনিয়োগ উদ্ভূত হিসাবে ২২৫ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই সময় বৈদেশিকমুদ্রার মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০১৫ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে বিনিয়োগ ব্যয় প্রভূত বৃদ্ধি পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট চরম আকার ধারণ করে।

১৯৫৭ সালে সরকার আমদানি নিয়ন্ত্রণের কঠোর নীতি গ্রহণ করেন। অবশ্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির অন্তিমতি দেওয়া হয়। এখনো বর্তমান আমদানি নীতি পর্যন্ত এই নীতিই বলবৎ আছে। এই নীতি অনুযায়ী স্থির হয় যে, মূল পরিকল্পনা কার্যকরী করার জন্ত এবং অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্ত বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবহার করা যাইবে। দেশের কর্মসংস্থান এবং উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে। যে সকল শিল্পের বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্ভাবনা আছে তাহাদেরও সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হয়।

এই কঠোর আমদানি নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালে অবস্থার অবনতি ঘটে।

এই সময় আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১২১৭ কোটি টাকা কিন্তু রপ্তানির পরিমাণ হয় ৬২২ কোটি টাকা। ১২৫৭ সালে চলতি খাতে ৪৫২ কোটি টাকা ঘাটতি হয়; অবশ্য ১২৫৮ সালে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়। চলতি খাতে ঘাটতির পরিমাণ হয় ৩৫৫ কোটি টাকা, পরবৎসর (১২৫৯) উহা আরও হ্রাস পাইয়া ১৭২ কোটি টাকা হয়। আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি উন্নয়নের ফলে বাণিজ্য ব্যালান্সের অবস্থার উন্নতি হয়।

ভারতের বহির্বাণিজ্যে ঘাটতির দরুন ১২৫৬ সাল হইতে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণ ক্রমাগত হ্রাস পাইয়া চলিতেছিল, ১২৫৮ সালে আসিয়া উহা বন্ধ হয়। ১২৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৮ কোটি টাকা। পুনরায় ১২৬১ সালের মার্চ মাসে ইহা হ্রাস পাইয়া ৩০৩৬ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

১২৬২-৬৩ সালে দেশের বাণিজ্য ব্যালান্সে প্রতিকূল চাপ অর্ধেক হ্রাস পায়। ১২৬৩ সালের এপ্রিল হইতে ১২৬৪ সালের মার্চ পর্যন্ত রপ্তানি আয় বৃদ্ধির দরুন ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় ১০০৭ কোটি টাকা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু ১২৬৪ সালের এপ্রিল হইতে পুনরায় অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে। আমদানি বৃদ্ধি এবং রপ্তানি হ্রাস হওয়ার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের উপর বিশেষ চাপ পড়ে। অবস্থার অবনতির দরুন আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে সাহায্য গ্রহণ করা অপরিহার্য হইয়া পড়ে। ১২৬৫-৬৬ সালে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৮৬৫ কোটি টাকা কিন্তু আমদানির পরিমাণ ছিল ১৩৯০ কোটি টাকা। ১২৬৬ সালের ৫ই জুন উপায়ান্তর না দেখিয়া সরকার টাকার মূল্য ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করেন।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের আমদানি-রপ্তানি নীতির বিচার করা প্রয়োজন। ১২৫৮ সালের অক্টোবর মাসে সরকার ছয়মাসের জন্ত আমদানি নীতি এক আমদানি নীতি গ্রহণ করেন। এই নীতিতে কঠোরভাবে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা হয় কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানি করিতে অনুমতি দেওয়া হয়।

১২৫৯ সালের এপ্রিল মাসে নূতন আমদানি নীতি ঘোষণা করা হয়। পূর্বের তায় আমদানি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় কিন্তু একই সঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধির জন্ত রপ্তানিকারক-দিগকে অধিকতর সুবিধা দেওয়া হয়। আমদানির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘসময়ের জন্ত লাইসেন্স দান করা হয়। ইহার ফলে শিল্প-উद्यোক্তাদের পক্ষে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উৎপাদন করা এবং এক সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সুবিধাজনক মূল্যে ক্রয় করা সম্ভব-পর হয়।

১২৫৯-৬০ সালে বাণিজ্য ব্যালান্সে উন্নতি হওয়ার ফলে আমদানি নীতিতে কঠোরতা হ্রাস করা হয়। কিন্তু ১২৬১ সালের আমদানি নীতিতে ভোগ্য দ্রব্য আমদানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১২৬২ সালের এপ্রিল মাসে পুরা এক বৎসরের জন্ত আমদানি নীতি ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণায় ৬৫টি দ্রব্যের আমদানির উপর

নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা হয় এবং পরিবার পরিকল্পনা সংক্রান্ত দুইটি দ্রব্যের উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়।

১৯৬৩-৬৪ সালের আমদানি নীতিতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৬৪-৬৫ সালের আমদানি নীতিতে কোন পরিবর্তন করা হয় নাই।

১৯৬৫-৬৬ সালে বৈদেশিকমুদ্রার অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় আমদানি নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করা হয়। ঔষধ, এক্সরে ফিল্ম, বই এবং শিল্পের প্রয়োজনীয় উপাদানের ক্ষেত্রে বিশেষ আমদানি হ্রাস করা হয় নাই। যে সকল দ্রব্য অত্যাবশ্যকীয় নয় অথবা যাহা দেশে পাওয়া যায় সেদ্রব্য আমদানি করার কঠোরতা বৃদ্ধি করা হয়। কতকগুলি দ্রব্যের আমদানি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়। টাকার মূল্য হ্রাস করিবার পূর্বে ১৯৬৬-৬৭ সালে যে আমদানি নীতি ঘোষণা করা হয় তাহা অত্যন্ত কঠোর ছিল। ১৯৬৬ সালের জুন মাসে টাকার মূল্য হ্রাস করিবার পর সরকার আমদানি নীতি উদার করেন। সরকার ৫৬টি অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পের এক তালিকা বাহির করেন। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্পগুলি তাহাদের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ প্রভৃতি আমদানি করিবার অনুমতি লাভ করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রামস্বামী মুদালিয়ার কমিটি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, বৎসরে দুইবারের পরিবর্তে একবার আমদানি লাইসেন্স দেওয়া মুদালিয়ার কমিটি উচিত এবং ৩০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করা প্রয়োজন। এই তহবিল হইতে রপ্তানি শিল্পগুলিকে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির জন্ত সাহায্য করা হইবে। এই কমিটি রপ্তানি উৎসাহিত করিবার জন্ত রপ্তানি আয়ের উপর আয়করের রেয়াৎ দিবার সুপারিশ করেন।

মুদালিয়ার কমিটি বলেন যে, আমদানি নিয়ন্ত্রণ নীতি একরূপ ভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে ইহা দেশের শিল্পোন্নতির সহায়ক হয়, বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের সহায়তা করে এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের হাতিয়ার হয়। পরিকল্পনায় অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পগুলির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানির সকল প্রকার সুযোগ দান করিতে হইবে। মুদালিয়ার কমিটি একটি বাৎসরিক রপ্তানি পরিকল্পনা রচনার সুপারিশ করেন।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমদানি হ্রাস করিয়া বাণিজ্য ব্যালান্স সমস্তার আংশিক সমাধান করা যায় মাত্র। এই সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধানের জন্ত রপ্তানি সম্প্রসারণের নীতিও গ্রহণ করা প্রয়োজন। রপ্তানি সম্প্রসারণ করিতে হইলে দেশে মুদ্রামান হ্রাস

শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। উৎপাদন বৃদ্ধির একাধিক পদ্ধতি আছে। অতিরিক্ত সময় কাজ করিয়া, অথবা যন্ত্রপাতির পুনর্গঠন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু যে পদ্ধতি লইয়া পরীক্ষা করা হয় তাহা হইল মুদ্রামান হ্রাসের নীতি। ১৯৬৬ সালের ৬ই জুন টাকার মূল্য ৩৬.৫ শতাংশ হ্রাস করা হয়। কিন্তু দুঃখের কথা

যে, মুদ্রামান হ্রাস করিয়াও রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায় নাই। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতের রপ্তানি ১০.১ কোটি টাকা হ্রাস পায়।

ভারতের গ্রায় দ্রুত সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে বেশ কিছুকাল ধরিয়া আমদানির আধিক্য থাকিবে। সুতরাং সরকারের একই সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় আমদানি হ্রাস, আভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রপ্তানি সম্প্রসারণের ত্রিমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। বর্তমানে সরকার এই নীতিই অনুসরণ করিতেছে।

রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি রপ্তানি-বাণিজ্যের বিকেন্দ্রীকরণ এবং নূতন নূতন বাজার অন্বেষণের জন্ত কতকগুলি কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের জন্ত রপ্তানি উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন (Export Promotion Council), রপ্তানিকারককে ঋণ সরবরাহ এবং তাহার ঋণ হ্রাস করিবার গৃহীত কার্যসূচী উদ্দেশ্যে রপ্তানি ঋণ এবং গ্যারান্টি কর্পোরেশন গঠন (Export Credit and Guarantee Corporation), রপ্তানি উন্নয়ন কর্মসূচীর মধ্যে সমন্বয়

সাধনের উদ্দেশ্যে বাণিজ্য বোর্ড (Board of Trade) গঠন, রপ্তানি বিলকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বিলবাজার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার সিদ্ধান্ত, শিল্প উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সুলভে অধিক ঋণদানের সুবিধাদান, প্রধান প্রধান ভারতীয় দ্রব্যের আমদানিকারক দেশে শিল্প ও শুভেচ্ছা মিশন প্রেরণ—এই সকল কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া সরকার রপ্তানি সমস্যার সমাধান করিতে আগ্রহী।

১৯৬৬-৬৭ সালে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্য আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। আমদানি মূল্য হয় ১২৫০ কোটি টাকা কিন্তু রপ্তানির মূল্য হয় মাত্র ১২৭০ কোটি টাকা অর্থাৎ রপ্তানির তুলনায় আমদানির আধিক্য হয় ৬৮০ কোটি টাকা। খাদ্যসবুট বাণিজ্য ব্যালান্সের অবনতিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে।

তুলনামূলক ভাবে বিচার করিয়া বলা যায় যে, অগ্রাগ্র শিল্প-সমৃদ্ধ দেশের তুলনায় ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য জাতীয় আয়ের অল্পপাতে অত্যন্ত কম। গ্রেট ব্রিটেনের রপ্তানি বাণিজ্য তাহার জাতীয় আয়ের ১৯ শতাংশ; পশ্চিম তুলনামূলক বিচার জার্মানীর রপ্তানি বাণিজ্য তাহার জাতীয় আয়ের ২১ শতাংশ, জাপানের রপ্তানি বাণিজ্য তাহার জাতীয় আয়ের ১৩ শতাংশ; অপর পক্ষে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য তাহার জাতীয় আয়ের মাত্র ১০ শতাংশ। এই কারণে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ করা বিশেষ প্রয়োজন।

স্মার ডোনাল্ড ম্যাকডুগাল হিসাব করিয়া বলেন যে, ১৯৭১ সালের পর হইতে ভারতের ১৫০০ কোটি টাকার (১০০০ কোটি টাকা সংরক্ষণ, ৫০০ কোটি টাকা উন্নয়ন এবং ১০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মূলধনের ঋণ বাবদ) বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে এবং ইহার জন্ত রপ্তানি সম্প্রসারণ অপরিহার্য। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হইবে রপ্তানি সম্প্রসারণ।

ভারতীয় বাণিজ্যনীতি এবং বাণিজ্য চুক্তি (Indian Commercial Policy and Trade Agreements) : ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ভারত অবাধ বাণিজ্য

নীতি অনুসরণ করে। ১৯২৩ সালে বিভেদমূলক সংরক্ষণনীতি গৃহীত হইলে স্বভাবতই অবাধ বাণিজ্যনীতি পরিত্যক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ এবং মূল্য হ্রাস পায়। ইহার কারণ হইল সাধারণভাবে চাহিদার

সঙ্কোচ এবং কৃষিজ দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য হ্রাস। গ্রেট ব্রুটেন এই মন্দার রাজকীয়
অগ্রাধিকার হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির

সহিত রাজকীয় অগ্রাধিকার (Imperial Preference) নামে

এক নূতন ধরনের বাণিজ্যনীতি অনুসরণ করে। রাজকীয় অগ্রাধিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালে কানাডার অটোয়াতে এক অধিবেশন বসে।

এই অধিবেশনে অল্প সকল সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলির সহিত ভারতও গ্রেট ব্রুটেনের সহিত চুক্তি সম্পাদন করে ; ইহাই অটোয়া চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, ভারত গ্রেট ব্রুটেন হইতে আমদানিকৃত কয়েক ধরনের মোটর যানের জন্ত ৭½ শতাংশ,

বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, উলবস্ত্র, স্নগন্ধি দ্রব্য, স্পিরিট ইত্যাদির জন্ত অটোয়া চুক্তি

১০ শতাংশ অগ্রাধিকার দিবে। গ্রেট ব্রুটেনও কয়েকটি দ্রব্যের

ক্ষেত্রে ভারতকে ১০ শতাংশ অগ্রাধিকার দিতে এবং কয়েকটি দ্রব্যকে বিনা শুল্কে গ্রহণ করিতে রাজী হয়। অটোয়া চুক্তির ফলে ভারত অপেক্ষা গ্রেট ব্রুটেনই অধিকতর লাভবান হয়। ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী একপভাবে অগ্রাধিকার লাভ করে যাহাতে ব্রিটিশ রপ্তানি শিল্পগুলিই অধিকতর সম্প্রসারিত হয়। রপ্তানি শিল্পগুলি সম্প্রসারিত হওয়ার দরুন পরোক্ষভাবে ব্রিটিশ অর্থনীতির অগ্রাধিকার ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং গ্রেট ব্রুটেন মন্দার প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে।

ভারতীয় যে সকল দ্রব্যকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছিল তাহার উল্লেখযোগ্যভাবে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারিত করিতে পারে নাই, কারণ কৃষিজদ্রব্যের মূল্য (ভারত প্রধানত কৃষিজ দ্রব্য রপ্তানি করিত) অনেক পরে বৃদ্ধি পায় এবং অগ্রাধিকার তালিকায় যে সকল সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল তাহা সকলই ভারতের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল না। সুতরাং অটোয়া চুক্তির দ্বারা গ্রেট ব্রুটেন প্রচ্ছন্নভাবে “প্রতিবেশীকে দরিদ্র কর” (Beggar my Neighbour Policy) নীতি অনুসরণ করিয়া ভারত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল ইত্যাদি উপনিবেশগুলিকে শোষণ করিয়া নিজ অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল। অটোয়া চুক্তির সুবিধার অধিকাংশই পাইয়াছে গ্রেট ব্রুটেন আর ভারত চরমভাবে শোষিত হইয়াছে। অবশ্য চা বাগানের এবং পাটকলের ব্রিটিশ মালিকগণ অটোয়া চুক্তির ফলে চা এবং পাটশিল্প সম্প্রসারণের সুযোগে প্রভূত মুনাফা অর্জন করে। ভারতে অটোয়া চুক্তির কঠোর সমালোচনা করা হয় বলিয়া ১৯৩৬ সালে এই চুক্তি বাতিল হইয়া যায়। কিন্তু বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে

১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ইহা বলবৎ রাখেন। ১৯৩৯ সালে ভারত-ব্রিটেন বাণিজ্য চুক্তি (Indo-British Trade Agreement) সাক্ষরিত হয়। কিন্তু ভারত-ব্রিটেন এই নতুন চুক্তিতে পূর্ববর্তী নীতির বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই বাণিজ্য চুক্তি এবং অটোয়া চুক্তির প্রধান ক্রটিগুলিও দূর করা হয় নাই। এই নতুন চুক্তি অনুসারে ভারত গ্রেট ব্রিটেন হইতে আমদানিকৃত ২০টি দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৭½ হইতে ১০ শতাংশ অগ্রাধিকার দিবে এবং গ্রেট ব্রিটেনও কতকগুলি ভারতীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার এবং বিনা শুল্কে আমদানির অনুমতি দিবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানি ও রপ্তানির উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ জারী করা হয় এবং ভারতীয় বাণিজ্য নীতির সহিত যুদ্ধকালীন প্রয়োজনের সমন্বয়সাধন করা হয়।

অক্ষয়শক্তিগুলির সহিত বাণিজ্য বন্ধ করা হয় এবং নিরপেক্ষ ও মিত্রপক্ষীয় দেশগুলির সহিত নিয়ন্ত্রিত হারে বাণিজ্য চলে।

স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে ভারতের বাণিজ্য নীতি (Indian Commercial Policy After Independence) : স্বাধীনতা লাভের পর রপ্তানি সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ভারত কমনওয়েলথ বহির্ভূত বহু দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সাক্ষর করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হওয়ার পর ভারত চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, পোল্যান্ড চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ইতালি, নরওয়ে এবং অস্ট্রা-ইউরোপীয় দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে ভারত সেই সকল দেশের সহিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে যাহারা ভারত হইতে চা, পাট, বস্ত্র, কুটির-শিল্পজাত দ্রব্য কিনিতে এবং পরিবর্তে মূলধনী দ্রব্য এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করিতে আগ্রহী।

যদিও অতীতে ভারত বহু দ্বিপাক্ষিক যুক্তি সম্পাদন করিয়াছে তথাপি GATT-এর সদস্য হিসাবে সে বহুমুখী বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাসী। ১৯৪৭ সালে জেনেভায় ভারত সমেত ২৩টি রাষ্ট্র সমবেত হইয়া শুল্ক এবং বাণিজ্য সম্পর্কে সাধারণ চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল শুল্ক হ্রাস করা; এই চুক্তির ফলে ভারত বহু দেশের নিকট হইতে শুল্ক হ্রাসের সুবিধা পায় এবং সকল দেশকে অনুরূপ সুবিধা দান করে।

দ্রুত সম্প্রসারণশীল দেশ হিসাবে ভারত GATT চুক্তি হইতে বিশেষ লাভবান হইবে বলিয়া মনে হয়। ১৯৫৫ সালে জেনেভাতে যে পর্যালোচনা সভা বসে তাহাতে স্থির হয় যে, অনুরূপ দেশসমূহ তাহাদের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার জগ্ৰ যাহাতে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয় করিতে পারে তাহার জগ্ৰ অতিরিক্ত শুল্ক হ্রাসের সুবিধা পাইবে। ১৯৫৮ সালে জেনেভায় GATT-এর দ্বাদশ অধিবেশনে বলা হয় যে, ইউরোপীয় সাধারণ বাজার পরিকল্পনায় (European Common Market Scheme) শিল্প-সমৃদ্ধ দেশগুলি যে নতুন শুল্ক নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহাতে অনুরূপ এবং কৃষি-প্রধান দেশগুলির রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। ফলে স্থির হয় যে, চা, কফি,

তামাক এবং চিনি রপ্তানিকারী অনুরূপ দেশগুলি সমবেতভাবে আমদানিকারী দেশগুলির নিকট শুদ্ধ হ্রাসের জ্ঞাপন আবেদন জানাইবে। ১৯৫২ সালে ভারত ও অন্যান্য অনুরূপ দেশ হইতে উন্নত দেশে প্রেরিত দ্রব্যসামগ্রীর উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে শিথিল করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৬০ সালের জানুয়ারী মাস হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে পশ্চিম জার্মানী ভারত হইতে আমদানিতে পাটজাত দ্রব্যের উপর আমদানি নিয়ন্ত্রণ উচ্ছেদ করিতে সম্মত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তাঁত বস্ত্র, কুটির শিল্পজাত দ্রব্য এবং নারকেলকাতার দ্রব্য অনুরূপ সুবিধা পাইবে। ১৯৬২ সাল এবং ১৯৬৩ সালে GATT-এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহ যাহাতে অনুরূপ দেশগুলি রপ্তানিকৃত চা, কফি কোকো এবং অন্যান্য দ্রব্যের শুদ্ধ হ্রাস করে সেজ্ঞাপন তাহাদের অনুরোধ করা হয়।

GATT-এর নতুন অধ্যায় ১৯৬৫ সালে সকল সদস্য দেশ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় উন্নতিকামী দেশগুলির নতুন পণ্যসামগ্রীর বাজার সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। ইহা ব্যতীত উন্নত দেশগুলি উন্নতিকামী দেশগুলির বর্তমান অথবা সম্ভাব্য আমদানির উপর নতুন কোন শুদ্ধ ধার্য করিবে না, এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উন্নতিকামী দেশগুলি উন্নত দেশসমূহ হইতে যে সুবিধা পাইবে তাহার পরিবর্তে উহাদের কোন সুবিধা দিতে হইবে না। সুতরাং বর্তমান বাণিজ্য নীতির ফলে ভারত দুইভাবে লাভবান হইবে—GATT-এর সদস্যভুক্ত দেশগুলির নিকট হইতে শুদ্ধ ছাড় পাইয়া বহির্বাণিজ্য বাড়াইবে এবং আমদানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় রোধ করিবে।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে ভারত ও আরও ৪৫টি দেশ জেনেভায় কেনেডি রাউণ্ড চুক্তি সাক্ষর করে। কেনেডি রাউণ্ড চুক্তি বিশ্বের সর্ববৃহৎ শুদ্ধ হ্রাসের প্রয়াস এবং ইহা উন্নত ও অনুরূপ দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধির সহায়তা করিবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুদ্ধ হ্রাস করিয়াছে আর ইহার ফলে ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যে বিশেষ লাভবান হইবে।

GATT-র সহিত রাজকীয় অগ্রাধিকারের (Imperial Preference) প্রণালী বিশেষভাবে জড়িত। রাজকীয় অগ্রাধিকার (বর্তমানে ইহা কমনওয়েলথ অগ্রাধিকার নামে পরিচিত) এখনো পর্যন্ত চালু আছে কিন্তু জাতীয় সরকার ইহাকে এরূপভাবে পরিচালনা করিতেছে যাহাতে ইহা আমাদের উন্নয়নী প্রয়াসের অনুরূপ হয়। কমনওয়েলথ অগ্রাধিকারের দরুন শিল্পপ্রধান দেশগুলি লাভবান হয় আর কৃষিপ্রধান দেশগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্ম অতীতে কমনওয়েলথ অগ্রাধিকারের সকল সুযোগই গ্রেট ব্রিটেন লাভ করিয়াছিল। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার পর হইতে ভারতে দ্রুত শিল্পায়ন হওয়ার দরুন রাজকীয় অগ্রাধিকার ভারতের অনুরূপে আসিয়াছে।

গ্রেট ব্রিটেন, ইউরোপীয় সাধারণ বাজার এবং ভারত (U. K., European Common Market and India) : অনেকের মনেই এই আশঙ্কা দেখা দিয়াছে যে, গ্রেট ব্রিটেন যদি ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে যোগদান করে তাহা হইলে ভারতের বহির্বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই যে, ইউরোপীয় সাধারণ বাজারে গ্রেট ব্রিটেন যোগদান করিলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। গ্রেট ব্রিটেন বর্তমানে ভারত হইতে যে দ্রব্যসামগ্রী আমদানি করে তাহার উপর কোন আমদানি শুল্ক বা পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ নাই। গ্রেট ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে গ্রেট ব্রিটেনের বাজারে ইউরোপীয় দ্রব্যের তুলনায় ভারতীয় দ্রব্যসমূহকে অধিক শুল্ক দিতে হইবে আর ইহার ফলে চা, তুলা, বস্ত্র এবং পাটজাতদ্রব্যের রপ্তানি ব্যাহত হইবে। রপ্তানি-আয় হ্রাস পাইলে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ব্যাহত হইবে। গ্রেট ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিবে কিনা ইহা এখনো পর্যন্ত অনিশ্চিত। অবশ্য বর্তমান অবস্থা দেখিয়া মনে হয় যে, পরিশেষে গ্রেট ব্রিটেন সাধারণ বাজারে অল্প-প্রবেশ করিবে। গ্রেট ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে ভারতের বহির্বাণিজ্যের কি অবস্থা হইবে তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে।

ভারত গ্রেট ব্রিটেন হইতে যে পরিমাণ আমদানি করে সাধারণ বাজারভুক্ত ছয়টি দেশ হইতে তদপেক্ষা সামান্য অধিক আমদানি করে। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের মাত্র এক তৃতীয়াংশ সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সহিত সম্পাদিত হয়। ইহার কারণ ভারতীয় দ্রব্য কোনরূপ শুল্ক এবং পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে গ্রেট ব্রিটেনে অল্পপ্রবেশ করিতে পারে কিন্তু সাধারণ বাজারভুক্ত দেশগুলিতে শুল্ক এবং পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণ বলবৎ আছে।

গ্রেট ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে গ্রেট ব্রিটেনে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক দার্ঘ্য হইবে। আর ইউরোপীয় রপ্তানিকারকগণ যে শুল্ক দেয় তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। কমনওয়েলথ অগ্রাধিকার বর্তমানে ভারতের অল্পকূলে, কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন সাধারণ বাজারে যোগদান করিলে উহা আর ভারতের অল্পকূলে থাকিবে না।

অবশ্য ব্রিটেন আশ্বাস দান করিয়াছে যে, সে যদি সাধারণ বাজারে যোগদান করে তাহা হইলে কমনওয়েলথ বাণিজ্য যাহাতে অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে। গ্রেট ব্রিটেনের সহিত ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যের যে পরিমাণ তাহা অব্যাহত রাখিতে হইবে। কিন্তু তাহাই যথেষ্ট নয়। সম্ভাব্য বাণিজ্য বৃদ্ধির কথাও চিন্তা করিতে হইবে। শুধুমাত্র বর্তমান জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখিতে হইলেই ভারতকে আগামী দশ বৎসরের মধ্যে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দ্বিগুণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা এবং বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট (Second Plan and the Foreign Exchange Crisis) : প্রথম পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট-জনিত কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয় নাই। প্রথম পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে কোরিয়া যুদ্ধ-

জনিত তেজীভাব থাকায় ভারতের রপ্তানির পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রথম পরিকল্পনা আরম্ভ হইবার সময় অনুমান করা হইয়াছিল যে, পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে ২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হইবে। কিন্তু কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, উন্নয়নমূলক ব্যয়ের ধীরগতি, এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণের দক্ষন চলতি বাণিজ্য ব্যালান্সে প্রকৃত ঘাটতি অনেক কম হয় এবং মাত্র ১২১ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হয় এবং ৭৫২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চিত থাকে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা অধিকতর উচ্চাকাঙ্ক্ষী। মূল এবং ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জ্ঞাত প্রভূত পরিমাণ মূলধনী দ্রব্য আমদানি অপরিহার্য হইয়া পড়ে। নূতন শিল্প সমূহ হইতে উৎপাদন আরম্ভ না হইলে রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করা যাইবে না। হিসাব করা হইয়াছিল যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে চলতি হিসাব খাতে ১১০০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে। স্টার্লিং রিজার্ভ হইতে ২০০ কোটি টাকা তোলা হইবে এবং বেসরকারী বিনিয়োগ হইতে ১০০ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে; ফলে মোট বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি হইবে ৮০০ কোটি টাকা।

১৯৫৬-৫৭ সালে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়ায় ১০৭৭ কোটি টাকা কিন্তু রপ্তানির পরিমাণ হয় মাত্র ৬৩৭ কোটি টাকা; ফলে বাণিজ্য ব্যালান্স বিশেষ ভাবে প্রতিকূল হয়। সুতরাং চলতি হিসাব খাতে যে ঘাটতি তাহা বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চিত তহবিল হইতে তুলিয়া মিটাইতে হইবে। ধীরে ধীরে অবস্থার আরো অবনতি ঘটিতে থাকে এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের প্রতিকূলতা বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম ১৮ মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ৩২৬ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা নিঃশেষ হইয়া যায়; আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার হইতে ২৫ কোটি টাকা স্বল্পকালীন ঋণ পাওয়া না যাইলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইত ৪২১ কোটি টাকা। ১৯৫৬ সালে বৈদেশিক মুদ্রার হ্রাস ১৫ হইতে ২০ কোটি টাকার হ্রাস ছিল, ১৯৫৭ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া ৪০ হইতে ৫০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়।

বৈদেশিক মুদ্রার দ্রুত নিঃশেষের কারণগুলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অত্যধিক উচ্চাশাই ইহার প্রধান কারণ। পরিকল্পনায় বিনিয়োগের হার অত্যন্ত বেশি ছিল বলিয়া পরিকল্পনার প্রথম বৎসরেই প্রভূত পরিমাণ মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করিতে হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষ বৎসরে ৬১২ কোটি টাকার মূলধনী দ্রব্য আমদানি করা হয় কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরে ইহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া ১২২০ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ইহা

অত্যধিক মূলধনী
দ্রব্যের আমদানি

ব্যতীত, সুয়েজ সঙ্কট এবং বহির্বিধে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির জ্ঞাত এই সময় মূলধনী দ্রব্যের মূল্য ১০ হইতে ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মুদ্রাসঙ্কট দেখা দিবে এই আশঙ্কায় বেসরকারী ব্যবসায়ীগণ আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া মজুত বাড়াইতে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের কারণ পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অত্যধিক মূলধনী দ্রব্য আমদানিই বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের প্রধান কারণ।

বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের দ্বিতীয় কারণ হইল খাত্ত আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি। জলসেচের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও ভারত এখনো কৃষি উৎপাদনের জন্ত মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল। ১৯৫৭-৫৮ সালে খাত্তশস্ত্রের উৎপাদন ৩০ লক্ষ টন খাত্ত আমদানি হ্রাস পায়। ফলে খাত্তশস্ত্র আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয় এবং ইহা বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট তীব্রতর করিয়া তোলে। ১৯৫১-৫২ সালে খাত্ত আমদানির জন্ত ২২৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু ১৯৫৫-৫৬ সালে ইহা হ্রাস পাইয়া মাত্র ২২ কোটি টাকা হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া পুনরায় ১৫২ কোটি টাকা হয়। সুতরাং খাত্ত আমদানি যে কেবল বাণিজ্য ব্যালান্সে প্রতিকূলতা আনিয়াছে তাহা নয়, বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটেও ইন্ধন যোগাইয়াছে।

তৃতীয়ত, পরিকল্পনা-বহির্ভূত নানা প্রকার ব্যয় ও বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট অবদান যোগায়। প্রতিরক্ষা খাতে বিমান ও নৌ বাহিনীর সরঞ্জাম আমদানির জন্ত বৈদেশিক মুদ্রার উপর চাপ পড়ে। প্রথম পরিকল্পনাকালে যে প্রকল্পনা-গুলি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই সেইগুলি শেষ করিবার জন্ত আমদানি-ব্যয় বৃদ্ধি পায়। উপরন্তু, সহকারী এবং পরিপূরক বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবার ফলে আমদানির পরিমাণও যে বৃদ্ধি পাইতে পারে পরিকল্পনা রচনার সময় ইহা বিবেচনা করা হয় নাই।

চতুর্থত, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা যে হারে বৃদ্ধি পায় দেশে ভোগ্যপণ্যের যোগান সেই হারে বৃদ্ধি পায় নাই। ভোগ্যপণ্যের উৎপাদন ভার প্রধানত কুটির এবং ক্ষুদ্রশিল্পের উপর আভ্যন্তরীণ ভোগ বৃদ্ধি গ্রস্ত করা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনার অগ্রগতির রিপোর্ট হইতে দেখা গিয়াছে যে, ইহাদের উৎপাদন আশানুরূপ হয় নাই। জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি ব্যতীত দ্রুত নগরীকরণ (urbanization) এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন ভোগব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পূর্বেই দেখা গিয়াছে যে, খাত্ত ঘাটতি মিটাইবার জন্ত যথেষ্ট পরিমাণ খাত্ত আমদানি করিতে হয়। আমদানি নিয়ন্ত্রণ থাকা সত্ত্বেও বেশ কিছু পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য দেশে আমদানি হয় এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের প্রতিকূলতা বৃদ্ধি করে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উন্নয়নের জন্ত মূলধনী দ্রব্য আমদানি খাত্তশস্ত্রের আমদানি বৃদ্ধি, পরিকল্পনা বহির্ভূত আমদানি বৃদ্ধি এবং ভোগ্য পণ্যের চাহিদা পূরণের জন্ত আমদানি বৃদ্ধি বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের কারণ।

বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কট এবং সরকারানীতি (Foreign Exchange Shortage and Government's Action) : দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম বৎসরের কাজ শেষ হইবার সময় হইতে বৈদেশিক মুদ্রার সঙ্কটজনক অবস্থা অনুভব করা যায়। ১৯৫৭

সালের জুলাই মাসে অবস্থা চরমে উঠে। ১২৫৭ সালের আগষ্ট মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ৩৭৫.৫২ কোটি টাকায় আসিয়া দাঁড়ায়। ফলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিধিবদ্ধ বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের সর্বনিম্ন পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা হইতে কমানিয়া ৩০০ কোটি টাকা করা হয়। ১২৫৭ সালের ৩১শে অক্টোবর এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া রাতারাতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনী আইনানুসারে ১১৫ কোটি টাকার স্বর্ণ এবং ৮৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা—এই মোট ২০০ কোটি টাকা রিজার্ভ রাখিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে কোন পরিমাণ নোট চালু করিতে পারিবে। বহু পূর্বেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল।

ভারতের হায়া সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকা প্রয়োজন। অংশত, নোট প্রচলনের জ্ঞা এবং অংশত, উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই রিজার্ভ থাকা প্রয়োজন। উন্নয়নকামী অর্থনীতির কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কাজ হইল কিছু পরিমাণ রিজার্ভ সৃষ্টি করা। এই সঞ্চিত তহবিল দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টার গতি অব্যাহত রাখিবার জ্ঞা ব্যয় করা হইবে। রিজার্ভ সংক্রান্ত নীতির ঘন ঘন এবং ব্যাপক পরিবর্তন কেবল জনগণের আস্থাই নষ্ট করিবে না, উহা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করিবে।

আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে সরকার অধিকতর সুবিবেচনার পরিচয় দিয়াছেন। সরকার মূলধনী দ্রব্য এবং অপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্যের আমদানি করিতে দিবে না। কিন্তু শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এবং আবাসিক উপকরণের জ্ঞা সরকার পর্যাণ্ট বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ করিবেন যাহাতে বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করা যায়। অতি দ্রুত রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইলে ভারতকে তাহার উৎপাদনের এক বৃহৎ অংশ রপ্তানি বাণিজ্যের জ্ঞা নিয়োজিত করিতে হইবে। তৈলবীজ, ভক্ষণীয় তৈল, তুলা, জুতা, ফল, মাছ, মাংস, মদ অধিক পরিমাণে রপ্তানি করিতে হইবে। ১২৬৬ সালের জুন মাসে মুদ্রামান হ্রাসের পর ইহা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শুধুমাত্র রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণ করা ভারতের পক্ষে সম্ভব নয়। তাহাকে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করিতেই হইবে। স্বল্পকালীন বৈদেশিক সাহায্যে কোনও কাজ হইবে না কারণ স্বল্প সময়ের মধ্যে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিবে না। অধিক পরিমাণে দীর্ঘমেয়াদী সাহায্য সংগ্রহ এবং স্বল্প-মেয়াদী ঋণগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী ঋণে পরিণত করা আবশ্যিক।

১২৬২ সালে চীনা আক্রমণের পর জাতীয় সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের পর্যালোচনা করিয়া নূতন স্বর্ণনীতি ঘোষণা করেন। প্রথমত, সরকার স্বর্ণ-বণ্ড চালু করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৫ বৎসর মেয়াদী এই বণ্ড নূতন স্বর্ণনীতি হইতে ৬ শতাংশ সুদ পাওয়া যাইবে। বণ্ডে বিনিয়োজিত স্বর্ণমূল্য হইবে প্রতি তোলা ৬২ টা. ৫ পয়সা—ইহাই স্বর্ণের আন্তর্জাতিক বাজার দাম। দ্বিতীয়ত,

স্বর্ণের ক্রয়-বিক্রয় লইয়া ফাটকাবাজী রোধ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার সারা দেশে স্বর্ণের আগাম ব্যবসায় (Forward Trading) নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তৃতীয়ত, ১৯৬৩ সালের ৯ই জানুয়ারী সরকার স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন (Gold Control Rules) জারী করিয়া, অলঙ্কার ব্যতীত অল্প কোন স্বর্ণ রাখা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করেন। ভবিষ্যতে দেশে যে সকল স্বর্ণালঙ্কার নির্মিত হইবে তাহাদের বিশুদ্ধতা ১৪ ক্যারেটের অধিক হইতে পারিবে না। আরও ঘোষণা করা হয় যে, যদি কাহারও অলঙ্কার ব্যতীত অল্প কোন আকারে ৫০ গ্রামের অধিক স্বর্ণ থাকে তাহা স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন জারী হইবার এক মাসের মধ্যে সরকারকে জানাইতে হইবে। হিসাব করা হইয়াছে যে, ৪০০০ কোটি টাকার স্বর্ণ দেশে আছে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে মাত্র ৪ কোটি টাকার স্বর্ণ সরকারকে জানানো হয়। ভারতীয় নারীর স্বর্ণালঙ্কারের প্রতি অস্বাভাবিক আকর্ষণ থাকায় দেশে স্বর্ণের এক অস্বাভাবিক চাহিদা রহিয়াছে। কালোবাজারীরা অসদুপায়ে অর্জিত টাকা সহজেই স্বর্ণে রূপান্তরিত করিতে পারে এবং জনগণ মুদ্রাস্ফীতির সময় স্বর্ণের উপর টাকা বিনিয়োগ করা নিরাপদ বলিয়া মনে করে। স্বর্ণের অত্যধিক চাহিদা এবং তজ্জনিত মূল্য বৃদ্ধি স্বর্ণের চোরা আমদানি উৎসাহিত করে এবং বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একবার চোরা পথে স্বর্ণ দেশে অনুপ্রবেশ করিলে খোলা বাজারে ইহা বিক্রয় করা বা অল্প আকারে রূপান্তর করা কঠিন নয়। যদি অলঙ্কারের অল্প স্বর্ণের চাহিদা হ্রাস পায়, তাহা হইলে ভারতীয় বাজারে স্বর্ণের মূল্য হ্রাস পাইয়া আন্তর্জাতিক স্তরে নামিয়া আসিবে, এবং স্বর্ণের চোরা আমদানি আর লাভজনক না হওয়ায় উহা বন্ধ হইয়া যাইবে। কিন্তু সরকারের স্বর্ণনীতি আভ্যন্তরীণ স্বর্ণের মূল্য হ্রাস করিতে ব্যর্থ হয়। সরকারী স্বর্ণ-নীতির ফলে যে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার স্বর্ণকার বেকার হইবে তাহাদের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করাও এক দুর্লভ সমস্যা। সরকারের নূতন স্বর্ণনীতি শুধু স্বর্ণকারদের মধ্যেই নয়, জন-গণের মধ্যেও ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। ফলে বাধ্য হইয়া ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকার স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ আইন শিথিল করেন। স্থির হয় যে, স্বয়ংনিযুক্ত স্বর্ণশিল্পীরা ১৪ ক্যারেটে বিশুদ্ধতার অধিক স্বর্ণালঙ্কার ভাঙ্গিয়া পূর্বের বিশুদ্ধতার অলঙ্কার নির্মাণ করিতে পারিবে কিন্তু নূতন স্বর্ণালঙ্কার নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বর্ণের বিশুদ্ধতা ১৪ ক্যারেটের অধিক হইতে পারিবে না। কিন্তু জনগণের উত্তেজনা ইহাতেও প্রশমিত না হওয়ায় স্বর্ণনিয়ন্ত্রণ বিধির পুনঃসংশোধন করিয়া ঘোষণা করা হয় যে, ১৯৬৬ সালের ২রা নভেম্বর হইতে অলঙ্কার নির্মাণের অল্প যে কোন বিশুদ্ধতার স্বর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারিবে।

পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading During Developmental Planning) : পরিকল্পিত অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের স্বপক্ষে দুইটি প্রধান যুক্তি আছে। প্রথমত, ইহা সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধির একটি সহজ উপায় এবং দ্বিতীয়ত, মুদ্রাস্ফীতির সময় ইহা গ্রায্য মূল্যে জনসাধারণকে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সাহায্যে সহজেই চাহিদা, মূল্য এবং উৎপাদনব্যয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হয়, কারণ, রাষ্ট্রকে সামগ্রিক চাহিদা ও যোগানের হিসাব রাখিতে হয়। মুদ্রা-ক্ষীতির সময় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের মাধ্যমে চাহিদা, মূল্য এবং যোগানদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা এবং লব্ধ মুনাফা উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ১৯৬৫ সালে খাদ্য কর্পোরেশন (Food Corporation of India) গঠন করিয়া খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে এই কর্পোরেশনটি খাদ্য ক্রয়, মজুত, প্রেরণ, বণ্টন এবং বিক্রয়ের কাজে নিয়োজিত রহিয়াছে।

স্বাধীনতালাভের পর সরকার রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগী হয়। দুইটি কমিটি ভারতে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সম্ভাবনা লইয়া পর্যালোচনা করিয়া দেখেন। প্রথম

কমিশনটি ১৯৪২ সালে ডাঃ পি. এস. দেশমুখের নেতৃত্বে গঠিত হয়।
দেশমুখ কমিটি

এই কমিটি খাদ্য ও সার বিক্রয়ের জন্ত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন নামে একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা গঠনের সুপারিশ করে। দ্বিতীয়ত, এই কমিটি আরও সুপারিশ করে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরিচালিত আমদানি-রপ্তানির ভার এই সংস্থার উপর হস্ত করা উচিত। পূর্ব আফ্রিকা হইতে তুলা আমদানি এবং ছোট আঁশ যুক্ত তুলা ও কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির ভারও এই সংস্থার উপর দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। কমিটির মতে যে সকল ক্ষেত্রে সরকারী আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা আছে সেই সকল ক্ষেত্রেই এই সংস্থার কাজ করা উচিত। ইহা ব্যতীত অধিক মূল্যের বিলাস দ্রব্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য লাভজনক হইবে বলিয়া কমিটি মনে করে।

প্রথম পরিকল্পনা কালে শ্রী এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও-এর সভাপতিত্বে দ্বিতীয় কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি এই সিদ্ধান্তে আসে যে, পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয়

বাণিজ্য কর্পোরেশনের পক্ষে খাদ্যশস্য, তুলা এবং সার আমদানির
রাও কমিটি

কাজ হাতে লওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নাই। অবশ্য তাঁতবস্ত্র এবং কয়েকটি কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির জন্ত কমিটি রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠনের সুপারিশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উভয় কমিটিই সীমাবদ্ধ আকারে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের সমর্থন করে।

কর অনুসন্ধান কমিশনও (১৯৫৩-৫৪) রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যসংক্রান্ত প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা করিয়া বলে যে, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য হইতে চমকপ্রদ ভালো

কর কমিশনের
মন্তব্য

কল লাভ করা যাইবে না। কমিশনের মতে, সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা এই কাজের উপযোগী নয় এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তন করা হইলে উহা প্রশাসনিক জটিলতা বৃদ্ধি করিবে।

১৯৫৬ সালে সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীনে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন ৫ কোটি টাকা। প্রারম্ভিক আদায়ীকৃত মূলধন

ছিল এক কোটি টাকা; পরে উহা বৃদ্ধি করিয়া ২ কোটি টাকা করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশন হইতে এই সংস্থা নিয়ন্ত্রিত দেশজুলিতে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে যাহার পরিবর্তে ঐ সকল দেশ হইতে ইম্পাত, সিমেন্ট এবং যন্ত্রপাতি আমদানি বৃদ্ধি করা যায়। ইহার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার চাপ কিছুটা হ্রাস পায়। কর্পোরেশন ইতিমধ্যেই সিমেন্ট, কটিক সোডা, কাঁচা সিল্ক, সার, জিপসাম, গুঁড়া দুধ, রং, কপূর, নিউজ-প্রিন্ট প্রভৃতি আমদানির ব্যবস্থা করিয়াছে। এরূপভাবে এবং এরূপ পদ্ধতিতে এই সকল দ্রব্য আনা হইতেছে যাহাতে ঐ সকল দ্রব্যের জাতীয় উৎপাদন কিছুমাত্র ব্যাহত হইতেছে না। কর্পোরেশন লৌহ ও ম্যাংগানিজ আকরিক, পাট, জুতা, লবণ, বস্ত্র, চা, কফি, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য এবং পশমজাত দ্রব্য রপ্তানির ব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৫৬ সালের জুলাই মাসে সরকার বিদেশ হইতে সিমেন্ট আমদানি এবং আভ্যন্তরীণ বণ্টনের ভার এই কর্পোরেশনের উপর হস্ত করে। সম্প্রতি ম্যাংগানিজ রপ্তানিকারক এবং খনিমালিকদের সহিত কর্পোরেশন যৌথ বিক্রয় কাজে নামিয়াছে। ১৯৬২-৬৩ সালে কর্পোরেশন মৎস্য-চাষ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাপান হইতে মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন আমদানির ব্যবস্থা করে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৬২ সালে কর্পোরেশন পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষুদ্র শিল্পকে রপ্তানি সাহায্য দান করে। ১৯৬৬-৬৭ সাল হইতে কর্পোরেশন রেল-ওয়্যার, বৈদ্যুতিক বাল্ব এবং এসপিরিন রপ্তানির ব্যবস্থা করে।

১৯৫৬-৫৭ সালে কর্পোরেশনের মোট বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ২ কোটি টাকা, ১৯৬৫-৬৬ সালে বৃদ্ধি পাইয়া ১০৪.৩৮ কোটি টাকা হয়। কর্পোরেশন ইহার নয় বৎসর কালের মধ্যে সরকারী রাজস্বখাতে ১৬.৪২ কোটি টাকা দিয়াছে। ইহা ব্যতীত কর্পোরেশন ৮.২৬ কোটি টাকা রিজার্ভ সৃষ্টিও করিয়াছে।

কর্পোরেশন বন্দর উন্নয়ন এবং পরিবহণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। দ্রুত আমদানি-রপ্তানির জগত বন্দরের সুবিধা এবং পরিবহণ ও সংসরণের সুবন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। জাপান ও অন্যান্য দেশের সহিত ভারত লৌহ আকরিক রপ্তানির যে দীর্ঘকালীন চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে, তাহার ফলে, বন্দর এবং খনি অঞ্চলের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ দ্রুততর হইয়াছে।

কর্পোরেশন বহু মূল্যবান চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে এবং ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে কিছু মূল্যবান অর্জনও করিতেছে। খনিজ দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের ভূমিকা সন্তোষজনক। ভারতের জুতা, হস্তনির্মিত দ্রব্য এবং পশমজাত দ্রব্যের জগত কর্পোরেশন নূতন নূতন বাজার উদ্ভাবন করিয়াছে। সুলভে যাহাতে ইম্পাত, সিমেন্ট, নিউজ প্রিন্ট, কপূর, রং, কাঁচা সিল্ক, বস্ত্রবয়ন যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, গুঁড়া দুধ, কটিক সোডা আমদানি করা যায় কর্পোরেশন সে ব্যবস্থাও করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় সংস্থার সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করা ব্যতীত কর্পোরেশন জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক, সুইজার-

ল্যাণ্ড, হংকং, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সহিত বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কর্পোরেশনের কার্যাবলী বেশ সন্তোষজনক। বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের সময় সরকারের উচিত আমদানি সঙ্কোচ এবং রপ্তানি সম্প্রসারণ নীতিকে সুসম্বদ্ধ করা। রপ্তানি সম্প্রসারণ ব্যতীত কর্পোরেশন আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও কর্পোরেশনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্ত যে সকল দ্রব্যের আমদানি প্রয়োজন কর্পোরেশন অতি সতর্কতার সহিত তাহা বিবেচনা করিবে। বেসরকারী উদ্যোগের হস্তে ইহাদের আমদানির ভার দিলে অনিশ্চয়তা থাকিয়া যাইবে। ইহা ব্যতীত বর্তমান চরম মুদ্রাস্ফীতির সময় ভোগ্য-দ্রব্যের ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে হয়।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

অন্তর্বাণিজ্য এবং পরিবহন ব্যবস্থা

(Internal Trade and Transport)

আমাদের বহির্বাণিজ্যের তুলনায় অন্তর্বাণিজ্যের পরিমাণ অনেক বেশি। কিন্তু নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাবে ইহার পরিমাণ এবং গঠন সঠিক নির্ধারণ করা দুর্লব। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির এক হিসাবে প্রকাশ যে, ১৯৪০ সালে আমাদের অন্তর্বাণিজ্যের পরিমাণ ৭,০০০ কোটি টাকা এবং বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকার তায় ছিল। স্বাধীনতার পর পরিকল্পিত অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক কাজকারবার বৃদ্ধি পাওয়ার দরুন অন্তর্বাণিজ্যের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

আমাদের অন্তর্বাণিজ্যের একটি বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার ৬০ শতাংশ বন্দর এবং অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রের মধ্যে সংঘটিত হয় এবং বাকী ৪০ শতাংশ অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমূহের মধ্যে সম্পাদিত হয়। রেলপথের ক্রটিপূর্ণ পরিকল্পনার জন্ত বন্দর এবং দূরবর্তী উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে বাণিজ্যের অত্যধিক চাপ পড়ে। ইহার ফলে বন্দরগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপে বিশেষ বিকাশলাভ করিয়াছে, কিন্তু দেশভিত্তিক জেলাসমূহ অনুন্নত রহিয়া গিয়াছে। যাহা হউক, পরিকল্পনাকালে পরিবহন, যোগাযোগ এবং ব্যান্ধব্যবস্থার সুপরিকল্পিত উন্নয়নের ফলে অন্তর্বাণিজ্যের সুখম বিকাশ ঘটিতেছে।

ভারতীয় পরিবহন ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা (Indian Transport System and Developmental Planning) : কোন অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করিতে হইলে দেশব্যাপী সুপরিকল্পিত এবং সুসম্বন্ধ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অতীতে বাণিজ্য এবং শাসন ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ সাধন করা হইত। কিন্তু বর্তমানে পরিকল্পিত অর্থনীতিতে দ্রুত শিল্পায়ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরিবহন ব্যবস্থাকে সম্প্রসারিত করিতে হইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে ৫৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় মাত্র ৫২২ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে দেশের পরিবহন ব্যবস্থার, বিশেষ করিয়া রেলপথের সম্প্রসারণ করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে ১৩৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, উহা সমগ্র ব্যয়ের ২৯ শতাংশ। অবশ্য প্রকৃত ব্যয় অনেক কম হইয়াছিল—১২৯৯ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে ১৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। অবশ্য প্রকৃত ব্যয় হয় অনেক বেশি—১৯৩৫ কোটি টাকা।

খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনায় পরিবহণ এবং যোগাযোগ খাতে ৩০.১০ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

রেলপথ (Railway Transport) : বিগত ১০৪ বৎসরে ভারতীয় রেলপথের বিশ্বয়কর অগ্রগতি হইয়াছে। ১৮৫৩ সালে ভারতে প্রথম রেলপথের পত্তন হইলেও প্রকৃতপক্ষে ১৮৬৩ সাল হইতেই রেল পরিবহণ আরম্ভ হয়। ১৮৫৩ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ৩০ কিলোমিটার, ১৯৬৪-৬৫ সালে উহার দৈর্ঘ্য দাঁড়াইয়াছে ৫৮,২৭৩ কিলোমিটার। বেসরকারী উদ্যোগে রেলপথের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ইহা বৃহত্তম জাতীয় শিল্প এবং ইহাতে বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ২৪৪১ কোটি টাকা। দেশের মোট মালবহনের ৮০ শতাংশ এবং যাত্রীবহনের ৬০ শতাংশ রেলপথ কর্তৃক পরিবাহিত হয়।

১৮৫৩ সালে আটটি বৃটিশ কোম্পানী ভারতে রেলপথের পত্তন করে। সরকার ইহাদের নানাপ্রকার প্রতিশ্রুতি দান করে। ১৯২১ সালে এ্যাকওয়ার্থ কমিটি (Acwarth Committee) জাতির বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে রেলপথকে ধীরে ধীরে জাতীয়করণ করিতে সুপারিশ করে। ১৯২৫ সাল হইতে জাতীয়করণের কাজ আরম্ভ হয় এবং ১৯৪৪ সালে রেলপথ জাতীয়করণ সম্পূর্ণ হয়।

স্বাধীনতালাভের পর ১৯৫১ সালে রেলপথের আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস (Zonal Regrouping) করা হয়। ইহার ফলে ব্যয়সঙ্কোচ, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রশাসনিক একরূপতা এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভবপর হইবে। ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন পর্যায়ে রেলপথের এই আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস সাধিত হয়। নিম্নলিখিত নয়টি অঞ্চলে (Zone) রেলপথগুলি বিভক্ত :

- (১) দক্ষিণ রেলপথ (Southern Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত।
- (২) পশ্চিম রেলপথ (Western Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাই-এ অবস্থিত।
- (৩) কেন্দ্রীয় রেলপথ (Central Railway) : ইহার কার্যালয় বোম্বাই-এ অবস্থিত।
- (৪) উত্তর রেলপথ (Northern Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় দিল্লীতে অবস্থিত।
- (৫) পূর্ব রেলপথ (Eastern Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত।
- (৬) উত্তর-পূর্ব রেলপথ (North-Eastern Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় গোরক্ষপুরে অবস্থিত।

- (৭) উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (North-East Frontier Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় পাণ্ডুতে (আসাম) অবস্থিত।
- (৮) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ (South Eastern Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় কলিকাতায় অবস্থিত।
- (৯) দক্ষিণ কেন্দ্রীয় রেলপথ (South Central Railway) : ইহার প্রধান কার্যালয় সেকেন্দ্রাবাদে অবস্থিত।

রেলপথের পুনর্বিহাস প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু বিশৃঙ্খলা এবং জটিলতার সৃষ্টি করিলেও বর্তমানে ইহার প্রত্যাশিত সুফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পুনর্বিহাসের দরুন এক কাজ দুইবার করার অসুবিধা দূর হইয়াছে, রেলপথের অর্থব্যবস্থায় স্থায়িত্ব আনিয়াছে, দেশের সর্বত্র একই ধরনের রেলভাড়া প্রবর্তন করা হইয়াছে এবং যাত্রীদিগকে একই ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

প্রথম পরিকল্পনার দশ বৎসর পূর্ব হইতেই রেলপথের উপর প্রবল চাপ পড়িতেছিল। সেই কারণে প্রথম পরিকল্পনায় রেল সম্পত্তির পুনর্গঠন এবং আধুনিকীকরণের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি ও শিল্পায়নের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম পরিকল্পনা প্রথম পরিকল্পনাকালে রেলপথের পুনর্গঠন করা হয়। এই সময় রেলযাত্রীদের অধিকতর সুযোগ ও সুবিধাদানের ব্যবস্থা করা হয় এবং রেল কর্মচারীগণের জন্ম উন্নত বাসস্থান ও অগ্রাঙ্ক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনায় রেলপরিবহণ খাতে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয় ৪২৩.৭৩ কোটি টাকা।

জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা পরিবহণের জন্ম রেলপথ সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২০০ কোটি টাকা রেলপথ উন্নয়নের জন্ম বরাদ্দ করা হয়। ইহা ব্যতীত ২২৫ কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনা রেলপথ অবপূর্তি তহবিলে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে

রেলপথের জন্ম মোট ১১২১.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়; রেল কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সম্পদ হইতে ৫০০ কোটি টাকা দিবে। এই সময় ৮০০ মাইল নূতন পথের পত্তন হইবে বলিয়া

আশা করা হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ৬১৫ মাইল রেলপথ নির্মিত তৃতীয় পরিকল্পনা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় প্রথমে রেলপথ খাতে ১৩২৫ কোটি টাকা

বরাদ্দ করা হয়, কিন্তু পরে ইহা বৃদ্ধি করিয়া ১৬৬৮ কোটি টাকা করা হয়।

সড়ক উন্নয়ন এবং পথ পরিবহণ (Road Development and Road Transport) : দ্রুত শিল্পায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সড়ক পরিবহণের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে। রাস্তাঘাট উন্নত হইলে সহজেই দূরবর্তী অঞ্চল হইতে বেকার শ্রমিককে আনিয়া কাজে লাগানো যায় এবং সহজেই সম্পদ একত্রিকরণ করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হইলে দূরবর্তী গ্রামগুলির বিচ্ছিন্ন থাকার অসুবিধা দূর হয়।

সুতরাং ভারতের বর্তমান অবস্থায় সড়ক উন্নয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে দ্বিমত থাকিতে পারে না। কিন্তু শুধুমাত্র নূতন পথ এবং জাতীয় সড়ক নির্মাণ করিলেই চলিবে না, পুরাতন পথগুলিকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। রাস্তাঘাট উন্নত হইলে পরিবহণব্যয় হ্রাস পায় এবং দরিদ্র জনগণ উপকৃত হয়। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করিবে। পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের জন্ত ইহা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ২০০ মিলিয়ন টন দূরগামী মাল বহনের প্রয়োজন হয়। রেলপথ ইহার মধ্যে ১৬০ মিলিয়ন টন মাল বহন করিতে পারিবে। ফলে ৪০ মিলিয়ন টন মাল বহনের ভার সড়ক পরিবহণের উপর পড়িবে। ইহা হইতেই উন্নত সড়ক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যায়।

সড়ক উন্নয়ন যে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বসর্ত ইহা প্রথম ১৯৪৩ সালে নাগপুরে চীফ ইঞ্জিনিয়ারদের সম্মেলনে উপলব্ধি করা হয়। নাগপুর পরিকল্পনায় সড়কগুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়—(১) জাতীয় সড়ক (National Highways), (২) রাজ্য সড়ক (State Highways), (৩) প্রধান ও অপ্রধান জেলাপথ (Major and Minor District Roads) এবং (৪) গ্রাম্য পথ (Village Roads)। এই পরিকল্পনায় বর্তমান সড়কগুলির উন্নতি এবং নূতন সড়ক নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। বলা হয় যে, আগামী দশ বৎসরের মধ্যে পরিকল্পিত পদ্ধতিতে উল্লিখিত চার ধরনের সড়কের উন্নতি করিতে হইবে।

নাগপুর পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যে, উন্নত কৃষি অঞ্চলে অবস্থিত কোন গ্রাম প্রধান সড়ক হইতে ৫ মাইলের অধিক দূরে থাকিবে না। অথবা কোন প্রধান সড়ক হইতে ২০ মাইলের অধিক দূরে থাকিবে না। নাগপুর পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারসমূহ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে কেন্দ্রীয় সরকার ১৩,৪০০ মাইল দীর্ঘ জাতীয় সড়কগুলির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২০ কোটি টাকা ব্যয়ে সড়ক উন্নয়নের একটি পাঁচ বৎসরের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ইহাতে ৮০ হাজার মাইল সড়ক নির্মাণের ব্যবস্থা ছিল।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সড়ক উন্নয়নের কর্মসূচী নাগপুর পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতে ২৭,০০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং ১৪৭,০০০ মাইল কাঁচা রাস্তা ছিল। প্রথম পরিকল্পনাকালে ১০,০০০ মাইল পাকা রাস্তা এবং ২০,০০০ মাইল নীচু রাস্তা নির্মিত হয়। পথ নির্মাণের জন্ত প্রথম পরিকল্পনায় ১৪৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে সড়ক এবং সড়ক পরিবহণের জন্ত মোট ব্যয় হয় ২৪২ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় সড়ক নির্মাণের খাতে মোট প্রস্তাবিত ব্যয় ৩৫০ কোটি টাকা ধরা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় ৪০,২০০ কিলোমিটার পাকা সড়ক নির্মাণের

লক্ষ্যমাত্রা ধার্য ছিল। ১৯৬৪ সালের শেষে ৩০,২৫০ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈয়ারী হয়। এই সময়ের মধ্যে ১,১২,৬৫০ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তাও নির্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় সড়ক উন্নয়নের জন্ত ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫৮ সালে আন্তঃরাজ্য পরিবহণ কমিশন (Inter-State Transport Commission) গঠিত হয়। এই কমিশন আন্তঃরাজ্য সড়ক পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করিবে।

প্রথম পরিকল্পনায় রাজ্যগুলিতে পথ পরিবহণ জাতীয়করণের জন্ত ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হয় ১০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ১৩.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং ১৯৫০ সালের পথ পরিবহণ কর্পোরেশন আইনানুসারে (Road Transport Corporation Act) রাজ্যসরকারগুলিকে কর্পোরেশন গঠনে পরামর্শ দেওয়া হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় পথ পরিবহণ জাতীয়করণের জন্ত ২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়।

জল পরিবহণ—জাহাজ শিল্প (Marine Transport—Shipping) : জলপথ পরিবহণের জন্ত জাহাজ শিল্প গড়িয়া তোলা প্রয়োজন। ভারতের জাহাজ শিল্প গড়িয়া তোলার স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির অবতারণা করা হয়—

প্রথমত, ভারতের তটরেখা প্রায় ৩৬০০ মাইল দীর্ঘ এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারত যষ্ঠস্থান অধিকার করে। ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানত জলপথের উপরই নির্ভরশীল। এই অবস্থায় শক্তিশালী নৌবহরের প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, ভারতের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যের মাত্র ৪ শতাংশ ভারতীয় জাহাজ দ্বারা পরিচালিত হয়। আর বাকী অংশ বৈদেশিক জাহাজ দ্বারা পরিবাহিত হয়।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রনৈতিক নিরাপত্তার দিক হইতেও শক্তিশালী নৌবহর অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

চতুর্থত, আমরা যদি নিজস্ব জাহাজ শিল্প গড়িয়া তুলিতে পারি তাহা হইলে ভারতীয় শিল্পের পরিবহণ-ব্যয় হ্রাস পাইবে এবং বৈদেশিক বাজারে তাহার প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। যদি দ্রব্যসামগ্রী ভারতীয় জাহাজে পরিবাহিত হয় তাহা হইলে প্রভূত পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার খরচ বাঁচিয়া যাইবে।

১৯৪৭ সালে সরকার জাহাজ পরিবহণ নীতি কমিটি (Shipping Policy Committee) নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির প্রধান প্রধান সুপারিশগুলি বর্ণনা করা হইল :—

(ক) আগামী ৭ বৎসরের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের মাল বহন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া ২০ লক্ষ টন করিতে হইবে; (খ) ভারতীয় বাণিজ্যের ১০০ ভাগ ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির হাতে থাকিবে; (গ) দূরবর্তী দেশগুলির সহিত বাণিজ্যের ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজগুলির দ্বারাই পরিবাহিত হইবে; (ঘ) অক্ষশক্তিসমূহ (Axis Power) প্রাচ্যদেশে যে পরিমাণ বাণিজ্য করিত তাহার ৩০ ভাগ ভারতীয় জাহাজ দ্বারা

পরিবাহিত হইবে এবং (৬) সরকারী নীতি জাহাজ শিল্প সম্প্রসারণের অনুকূল হইবে।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে জাহাজী শক্তির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫ লক্ষ টনে। ১৯৫০ সালে উপকূল বাণিজ্যের ভার সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় জাহাজগুলির উপরই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই সময় নৌশিক্ষারও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। বোম্বাই ও কলিকাতায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করিয়া অফিসারদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জাহাজীশক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালে সিম্বিয়া স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর নিকট হইতে বিশাখাপত্তমের জাহাজ তৈয়ারীর কারখানা ক্রয় করিয়া ইহার নূতন নাম-করণ করা হয় হিন্দুস্তান জাহাজ নির্মাণ কারখানা। এই কোম্পানীর মূলধনের ৬ অংশ সরকারের। একটি জাপানী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ভারতসরকার কোচিনে ভারতের দ্বিতীয় জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপন করিতেছেন। ইহা সম্পূর্ণ হইলে বৎসরে ৬০,০০০ হইতে ৮০,০০০ টনের ৮টি জাহাজ নির্মাণ করিতে পারিবে। এই পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় হইবে ১৮ মিলিয়ন ডলার।

১৯৫৮ সালে নূতন মার্চেন্ট শিপিং আইন (Merchant Shipping Act) পাশ করা হয়। এই আইন অনুসারে ১৯৫৯ সালে জাতীয় জাহাজ নির্মাণ বোর্ড এবং একটি জাহাজ নির্মাণ উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে মোট জাহাজী শক্তির পরিমাণ ছিল ৩২০,৭০৭ টন। প্রথম পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল ২১৫,০০০ টন জাহাজী শক্তি বৃদ্ধি করা। এই লক্ষ্য মোটামুটিভাবে পূরণ হওয়ার কালে প্রথম পরিকল্পনার শেষে জাহাজীশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০০,৭০৭ টন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাহাজীশক্তি ৩০০,০০০ টন বৃদ্ধির লক্ষ্য-মাত্রা গৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে জাহাজী শক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০০,০০০ টন। তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,৪৫ মিলিয়ন টন জাহাজীশক্তি বৃদ্ধি করা।

প্রথম পরিকল্পনায় জাহাজ নির্মাণের জন্ত ১২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, পরে ইহা বৃদ্ধি করিয়া ২৬.৩ কোটি টাকা করা হয়। অবশ্য প্রকৃত ব্যয় হয় ১৮.৭ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাহাজ নির্মাণ বাবদ প্রকৃত ব্যয় হয় ৫২.৭ কোটি টাকা। তৃতীয় পরিকল্পনায় জাহাজ নির্মাণ খাতে ৫৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইহা ব্যতীত জাহাজ নির্মাণ উন্নয়ন তহবিল হইতে আরও ৪ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বিমানপথ (Civil Aviation) : ১৯২০ সাল হইতে বোম্বাই, কলিকাতা এবং রেঙ্গুনের মধ্যে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। এজন্ত প্রয়োজনীয় বিমানঘাটি নির্মাণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে বেসরকারী বিমানপথ বিভাগ (Civil Aviation Department) স্থাপিত হয়। ১৯৩২ সালে টাটা এয়ারওয়েজ

আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল পত্তন করে এবং ইহার পর ১৯৩৮ সালে এম্পায়ার এয়ার মেল পরিকল্পনা চালু হয়। সরকার ১৯৪৬ সালে বেসরকারী কোম্পানীগুলির সহায়তায় আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৪৬ সালে বিমান পরিবহণ লাইসেন্সিং বোর্ড গঠিত হয়।

১৯৪৭ সাল হইতে প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভ পর্যন্ত বিমানঘাটি সম্প্রসারণ এবং অগ্ন্যাগ্নি উন্নয়ন বাবদ ৬.৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছিল। প্রথম ব্যয়বরাদ্দ পরিকল্পনায় বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্ত ৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই খাতে ১২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় অসামরিক বিমান পরিবহণের জন্ত ৫৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়।

প্রথম পরিকল্পনাকালে বিমান পরিবহণ জাতীয়করণের কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। ১৯৫৩ সালে এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল এবং ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই দুইটি কর্পোরেশন ভারতে বিমান পরিবহণ সুসম্বদ্ধ এবং শক্তিশালী করিয়াছে এবং ইহার নূতন সম্প্রসারণ সূচী গ্রহণ করিয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় ২.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইলেও প্রকৃত ব্যয় হইয়াছিল ১৫.৩ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৩০.৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়, ইহার মধ্যে ১৬ কোটি টাকা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশনের জন্ত এবং ১৪.৫ কোটি টাকা এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টার-ন্যাশনালের জন্ত বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় এই দুইটি কর্পোরেশনের জন্ত মোট ২২.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়—১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় ইণ্ডিয়ান এয়ার-লাইনস্ কর্পোরেশনের জন্ত, এবং ১৪.৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় এয়ার ইণ্ডিয়া ইন্টার-ন্যাশনালের জন্ত।

জাতীয়করণের পূর্বে ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমানব্যবস্থা নয়টি কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত হইত। স্বভাবতই ইহাদের মধ্যে ক্ষতিকারক প্রতিযোগিতা অব্যাহত থাকিত। জাতীয়করণের ফলে এই নয়টি কোম্পানী লইয়া ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন গঠিত হয়। জাতীয়করণের দরুন প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অপচয়মূলক প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়াছে। অবশ্য ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত এই কর্পোরেশনের বাজেটে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা দেয়। ইহার পর অবশ্য ধীরে ধীরে ঘাটতি হ্রাস পায়। ১৯৬৬-৬৭ সালে ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪.৬ কোটি টাকা। মুদ্রামান হ্রাসই এই ক্ষতির কারণ। ১৯৬৩ সালের মে মাসে ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ কর্পোরেশন শতকরা ১০ ভাগ ভাড়া বৃদ্ধি করে। ১৯৬৭ সালের জুলাই মাসে পুনরায় ভাড়া বৃদ্ধি করা হয়। ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ক্ষতি পূরণ হইয়া আসিবে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা (Transport under Development Planning) : দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিবহণ ব্যবস্থার উপর

নির্ভরশীল। শুধুমাত্র পরিবহণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিলেই চলিবে না, বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থাকে সুসংঘদ করাও প্রয়োজন। সুপরিকল্পিতভাবে পরিবহণ ব্যবস্থাকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে অপচয়মূলক প্রতিযোগিতা বন্ধ হইবে। দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুথম উন্নয়নের পূর্বসর্ত হইল সুসংঘদ পরিবহণ ব্যবস্থা। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার, কৃষি উন্নয়ন এবং দ্রুত শিল্পায়ণের জন্য উন্নত এবং সুসংঘদ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রয়োজন। আর একদিক হইতে উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহা ভারতের আভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণে সহায়তা করিবে।

পরিবহণ সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য ১৯৫২ সালে পরিবহণ নীতি এবং সমন্বয়-সাধন কমিটি (Transport Policy and Co-ordination Committee or Neogi Committee) গঠিত হয়। ১৯৬১ সালে এই কমিটি পরিকল্পনা কমিশনকে তাহার প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করে। শীঘ্রই এই কমিশনের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে। আশা করা যায় ইহাতে সড়ক পরিবহণ এবং রেল পরিবহণের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করা হইবে।

বর্তমানে সকল ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হইতেছে। এই অবস্থায় শুধুমাত্র রেল এবং পথ পরিবহণের সমন্বয় সাধন করিলেই চলিবে না—রেলপথ এবং জলপথের মধ্যেও সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। উপকূলীয় জলপথ রেলপথের পরিপূরক হইতে পারে।

বিভিন্ন প্রকারের পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয়সাধনের গুরুত্ব, পরিকল্পনা কমিশন উপলব্ধি করিয়া প্রথম পরিকল্পনাকালে একটি সুসংঘদ পরিবহণ পরিকল্পনা রচনা করেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করা হয় এবং একই সঙ্গে সকল প্রকার পরিবহণের উন্নতির চেষ্টা করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনায় একদিকে রেল এবং সড়ক পরিবহণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং অপর দিকে রেল এবং জলপথের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করা হয়। সুসংঘদ পরিবহণ ব্যবস্থার প্রভাব ইতিমধ্যেই আমাদের অর্থনীতিতে আমরা অনুভব করিতে পারিতেছি। সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে সুসংঘদ এবং উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা গতির সঞ্চার করে।

প্রশ্নপত্র ও উত্তরসংকেত

1. Give a brief account of the recent attempts made by the Reserve Bank of India to control the volume of bank credit.

(C. U. B. Com. '59) [পৃষ্ঠা ৩৫২-৫৮]

2. Discuss the methods through which the Reserve Bank of

India can control the credit situation. What new powers have been given to the Reserve Bank for controlling currency and credit during the Second plan period ? (C. U. B. A. '59) [পৃষ্ঠা ৩৫২-৩৫৭]

3. Give a critical review of the working of the Reserve Bank of India. (C. U. B. A. '57) [পৃষ্ঠা ৩৪৬-৪৮]

4. Write a critical note on the working of the Reserve Bank of India. (C. U. B. Com. '56) [পৃষ্ঠা ৩৪৬-৪৮]

5. Describe the main features of the selective credit control measures recently introduced in India by the Reserve Bank. Do you think that these measures have succeeded in checking new inflationary forces generated in the economy ? [পৃষ্ঠা ৩৫২-৫৭]

6. Examine briefly the monetary policy of the Reserve Bank of India since 1956. (C. U. B. Com '65) [পৃষ্ঠা ৩৫২-৫৭]

7. "The Reserve Bank of India's monetary policy has been a policy of controlled expansion during the plan period." Explain the main features of this policy. (C. U. B. A. '62) [পৃষ্ঠা ৩৫২-৫৮]

8. Write a note on the Bill Market Scheme. (C. U. B. Com. '64) [পৃষ্ঠা ৩৫৮-৬০]

9. How far do you think the establishment of the State Bank of India has solved the problem of rural banking facilities in the country ? (C. U. B. A. '59) [পৃষ্ঠা ৩৭২-৭৪]

10. Show the aim and scope of the Land Mortgage Bank of India. (C. U. B. Com. '49) [পৃষ্ঠা ৩৬৮-৬৯]

11. Do you advocate the nationalization of the Commercial Banks in India. (C. U. B. A. Hons. '58) [পৃষ্ঠা ৩৭৪-৭৬]

12. Indicate the main features of the scheme of insurance of Bank Deposits recently adopted in India. What are the aims and purpose of the scheme ? (C. U. B. A. '62) [পৃষ্ঠা ৩৬৪-৬৬]

13. Analyse the main features of the present currency system of India. What changes have been recently introduced in the law relating to the paper currency reserve ? (C. U. B. A. '58 [পৃষ্ঠা ৩৮৭-৮৮]

14. Describe the present system of the issue and regulation of the paper currency in India. (C. U. B. Com. '57, '64) [পৃষ্ঠা ৩৮৭-৮৮]

15. Write a note on Sterling Balances. (C. U. B. Com. '63 [পৃষ্ঠা ৩৮১-৮২]

16. Explain the circumstances that led to the devaluation of the Indian Rupee in 1966. What would be the probable effects of devaluation on the Indian economy. [পৃষ্ঠা ৩৮৪-৮৭]

17. Examine the main causes explaining the continuous rise in prices in India. What steps would you suggest for checking this rise ? (C. U. B. A. '62) [পৃষ্ঠা ৩৯৩-৯৭]

18. Show how India has been benefited in recent times by the International Monetary Fund and the World Bank. [পৃষ্ঠা ৩৮৮-৯২]

19. Discuss the main factors that have affected India's balance of payments situation since the initiation of the second plan. (C. U. B. Com. '59) [পৃষ্ঠা ৪০০-৪০৬]

20. Discuss the main features of India's export trade and examine the prospects of increasing our export earning in the near future. (C. U. B. Com. '58) [পৃষ্ঠা ৪০১-৪০৬]

21. What are the causes of the growing deficit in India's balance of payments ? What steps have been taken to meet the situation ? (C. U. B. A. '58) [পৃষ্ঠা ৪০১-৪০৬]

22. What important changes have taken place in the nature, volume and direction of India's foreign trade since independence ? (C. U. B. A. '55, B. Com. '62) [পৃষ্ঠা ৪০১-৪০৬]

23. Discuss the advantages of State Trading in an inflationary situation. Make a short review of the working of the State Trading Corporation of India. [পৃষ্ঠা ৪১৩-১৬]

24. Write a note on the State Trading Corporation of India. [পৃষ্ঠা ৪১৩-১৬]

25. Describe carefully the advantages which will result from the regrouping of Indian Railways as decided by the Government of India. (C. U. B. Com. '52) [পৃষ্ঠা ৪১৮-১৯]

26. Discuss the economics of road and rail competition and examine the measures taken by railways to meet road competition in this country. (C. U. B. Com. '49) [পৃষ্ঠা ৪১৮-২১]

27. Describe the progress of road and railway transport during the Five Year Plan periods. [পৃষ্ঠা ৪১৮-২১]

28. Briefly enumerate the achievements of Air Transport (Civil Aviation) in India since its nationalization in August 1953. [পৃষ্ঠা ৪২২-২৩]

পারিশিষ্ট

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তাবনা

(Prelude to the Fourth Plan)

সাক্ষ্যের পূর্বসূর্তের অভাব এবং চীন ও পাকিস্তান কর্তৃক অতর্কিত আক্রমণের ফলে প্রতিরক্ষা ব্যয় বৃদ্ধির দরুন যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা তৃতীয় পরিকল্পনাকে বার্থতায় পর্যবসিত করে। পর পর দুইটি যুদ্ধ, ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফুর, ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহের সমস্যা এবং বাণিজ্য ব্যালান্সের নৈরাশ্রজনক পরিস্থিতির দরুন স্বল্পকালীন লক্ষ্যমাত্রায় ব্যাপক অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠিত করা হয় এবং অধ্যাপক গ্যাডগিল পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। যে অনিশ্চিত অবস্থা চলিতেছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ঘোষণা করেন যে, ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাস হইতে চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হইবে।

পরিকল্পিত উন্নয়নের দুইটি পর্যায় (Two Phases of Planned Development) : ভারতের সাম্প্রতিক উন্নয়নী প্রয়াসকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৬১-৬২ সাল পর্যন্ত প্রাই প্রথম দশ বৎসরকে উন্নয়নের প্রথম পর্যায় বলা হয়; এই সময় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করিবার জন্ত পরিকল্পিত উন্নয়নী প্রয়াসের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই সময় বিনিয়োগ জাতীয় আয়ের ৭.৬ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১২.২ শতাংশ হয় এবং আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় জাতীয় আয়ের ৫.৩ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৯.৬ শতাংশ হয়। এই সময় জাতীয় আয় বার্ষিক ৪.৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পায় এবং এই পর্যায়ের শেষে মাথাপিছু আয় ১৭.৬ বৃদ্ধি পায়। এই পর্যায়ের শেষদিকে ভারতে শিল্প বিপ্লবের পূর্বাভাস দেখা দেয় এবং সর্বস্তরে নূতন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়।

উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ১৯৬২ সালের শেষ দিকে। এই সময় চীন ভারত আক্রমণ করিয়া আমাদের উন্নয়নী কর্মসূচীকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ১৯৬২ সালের পরবর্তী পাঁচ বৎসরে ভারতীয় অর্থনীতিতে প্রচণ্ড ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয়। সীমান্তে দুই প্রতিবেশী দেশ কর্তৃক পর পর আক্রান্ত হইয়া এবং উপযুক্ত দুইটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দরুন যে অবস্থিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহা আমাদের পরিকল্পিত প্রয়াসকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে। তৃতীয় পরিকল্পনা কালে প্রকৃত জাতীয় আয় মাত্র ১৪.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং মাথাপিছু আয় ১৯৬০-৬১ সালের তুলনায় মাত্র ১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৪-৬৫ হইতে ১৯৬৬-৬৭ সালের মধ্যে মূল্যস্ফুর ৪৬.১ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে প্রকৃত আয় বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাস পায়।

মধ্যবর্তী পর্যায়ের বাৎসরিক পরিকল্পনা (Intermediate Period of Annual Plan) : ১৯৬৮-৬৯ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হইবার পর চতুর্থ-পরিকল্পনার প্রস্তুতি পর্ব শুরু হয়। ১৯৬৯ সালের ১লা এপ্রিল হইতে চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হইবে। ১৯৬৮-৬৯ সালের ২,৩৩৭ কোটি টাকার যে বাৎসরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাহাতে এই সময় জাতীয় আয় ৭ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা হয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের পরিকল্পনা ব্যয় ১৯৬৭-৬৮ সালের প্রত্যাশিত ব্যয় ২২০৫ কোটি টাকা অপেক্ষা সামান্য কম হইবে। ১৯৬৮-৬৯ সালের ২,৩৩৭ কোটি টাকার যে বাৎসরিক পরিকল্পনা করা হইয়াছে তাহাতে ৩০৭ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয় করা হইবে।

১৯৬৮-৬৯ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনা শেষ হইলেই চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু হইবে। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৬৯ সালের মার্চ পর্যন্ত এই অন্তর্বর্তী সময় বাৎসরিক পরিকল্পনার সময় বলিয়া গণ্য করিতে হইবে; সুতরাং এই সময়কে সম্পূর্ণ “পরিকল্পনা বিরতি” (Plan Holiday) বলা ঠিক হইবে না। পরিকল্পনা স্থগিত রাখার অর্থ হইল প্রকৃতপক্ষে বিনিয়োগ স্থগিত রাখা এবং অর্থনৈতিক কাজ-কারবারের পরিমাণ হ্রাস করা। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ বৎসরের তুলনায় ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সাম্প্রতিক মন্দা ইহারই অন্ততম কারণ। পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, ১৯৬৮-৬৯ সালে এমন একটি সুদৃঢ় বিনিয়াদ পাওয়া যাইবে যেখান হইতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়নী প্রয়াস শুরু করা সহজ হইবে। ১৯৬৮ সালের মে মাসে পরিকল্পনা কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনার যে প্রস্তুতি পত্র (Approach Note) দেয় তাহাতে পরিকল্পনার একটি রূপরেখা পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন এবং লক্ষ্যমাত্রা (Fourth Plan's Size and Targets) : অধ্যাপক গ্যাডগিল রচিত চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তুতি নোট জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (National Development Council) কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ইহারই আলোকে চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭০—১৯৭৩-৭৪) চূড়ান্ত রূপ গ্রহণ করিবে। পরিকল্পনা কমিশন মনে করেন যে, ভারতীয় অর্থনীতি চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বার্ষিক ৫ হইতে ৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে। শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করিয়া এবং কৃষিতে নূতন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করিয়া ৫ হইতে ৬ শতাংশ হারে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন কঠিন হইবে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৯৬৮-৬৯ সালের বাৎসরিক পরিকল্পনায় ৫/৬ শতাংশ হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছিল সুতরাং কমিশন বাৎসরিক সম্প্রসারণের যে হার চিন্তা করিয়াছে তাহা বাস্তবোচিত হইয়াছে। শিল্পগত ভিত্তির বিচারে পাকিস্তান ভারতের তুলনায় যথেষ্ট অনগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও গত পাঁচ বৎসরে ইহার বার্ষিক ৫/৬ শতাংশ হারে উন্নয়ন হার বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিগত তিন বৎসরে সিংহলের অর্থনীতি সম্প্রসারণ বৎসরে ৫ শতাংশ হারে

বৃদ্ধি পাইয়াছে; সুতরাং যদি মৌসুমী বায়ু প্রবাহ চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বারবার বিরুদ্ধাচরণ না করে তাহা হইলে সামগ্রিক সম্প্রসারণ ৫ হইতে ৬ শতাংশ হারে পূরণ করা কঠিন হইবে না।

কৃষির ক্ষেত্রে উন্নয়নের হার বার্ষিক ৫ শতাংশ হইলেও শিল্পের ক্ষেত্রে ইহা ৮ হইতে ১০ শতাংশ হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫২-৬০ এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে শিল্পের ক্ষেত্রে বার্ষিক সম্প্রসারণের হার ছিল ৮ হইতে ৯ শতাংশ কিন্তু শেষ তিন বৎসরে মন্দাজনিত কারণে সম্প্রসারণ হার হ্রাস পাইয়া ৩/৪ শতাংশ হয়। সুতরাং আমরা যদি চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সম্প্রসারণের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাইতে চাই তাহা হইলে বর্তমান সম্প্রসারণ হারকে তিনগুণ বৃদ্ধি করিতে হইবে।

কৃষির ক্ষেত্রে বার্ষিক ৫ শতাংশ হারে সম্প্রসারণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অবশ্য ১৯৬৫-৬৬ এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে পর পর খরা দেখা দেওয়ায় সম্প্রসারণের হার বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। নূতন কৃষিকৌশল প্রয়োগ করিয়া ইতিমধ্যেই সফল পাওয়া গিয়াছে এবং আশা করা যায় যে, সর্তকতার সহিত কৃষির যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হইয়াছে তাহা ফলপ্রসূ হইবে।

কমিশন চতুর্থ পরিকল্পনাকালে স্বয়ংনির্ভরশীলতার নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে চতুর্থ পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া বর্তমানের অর্ধেক করিতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া অর্ধেক করিতে হইলে রপ্তানির পরিমাণ বার্ষিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ১৯৬৬ সালের মুদ্রামূল্য হ্রাসের পর ভারতের রপ্তানির পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে; সুতরাং বার্ষিক ৭ শতাংশ রপ্তানি বৃদ্ধি করা খুবই কঠিন কাজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্ততিপত্রে পরিকল্পনার আয়তন সম্পর্কে নির্দিষ্ট করিয়া কিছু বলা হয় নাই কিন্তু যে লক্ষ্যমাত্রার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন নির্ধারণ করা কঠিন নয়। আয় এবং উৎপাদনের ৫ হইতে ৬ শতাংশ হার বৃদ্ধির জ্ঞাত আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বর্তমানের ৮ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২ শতাংশ করিতে হইবে। ইহার ভিত্তিতে এবং বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া অর্ধেক করিতে হইবে ইহা মনে রাখিয়া আমরা চতুর্থ পরিকল্পনার আয়তন নির্ধারণ করিতে পারি। বিগত কয়েক বৎসরে জাতীয় আয় গড়ে ৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববর্তী বৎসরের তুলনায় ১৯৬৮-৬৯ সালে ৩ শতাংশ হারে জাতীয় অর্থনীতির সম্প্রসারণ হইলে ঐ বৎসর জাতীয় আয় ৩১,২০০ কোটি টাকা হইবে। এই ভিত্তিতে ১৯৬৮-৬৯ সালে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২,৬০০ কোটি টাকা হইবে। বৈদেশিক সাহায্য ১৬০০ কোটি টাকা হইতে ১৬৫০ কোটি টাকার মধ্যে থাকিবে (PL ৪৮০ আমদানি ইহার অন্তর্ভুক্ত); বর্তমানে যে পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া যাইতেছে তাহা অব্যাহত থাকিবে ইহা ধরিয়া লইলে চতুর্থ পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে নীচ বৈদেশিক

সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৪০০০ কোটি টাকা। যদি চতুর্থ পরিকল্পনাকালে সঞ্চয়ের হার ৮ শতাংশ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ১২ শতাংশ করিতে হয় এবং জাতীয় আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে হয় তাহা হইলে ১৮,৫০০ কোটি টাকা সঞ্চয় করার প্রয়োজন হইবে। মোট সঞ্চয়ের সহিত মোট বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ যোগ করিলে পরিকল্পনার মোট বিনিয়োগের হিসাব পাওয়া যাইবে। চতুর্থ পরিকল্পনায় আনুমানিক ২২,৫০০ কোটি টাকা (১৮,৫০০ কোটি + ৪০০০ কোটি) বিনিয়োজিত হইবে।

পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করিতে হইলে মূলধন-উৎপাদনের অনুপাত (Capital-output Ratio) ২.৫ : ১ হইবে। বিগত ১৭ বৎসরে মূলধন-উৎপাদন অনুপাত ছিল ৪ : ১ ইহার অর্থ হইল কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে প্রকল্পগুলি দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পরিকল্পনার তুলনায় স্বল্প প্রগাঢ় (less intensive) হইবে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন পরিকল্পনা কমিশন পূর্বের তুলনায় স্বল্প প্রগাঢ় মূলধন-উৎপাদন অনুপাত নির্বাচন করিল। ইহার কারণ হইল যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে কমিশন অধিক নূতন উৎপাদন-ক্ষমতা সৃষ্টি করিতে আগ্রহী নয়। সেই জগৎ নূতন উৎপাদন ক্ষমতা সৃষ্টি করার পরিবর্তে কমিশন পূর্বতন অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহারেই অধিক আগ্রহী। সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা থাকায় উহার পরিপূর্ণ ব্যবহারের উপর জোর দিতে হইবে। চতুর্থ পরিকল্পনা সরকারীভাবে স্থগিত থাকিলেও কৃষির ক্ষেত্রে নূতন কৃষিকৌশল প্রয়োগ করা হইয়াছে এবং ইহার ফলে নূতন উৎপাদন ক্ষমতার সৃষ্টি হইবে। কৃষির অচলাবস্থার অবসান করিতে হইলে নূতন উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার করিতে হইবে। খাদ্যশস্যের সর্বনিম্ন মূল্য বাঁধিয়া দিলে উৎপাদকগণ উৎসাহ পাইবে। একর প্রাতি উৎপাদন বৃদ্ধি চতুর্থ পরিকল্পনাকালে খুব একটা উচ্চাশা বলিয়া মনে হয় না। নূতন কৃষি কৌশল প্রয়োগ করিয়া কৃষি ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ উৎপাদন বৃদ্ধি খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

চতুর্থ পরিকল্পনার গঠন-কৌশল (Strategy of the Fourth Plan) :
চতুর্থ পরিকল্পনার গঠন-কৌশলের নির্মাতা হইলেন অধ্যাপক গ্যাড্‌গিল। গ্যাড্‌গিল টেকনিকের ভিত্তি হইল নূতন কৃষি কৌশল। শিল্পক্ষেত্রে গ্যাড্‌গিল যে টেকনিক গ্রহণ করিয়াছেন তাহার সহিত ফরাসী নির্দেশমূলক পরিকল্পনার (Indicative Planning) সাদৃশ্য রহিয়াছে।

নূতন কৃষিকৌশলের দুইটি প্রধান স্তর রহিয়াছে। প্রথমত, স্থির হইয়াছে যেসকল অঞ্চলে বর্ধিত উৎপাদনের সর্বাধিক সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই সকল অঞ্চলে প্যাকেজ কর্মসূচী (Package Programme) চালু করা হইবে। উন্নত বীজ, শস্যনাশক কীট নিয়ন্ত্রণ, উন্নত সেচ পদ্ধতি এবং উন্নত সারের কাম্য প্রয়োগ প্যাকেজ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, জলসেচ সুবিধা প্রাপ্ত অঞ্চলে দানাশস্যের ক্ষেত্রে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করিয়া দুইটি ফসল উৎপন্ন করিতে হইবে।

গ্যাড্‌গিল পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেখিতে পাওয়া যাইবে। ভারী শিল্পের ক্ষেত্রে গ্যাড্‌গিল উন্নয়নী প্রয়াস শিথিল করিবার পক্ষপাতি নয়। তিনি মনে করেন যে, পরিণামে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্ত এই শিল্পগুলির উন্নয়ন করা প্রয়োজন। প্রস্তুতিপত্রে বলা হইয়াছে যে, লৌহ ও ইস্পাতের ক্ষেত্রে বর্তমান উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি হইতে বুঝা যায় যে, কিছু পরিমাণ উন্নয়ন প্রচেষ্টাযুক্ত হইলে রপ্তানি যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইবে। গ্যাড্‌গিল মনে করেন যে, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, সিমেন্ট এবং ধাতব পদার্থ রপ্তানির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। গ্যাড্‌গিল আশা করেন যে, চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রপ্তানি বার্ষিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা এবং বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ কমাইয়া অধিক করা সম্ভব হইবে।

উন্নয়নকামী প্রতিবেশী দেশগুলির তুলনায় ভারতের সঞ্চিত লৌহ আকরিক এবং কয়লার পরিমাণ অনেক বেশি। লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে ঐ সকল দেশের তুলনায় ভারতের কারিগরী দক্ষতাও অনেক বেশি। সুতরাং আমরা লৌহ, ইস্পাত এবং অগ্নাশ্রু ধাতব দ্রব্য রপ্তানি করিতে পারিব কিন্তু সমস্তা হইল পাশ্চাত্য প্রতিযোগী দেশগুলির তুলনায় আমাদের দেশের দ্রব্যের মূল্য অনেক বেশি। অধ্যাপক গ্যাড্‌গিল এই সমস্তার গভীর তলদেশে প্রবেশ করেন নাই কিন্তু সাধারণভাবে নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যদি উন্নয়নকারী দেশসমূহে নূতন নূতন দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে চাই তাহা হইলে স্থগিত লেনদেন ব্যবস্থা (Deferred Payment Systems) প্রবর্তন করিতে হইবে। গ্যাড্‌গিল নূতন কৃষিকৌশলের উপর গুরুত্ব আরোপ করিলেও শিল্পের কর্মসূচীকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন নাই। ভবিষ্যতে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন মিটাইবার জন্তই নয়—রপ্তানি আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেও লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ধাতব দ্রব্য উৎপাদিত হইবে। ইহা হইলে আমাদের বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরতা হ্রাস পাইবে।

ডাঃ ভি.কে. আর. ভি. রাও সম্প্রতি চতুর্থ পরিকল্পনার যে টেকনিক দিয়াছেন উহার সহিত গ্যাড্‌গিল টেকনিকের তুলনা করা যাইতে পারে। ডাঃ রাও নূতন কৃষি কৌশলকে জোরদার করিবার জন্ত মাঝারি এবং ছোট জলসেচ পরিকল্পনা, ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচী এবং শস্য সংরক্ষণের জন্ত শস্যভাণ্ডার স্থাপনকে ইহার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। লৌহ ও ইস্পাত, সিমেন্ট ইত্যাদির উদ্ভূত উৎপাদন জলসেচ, ভূমি উন্নয়ন কর্মসূচী এবং গুদামঘর নির্মাণে ব্যবহৃত হইলে তবেই কৃষির ক্ষেত্রে গতিবেগের সঞ্চার হইবে। ডাঃ রাও মনে করেন যে, উন্নয়নকামী দেশে আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবেই। সুতরাং প্রয়োজনীয় আমদানির সহিত রপ্তানির সামঞ্জস্য রাখিবার জন্ত রপ্তানির পরিমাণ ৪০ হইতে ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ডাঃ রাও-এর হিসাববহুযায়ী চতুর্থ পরিকল্পনাকালে রপ্তানি বার্ষিক ৮ হইতে ৮.৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাইবে। অধ্যাপক গ্যাড্‌গিলের অনুমান অপেক্ষা ইহা ১ হইতে ১.৫ শতাংশ অধিক। অবশ্য

রপ্তানি বৃদ্ধির কোন নূতন টেকনিকের কথা ডাঃ রাও বলেন নাই। রপ্তানিশিল্পে কর হ্রাস এবং জাহাজ পরিবহণ ব্যয়ের জ্ঞাত অর্থ সাহায্যদানের নির্দেশ তিনি দিয়াছেন।

চতুর্থ পরিকল্পনার তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য (Three main objectives of the Fourth Plan) : চতুর্থ পরিকল্পনার প্রস্তুতিপত্রে তিনটি প্রধান উদ্দেশ্যের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমত, স্বয়ং নির্ভরশীলতার প্রতি অগ্রসর হইতে হইবে, দ্বিতীয়ত, উন্নয়নের সুবিধা বিভিন্ন অঞ্চলে সমানভাবে বণ্টন করিতে হইতে এবং তৃতীয়ত, স্থিতিশীলতার সহিত সম্প্রসারণ করিতে হইবে (growth with stability) এই তিনটি উদ্দেশ্যের মধ্যে স্বয়ং নির্ভরশীলতার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিকল্পনার স্বয়ং নির্ভরশীলতার লক্ষ্যের সহিত পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্যের তুলনা করা যাইতে পারে। প্রথম পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে স্বয়ং নির্ভরশীলতা অর্জন করা। দ্বিতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করা আর তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল স্বয়ং নির্ভরশীল সম্প্রসারণ। কতকগুলি অল্পকাল শক্তির প্রতিক্রিয়ার প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে পূরণ হইয়াছিল। ইহা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় রাজনৈতিক মন্ত্র প্রচারের ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল—অর্থনৈতিক বাস্তবতার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না।

স্বয়ং নির্ভরশীলতার মূলমন্ত্র হইল যে, বৈদেশিক সাহায্যের উপর ক্রমাগত নির্ভর করিয়া দেশের উন্নয়ন করা উচিত নয়। সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ বৎসরে যাহাতে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ হ্রাস করিয়া বর্তমানের তুলনায় অর্ধেক করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য ইহার জ্ঞাত আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি করিতে হইবে।

অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের সহিত কিছু প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং কাঁচামালের আমদানি বৃদ্ধি অপরিহার্য। যাহাতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি না হয় তাহার প্রতি সর্বতক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রাস্টিক দ্রব্য, ঔষধপত্রাদি, সিনথেটিক সূক্ষ্মসূত্র কাগজ প্রভৃতি নূতন নূতন দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করিয়া স্বয়ং নির্ভরশীলতা অর্জন করিতে হইবে। লৌহ ও ইস্পাত, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অগ্নাত ধাতুদ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাইলে রপ্তানি-বাণিজ্য যথেষ্ট সম্প্রসারিত হইবে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ মূল্যান্তর অত্যধিক বলিয়া রপ্তানি সম্প্রসারণ করা খুব সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।

চতুর্থ পরিকল্পনার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল সুসম আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। পরিকল্পিত উন্নয়নের সুবিধা যতদূর সম্ভব সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। সমাজের দুর্বল এবং দরিদ্র সম্প্রদায় যাহাতে উন্নয়নের কিছু পরিমাণ সুযোগ লাভ করে তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রশ্ন হইল গ্যাড্‌গিল পরিকল্পনা কৌশল প্রয়োগ করা হইলে কি এই সকল উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব হইবে?

গ্যাড্‌গিলের শিল্প পরিকল্পনা কৌশল উদ্বোধিত। সৃষ্টিতে উৎসাহদান করিয়া মিশ্র অর্থনীতির পরিচালনায় সহায়তা করিবে। বেসরকারী ক্ষেত্রে সাফল্যাভ করিয়াছে এইরূপ উদ্বোধিতাদিগকে সর্বাধিক সুযোগ দেওয়া হইবে। দেশের বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি অধিকতর অভিজ্ঞ এবং সুসংগঠিত। যদি অতীত কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদান করা হয় তাহা হইলে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি সম্প্রসারিত হইবে সত্য কিন্তু নবগঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়ন ব্যাহত হইয়া যাইবে। এই নীতির দরুন কিছু পরিমাণ আঞ্চলিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হইলেও অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

নূতন কৃষিকৌশলের দরুন ভারতের ১৫টি জেলা প্যাকেজ কর্মসূচীর সুবিধা পাইবে কিন্তু ইহা উন্নয়নের সমবর্তন নীতির পরিপন্থী। নূতন কৃষি কৌশল সাফল্যাভ করিলে প্যাকেজ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলের কৃষক অগ্রাণু অঞ্চলের কৃষকদের তুলনায় উচ্চ জীবন-যাত্রার মানের অধিকারী হইবে।

চতুর্থ পরিকল্পনার শেষ উদ্দেশ্য হইল স্থিতিশীল সম্প্রসারণ। ইহা নূতন কোন লক্ষ্য নয় কারণ আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্যমাত্রায় সামঞ্জস্য রহিয়াছে। বিগত ৩ বৎসরে ৪৬ শতাংশ মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু প্রস্তুতিপত্রে মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনিবার জন্য কোন নির্দিষ্ট নীতি গ্রহণের কথা নাই।

৫ অথবা ৬ শতাংশ হারে অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়ন খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা না আনিতে পারিলে এই উন্নয়নের কোন অর্থই থাকিবে না। আমাদের পরিকল্পনা গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা এবং ইহার চরম সাফল্য নির্ভর করে জনগণের উচ্চাঙ্গে অংশগ্রহণের মাধ্যমে। স্থিতিশীল সম্প্রসারণ ঘটিলে তবেই কল্যাণমূলক সম্প্রসারণের আদর্শ পূরণ হইবে। মূল্যস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে স্থিতিশীলতা অর্জন করা কঠিন হইবে। তবুও আশা করা যাইতে পারে যে, নূতন কৃষিকৌশল প্রয়োগ করিয়া কৃষির ক্ষেত্রে নূতন গতিবেগের সঞ্চার হইলে এবং শিল্পের অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার ঘটিলে ভারতীয় অর্থনীতি স্থিতিশীল সম্প্রসারণের পথে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হইতে পারিবে।

বাণিজ্য ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (Social Control of Commercial Banks)

যুদ্ধোত্তর কালে সমগ্র ব্যাঙ্কব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং জনগণের উপর ব্যাঙ্ক বিপর্যয়ের ক্ষতিকর প্রভাব দূর করিয়া ব্যাঙ্কব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪২ সালে ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন (Banking Companies Act) পাশ করা হয়। ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইন ভারতের ব্যাঙ্কব্যবস্থায় একরূপতা ও সংবদ্ধতা আনিয়াছে এবং আমানত সংগ্রহ ও ঋণদানের ব্যাপারে এক সুনির্দিষ্ট নীতির প্রবর্তন করিয়াছে।

তথাপি মনে করা হয় যে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অগ্রাধিকারের সহিত ঋণ বণ্টনের অধিকতর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দেশের অর্থনৈতিক জীবনের কেন্দ্রস্থলে ব্যাঙ্কব্যবস্থা রহিয়াছে বলিয়া ইহা একচেটিয়া প্রবণতা, ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ও সম্পদের অপব্যবহার রোধ এবং সম্প্রসারণ হার চরম কাম্য স্তরে আনিয়া দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করিবে।

পরিপূর্ণ জাতীয়করণ করা হইলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সমস্ত ক্রটি-বিচ্যুতি দূর করা যাইবে সত্য কিন্তু ইহার ফলে প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সহায়সম্বলের উপর অত্যধিক চাপ পড়িবে। এই কারণে স্থির হইয়াছে এরূপ কার্যসূচী প্রবর্তন করা হইবে যাহার ফলে বাণিজ্য ব্যাঙ্কগুলির কার্যাবলীর উপর সক্রিয় সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হয়। ব্যাঙ্কব্যবস্থার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তিনটি উদ্দেশ্য আছে : (ক) ব্যাঙ্কব্যবস্থার পরিধি বৃদ্ধি এবং কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে ঋণ সম্প্রসারণ করা ; (খ) রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করা যেমন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহের স্ফূর্ত রূপায়ণ এবং সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন ; (গ) ঋণদান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পরিচালক সভায় ব্যাপকতর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মিঃ পানেন্ডিকার (Mr. V. A. Pai Panandikar) যে রিপোর্ট সরকারের নিকট দাখিল করিয়াছেন তাহাতে পরিপূর্ণ জাতীয়করণের সুবিধা-অসুবিধার কথা চিন্তা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জাতীয়করণের ফলে অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে। মিশ্র অর্থনীতির সহিত ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সামঞ্জস্যবিধান করা যায় না। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ এবং তত্ত্বাবধানে থাকিয়া বেসরকারী ব্যাঙ্ক সামাজিক উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারে এবং সেই সঙ্গে ব্যক্তি এবং উद्यোক্তাদিগের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নমনীয়তাও রক্ষা করিতে পারিবে।

অর্থনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিবে এবং ইহা একদিকে ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যে এবং অপর দিকে ব্যবসায় এবং শিল্পের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত যোগসূত্র ব্যাহত করিবে। বিনিয়োগকারীর মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে আমানত বৃদ্ধি ব্যাহত হইবে এবং উহা সংগঠিত টাকার বাজার হইতে অসংগঠিত টাকার বাজারে চলিয়া যাইবে। ব্যাঙ্কব্যবস্থা জাতীয়করণ করা হইলে উহার উপর রাজনৈতিক চাপ আসিবে এবং ঋণদানের ব্যাপারে অর্থনৈতিক বিবেচনার পরিবর্তে রাজনৈতিক বিবেচনা অগ্রাধিকার লাভ করিবে। প্রশাসনিক দিক হইতে বিচার করিয়া বলা হয় যে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইলে প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিবে এবং বাঁধাধরা নিয়মশাসিত আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের উদ্ভব হইবে। ইহার ফলে ব্যাঙ্কার এবং মন্ত্রকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইবে। অতিরিক্ত সাবধানতা দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধার সৃষ্টি করিবে। আর্থিক দিক হইতে বিচার করিলে বলা যায় যে, বাণিজ্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করা হইলে

ব্যাঙ্কের বর্তমান অংশীদারদিগকে ক্ষতিপূরণ দিবার সমস্তা রহিয়াছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হইলে জাতীয় বাণিজ্য, বৈদেশিক সাহায্য এবং বৈদেশিক মূলধন প্রবাহের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে।

পানেন্ডিকর রিপোর্ট ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবী নাকচ করিলেও ভারতের বেসরকারী ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্রটিসমূহ অগ্রাহ্য করিতে পারেন নাই। এই রিপোর্টে স্বীকার করা হইয়াছে যে, নূতন উত্তোজনাগণ পর্যাপ্ত পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হয়। ব্যাঙ্কগুলি শুধুমাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ঋণ গ্রহীতাদের চাহিদা মিটাইতেই আগ্রহ প্রকাশ করে। এই রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, বাণিজ্য ব্যাঙ্ক কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে এবং ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। মোট ব্যাঙ্কঋণের এক শতাংশেরও কম কৃষি পাইয়া থাকে। ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রেও ব্যাঙ্কঋণ আশাহীনরূপে নয়। দেশের শিল্পোৎপাদনের ৪০ শতাংশ ক্ষুদ্রশিল্প হইতে পাওয়া যাইলেও ইহা ব্যাঙ্ক কর্তৃক শিল্পক্ষেত্রে প্রদত্ত ঋণের মাত্র ৬ শতাংশ পাইয়া থাকে। এই সকল দোষত্রুটি দূর করিবার জন্ত পানেন্ডিকর বাণিজ্য ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের সুপারিশ করেন।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ হইল ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অথবা প্রস্তাবিত জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) কর্তৃক ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্প্রসারণ। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পার্লামেন্টে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিল উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। পরে ইহা আইনে পরিণত হয়।

ব্যাঙ্ক সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আইনের দুইটি পর্যায় আছে : প্রথমত, ঋণদান সংক্রান্ত সঠিক নীতি নির্ধারণের জন্ত জাতীয় ঋণ পরিষদ (National Credit Council) গঠন করিতে হইবে এবং দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী গঠনে পরিবর্তন করা হইবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যাঙ্কঋণের চাহিদা নির্ধারণ করা এবং ঋণ বণ্টন ও বিনিয়োগের ব্যাপারে ক্ষুদ্রশিল্প, কৃষি এবং রপ্তানিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সর্বভারতীয় পর্যায়ে জাতীয় ঋণ পরিষদ গঠন করা হইতেছে। পরিষদ পরিকল্পনার অগ্রাধিকারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঋণ বণ্টনের ব্যাপারে সহায়তা করিবে। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকার জাতীয় ঋণ পরিষদ গঠন করেন।

জাতীয় ঋণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা ২৫-এর অধিক হইবে না। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর যথাক্রমে ইহার চেয়ারম্যান এবং ভাইস গঠন চেয়ারম্যান। পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, কেন্দ্রীয় অর্থ-দপ্তরের সেক্রেটারী এবং কৃষি পুনঃঅর্থসরবরাহ কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পরিষদের তিন জন স্থায়ী সদস্য। বাকী ২০ জন সদস্য বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, সমবায়, বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্রশিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির প্রতিনিধিত্ব করিবেন। ইহাদের কার্যকাল ৩ বৎসর স্থায়ী হইবে।

জাতীয় ঋণ পরিষদের প্রধান প্রধান কার্য হইল : (ক) নির্দিষ্ট সময় পর পর অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কঋণের চাহিদা নির্ধারণ করা, (খ) সহায়সম্বলের কথা বিবেচনা করিয়া ঋণদান এবং বিনিয়োগের ব্যাপারে অগ্রাধিকার কার্য প্রদান করা হইবে ; বিশেষ করিয়া কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে যাহাতে প্রয়োজনীয় ঋণের অভাব না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিতে হইবে, (গ) বাণিজ্য ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং বিশেষীকৃত ঋণদান সংস্থাগুলির (Specialised Agencies) ঋণদান এবং বিনিয়োগ নীতির মধ্যে এরূপভাবে সমন্বয় সাধন করিতে হইবে যাহাতে সম্পদের কার্য ব্যবহার করা যায় এবং (ঘ) চেয়ারম্যান এবং সহকারী চেয়ারম্যান কর্তৃক উত্থাপিত অগ্রাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিও বিবেচনা করা যায়। বৎসরে অন্ততঃ দুইবার পরিষদের অধিবেশন বসিবে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর অতিরিক্ত আইনগত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অতীতে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমানতকারীর স্বার্থরক্ষা করা। প্রস্তাবিত বিলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর যে নূতন ক্ষমতা প্রদান করা হইবে তাহার অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ এবং কার্যকরী হইবে।

নূতন আইনানুসারে বাণিজ্য ব্যাঙ্ক পরিচালনায় মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হইবে। প্রত্যেক ব্যাঙ্কে একজন করিয়া পুরাসময়ের জ্ঞাত চেয়ারম্যান নিয়োগ করিতে হইবে। পেশাগত ব্যাঙ্কারই চেয়ারম্যান হইতে পারিবে—কোন শিল্পপতি ঐ পদ পাইবে না। যদি ব্যাঙ্কের মনোনীত প্রার্থী রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে না হয় তাহা হইলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিজ মনোনীত প্রার্থী নিয়োগ করিবার এবং প্রয়োজন বোধ করিলে চেয়ারম্যানকে পদচ্যুত করিবার ক্ষমতা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের থাকিবে। প্রয়োজন দেখা দিলে সরকার কোন ব্যাঙ্কের কার্যভার সহস্বে গ্রহণ করিতে ইতস্তত করিবেন না। যদি কোন ব্যাঙ্ক ক্রমাগত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নূতন নির্দেশানুক নীতি অগ্রাহ্য করিতে থাকে অথবা যদি মনে করা হয় যে, বিশেষ এলাকায় ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ের অধিকতর সুবিধার জ্ঞাত কোন ব্যাঙ্কের কার্যভার সরকারের গ্রহণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে সরকার তাহা করিতে বিধা করিবেন না।

নূতন আইন কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কাজ করিবে। প্রারম্ভিক পর্যায়ে যে সকল ব্যাঙ্কের আমানত ২৫ কোটি টাকার উপর তাহাদের ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ প্রযোজ্য হইবে এবং ধীরে ধীরে সকল ব্যাঙ্কের উপর উহা প্রসারিত হইবে।

এই বিলের অগ্রতম উদ্দেশ্য হইল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহিত ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর যে সম্পর্ক আছে তাহা ছিন্ন করা। ইহা একটি কার্যসংস্কার সন্দেহ নাই কিন্তু প্রস্তাবিত কর্মসূচী এই উদ্দেশ্য সাধনে কতদূর সাফল্য লাভ করিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীতে কয়েকজন কৃষি, ক্ষুদ্রশিল্প প্রভৃতির প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া ব্যাঙ্কের কার্যাবলীতে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা যাইবে বলিয়া মনে হয় না।

কৃষির জন্ত ব্যাঙ্ক ঋণের সর্বনিম্ন অনুপাত নির্ধারণ করিয়া দিলে অধিকতর সুফল পাওয়া যাইত।

বাণিজ্য ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বলিতে শুধুমাত্র বেসরকারী ব্যাঙ্কের উপর নিয়ন্ত্রণ বুঝায় না। বৃহৎ বেসরকারী ব্যবসায়কেও প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ঋণদান সংস্থার উপরও প্রযোজ্য হইবে।

সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল কথা হইল দেশের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করিয়া ব্যাঙ্ক ঋণের বণ্টন করিতে হইবে। বর্তমানে ইহা হইতেছে না। বর্তমানে ব্যাঙ্কগুলি কায়মী স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে বলিয়া দেশের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঋণ সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিয়াছে এবং ইহার ফলে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে ভারসাম্যহীনতা বৃদ্ধি পাইতেছে। সামাজিক নিয়ন্ত্রণবিধির দ্বারা এই ত্রুটি দূর করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

সমালোচনা (Criticism) : বাণিজ্য ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নানারূপ সমালোচনা করা হইয়াছে। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ডাঃ আর. কে. হাজারী (Dr. R. K. Hazari) ব্যাঙ্কের সামাজিক নিয়ন্ত্রণের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কাম্য সংস্কার সাধন করিতে পারিবে না। তাঁহার মতে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করা জাতীয়করণ করা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। তিনি প্রস্তাবিত জাতীয় ঋণ পরিষদের কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন এবং দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় ইহাকে একটি অপ্রয়োজনীয় সংস্থা বলিয়া বর্ণনা করেন। প্রথ্যাত অর্থনীতিবিদ ডাঃ সরোজকুমার বসুও এই অভিমত পোষণ করেন।

শ্রী সি. এইচ. ভাবার (C. H. Bhabha) মতে “ব্যাঙ্কের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ” সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজের হ্রায় একটি অস্পষ্ট ধারণা—কোথাও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই। ব্যাঙ্ক সমূহের কার্যাবলী ত্রুটি বিচ্যুতির উদ্দেশ্যে একথা তিনি বলেন না কিন্তু সরকারী ক্ষেত্রে যে ধরনের ভুল ভ্রান্তি হয় তাহার তুলনায় ইহা নগণ্য। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকর করার দোহাই দিয়া কোন হটকারী পরিবর্তন ভারতের অর্থনীতিতে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করিতে পারে। বর্তমানের বিশৃঙ্খল অর্থব্যবস্থা এবং কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রতি উপেক্ষার জন্ত দায়ী হইল সরকারের ত্রুটি পূর্ণ ফিসক্যাল এবং আর্থিক নীতি এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যর্থতা।

সামাজিক করণের দোহাই দিয়া যাহাতে ব্যাঙ্ক “রাজনীতিকরণ” করা না হয় অথবা যাহারা মূলধন যোগান দিয়া বুঁকি লইয়া ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উন্নয়নের সহায়তা করিয়াছে তাহাদের অধিকার যেন অনায়াস ভাবে সঙ্কুচিত করা না হয় তাহা দেখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে কঠোর নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বর্তমান প্রবণতাও হইল ব্যক্তিগত উদ্যোগ প্রতিযোগিতাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র

Indian Economics—Pass (B.A.)

1965

1. Examine the causes of the rising food prices in India in the present times.

বর্তমানে ভারতে খাদ্যব্যয়ের যে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহার কারণগুলি আলোচনা কর।

2. Examine the progress of co-operative farming in India.

ভারতে সমবায় চাষের যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর।

3. Give an account of the industrial development of India during the Plan period.

পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতে যে শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়াছে তাহা বর্ণনা কর।

4. Give a critical review of the monetary policy of the Reserve Bank of India since the inception of the Second Five Year Plan.

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে আর্থিক নীতি অনুসরণ করিয়াছে তাহার পর্যালোচনা কর।

5. Examine the main features of the Industrial Development Banks that has been recently established in India.

সাম্প্রতিক কালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

6. Discuss the role of deficit financing in financing economic development of India during the Plan period.

পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা আলোচনা কর।

7. Discuss the main features of the present monetary standard of India.

ভারতের বর্তমান মুদ্রামানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

8. Explain the main features of the present machinery for the settlement of industrial disputes in India.

ভারতে বর্তমানে শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির উপায়সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

9. Examine the main features of the fiscal policy adopted by the Government of India since 1949-50.

১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ভারত সরকার যে শুল্কনীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

10. Discuss the case for an Expenditure Tax in India in the present times.

বর্তমানে ভারতে ব্যয়কর স্থাপনের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

Indian Economics—Pass (B. A.)

1966

1. What are the main sources of supply of credit in India's rural areas? What part is the Reserve Bank of India playing in the provision of agricultural credit?

ভারতের গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের প্রধান উৎসগুলি কি কি? কৃষি ঋণদানের ক্ষেত্রে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কি ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে?

2. Give a critical estimate of the achievements of the Third Five Year Plan.

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অগ্রগতির পর্যালোচনা কর।

3. Discuss the present position and problems of the Steel Industry in India.

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাতের বর্তমান অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

4. Discuss the financial problems of the small and medium sized Industries in India. Give in this connection an account of the part played by the State Finance Corporation in the financing of such industries.

ভারতীয় ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্পসমূহের আর্থিক সমস্যার আলোচনা কর। ঐ ধরনের শিল্পে অর্থসরবরাহের ক্ষেত্রে রাজ্য অর্থ-কর্পোরেশনের ভূমিকা আলোচনা কর।

5. Examine the factors which are hampering the flow of exports from India. Discuss the steps that have been taken to increase the flow of India's exports in recent years.

ভারতের রপ্তানি সম্প্রসারণে যে সকল বাধা রহিয়াছে তাহার আলোচনা কর। সাম্প্রতিককালে রপ্তানি সম্প্রসারণের জন্ত ভারতে যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

6. Examine the main recommendations of the Fourth Finance Commission of India.

ভারতের চতুর্থ অর্থ-কমিশনের প্রধান সুপারিশগুলি আলোচনা কর।

7. Are you in favour of nationalisation of Indian Commercial Banks in the present times? Give reasons for your answer.

বর্তমান সময়ে তুমি কি ভারতীয় বাণিজ্য ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ সমর্থন কর? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

8. Discuss the case for and against State trading in foodgrains in India in the present times.

বর্তমানকালে ভারতে খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও।

9. Write a short note on the size of the Fourth Five Year Plan of India.

ভারতের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আয়তন সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

10. How would you propose to deal with difficulties in the balance of payment position of India.

ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্সে যে অসুবিধার সৃষ্টি হইয়াছে কিরূপে তুমি তাহার প্রতিবিধান করিতে চাও?

Indian Economics—Pass (B.A.)

1967

1. What are the difficulties in the way of marketing agricultural produce in India? What remedies have been proposed to deal with the same?

ভারতে কৃষিপণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থার অসুবিধাগুলি কি কি? উহাদের প্রতিবিধানের জন্ত কি কি প্রস্তাব করা হইয়াছে?

2. Write a note on the different forms in which external aid has been made available to India in implementing the Five Year Plans.

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করার জন্ত বৈদেশিক সাহায্য যে সকল বিভিন্ন আকারে ভারত পাইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

3. Examine the causes of the recent price rise in India. What remedial measure would you suggest for holding the price line?

ভারতে বর্তমান মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণগুলি আলোচনা কর। মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে?

4. Describe the various social security measures for industrial labour adopted by the Government of India.

ভারত সরকার শিল্প-শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্ত যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বর্ণনা কর।

5. Explain the objectives of the devaluation of the rupee which took place in June, 1966.

১৯৬৬ সালের জুন মাসে যে মুদ্রামান হ্রাস করা হয় তাহার উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা কর।

6. Describe the present composition and direction of India's foreign trade. State briefly the present policy of the Government of India with regard to (a) exports and (b) imports.

ভারতের বর্তমান বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন এবং গতির আলোচনা কর। (ক) রপ্তানি এবং (খ) আমদানি সম্পর্কে সংক্ষেপে ভারত সরকারের বর্তমান নীতির আলোচনা কর।

7. Discuss the objectives and functions of the Industrial Development Bank of India. In what respects does this institution differ from Industrial Finance Corporation of India ?

ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী আলোচনা কর। ভারতীয় অর্থ কর্পোরেশনের সহিত ইহার পার্থক্য কোথায় ?

8. Discuss the present position and problems of the Indian Jute Mill Industry.

ভারতীয় পাট শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা কর।

9. Examine the present structure of taxation in India. How would you like to modify it and why ?

ভারতের বর্তমান কর-কাঠামো আলোচনা কর। কেন এবং কি পদ্ধতিতে ইহার সংশোধন করিতে চাও ?

10. Write short notes on any two of the following :

(a) Selective Credit Control by the Reserve Bank of India.

(b) The Scheme of Insurance of Bank Deposits recently introduced in India.

(c) The Food Corporation of India.

নিম্নলিখিত যে কোন দুইটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা রচনা কর—

(ক) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্বাচনমূলক ঋণ নিয়ন্ত্রণ।

(খ) ভারতে সাম্প্রতিককালে প্রবর্তিত ব্যাঙ্ক আমানত বীমা পরিকল্পনা।

(গ) ভারতের খাদ্য কর্পোরেশন।

Indian Economics—Pass (B. A.)

1968

Revised Regulation.

1. Give a critical assessment of the current food situation in India.

ভারতের বর্তমান খাদ্যসমস্যার পর্যালোচনা কর।

2. What policies would you advocate for arresting inflationary pressures during the Forth Plan period ?

চতুর্থ পরিকল্পনাকালে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধের জন্য কোন নীতি তুমি সমর্থন কর ?

3. Explain the role of deficit financing in planned economic development of underdeveloped countries in the context of the Indian situation.

ভারতের অবস্থা উল্লেখ করিয়া অর্ধোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঘাটতি ব্যয়ের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

4. Explain the reasons for the foreign exchange crisis during the plan period in India. What measures would you suggest to improve the situation ?

পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতে বৈদেশিক মুদ্রাসঙ্কটের কারণ ব্যাখ্যা কর। সঙ্কট অবসানকল্পে কি পন্থাসমূহ তুমি গ্রহণ করিবে ?

5. Discuss the objectives and functions of the Development Banks that are operating in India.

ভারতে কার্যরত উন্নয়ন ব্যাঙ্কসমূহের উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী আলোচনা কর।

6. Give your own ideas about the proper sizes and properties for the next Five Year Plan of India.

ভারতের পরবর্তী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সঠিক আকার এবং অগ্রাধিকার সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত কর।

7. Analyse the impact of population growth of India's economic development.

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

8. Examine the causes of industrial disputes in India in recent

years. What legal machinery is available for the settlement of industrial disputes in India to-day ?

সাম্প্রতিককালে ভারতে শিল্পবিরোধের কারণগুলি আলোচনা কর। বর্তমানে শিল্পবিরোধ নিষ্পত্তির জগ্গ ভারতে কি আইনগত উপায় রহিয়াছে ?

9. From what sources do you think additional resources can be mobilized for financing the requirements of Indian economic development ? What reform in the Indian Tax structure would you suggest in this connection ?

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জগ্গ কোন্ কোন্ উৎস হইতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ করা যাইবে বলিয়া তুমি মনে কর ? এই প্রসঙ্গে ভারতীয় কর কাঠামোর কিরূপ সংস্কার তুমি চাও ?

10. Give a critical review of the current problems that face the Indian Cotton Mill industry.

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প বর্তমানে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা কর।

Calcutta University B. Com. Questions

INDIAN ECONOMIC PROBLEMS

1965

1. Give a critical estimate of the achievements of the first two Five Year Plans in the sphere of agriculture.

প্রথম দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষির ক্ষেত্রে সাফল্যের পর্যালোচনা কর।

2. Comment on the main features of the fiscal policy followed in India since 1949-50.

১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ভারতে অনুসৃত ফিস্ক্যাল নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির উপর মন্তব্য কর।

3. Describe the agencies available in India for supplying long-term finance to large-scale industries. How far are they adequate and efficient ?

ভারতে বৃহদায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন মূলধন সরবরাহকারী সংস্থাগুলির বর্ণনা কর। ইহারা কতখানি পর্যাপ্ত এবং দক্ষ ?

4. Discuss the recent developments in the balance of payments position of this Country.,

এই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্সের যে সাম্প্রতিক পরিবর্তন হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

5. Discuss the nature of unemployment problem in India. What steps would you suggest for the reduction of unemployment in this Country ?

ভারতে বেকার সমস্যা প্রকৃতি আলোচনা কর। বেকার সমস্যা হ্রাস করিবার জন্ত তুমি কি ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করিবে ?

6. Critically examine the measures that have been adopted in India during the plan periods for the development of small and cottage industries.

পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতে ক্ষুদ্র এবং কুটীরশিল্পের উন্নয়নের জন্ত যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের পর্যালোচনা কর।

7. Discuss the relation between the joint stock banks and the Reserve Bank of India.

যৌথ মূলধনী ব্যাঙ্ক এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্পর্ক আলোচনা কর।

8. Discuss the measures of social security adopted in India for industrial workers.

শিল্প-শ্রমিকদের জন্ত ভারতে সামাজিক নিরাপত্তার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

9. Discuss the case for and against using foreign capital for India's economic development. What are the different sources of such Capital available to India ?

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈদেশিক মূলধন ব্যবহারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি দেখাও। ভারতে বৈদেশিক মূলধনের উৎসগুলি কি কি ?

10. Write short notes on any two of the following :—

(a) Managing Agency System in India, (b) Central Excise Duties, (c) Population Problem in India, (d) National Income in India.

যে কোন দুইটির উপর টীকা লিখ—(ক) ভারতের ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা, (খ) কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্ক, (গ) ভারতে জনাধিক্য সমস্যা, (ঘ) ভারতের জাতীয় আয়।

1966

1. Examine the case for and against the introduction of Co-operative farming in India.

ভারতে সমবায় চাষ প্রবর্তনের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি পরীক্ষা কর।

2. Indicate the nature of the food problem in India. How far can State Trading solve the problem ?

ভারতে খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি আলোচনা কর। খাদ্যশস্যের রাষ্ট্রীয়করণ এই সমস্যা কতদূর সমাধান করিতে পারে ?

3. Write a critical note on the methods adopted for financing the Third Five Year Plan of India.

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অর্থ সংগ্রহের যে পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করা হইয়াছে তাহাদের পর্যালোচনা কর।

4. Give a critical comment on the working of the Industrial Finance Corporation of India.

ভারতের শিল্প অর্থ কর্পোরেশনের কার্যাবলীর পর্যালোচনা কর।

5. Describe the existing machinery for the settlement of industrial disputes in India. Is it adequate and efficient ? Give reasons for your answer.

ভারতের শিল্পবিবাদ নিষ্পত্তির উপায়ের বর্ণনা কর। ইহা কি যথেষ্ট এবং দক্ষ ? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

6. Examine the monetary policy of the Reserve Bank of India since 1956.

১৯৫৬ সালের পর হইতে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের আর্থিক নীতির আলোচনা কর।

7. Discuss the scheme of Deposit Insurance as adopted in India.

ভারতে গৃহীত আমানত বীমা পরিকল্পনা আলোচনা কর।

8. Comment on the distribution of financial resources between the Union and State Governments in India.

ভারতে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের মধ্যে আর্থিক সম্পদ বন্টন সম্পর্কে মন্তব্য কর।

9. Critically examine the industrial policy of the Government of India.

ভারত সরকারের শিল্পনীতি পর্যালোচনা কর।

10. Explain the reasons for the introductions of the Expenditure Tax in India.

ভারতে ব্যয়কর প্রবর্তনের স্বপক্ষে যুক্তিসমূহ আলোচনা কর।

1967

1. Comment on the achievements and deficiencies in the sphere of agriculture during the Third Plan period in India.

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে কৃষির ক্ষেত্রে সাফল্য এবং ব্যর্থতার পর্যালোচনা কর।

2. Give a critical estimate of the Co-operative movement in India.

ভারতে সমবায় আন্দোলনের পর্যালোচনা কর।

3. Indicate the place of small industries in Indian economy. Discuss the steps that have been taken to develop them.

ভারতীয় অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্পের স্থান নির্দেশ কর। উহার উন্নতির জন্য যে কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

4. Examine the main features of the fiscal policy followed in India since 1949-50.

১৯৪৯-৫০ সাল হইতে ভারতে অনুসৃত শুল্কনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যালোচনা কর।

5. Discuss the measures adopted in India for providing social security to the industrial workers.

শিল্প শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তার জন্য ভারতে যে সকল কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।

6. Discuss the main reasons for devaluating the Indian rupee in June, 1966.

১৯৬৬ সালের জুন মাসে ভারতীয় টাকার মূল্যমান হ্রাসের প্রধান প্রধান কারণগুলি আলোচনা কর।

7. Account for the rise in the general price level in India during the period of the Third Five Year Plan.

তৃতীয় পরিকল্পনাকালে ভারতে সাধারণ মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণ বিশ্লেষণ কর।

8. Discuss the relation between the Reserve Bank of India and the joint stock banks.

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং যৌথমূলধনী ব্যাঙ্কসমূহের মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা কর।

9. Write a short note on the balance of payments problems of India in recent years.

সাম্প্রতিককালে ভারতের বাণিজ্য ব্যালান্স সমস্যার উপর একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

10. Write a note on the importance of Income Tax and Central Excise duties in india.

ভারতে আয় কর এবং কেন্দ্রীয় অন্তঃশুল্কের প্রয়োজনীয়তার উপর টীকা লিখ।

B. Com. 1968

1. Indicate the nature of the food problem in India. How far do you think that complete state trading is desirable or feasible in solving the problem ?

ভারতের খাদ্য সমস্যার প্রকৃতি বর্ণনা কর। এই সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য কতদূর বাঞ্ছনীয় বা কার্যকরী বলিয়া তুমি মনে কর ?

2. Describe briefly the agencies available in India for supplying long term finance to large scale industries. How far are they adequate or efficient ?

ভারতে বৃহদায়তন শিল্পে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রাপ্তির বিভিন্ন উৎসগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। ঐগুলি কতদূর পর্যাপ্ত ও দক্ষ ?

3. Write a short note on the growth of population in this country during the Plan period, and its impact on the economic developments of India.

পরিকল্পনাধীন সময়ে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখ এবং ভারতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে উহার প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

4. Argue the case for and against the nationalisation of banks in India.

ভারতে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি আলোচনা কর।

5. What are the main causes of industrial disputes in India ? Comment on the machinery available for the settlement of such industrial disputes.

ভারতের শিল্পবিরোধের প্রধান কারণগুলি কি ? এইরূপ শিল্পবিরোধের নিষ্পত্তির উপায়গুলি সম্পর্কে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

6. Write a note on the deficiencies of the Third Five Year Plan of India. What according to you, are the problems that need urgent attention in the Fourth Plan ?

ভারতের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ত্রুটিবিচ্যুতির উপর টীকা লিখ। তোমার মতে চতুর্থ পরিকল্পনায় কোন্ সমস্যা সমাধানের প্রতি জরুরী দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন ?

7. Comments on the industrial policy of the Government in India.

ভারত সরকারের শিল্পনীতি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য ব্যক্ত কর।

8. Critically examine the existing arrangements regarding distribution of financial resources between the Union and the State Governments in India.

কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পদ বণ্টনের বর্তমান ব্যবস্থার আলোচনা কর।

9. Discuss the chief of foreign trade of India. Describe briefly the measures adopted in recent times to promote export trade.

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর। বর্তমানে রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্ত যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান কর।

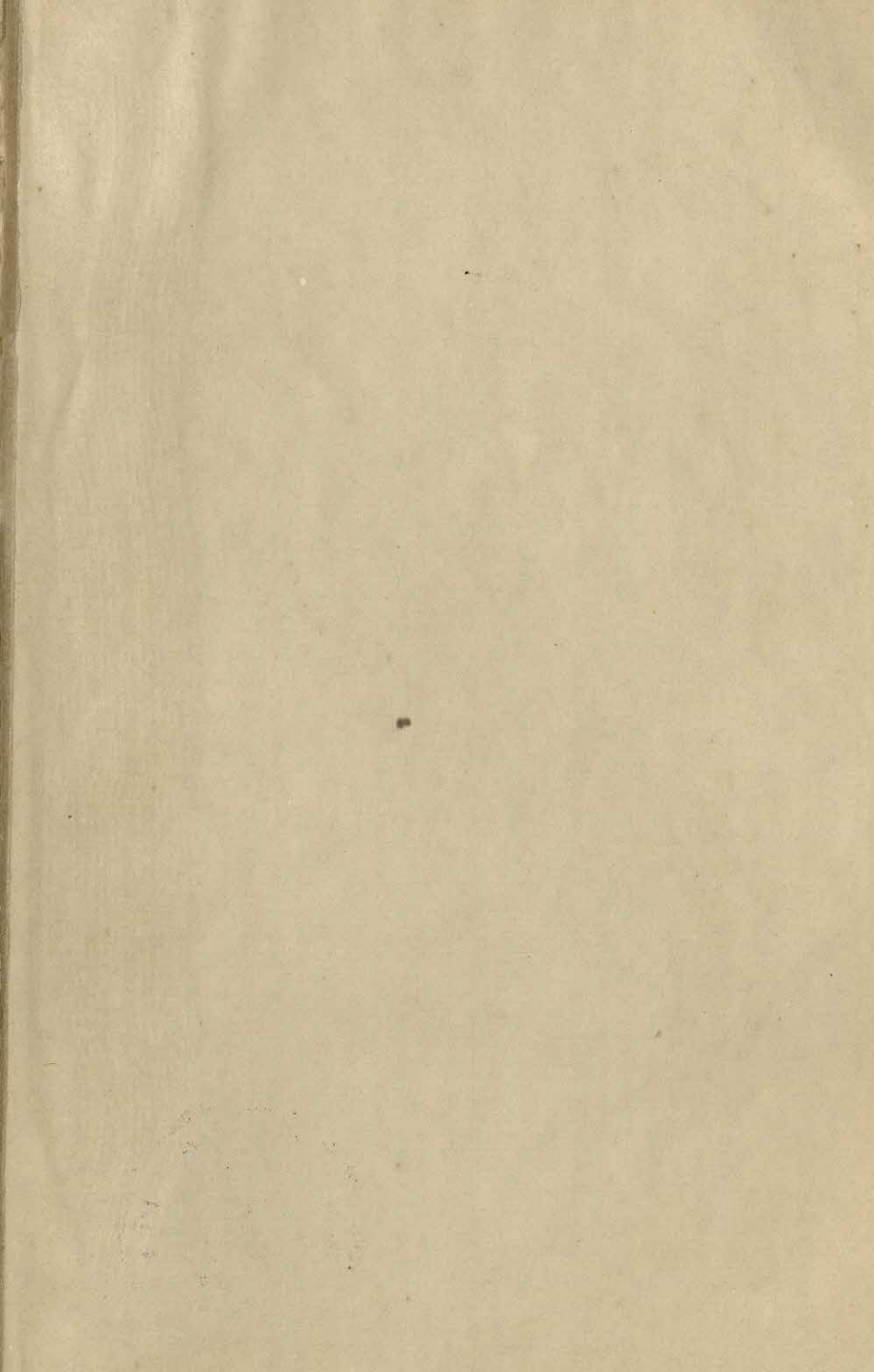
10. Discuss the case for using foreign aid to bring about economic development in India.

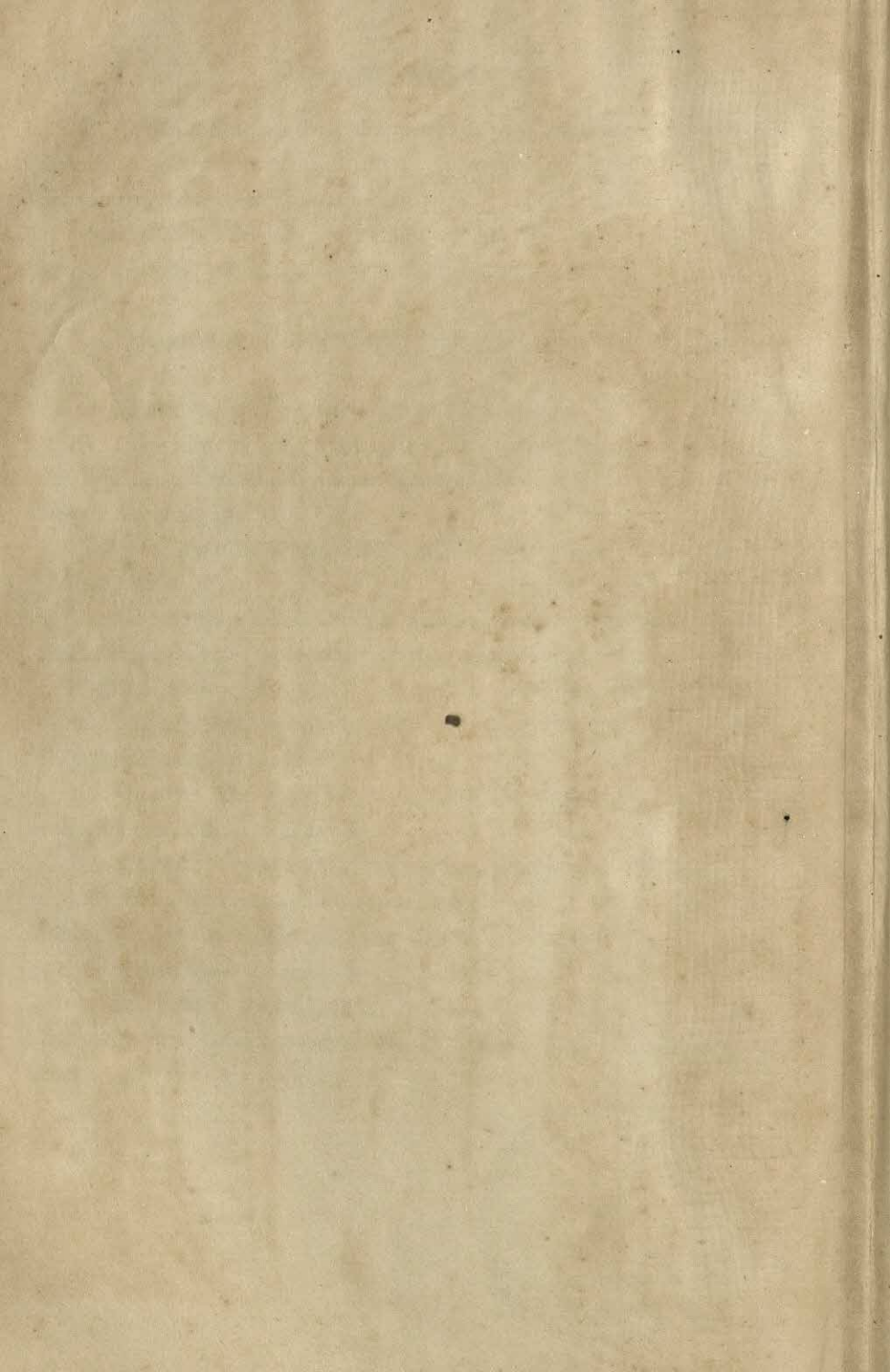
ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা আলোচনা কর।

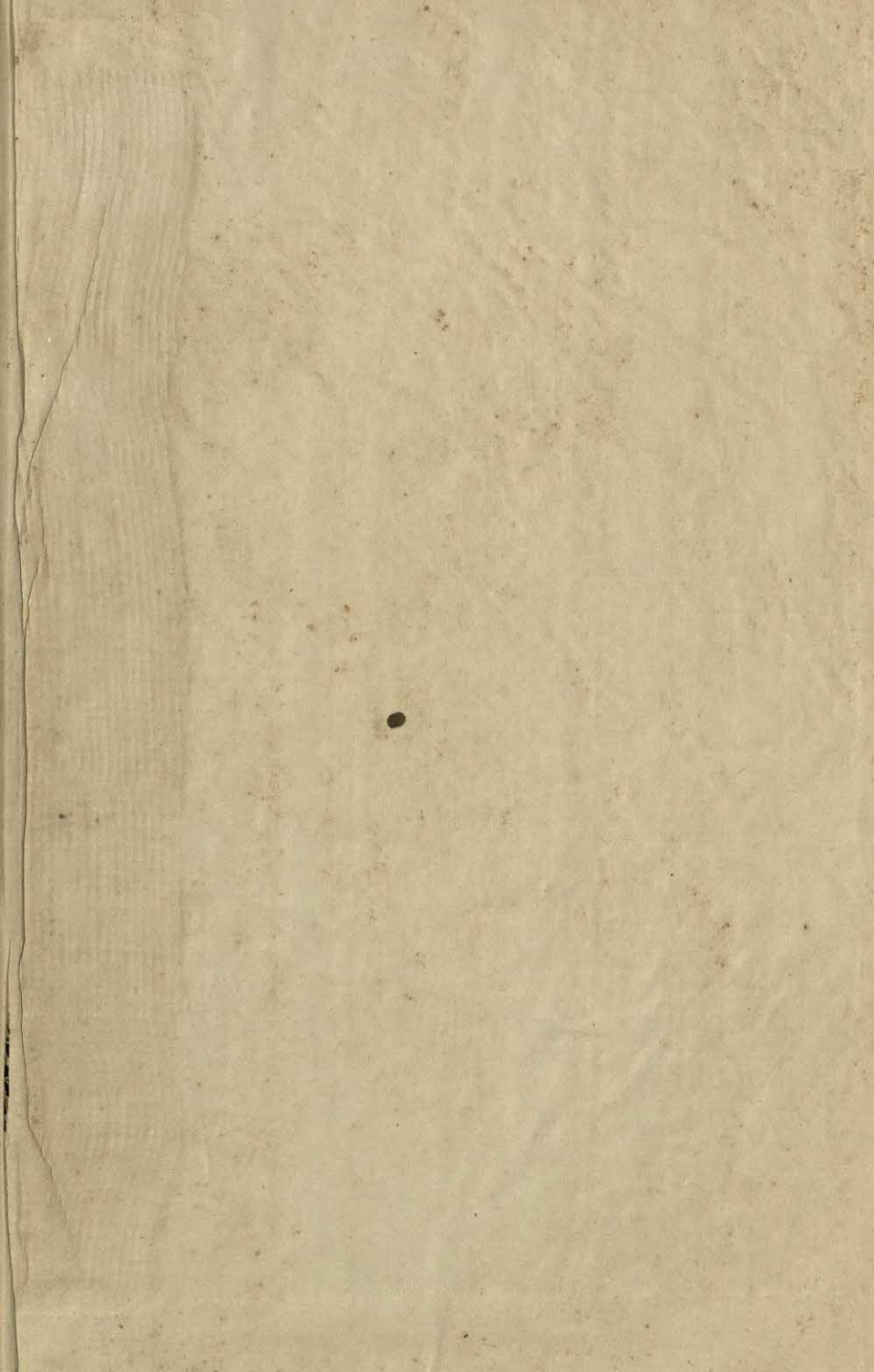
11. Comment on the nature and magnitude of the problem of unemployment in India and on the measures adopted during the Plan period to solve the problem.

ভারতের বেকার সমস্যা প্রকৃতি ও গুরুত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য কর। এবং পরিকল্পনাধীন সময় ঐ সমস্যা সমাধানের জন্ত যে কার্যসূচী প্রণয়ন করা হইয়াছে তাহা আলোচনা কর।









আধুনিক অর্থনীতি

—জিতেন্দ্র কুমার মিত্র

ব্যবসায় সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা

—সত্যশরণ চ্যাটার্জী

বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন

—অরুণকুমার সেন ও জিতেন্দ্র কুমার মিত্র

SIMPLIFIED COMMERCIAL AND INDUSTRIAL LAW

(in Questions and Answers)

With a Foreword by

Rector A. K. Sen and Prof. J. K. Mitra

SIMPLIFIED INDIAN ECONOMICS

(in Questions and Answers)

With a Foreword by

Prof. Akash Ghosh

দি ওয়াল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৭ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

দশ টাকা